প্রথম সংস্করণ ১৯৪৮

অনুবাদ : মাহফুজ উল্লাহ

প্রকাশনে : বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়

মুদ্রণে : বিদেশী ভাষা মুদ্রণালয়

পরিবেশনায় : চীনা প্রকাশন কেন্দ্র (গুওজি শুডিয়ান)

সূচীপত্র

«হে যুদ্ধ স্বাগত» গল্প সংকলনের ভূমিকা

যৌবনে আমারও অনেক স্বপ্ন ছিল। যার অনেককিছু এখন মনে নেই, কিন্তু তা নিয়ে কোন দুঃখবোধ নেই। অতীতের স্মৃতিচারণায় আনন্দ আছে, কিন্তু কখনো কখনো নিজেকে বড় একা মনে হয়। ফেলে আসা নিঃসঙ্গ দিনগুলোকে আঁকড়ে ধরার কোন মানে হয় না। কিন্তু অসুবিধে হচ্ছে আমি পুরোপুরি ভুলে যেতে পারি না। আমার স্মৃতি থেকে যা মুছে ফেলতে পারিনি, তা থেকেই এ গল্পগুলোর জন্ম।

চার বছরেরও বেশী সময় প্রায় প্রতিদিন আমি বন্ধকী কারবারের দোকান ও ঔষধের দোকানে যেতাম। মনে করতে পারি না তখন বয়স কত ছিল। কিন্তু ঔষধের দোকানের কাউণ্টারের উচ্চতা ছিল আমার সমান এবং বন্ধকী কারবারের দোকানের কাউণ্টারের উচ্চতা ছিল আমার দ্বিগুণ। দ্বিগুণ উচ্চতার সেই কাউণ্টারে কাপড় ও গহনা দিয়ে আমি তাদের ঘৃণা-মেশানো টাকা নিতাম এবং সমান উচ্চতার কাউণ্টারে গিয়ে দীর্ঘ অসুস্থ বাবার জন্য ঔষধ কিনতাম। বাড়ীতে ফেরার পর নিজেকে ব্যস্ত রাখার মত অনেক কিছু ছিল। যে ডাক্তার বাবাকে দেখতেন তিনি ছিলেন বহু পরিচিত। তিনি অস্বাভাবিক ঔষধ ব্যবহার করতেন। শীতকালে ঘৃতকুমারীর শেকড়, তিন বছর ধরে শিশির ভেজা আখ, দম্পতি ঝিঁঝিঁ পোকা এবং বীজ পাকা আর্ডিসিয়া ...... যেগুলো সংগ্রহ করা ছিল কষ্টসাধ্য। কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত বাবার শরীর দিন দিন খারাপ হতে থাকে।

আমি বিশ্বাস করি যারা বিত্ত থেকে দারিদ্রে নেমে আসে, তারা বুঝতে পারবে সংসার কি? আমি N -এ K স্কুলে[1] যেতে চেয়েছিলাম, সম্ভবতঃ পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য। যাতায়াতের জন্য আট টাকা জোগাড় করা এবং যা খুশী করতে দেয়া ছাড়া মায়ের কিছুই করণীয় ছিলনা। মা যে কেঁদেছেন সেটা স্বাভাবিক। কেননা সে সময় চিরায়ত সাহিত্য পড়া এবং রাজকীয় পরীক্ষা দেয়াই

ছিল উত্তম ব্যবস্থা। যে কেউ 'বিদেশী বিষয়' পড়েছে, সবাই তাকে নিষ্কর্মা হিসেবে খাটো করে দেখেছে, — যে হতাশায় বাধ্য হয়ে বিদেশী শয়তানদের কাছে আত্মা বিক্রী করেছে। আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ির দু:খও মায়ের ছিল। কিন্তু এতৎসত্বেও আমি N -এ গিয়ে K স্কুলে ভর্তি হই। সেখানেই প্রথমবারের মত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অংক, ভূগোল, ইতিহাস, ছবি আঁকা এবং শারীরিক শিক্ষার মত বিষয়গুলোর নাম শুনি। শরীরতত্ব সম্পর্কে সেখানে কোন কোর্স ছিলনা। কিন্তু সেখানেই «মানবদেহ সম্পর্কে নতুন পাঠ» এবং«রসায়ন ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে রচনা»র কাঠের সংস্করণ আমরা দেখতে পাই। আমার চেনা ডাক্তারের কথা ও ব্যবস্থাপত্র মনে কবে এবং এখন যা জানি তার সঙ্গে তা মিলিয়ে আমি বুঝতে পারি এরা হয়ত বোকা নযত হাতুড়ে ডাক্তার। এদের হাতে নিগৃহীত পঙ্গু ও পবিবারগুলোর জন্য আমি সমবেদনা বোধ করতে থাকি। অনূদিত ইতিহাস থেকে আমি জানতে পারি পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের ফলে ব্যাপকভাবে জাপানে সংস্কার শুরু হযেছে।

এই তুচ্ছ জ্ঞানই আমাকে জাপানের একটি প্রাদেশিক মেডিকেল কলেজে নিয়ে যায়। আমি স্বপ্ন দেখতাম চীনে ফিরে এসে বাবার মত ভুল চিকিৎসাব শিকার রোগীদের সারিয়ে তুলব। যুদ্ধ বাঁধলে সেনাবাহিনীব ডাক্তার হিসেবে কাজ করব এবং একই সময়ে সংস্কারে দেশবাসীর বিশ্বাস জাগিয়ে তুলব।

জানি না মাইক্রোবায়োলজি পড়ানোর জন্য আজ কি ধরণের আধুনিক ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তখন জীবাণু দেখানোর জন্য লণ্ঠন স্লাইড ব্যবহার করা হোত এবং তাড়াতাড়ি বক্তৃতা শেষ হলে সময় কাটানোর জন্য শিক্ষক প্রাকৃতিক দৃশ্য বা খবরেব স্লাইড ব্যবহার করতেন। তখন জাপান-রাশিয়া যুদ্ধ চলছে। কাজেই যুদ্ধের প্রচুব ছবি ছিল এবং অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে বক্তৃতা কক্ষে আমাকেও হাততালি ও আনন্দে যোগ দিতে হত। দীর্ঘদিন কোন দেশ-বাসীকে আমি দেখি নি। কিন্তু একদিন একটি ছবিতে বেশকিছু চীনা দেখি, যাদের একজন বন্দী এবং তার পাশে বেশকিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে। তারা শক্তসমর্থ মানুষ কিন্তু উদাস। ধারাবর্ণনা অনুযায়ী বন্দী লোকটি রাশিয়ার গুপ্তচর, অন্যদের প্রতি হুঁশিয়ারি হিসেবে জাপানী সৈন্যরা যার মাথা কেটে ফেলবে। সেখানে সমবেত চীনারা এই মজা দেখতে এসেছে।

পড়া শেষ না করেই আমি টোকিও'র উদ্দেশে যাত্রা করি। কেননা এ ছবি দেখার পর মনে হয় চিকিৎসা বিজ্ঞান আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। একটি দুর্বল এবং অনুন্নত দেশের লোক যত শক্তসমর্থই হোক না কেন, উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে অথবা এ ধরণের ব্যর্থ পরীক্ষার সাক্ষী হতে পারে। এদের কতজন

অসুস্থতায় মারা যায় তাতে কিছু যায় আসে না। সেজন্যে সবচে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন। সেই থেকে উপলব্ধি করি এ ব্যাপারে সাহিত্যই হচ্ছে সবচে উত্তমপন্থা এবং আমি একটি সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেই। বহু চীনা ছাত্র টোকিওতে আইন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন এমনকি পুলিশীকাজ ও প্রকৌশলবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছিল কিন্তু শিল্প-সাহিত্য কারো বিষয় ছিল না। যাহোক, এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও কিছু সমমনার সঙ্গে আমার দেখা হয়। প্রয়োজনীয় কয়েকজনের সঙ্গে আমরা মিলিত হই। আলোচনার পর ঠিক হয় আমাদের প্রথম কাজ পত্রিকা প্রকাশ করা, যার নাম থেকে বোঝা যায় এটা নতুন জন্ম। তখন প্রাচীনপন্থী ছিলাম বলে এর নাম দেই «নতুন জীবন»।

প্রকাশনার সময় ঘনিয়ে আসতেই আমাদের কিছু লেখক পিছিয়ে পড়ে এবং তাব পর তহবিল প্রত্যাহার করা হয়। শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে কপর্দকহীন তিনজন। অশুভ সময়ে আমরা পত্রিকাব কাজ শুরু করেছি বলে ব্যর্থতার সময় কারো কাছে অভিযোগ করতে পাবি নি। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা তিনজন আলাদা হয়ে পড়ি এবং রঙীন ভবিষ্যতের কল্পনা শেষ হয়ে যায়। এ ভাবেই «নতুন জীবনের» অপমৃত্যু ঘটে।

সে সময়ে আমি আসলে কিছুই বুঝতাম না। শুধু পরবর্তী পর্যায়ে এর অসাড়তা উপলব্ধি করতে পারি। পরে বুঝতে পারি কারো আকাংক্ষাকে যদি সমর্থন করা হয় তাহ'লে তা তাকে অনুপ্রাণিত করে, কিন্তু ঐ আকাংক্ষার বিরোধিতা করা হ'লে তা তাকে প্রতিরোধী ক'রে তোলে। কিন্তু সবচে বড় ব্যর্থতা হচ্ছে তার সোচ্চার কণ্ঠ যদি সমর্থন বা বাধা না পায়। এ হচ্ছে বিশাল মরুভূমিতে অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকা। তাই আমি নিঃসঙ্গ বোধ করতে শুরু করি।

এবং এই ক্রমবর্ধমান নিঃসঙ্গতা আমার হৃদয়কে বিষাক্ত সাপের মত জড়িয়ে ধরে।

বিশাল দুঃখবোধ সত্বেও আমার কোন ক্ষোভ ছিলনা। কেননা এই অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারি আমি সে ধরণের বীর পুরুষ নই যার আহ্বানে লক্ষ জনতা সমবেত হয়।

কিন্তু এই যন্ত্রণাদায়ক নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে ওঠা দরকার ছিল। তাই আমার অনুভূতি ভোঁতা করে দেয়ার জন্য একই সঙ্গে অতীতের দিকে তাকিয়ে এবং বর্তমানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমি বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করি। পরবর্তীতে আরো বিশাল নিঃসঙ্গতা ও দুঃখবোধ আমাকে পেয়ে বসে। তা আমি স্মরণ করতে চাইনা। আশা করি আমার সঙ্গেই এর পরিসমাপ্তি ঘটবে। তবু আমার অনুভূতিকে

ভোঁতা করে দেয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি—আমি যৌবনের উৎসাহ উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলি।

কথিত আছে S —হোষ্টেলের তিন কামরার একটিতে এক মহিলা থাকতেন। তিনি উঠোনের লোকাস্ট গাছে গলায় দড়ি দিয়েছিলেন। গাছটি এত বড় হয়েছিল যে ডাল ছোঁয়া যেতনা, কিন্তু কামরাগুলো ছিল জনশূন্য। পুরনো লিপি নকল করার জন্য আমি কয়েকবছর সেখানে থাকি। আমার অতিথির সংখ্যা ছিল নগণ্য। সে সব লিপিতে কোন রাজনৈতিক প্রশ্ন বা সমস্যা ছিল না। আমার একমাত্র আশা ছিল এধবণের শান্তিপূর্ণ জীবন কাটানোর। গরমের রাতে মশা বেড়ে গেলে আমি লোকাস্ট গাছের নীচে গিয়ে বসতাম। পাখা নাড়তে নাড়তে পাতার ফাঁক দিয়ে আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম আর বরফের মত ঠাণ্ডা শুয়া পোকা এসে পড়তে আমার ঘাড়ে।

মাঝে মাঝে কথা বলার জন্য আসত আমার একমাত্র অতিথি ও পুরনো বন্ধু জিন সিনই ভাঙ্গা টেবিলের ওপর ব্যাগ রেখে সে তার লম্বা গাউন খুলত। তার পর আমার মুখোমুখি বসত। এমনভাব দেখাত যে কুকুরের তাড়া খেয়ে তখনো তার বুক ধুক ধুক করছে।

আমি যেসব লিপি নকল করেছি তা দেখে একরাতে সে জানতে চায়, "এসব লিপি নকল করে কি লাভ?"

"কোন লাভ নেই।"

"তাহলে নকল করছ কেন?"

"বিশেষ কোন কারণ নেই।"

"আমি ভাবছি তুমি হয়ত কিছু লিখবে ......"

আমি বুঝতে পারলাম তারা«নতুন যৌবন»[2] পত্রিকা সম্পাদনা করছে। কিন্তু এ পর্যন্ত পক্ষে বা বিপক্ষে কোন প্রতিক্রিয়া না থাকায় নিঃসঙ্গ বোধ করছে। আমি বললাম :

"জানালাবিহীন একটি লোহার বাড়ীর কথা চিন্তা কর যা ধ্বংস করা যায় না। এর ভেতরে বহু লোক গভীর ঘুমে অচেতন যারা সহসা দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে। কিন্তু তুমি জান, যেহেতু তারা ঘুমের মধ্যে মারা যাবে তাই মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করবে না। তুমি যদি এখন হাল্কা ঘুমের কয়েকজনকে জাগানোর জন্য চীৎকার কর এবং অন্যান্য হতভাগ্যদের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে দাও, তাহলে কি তুমি তাদের উপকার করছ?"

"যদি কয়েকজন জেগে ওঠে, তাহলে তুমি বলতে পার না যে লোহার বাড়ী

ভেঙ্গে ফেলার কোন আশা নেই।"

সত্যি বলতে কি, আপন বিশ্বাস সত্বেও আমি আশা ছাড়িনি কেননা ভবিষ্যতের মধ্যেই আশা নিহিত। তার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়ার জন্য নিজে কোন প্রমাণ হাজির করতে পারিনি। তাই লিখতে রাজী হই এবং আমার প্রথম গল্প «এক পাগলের ডায়েরী»। সেই থেকে আমি লেখা বন্ধ করতে পারিনি। এবং এই সংখ্যা একডজন না হওয়া পর্যন্ত বন্ধুদের অনুরোধে সময় সময় কোন না কোন গল্প লিখেছি।

আমার কথা বলতে গেলে, নিজেকে প্রকাশ করার জন্য আমি আর কোন বিশেষ প্রেরণা অনুভব করিনা, সম্ভবতঃ অতীতের নিঃসঙ্গতার বেদনা পুরোপুরি ভুলতে পারিনি বলে। নিঃসঙ্গতার বিরুদ্ধে যারা লড়ছে তারা যাতে সাহস না হারায় সে জন্যে মাঝে মাঝে চীৎকার করে সাহস জোগাই। আমার সে চীৎকার সাহসের না বেদনার, বিরক্তিকর না হাস্যকর তাতে পরোয়া করি না। যেহেতু এটা যুদ্ধের আহ্বান, তাই আমাকে সেনাপতির আদেশ মানতেই হবে। এজন্যে আমি মাঝে মাঝে কটাক্ষ করি। যেভাবে আমি «ঔষধ» গল্পে পুত্রের কবরে পরিচয়হীন পুষ্পমাল্য এনেছি বা «আগামী কাল» গল্পে বলিনি যে চার নম্বর শানের স্ত্রীর ছোট্ট ছেলে সম্পর্কে কোন স্বপ্ন ছিল না। কেননা তখন আমাদের নেতারা ছিলেন হতাশাবাদ বিরোধী। এবং যে যুবকরা সুখস্বপ্ন দেখছে তাদের নিঃসঙ্গতার বেদনা দিয়ে ভরিয়ে দিতে চাইনি কেননা যৌবনে আমিও সুখস্বপ্ন দেখেছি।

তাই এটা পরিষ্কার যে আমার গল্পগুলো শিল্পকর্ম নয়। এগুলো এখনো গল্প হিসেবে পরিচিত এবং একটি বইয়ে সংকলিত হচ্ছে বলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। যদিও এই সৌভাগ্যে আমি অস্বস্তি বোধ করি, তথাপি এইজন্যে ভালো লাগে যে নিদেনপক্ষে মানব সংসারে তার পাঠক রয়েছে।

যেহেতু উল্লিখিত কারণে আমার এই ছোট গল্পগুলো একটি সংকলনে পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে, তাই আমি নাম দিয়েছি«হে যুদ্ধ স্বাগত»।

ডিসেম্বর ৩, ১৯২২, বেইজিং

টীকা

1. নানজিং-এ জিয়াংনান নৌ একাডেমী।
2. «নতুন যৌবন» , সে সময়ের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে সবচে প্রভাবশালী পত্রিকা।

এক পাগলের ডায়েরী

তারা দুই ভাই হাইস্কুলে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তাদের নাম এখানে বলার দরকার নেই। বহু বছরের ব্যবধানে আমাদের যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যায়। কিছু-দিন আগে জানতে পারি তাদের একজন গুরুতর অসুস্থ। পুরনো বাড়ী যাবার পথে যাত্রাবিরতি করে তাদের দেখতে যাই। একজনের সঙ্গেই শুধু আমার দেখা হয়। সে জানায় তার ছোট ভাই পঙ্গু।

সে বলে: "এতখানি পথ কষ্ট করে আমাদের দেখতে এসেছ বলে খুশী হয়েছি, আমার ভাই কয়েকদিন আগে সেরে উঠেছে এবং সরকারী কর্মোপলক্ষে অন্যত্র চলে গিয়েছে।" তার পর হাসতে হাসতে তার ভাইয়ের দুটি ডায়েরী বের করে সে বলে এগুলো থেকে তার অসুস্থতা বুঝতে পারবে। পুরনো বন্ধুকে এগুলো দেখালে কোন ক্ষতি নেই। আমি ডায়েরীগুলো নিয়ে আসি এবং ভালো করে পড়ে দেখি। দেখতে পাই সে একধরনের মানসিক উৎপীড়নে ভুগেছে। লেখাগুলো বিভ্রান্তিকর এবং অসঙ্গতিপূর্ণ এবং সে বহু আজগুবী মন্তব্য করেছে। উপরন্তু তারিখ লেখার কথা ভুলে গেছে। একমাত্র কালির ভিন্নতা এবং লেখার পার্থক্য থেকে বোঝা যায় এগুলো একই তারিখের লেখা নয়। কিছু অংশ মোটেই বিচ্ছিন্ন নয় এবং চিকিৎসা গবেষণার জন্য আমি কিছু অংশ নকল করেছি। আমি ডায়েরীর কোন অযৌক্তিকতা পরিবর্তন করি নি। শুধু নাম বদলেছি। অবশ্য এরা সবাই এ সংসারে গুরুত্বহীন অপরিচিত গেঁয়ো লোক। সুস্থ হয়ে ওঠার পর লেখক নিজেই ডায়েরীর শিরোনাম ঠিক করেছেন, তাই আমি বদলাই নি।

১

আজ রাতে চাঁদের আলোয় বান ডেকেছে। ত্রিশ বছরের বেশী তা দেখি নি। আজ রাতে এ জ্যোৎস্না দেখে মন ভরে গেছে। মনে হচ্ছে গত ত্রিশ বছর ধরে অন্ধকারে ছিলাম। এখন আমাকে খুব সতর্ক হতে হবে। না হলে যাও বাড়ীর কুকুরটি আমার দিকে দু'বার তাকাবে কেন?

আমার ভয়ের কারণ আছে।

২

আজ রাতে কোন চাঁদ নেই। জানি এটা অমঙ্গলের প্রতীক। আজ সকালে যখন সাবধানে বাইরে গেছি তখন যাও সাহেব এমন অদ্ভুতভাবে তাকালেন যেন তিনি আমার ভয়ে ভীত, যেন আমাকে খুন করতে চান। ধরা পড়ার ভয়ে সে-খানে আরো সাত আট জন আমার সম্পর্কে ফিসফিসিয়ে আলাপ করছিল। যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তারা সবাই ঐ ধরণের। তাদের মধ্যে সবচে হিংস্র ব্যক্তি আমাকে দেখে ভেংচি কেটেছে। তাদের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে বুঝতে পেরে ভয়ে আমার আপাদমস্তক কাঁপতে থাকে।

যাহোক, আমি নির্ভয়ে চলতে থাকি। সামনে একদল ছেলেমেয়েও আমাকে নিয়ে আলাপ করছিল। তাদের চোখের দৃষ্টি ঠিক মিঃ যাও-এর মত এবং মুখমণ্ডলও বিমর্ষ। বুঝতে পারিনা কেন তারা এ ধরনের ব্যবহার করছে। "বল, কি হয়েছে।" চীৎকার না করে পারলাম না। কিন্তু তারা পালিয়ে যায়।

বুঝতে পারি না আমার সঙ্গে মিঃ যাও বা রাস্তার লোকজনের কিসের শত্রুতা। শুধু মনে পড়ে বিশ বছর আগে মিঃ গু জিউ-র পুরনো ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করেছি এবং তাই নিয়ে মিঃ গু অসন্তুষ্ট ছিলেন। মিঃ যাও তাঁকে জানেন না, কিন্তু হয়ত শুনে থাকবেন। তাই প্রতিশোধ নেয়ার জন্য রাস্তার লোকজনের সঙ্গে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। কিন্তু বাচ্চাদের ব্যাপারটা কি? সে সময় তাদের জন্ম হয়নি। আজ তারা এমন অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকাবে কেন? যেন আমাকে ভয় পায়, যেন আমাকে খুন করতে চায়। এই বিভ্রান্তি ও বিপর্যয় আমাকে সত্যিই ভয় পাইয়ে দেয়।

আমি জানি। তারা নিশ্চয়ই তাদের বাপ মায়ের কাছ থেকে এ সব শিখে থাকবে।

৩

রাতে ঘুমোতে পারি না। কোন কিছু বুঝতে হলে ভালোভাবে ভেবে দেখা দরকার।

ম্যাজিষ্ট্রেট যাদের শূলে চড়িয়েছে, বদমাতব্বররা যাদের চড় মেরেছে, দারোগা-পুলিশ যাদের বউ কেড়েছে, পাওনাদাররা যাদের বাপ-মা'কে গলায় দড়ি দিতে বাধ্য করেছে তাদেরকে আর কখনো কালকের মত এত ভীত ও মারমুখী দেখায় নি।

সবচে অস্বাভাবিক ব্যাপার হচ্ছে রাস্তার সেই মেয়েলোকটি। ছেলের পাছায় চড় মেরে সে বলেছে : "ছোট্ট শয়তান! আমার ইচ্ছে করে তোর শরীর থেকে মাংস কামড়ে খেতে।" তবু সারাক্ষণ সে আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমি বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম ; তারপর সেই হোঁদল, দাঁতাল লোকগুলো উপহাস করতে থাকে। বুড়ো ছেন এগিয়ে এসে আমাকে বাড়ীতে নিয়ে আসে।

সে আমাকে বাড়ী নিয়ে এসেছে। বাড়ীতে জ্ঞাতি গোষ্ঠীর এমন ভাব যে আমাকে চেনে না। অন্যদের মত তাদের চোখেও একই দৃষ্টি। যখন পড়ার ঘরে যাই এমনভাবে দরজা বন্ধ করেছে যেন হাঁস মুরগী খোঁয়াড়ে পুরছে। এ ঘটনা আমাকে আরো বিভ্রান্ত করে দেয়।

কয়েকদিন আগে 'নেকড়ের বাচ্চা' গ্রাম থেকে আমাদের এক ভাড়াটে শস্যহানির খবর জানাতে এসেছিল। বড়দা'কে জানায় তাদের গ্রামে এক দুষ্ট লোককে পিটিয়ে মারা হয়েছে। তারপর একদল লোক সাহস বাড়ানোর জন্য তার কলজে তেলে ভেজে খেয়েছে। বাধা দিতেই বড়দা' এবং ভাড়াটে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকায়। শুধু আজকেই বুঝতে পেরেছি বাইরের লোকদের মত তাদের চোখেও একই দৃষ্টি ছিল।

শুধু এ কথা ভাবলেই ভয়ে মাথা থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত কাঁপতে থাকে।

তারা মানুষ খেকো, তাই আমাকেও খেয়ে ফেলতে পারে।

বুঝতে পারি সেই মহিলার "মাংস কামড়ে খাওয়া" সেই হোঁদল, দাঁতাল লোকদের অট্টহাসি এবং ভাড়াটের গল্প সবই গোপনসংকেত। বুঝতে পারি তাদের কথা বিষাক্ত, হাসি ছুরির মত। তাদের দাঁত সাদা ও ঝকঝকে, তারা সবাই মানুষ খেকো।

যদিও আমি লোকটা মন্দ নই, আমার মনে হয় যে থেকে আমি মিঃ গু-র ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি সেই থেকে ব্যাপারটা শত্রুতায় দাঁড়িয়েছে। তাদের এমনসব গোপন কথা আছে যা আমি অনুমান করতে পারি না। একবার

রেগে গেলে তারা যে কাউকে মন্দ লোক বলে গাল দেবে। আমার মনে পড়ে যখন বড়দা' আমাকে রচনা লিখতে শিখিয়েছেন তখন কার কথা: যত ভাল লোক হোক না কেন আমি উল্টো যুক্তি দিলে তিনি সায় দিতেন। মন্দ লোকদের ক্ষমা করলে বলতেন, "খুব ভাল হয়েছে, এতে মৌলিকত্ব আছে।" তাদের গোপন চিন্তা অনুমান করব কেমন করে — বিশেষ করে যখন তারা মানুষ খেতে রাজী?

কোন কিছু বুঝতে হলে ভালোভাবে ভেবে দেখা দরকার। মনে পড়ে অতীতে মানুষ প্রায়ই মানুষের মাংস খেত, কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাছে অস্পষ্ট। ব্যাপারটা খুঁজে দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার ইতিহাসের কোন দিনপঞ্জী নেই এবং পাতায় পাতায় লেখা আছে "সততা ও নৈতিকতা।" ঘুমোতে পারি না বলে আমি ইচ্ছে করে মাঝরাত অবধি পড়াশোনা করি। যতক্ষণ না দৃষ্টি গুলিয়ে যায় এবং পুরো বইতে ভেসে ওঠে দুটি শব্দ "মানুষ খাও।"

বইয়ে লেখা সমস্ত শব্দ, আমাদের ভাড়াটের সকল কথা হেঁয়ালি হাসি হেসে আমার দিকে অবাকভাবে তাকিয়ে থাকে।

আমিও একজন মানুষ এবং তারা আমাকে খেতে চায়।

৪

সকালে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলাম। বুড়ো ছেন খাওয়া দিয়ে যায়: এক বাটি তরকারী, এক বাটি সেদ্ধ মাছ। মাছটির চোখ শক্ত এবং বিবর্ণ, মুখটা মানুষ-খেকো মানুষদের মত হা করা। কয়েক লোকমার পর আর বুঝতে পারি নি তা মাছ না মানুষের মাংস। তাই সবকিছু বমি করে দেই।

আমি বললাম: "বুড়ো ছেন, দাদাকে গিয়ে বল আমার দম আটকে আসছে, তাই বাগানে একটু বেড়াতে চাই।" বুড়ো কিছু না বলে চুপচাপ চলে যায়। একটু পরে ফিরে এসে গেট খুলে দেয়।

আমি নড়ি নি। কিন্তু দেখতে চেয়েছি তারা কেমন ব্যবহার করে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল তারা যেতে দেবে না। সত্যিই তাই। ধীরে ধীরে দাদা এলেন একজন বয়স্ক লোককে সঙ্গে করে। তাঁর চোখে খুনীর দৃষ্টি। দেখে ফেলব ভয়ে তিনি মাথা নুইয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে চুরি করে আমাকে দেখতে থাকেন।

দাদা বললেন: "তোমাকে আজ খুব ভালো দেখাচ্ছে।"

আমি জবাব দিলাম: "হ্যাঁ।"

তিনি বললেন: "তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য আজ মিঃ হো'কে এনেছি।"

আমি বললাম : "ঠিক আছে।" আসলে আমি ভালোভাবেই জানতাম এই বুড়ো ছদ্মবেশী কসাই। সে নাড়ী দেখার ভান করেছে আমার শরীরে মাংসের পরিমাণ জানার জন্যে ; এতে সে আমার মাংসের ভাগ পাবে। তবু আমি ভয় পাই নি। যদিও আমি মানুষ খেকো নই, আমার সাহস তাদের চেয়ে বেশী। সে কি করে দেখার জন্য আমি হাতজোড়া বাড়িয়ে দিলাম। বুড়ো বসল, চোখ বন্ধ করল, কিছুক্ষণ আবোলতাবোল বকল, কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তার পর উল্টানো চোখ মেলে বলল : "কল্পনার জগতে ভেসে বেড়াবে না। কয়েক-দিন চুপচাপ বিশ্রাম নাও, তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

কল্পনার জগতে ভেসে বেড়াবে না। চুপচাপ কয়েকদিন বিশ্রাম নাও। যেহেতু আমি মোটাতাজা হয়েছি, তাই তারা বেশী খেতে পাবে। কিন্তু তাতে আমার কি লাভ? অথবা সবকিছু 'ঠিক' হয়ে যাবে কি ভাবে? এসব লোকজন মানুষের মাংস খেতে চায়, আবার মনের ভাব লুকিয়ে রাখতে চায়। জলদি কাজ করারও সাহস নেই। এসব দেখে শুনে আমার হাসতে হাসতে মরে যাবার দশা। আমার এমন মজা লেগেছে আমি হাসিতে ফেটে পড়ি। আমি জানতাম এ হাসিতে সাহস এবং সততা আছে। আমার সাহস ও সততায় দাদা ও বুড়ো দুজনের মুখ শুকিয়ে যায়।

কিন্তু যেহেতু আমি সাহসী, তাই তারা আমাকে খেতে আরো বেশী আগ্রহী, আমার কিছু সাহসে ভাগ বসানোর জন্য। বুড়ো গেটের বাইরে চলে যায়। কিন্তু বেশী দূর যাবার আগে দাদাকে চুপিচুপি বলে : "এখনই খেয়ে ফেলতে হবে।" দাদাও সায় জানান। সুতরাং তুমিও এর সঙ্গে জড়িত! বেদনাদায়ক হলেও এই বিস্ময়কর আবিষ্কার আমার প্রত্যাশার বাইরে নয় ; আমাকে খেয়ে ফেলার দোসর আমার দাদা।

আমার দাদা মানুষ খেকো।

আমি মানুষ খেকো'র ছোট ভাই!

অন্যরা আমাকে খেয়ে ফেলবে, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আমি মানুষ খেকো'র ছোট ভাই।

৫

গত কয়েকদিন ধরে আবার ভাবছি : যদি সেই বুড়ো ছদ্মবেশী কসাই না হয়ে সত্যি ডাক্তার হয় ; তাহলেও সে মানুষ খেকো হবে। তার পূর্বসূরী লি

শিযেন[1] -এর লেখা ভেষজবিদ্যা বইতে পরিষ্কার লেখা আছে সেদ্ধ করে মানুষের মাংস খাওয়া যায় ; তাই সে কি বলতে পারে সে মানুষ খায়না ?

দাদাকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। আমাকে পড়ানোর সময় তিনি নিজ মুখে বলেছেন : "খাওয়ার জন্য লোকজন সন্তান বিনিময় করে।"[2] একবার এক মন্দ লোক সম্পর্কে বলার সময় তিনি বলেছেন তাকে শুধু খুন করাই উচিত নয়, তার "মাংস খেয়ে ফেলা এবং চামড়ার ওপর ঘুমানো উচিত।" আমার তখনো বয়স কম এবং কিছুক্ষণ বুক কাঁপতে থাকে। সেদিন 'নেকড়ের বাচ্চা' গ্রামের ভাড়াটে একজনের কলজে খেয়ে ফেলার যে গল্প বলেছে তাতে তিনি মোটেও অবাক হননি, বরং সায় দিয়েছেন। তিনি আগের মতই নিষ্ঠুর। যেহেতু "সন্তান বিনিময়" সম্ভব তাই যে কোন কিছু বিনিময় করা যায়, যে কোন লোককে খাওয়া যায়। অতীতে শুধু তাঁর ব্যাখ্যা শুনেছি, তাতে কান দেইনি। এখন বুঝতে পারি যখন তিনি এসব বলতেন তখন তাঁর ঠোঁটের কোণে শুধু মানুষের চর্বিই লেগে থাকতনা, তাঁর সমস্ত হৃদয় তৈরী হয়ে থাকত মানুষ খাওয়ার জন্য।

৬

গভীর অন্ধকার। জানিনা এখন দিন না রাত। যাও বাড়ীর কুকুরটি আবার ডাকছে।

সিংহের হিংস্রতা, খরগোশের ভীরুতা, শেয়ালের ধূর্ততা . . . . . .

৭

আমি তাদের ব্যাপারটা জানি। তারা সোজাসুজি কাউকে খুন করতে চায় না, পরিণতির ভয়ে সাহসও করেনা। অপরদিকে আমাকে আত্মহননে বাধ্য করতে তারা দল পাকিয়েছে এবং সর্বত্র জাল ফেলেছে। কয়েকদিন আগে রাস্তায় লোকজনের ব্যবহার এবং গত কয়েকদিনে দাদার মনোভাব থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাদের সবচে বেশী পছন্দ হচ্ছে একজন লোক তার বেল্ট খুলে কড়িকাঠের সঙ্গে গলায় দড়ি দেবে। তাহলেই তারা খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত না হয়ে মনের ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে। স্বভাবতঃই তারা এতে

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। অপরদিকে ভয়ে বা চিন্তায় কেউ শুকিয়ে মরলেও তাদের আপত্তি নেই।

তারা শুধু মরা মাংস খায়! হিংস্র প্রাণী হায়েনার কথা, যা সবসময় মরা মাংস খায়, কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ে। এমনকি বড় হাড্ডিও এটা চিবিয়ে গিলে ফেলে ; শুধু এই ভাবনাই আমাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট। "হায়েনার" সঙ্গে নেকড়ের সম্পর্ক আছে এবং নেকড়ে কুকুর-প্রজাতির। আরেকদিন যাও বাড়ীর কুকুর আমার দিকে কয়েকবার তাকিয়েছে ; নিঃসন্দেহে এটাও ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে তাদের দোসর হয়েছে। বুড়োর চোখ ছিল নীচের দিকে, কিন্তু তা আমাকে প্রতারণা করেনি!

সবচে শোচনীয় অবস্থা দাদার। তিনিও মানুষ। তিনি কেন ভয় পান না? আমাকে খেয়ে ফেলার জন্য কেন তিনি অন্যের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছেন? একবার অভ্যাস হয়ে গেলে তিনি আর অপরাধের কথা ভাবেন না? অথবা মন্দ কাজ করার জন্য তিনি কি তাঁর হৃদয়কে নিষ্ঠুর বানিয়ে ফেলেছেন?

মানুষ খেকোদের অভিশাপ দেয়ার সময় দাদাকে দিয়েই শুরু করব। মানুষ খেকোদের বিরত করার সময়ও তাঁকে দিয়েই শুরু করব।

৮

আসলে অনেক আগেই এ সব যুক্তি তাদের মেনে নেয়া উচিত ছিল......

হঠাৎ কেউ এল। তার বয়স মাত্র বিশ। আমি তার চেহারা ভালোভাবে দেখিনি। তার মুখে ছিল হাসি, কিন্তু যখন সে আমাকে স্বাগত জানায় তখন তা সত্যি মনে হয়নি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, "মানুষ খাওয়া কি ঠিক?" হাসতে হাসতে সে জবাব দিল : "দুর্ভিক্ষ না থাকলে কেউ মানুষ খায় কি করে?"

তখনি বুঝতে পারি সে তাদের একজন। তবু সাহস সঞ্চয় করে আবার প্রশ্ন করি :

"এটা কি ঠিক?"

"তুমি এসব জিজ্ঞেস করছ কেন? তুমি সত্যিই...... ঠাট্টা করতে ভালবাস...... আজ খুব চমৎকার দিন।"

আজ খুব চমৎকার দিন, চাঁদ খুব উজ্জ্বল। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে চাই : "এটা কি ঠিক?"

তাকে উত্তেজিত মনে হল এবং সে বিড়বিড়িয়ে বলল, "না......"

"না? তাহলে তারা এখনো তা করছে কেন?"

"তুমি কিসের কথা বলছ?"

"আমি কিসের কথা বলছি? এখন তারা 'নেকড়ের বাচ্চা' গ্রামে মানুষ খাচ্ছে এবং দেখ গোটা বইতে তা নতুন লাল কালিতে লেখা আছে।"

তার মুখের ভাব বদলে বিবর্ণ হয়ে যায়। আমার দিকে তাকিয়ে বলে: "এটা হতে পারে। সবসময়ই এরকম ছিল ......"

"সবসময় এরকম ছিল বলেই কি এটা ঠিক?"

"তোমার সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলতে চাইনা। তোমার এসব নিয়ে কথা বলা উচিত নয়। যে কেউ এসব নিয়ে কথা বলে সে ভুল করছে।"

লাফিয়ে উঠে চোখ বড় করে তাকাই। কিন্তু লোকটি হাওয়া হয়ে গেছে। ঘামে আমার গা ভিজে গেছে। সে দাদার চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু সেও এর সঙ্গে জড়িত। নিশ্চয়ই বাবা-মা তাকে এসব শিখিয়েছে। এবং আমার ভয় হয় সে তার ছেলেকেও শিখিয়েছে, তাই ছেলেমেয়েরাও এমন মারমুখী হয়ে আমার দিকে তাকায়।

৯

মানুষ খেতে চাওয়া, একই সঙ্গে নিজেরাও খাবার হয়ে খাবার ভয়। তাই তারা একে অপরের দিকে গভীর সন্দেহের চোখে তাকায় ......

জীবন কত আরামদায়ক হত যদি তারা এই মোহ থেকে মুক্তি পেয়ে কাজে যেতে পারত, হাঁটতে পারত এবং আয়েসে খেতে ও ঘুমোতে পারত। তাদের সামনে এই একটি পথই খোলা। তবু এই পথে যেতে একে অপরকে বাধা দিয়ে পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, ভাই, বন্ধু, ছাত্র-শিক্ষক, জাত শত্রু এবং এমনকি অচেনা ব্যক্তি সবাই এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে।

১০

আজ খুব ভোরে দাদার খুঁজে গিয়েছিলাম। তিনি হলঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছিলেন। তাঁর পিছু পিছু গিয়ে দরজা ও তাঁর মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়াই। তার পর অসীম বিনয়ের সঙ্গে বলি:

"দাদা, তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।"

দ্রুত আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন : "কি?"

"খুব সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু বলতে আমার কষ্ট হয়।দাদা, সম্ভবতঃ শুরুতে সব আদিম মানুষই অল্পসল্প মানুষের মাংস খেত। পরে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাওয়ায় তাদের কেউ কেউ এটা বন্ধ করে। এবং যেহেতু তারা ভালো হবার চেষ্টা করে তাই তারা সত্যিকারের মানুষে বদলে যায়। কিন্তু কেউ কেউ এখনো সরীসৃপের মতো খাচ্ছে। কেউ কেউ বদলে মাছ, পাখী, বানর এবং শেষ পর্যন্ত মানুষ হয়েছে। কেউ কেউ ভালো হবার চেষ্টা করে নি এবং এখনো সরীসৃপ রয়ে গেছে। যারা মানুষ খেকো তারা যখন অন্যদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে তখন তাদের লজ্জা পাওয়া উচিত। বানরের সামনে সরীসৃপের যে লজ্জা তারচে বেশী লজ্জিত হওয়া উচিত।

"অতীতে জিয়ে এবং যৌ-এর খাবার হিসেবে নিজের ছেলেকে সেদ্ধ করেছিল ই ইয়া।[3] কিন্তু বাস্তবে পান গু-র হাতে স্বর্গ-মর্ত্য সৃষ্টির সময় থেকে মানুষ একে অপরকে খাচ্ছে—ই ইয়ার ছেলের সময় থেকে স্যু সীলিনের[4] সময় পর্যন্ত, স্যু সীলিনের সময় থেকে 'নেকড়ের বাচ্চা' গ্রামে ধরা পড়া লোকটির সময় পর্যন্ত। গত বছর তারা শহরে এক আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে এবং এক যক্ষারোগী তার রক্তে রুটি ভিজিয়ে তা চুষেছে।

"তারা আমাকে খেতে চায়। অবশ্যি আপনি একা এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারবেন না। কিন্তু আপনি তাদের দলে যোগ দিচ্ছেন কেন? মানুষ খেকো হিসেবে তারা যা খুশী করতে পারে। আমাকে খেলে, তারা আপনাকেও খেতে পারে, একই দলের লোকজন একে অপরকে খেতে পারে। কিন্তু আপনি যদি এখনই পথ বদলান, তাহলে সবাই শান্তি পাবে। যদিও এটা অনাদিকাল ধরে চলে আসছে তবু ভালো হবার জন্য আজকে আমরা বিশেষ উদ্যোগ নিতে পারি এবং বলতে পারি এটা আর ঘটবে না। দাদা, আমার বিশ্বাস আপনি এটা বলতে পারেন। আরেকদিন যখন ভাড়াটে ভাড়া কমাতে চেয়েছে, আপনি বলেছেন তা সম্ভব নয়।"

প্রথমে তিনি অবিশ্বাসের হাসি হেসেছেন, তারপর তাঁর চোখে খুনীর দৃষ্টি এসেছে এবং যখন তাদের গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছি তাঁর মুখ শুকিয়ে গেছে। গেটের বাইরে থেকে মিঃ যাও, তার কুকুর সহ একদল লোক উঁকি মারছে। সবার মুখ দেখতে পাচ্ছি না, মনে হচ্ছে মুখোশ আঁটা। তাদেরকে ফ্যাকাশে ও প্রাণহীন দেখাচ্ছে, তাদের হাসি লুকানো। আমি জানি তারা একদলের, সবাই মানুষ খেকো। কিন্তু এও জানি তাদের সবাই একই চিন্তা করে না।

তাদের কেউ কেউ মনে করে যেহেতু এটা চলে এসেছে তাই মানুষ খাওয়া উচিত। কেউ কেউ জানে মানুষ খাওয়া উচিত নয়, তবু তারা খেতে চায়। তারা ভয় পায় লোকজন তাদের গোপন কথা জেনে ফেলবে। তাই আমার কথা শুনতে পেয়ে তারা রেগেছে কিন্তু অবিশ্বাসী, মুচকি হাসি হেসেছে।

হঠাৎ দাদাকে ক্ষিপ্ত মনে হয় এবং তিনি চীৎকার করে উঠেন:

"তোমরা সব ভাগো এখান থেকে। পাগলের দিকে তাকিয়ে থাকার কি দরকার?"

তখন তাদের শয়তানী বুঝতে পারি। তারা কখনো তাদের মত বদলাবে না, সব পরিকল্পনা ঠিক হয়ে আছে। তারা আমাকে পাগল ঠাউরেছে। ভবিষ্যতে যখন আমাকে খেয়ে ফেলবে, কোন ঝামেলা হবে না। বরং লোকজন তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। আমাদের ভাড়াটে তাদের গ্রামে দুষ্ট লোককে খেয়ে ফেলার যে কথা বলেছে তা একই কায়দার। এটা তাদের পুরনো চাল।

বুড়ো ছেন তড়িঘড়ি দৌড়ে আসে। কিন্তু আমার মুখ বন্ধ করতে পারেনি, কেননা আমাকে লোকজনের উদ্দেশে বলতে হয়েছে:

"তোমরা বদলে যাও। হৃদয় মন নিয়ে বদলে যাও। তোমাদের জানা উচিত ভবিষ্যতে এ পৃথিবীতে মানুষ খেকোদের জায়গা হবে না।

না বদলালে তোমরা নিজেরা একে অপরকে খেয়ে ফেলবে। যদিও বহু জন্ম নিচ্ছে, তারা সত্যিকারের মানুষ-এর হাতে শেষ হয়ে যাবে, যেভাবে শিকারীর হাতে নেকড়ে শেষ হয়। ঠিক সরীসৃপের মত।"

বুড়ো ছেন সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে। দাদা চলে গেছেন। বুড়ো ছেন আমাকে কামরায় ফিরে যেতে বলেছে। কামরায় গভীর অন্ধকার। মাথার উপর কড়িকাঠ দুলছে। কিছুক্ষণ নড়ে আয়তনে বড়ো হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে আমার উপর বোঝা হয়ে চেপে বসেছে।

এত ভারী যে নড়তে পারছি না। তার অর্থ আমার মরে যাওয়া উচিত। আমি জানি এ ওজন মেকী, তাই কষ্ট করে আমাকে বেরুতে হয়। ঘামে গা ভিজে যায়। কিন্তু আমাকে বলতে হয়:

"এখনই তোমাদের হৃদয়ের অন্তকরণ থেকে বদলে যাওয়া উচিত, তোমাদের জানা উচিত ভবিষ্যতে এ পৃথিবীতে মানুষ খেকোদের জায়গা হবে না ......"

১১

সূর্যের কোন আলো নেই। দরজা খোলে না। প্রতিদিন দুবার আহার।

আমি খাবার কাঠি হাতে নেই। তারপর দাদার কথা মনে পড়ে। এখন জানি কিভাবে ছোট বোনের মৃত্যু হয়েছে। দাদাই এজন্যে দায়ী। সে সময় বোনের বয়স ছিল পাঁচ বছর। এখনো মনে পড়ে তার চেহারার কমনীয়তা। মা শুধু কাঁদতেন। তিনি মা'কে কাঁদতে বারণ করেন, সম্ভবতঃ বোনকে খেয়ে ফেলেছেন বলে। তাই মায়ের কান্না তাকে লজ্জা দিত। তার যদি কোন লজ্জা থাকত ......

দাদা আমার বোনকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু জানি না মা তা বুঝতে পেরেছেন কিনা।

আমার মনে হয় মা নিশ্চয়ই তা জানেন। কিন্তু কান্নার সময় তিনি কিছুই বলেন নি, সম্ভবতঃ তিনিও তা ঠিক মনে করেছেন। আমার মনে পড়ে চার-পাঁচ বৎসর বয়সের কথা। ঘরের দাওয়ায় বসে দাদা বলেছিলেন কারো বাবা মা'র অসুখ হলে নিজেকে সুসন্তান প্রমাণ করার জন্য তার উচিত নিজের শরীরের মাংস কেটে তা তাঁদের জন্য সেদ্ধ করে দেয়া। মা একথার প্রতিবাদ করেন নি। একটুকরো খাওয়া গেলে পুরোটাই খাওয়া যায়। এবং শোকের কথা মনে হলেই আমার হৃদয় থেকে রক্ত ঝরতে থাকে— সেটাই সবচে অবাক ব্যাপার।

১২

আমি আর এসব ভাবতে পারি না।

শুধু এটুকু বুঝতে পেরেছি যে গত কয়েকবছর ধরে আমি এমন জায়গায় বাস করছি যেখানে চার হাজার বছর ধরে তারা মানুষের মাংস খাচ্ছে। বোনের মৃত্যুর সময় দাদা সবেমাত্র বাড়ির দায়িত্ব নিয়েছেন। সম্ভবতঃ তিনি তার মাংস আমাদের ভাতে-তরকারিতে মিশিয়ে অজান্তে তা খেতে বাধ্য করেছেন।

হয়ত আমি অজান্তে বোনের কয়েক টুকরো মাংস খেয়েছি—এবার আমার পালা ......

আমার মত একজন মানুষ, যার ইতিহাসের চার হাজার বছর ধরে মানুষ খাওয়া চলছে, প্রথমে কিছু না জেনেও এখন কিভাবে সত্যিকারের মানুষদের মোকাবেলা করব?

১৩

সম্ভবতঃ এখনো অনেক শিশু আছে যারা মানুষ খায় নি।
শিশুকে বাঁচাও . . . . . .

এপ্রিল, ১৯১৮

টীকা

1. লি শিয়েন, বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী (১৫১৮—১৫৯৩), বা মেটেরিয়া মেডিকার লেখক।

2 এটা পুরনো চিরায়ত রচনা "জুও য়ুয়ান" থেকে উদ্ধৃতি।

3. পুরনো রেকর্ড অনুযায়ী ই ইয়া নিজের ছেলেকে সেদ্ধ করে ছি বংশের নবাব হুয়ানকে উপহার দিয়েছিল, তাঁর শাসনামলের সময় খৃঃ পূর্ব ৬৮৫ থেকে ৬৪৩। জিয়ে এবং যৌ ছিলেন আরো আগের অত্যাচারী শাসক। পাগল এখানে একটি ভুল করেছে।

4. স্যু সীলিন ছিলেন ছিং রাজবংশের (১৬৪৪—১৯১১) শেষ দিককার বিপ্লবী। ১৯০৭ সালে আনহুই প্রদেশের একজন সরকারী কর্মচারীকে হত্যার কারণে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং তাঁর হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ সেদ্ধ করে খেয়ে ফেলে।

খোং ইজি

লুযেনের শুঁড়ীখানাগুলো চীনের অন্যান্য এলাকার মত নয়। এসব শুঁড়ীখা-নায় রাস্তার মুখোমুখি সমকোণী কাউণ্টার আছে যেখানে মদ গরম করার গরম পানি থাকে। দুপুরে বা সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফেরার সময় লোকজন একবাটি মদ কেনে। বিশ বছর আগে এর দাম ছিল চার পয়সা আর এখন দশপয়সা। কাউণ্টারের পাশে দাঁড়িয়ে গরম মদ পান করে তারা অবসাদ দূর করে। মদের সঙ্গে খাবার জন্য আর এক পয়সায় এক প্লেট নোনা বাঁশের অংকুর বা মৌরী-মসলা দেয়া মটরশুঁটি কেনা যায়। আর বারো পয়সা হলে পাওয়া যায় এক প্লেট মাংস। কিন্তু এই খদ্দেরদের প্রায় সবাই ছোটজাতের, মাত্র গুটি কয়েকের সাধ্য আছে তা কেনার। শুধু লম্বা গাউনওয়ালা লোকজন পাশের কামরায় ঢুকে মদ ও খাবার অর্ডার দিয়ে মনের আনন্দে তা পান করে।

বারো বছর বয়সে শহরের প্রবেশ পথে 'শুভ শুঁড়ীখানায়' আমি বেয়ারা হিসেবে কাজ শুরু করি। শুঁড়ীখানার মালিকের মতে লম্বা গাউনওয়ালা খদ্দের-দের সামনে আমাকে বোকা দেখায়। তাই আমাকে বাইরের কামরায় কাজ দেয়া হয়। ছোটজাতের খদ্দেররা সহজে খুশী হলেও, তাদের মধ্যে কয়েকজন গোল-মেলে লোকও ছিল। মদ ঢালার সময় তারা নিজের চোখে তা দেখতে চাইত, দেখতে চাইত পাত্রের তলায় কোন পানি আছে কিনা অথবা গরম পানিতে তা ঠিকমত ডোবানো হচ্ছে কিনা। এত কড়াকড়ির মধ্যে মদে পানি মেশানো খুব কষ্টকর। তাই কয়েকদিন পর মালিক ঠিক করলেন আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। ভাগ্যভালো, একজন প্রভাবশালী লোক আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তাই তিনি আমাকে বরখাস্ত করতে পারেন নি। আমাকে মদ গরম করার এক ঘেঁয়ে কাজ দেয়া হয়।

সেই থেকে কাজ নিয়ে আমি সারাদিন কাউণ্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকি।

কাজে তৃপ্তি থাকলেও মনে হয়েছে এক ঘেঁয়ে ও ফালতু। মালিকের চেহারা ছিল মারমুখী আর খদ্দেররা ছিল খিটখিটে, তাই মজা করার উপায় ছিল না। শুধু খোং ইজি এলে একটু হাসতে পারতাম। একারণেই তাকে আমার এখনো মনে আছে।

লম্বা গাউনওয়ালা খদ্দেরদের মধ্যে একমাত্র খোং দাঁড়িয়ে মদ পান করত। বিশাল বপুর এই মানুষটি ছিল অদ্ভুতভাবে ফ্যাকাসে। মুখের বলিরেখায় প্রায়ই দেখা যেত ক্ষতচিহ্ন। তার ছিল লম্বা, আগোছালো কাঁচা-পাকা দাড়ি। লম্বা গাউন পরলেও সেটা ছিল জীর্ণ ও নোংরা। দেখে মনে হত দশ বছরের বেশী ধোয়াই বা রিফু করা হয় নি। তার কথায় এত পুরনো শব্দ থাকত যে অর্ধেক কথাই বোঝা যেত না। তার ডাকনাম ছিল খোং। তাই তাকে নাম দেয়া হয়েছিল খোং ইজি — বাচ্চাদের দ্রুতপঠনের প্রথম তিন অক্ষর। যখনই সে দোকানে আসত সবাই তার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসত। কেউ হয়ত বলে উঠত :

"খোং ইজি, তোমার চেহারায় আরো কিছু নতুন দাগ দেখা যাচ্ছে।"

এসব কথায় কান না দিয়ে খোং কাউণ্টারে এসে দু' বাটি গরম মদ ও মৌরী-মসলা দেয়া এক প্লেট মটরশুঁটির অর্ডার দিত। এজন্যে সে নয় পয়সা দিত। অমনি কেউ ইচ্ছা করে জোরে বলে উঠত :

"তুমি আবার চুরি করেছ।" বিস্ফারিত চোখে সে জিজ্ঞেস করত, "মিছেমিছি একজনের বদনাম করছ কেন?"

"হুঁ, বদনাম। গতপরশু আমি নিজের চোখে দেখেছি হো বাড়ী থেকে বই চুরির অপরাধে তোমাকে মেরে ঝুলিয়ে রেখেছে।"

খোং-এর মুখ লাল হয়ে যেত। প্রতিবাদ জানানোর সময় তার কপালের শিরা ফুলে উঠত, "বই নেয়া চুরি হতে পারে না...... বই বুদ্ধিজীবীর ব্যাপার, তাকে চুরি বলা যায় না।" তার পরেই আসত বিখ্যাত গ্রন্থের উদ্ধৃতি "দারিদ্রেও ভদ্রলোক চরিত্র নষ্ট করে না" এবং এক বোঝা দুর্বোধ্য শব্দ। শুঁড়ী-খানার সবাই হো হো করে হেসে উঠতেই পরিবেশ হাল্কা হয়ে যেত।

লোকমুখে শুনেছি খোং ইজি চিরায়ত বিষয় পড়েছে কিন্তু কখনো সরকারী পরীক্ষা পাস করেনি। জীবনধারণের কোন উপায় না থাকায় গরীব হতে হতে সে ভিখিরী হয়ে গেছে। ভাগ্যিভালো, তার হাতের লেখা ছিল সুন্দর এবং জীবনধারণের জন্য নকল করার অনেক কাজ সে পেতে পারত। তার দোষও ছিল : সে মদ পছন্দ করত আর আলসে ছিল। তাই কয়েকদিন পর বই, খাতা, কালি-কলম, তুলি নিয়ে সে উধাও হয়ে যেত। কয়েকবার এমন ঘটার পর কেউ আর তাকে নকল করার কাজ দিত না। তার পর মাঝেমধ্যে হাত-সাফাই করা

ছাড়া তার উপায় ছিল না। আমাদের শুঁড়ীখানায় তার ব্যবহার ছিল দেখার মত। পয়সা দিতে সে কখনো কসুর করে নি। মাঝে মাঝে পয়সা না থাকলে দেনাদারদের সঙ্গে তার নাম বোর্ডে উঠত। কিন্তু এক মাসের মধ্যেই সে পাওনা শোধ করে দিত এবং বোর্ড থেকে তার নাম মুছে যেত।

আধাবাটি মদ পান করার পর খোং তার মেজাজে ফিরে আসত। কিন্তু তখনই হয়ত কেউ বলে উঠত:

"খোং ইজি, তুমি কি সত্যি সত্যি পড়তে জানো?"

খোং এমনভাবে তাকাত যেন এ ধরণের প্রশ্ন অবান্তর। তারা আবার জিজ্ঞেস করত: "কিন্তু এটা কেমন করে হয় যে তুমি সবচে ছোট পরীক্ষা পর্যন্ত পাস করে নি?"

এতে খোংকে অসুখী এবং অশান্ত দেখায়। তার মুখ শুকিয়ে যেত, ঠোঁট নড়তে থাকত। কিন্তু সে শুধু সেই দুর্বোধ্য কথাগুলো বলত। আর সবাই হো হো করে হেসে উঠত। আনন্দময় হয়ে উঠত শুঁড়ীখানার পরিবেশ।

এসব সময়ে মালিকের গাল না খেয়ে আমি হাসিতে যোগ দিতে পারতাম। মাঝে মাঝে তিনিও খোংকে এমন প্রশ্ন করতেন যে তাতে হাসি পেত। তাদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই জেনে খোং বাচ্চাদের সঙ্গে গল্প করত। একবার সে আমাকে জিজ্ঞেস করে:

"তুমি কি কখনো স্কুলে গিয়েছ?"

সায় দিতেই সে বলে, "ঠিক আছে, তা হলে তোমাকে পরীক্ষা করব। মৌরী মশলা দেয়া মটরশুঁটি বাক্যের মধ্যে মৌরী লিখবে কি ভাবে?"

আমি ভাবলাম, "ভিক্ষুকের কাছে পরীক্ষা দেব না।" তাই মুখ ফিরিয়ে তাকে উপেক্ষা করি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে বায়না ধরে:

"তুমি এটা লিখতে পারনা? আমি তোমাকে শেখাব। মনে রাখবে! তোমাকে এসব মনে রাখতে হবে। কেননা পরে যখন নিজের দোকান হবে, তোমাকে হিসেব রাখতে হবে।"

আমার মনে হল নিজের দোকান হতে এখনো অনেক দেরী। তাছাড়া মালিক কখনো মৌরীমসলা দেয়া মটরশুঁটির হিসেব খাতায় লেখেন না। মজা ও বিরক্তি নিয়ে আমি উদাসভাবে জবাব দিলাম, "তোমার মাষ্টারী কে চায়? এটা কি হুই-সিয়াং এর হুই নয়?"

খোং খুব মজা পায় এবং কাউণ্টারে হাতের নখ দিয়ে আঘাত করতে থাকে। মাথা নাড়তে নাড়তে সে বলে, "ঠিক, ঠিক। তুমি কি জান চার রকমভাবে 'হুই' লেখা যায়?"

আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। ভুরু কুঁচকে আমি কেটে পড়ি। কাউণ্টারের ওপর অক্ষরগুলো লেখার জন্য খোং ইজি মদের মধ্যে নখ ডুবিয়েছে! কিন্তু আমার নজর নেই দেখে সে হতাশ হয়ে পড়ে।

কখনো কখনো আশেপাশের ছেলে মেয়েরা হাসির শব্দে মজায় যোগ দিতে আসত এবং খোং ইজিকে ঘিরে ধরত। খোং তাদের প্রত্যেককে একটি করে মৌরী মসলা দেয়া মটরশুঁটি দিত। মটরশুঁটি খাবার পরও ছেলেমেয়েরা ঘিরে থাকত — তাদের নজর থাকত প্লেটের দিকে। তাড়াতাড়ি সে হাত দিয়ে প্লেট ঢেকে উপুড় হয়ে বলত, "খুব বেশী নেই। আমি খুব একটা খাই নি।" তারপর মাথা সোজা করে মটরশুঁটির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলত, "না, না, খুব বেশী নেই।" তারপর হাসতে হাসতে ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করত।

খোং ইজি সঙ্গী হিসেবে খুব মজার ছিল, কিন্তু তাকে ছাড়াও আমাদের সময় ভালোই কাটত।

হেমন্ত উৎসবের কয়েকদিন আগে, একদিন শুঁড়ীখানার মালিক তার হিসেব পরীক্ষা করছিলেন। দেয়াল থেকে বোর্ড নামিয়ে তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, "অনেক দিন খোং ইজি'র দেখা নেই। তার কাছে এখনো উনিশ পয়সা পাওনা আছে।" তখনই বুঝতে পারলাম কতদিন তাকে দেখিনি।

খদ্দেরদের একজন বলে উঠল, "সে কেমন করে আসবে? গতবারের পিটুনীতে তার পা ভেঙে গেছে।"

"আহা!"

"সে আবার চুরি করতে গিয়েছিল। এবার বোকামি করেছে প্রাদেশিক বুদ্ধিজীবী মিঃ ডিং-এর বাড়ীতে চুরি করতে গিয়ে। যেন যে কেউ সেটা করতে পারে!"

"তারপর কি হয়েছে?"

"কি আর হবে? প্রথমে তাকে স্বীকারোক্তি লিখতে হয়েছে, তারপরে পিটুনী। পিটুনী প্রায় সারারাত ধরে চলে, পা ভেঙে যাওয়া পর্যন্ত।"

"তার পর?"

"তার পা জোড়া ভেঙে গেছে।"

"কিন্তু তার পর কি হয়েছে?"

"তার পর? ...... কে জানে? সে হয়ত মরে গিয়ে থাকবে।" মালিক আর কিছু জানতে চায় নি, হিসেব মেলাতে থাকে।

হেমন্ত উৎসবের পর, শীত আসতে শুরু করলে বাতাসও দিন দিন ঠাণ্ডা

হতে থাকে। সারাদিন চুলার কাছে বসে থাকলেও আমাকে প্যাডেড কোট পরতে হয়। একদিন দুপুরে দোকান প্রায় খালি। চোখ বন্ধ করে বসে আছি এমন সময় শুনতে পেলাম :

"একবাটি মদ গরম কর।"

গলার স্বর নীচু, কিন্তু পরিচিত। কিন্তু মাথা তুলতেই কেউ নজরে পড়লো না। আমি দাঁড়িয়ে দরজার দিকে তাকালাম। দেখতে পেলাম দরজার দিকে মুখ করে কাউণ্টারের নীচে বসে আছে খোং ইজি। তার চোখ জোড়া বসে গেছে, মুখ শুকনো, খুব বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে। তার গায়ে টুটা ফাটা একটি জ্যাকেট। গলার সঙ্গে ঝোলানো একটি মাদুরের ওপর সে পা আড়াআড়ি করে বসে আছে। আমাকে দেখতে পেয়ে সে আবার বলল :

"এক বাটি মদ গরম কর।"

এ সময়ে কাউণ্টারের ওপর দিয়ে মাথা বাড়িয়ে মালিক বললেন, "খোং ইজি নাকি? তোমার কাছে এখনো উনিশ পয়সা পাওনা আছে।"

একটু অস্থির হয়ে খোং ইজি জবাব দিল, "সেটা আগামীবার মিটিয়ে দেব। এবার নগদ পয়সা দিচ্ছি। মদ ভালো হওয়া চাই।"

মালিক মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করে,

"খোং ইজি, তুমি আবার চুরি করতে গিয়েছিলে?" কিন্তু প্রতিবাদ না করে সে শুধু বলে :

"ঠাট্টা কর না।"

"ঠাট্টা? চুরি না করলে তারা তোমার পা ভেঙেছে কেন?"

নীচু গলায় খোং বলল, "পড়ে গিয়ে, পড়ে গিয়ে আমার পা ভেঙেছে।" ব্যাপারটা শেষ করার জন্য তার চোখে আকুল মিনতি। কিন্তু ততক্ষণে বেশ কয়েকজন জড়ো হয়েছে এবং তারা হাসতে শুরু করেছে। আমি মদ গরম করে তা নিয়ে চৌকাঠের ওপর রাখলাম। টুটাফাটা কোটের পকেট থেকে চার পয়সা বের করে সে আমার হাতে দিল। দেখতে পেলাম তার হাত জোড়া কাদামাখা। সে নিশ্চয়ই হামাগুড়ি দিয়ে এখানে এসেছে। তারপর মদ শেষ করে লোকজনের হাসাহাসি ও চুটকির মধ্যে সে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। খোং এর দেখা নেই। বছরের শেষে বোর্ড নামিয়ে মালিক বললেন, "খোং ইজি'র কাছে এখনো উনিশ পয়সা পাওনা আছে।" পরের বছর ড্রাগন নৌকা উৎসবের সময়ও তিনি একই কথা বললেন। কিন্তু হেমন্ত উৎসবের সময় আর কিছু বললেন না। আরেকটি নববর্ষ এলো কিন্তু তাকে আর দেখা গেল না।

সেই থেকে আমি আর তাকে দেখি নি।
হয়ত সে সত্যি সত্যি মরে গিয়ে থাকবে।

মার্চ, ১৯১৯

ঔষধ

১

হেমন্তের কাকভোর। চাঁদ ডুবে গেছে কিন্তু সূর্য ওঠে নি। বিশাল আকাশ নীল চাদরের মত বিছানো। নিশাচর ছাড়া আর কেউ জেগে নেই। বুড়ো শুয়ান হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে। খশ্ করে ম্যাচ জ্বালিয়ে হারিকেন ধরায়। চা-দোকানের দু'কামরার ওপর এক ভুতুড়ে আলো নেমে আসে।

বউ জানতে চায়, "ছোট শুয়ানের বাপ, তুমি কি এখন যাচ্ছ?" ভেতরের ছোট্ট কামরা থেকে কাশির শব্দ আসছে।

"হুঁ।

কাপড় পরতে পরতে বুড়ো শুয়ান জবাব দেয়। তারপর হাত বাড়িয়ে বলে "ওটা দাও।"

কিছুক্ষণ বালিশের নীচে হাতড়ে বউ টাকার পোটলা তার হাতে তুলে দেয়। বুড়ো শুয়ান ভয়ে ভয়ে সেটা পকেটে ঢোকায়, দুবার পকেট চাপড়ে দেখে। তারপর কাগুজে লণ্ঠন জ্বালিয়ে ভেতরের কামরায় ঢোকে। প্রথমে মৃদু কাশির শব্দ আসে, তারপর আরো জোরে। সব কিছু থেমে গেলে, বুড়ো আস্তে আস্তে বলে, "বা'জান ...... উঠিস না। ...... তোর মা দোকান দেখাশোনা করবে।"

জবাব না পেয়ে বুড়োর মনে হল ছেলে গভীর ঘুমে অচেতন। সে রাস্তায় নেমে আসে। অন্ধকারে ধূসর রাস্তা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। লণ্ঠনের আলো পায়ের সঙ্গে সঙ্গে দুলছে। এখানে সেখানে কুকুর চোখে পড়ে। কিন্তু একটাও ঘেউ ঘেউ করছে না। ঘরের চেয়ে বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। তবু বুড়ো শুয়ানের সাহস বেড়ে যায়, যেন হঠাৎ তার বয়স কমে গেছে, যাদুর জীবনী-শক্তি পেয়ে

গেছে। সে পা চালিয়ে দেয়। রাস্তা পরিষ্কার হতে হতে আকাশও পরিষ্কার হয়ে আসে।

বুড়ো শুয়ান একমনে হেঁটে চলেছে। সামনে পথের শেষ দেখতে পেয়ে হঠাৎ তার সম্বিৎ ফিরে আসে। কয়েক পা পিছিয়ে এক দোকানের কার্নিসের নীচে সে বন্ধ দরোজার সামনে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণের মধ্যে ঠাণ্ডায় তার কাঁপুনি ধরে যায়।

"আহা, বুড়ো।"

"বেশ সতেজ মনে হয় ......।"

বুড়ো শুয়ান আবার সজাগ হয়। চোখ খুলতেই দেখতে পায় কয়েকজন লোক যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। তাদের একজন আবার তার দিকে ফিরেও তাকায়। সে তাকে পরিষ্কার দেখতে না পেলেও মনে হল খাওয়া দেখে অভুক্ত মানুষের যা হয়, তার চোখ সেরকম জ্বল জ্বল করছে। বুড়ো শুয়ান তাকিয়ে দেখে লণ্ঠন নিভে গেছে। পকেট চাপড়ে দেখে — না, পোটলাটা আছে। তারপর আশে পাশে তাকাতেই তার অদ্ভুত সব লোক নজরে পড়ে। ভূতের মত দু'জন, তিনজন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ভালো করে তাকাতেই, তাদের আর অদ্ভুত মনে হয় না।

সে দেখতে পায় জনা কয়েক সৈন্য ঘোরাঘুরি করছে। দূর থেকে তাদের ইউনিফর্মের বড়ো সাদা চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যায়, কাছে আসতে লাল বর্ডারও চোখে পড়ে। পরমুহূর্তে ধূপধাপ শব্দে একদল লোক পার হয়ে গেল। তারপর একটু আগে যে ছোট্ট দলটি এসেছিল তারা জড়ো হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ঠিক পথের শেষ প্রান্তের আগে হঠাৎ থেমে গিয়ে তারা অর্ধ বৃত্তাকারে আবার জড়ো হয়।

বুড়ো শুয়ান সেদিকে তাকিয়ে দেখে। কিন্তু শুধু লোকজনের পেছন দিকটা দেখতে পায়। অদৃশ্য হাতে গলা ধরে ঝোলানো হাঁসের মত তাদের দেখা যাচ্ছে। এক মুহূর্ত সব চুপচাপ, তারপর একটি শব্দ শোনা গেল। দর্শকদের মধ্য হৈচৈ পড়ে যায়। তারা সবাইকে পেছনে ঠেলতে শুরু করে। ধাক্কায় বুড়ো শুয়ানের প্রায় পড়ে যাবার দশা হয়।

পুরো শরীর কালো কাপড়ে ঢাকা একজন এসে বুড়ো শুয়ানকে বলে, "তোমার টাকা আমাকে দাও, আমি তোমাকে জিনিষ দেব।" তার চোখ জোড়া চাকুর মত। ভয়ে বুড়ো শুয়ান চুপসে যায়। সে তার লম্বা একটি হাত বাড়িয়ে দেয় বুড়োর দিকে। আর এক হাতে ধরা আছে একটি সেদ্ধ রুটি, যা থেকে ফোটায় ফোটায় ঝরছে লাল তরল পদার্থ।

টাকার জন্য বুড়ো শুয়ান জলদি হাতড়াতে থাকে। কাঁপতে কাঁপতে সে প্রায় দিয়েই দিচ্ছিল, কিন্তু ভয়ে অন্য বস্তুটি নিতে সাহস হলো না। অস্থির হয়ে লোকটি চীৎকার করে উঠে, "তোমার কিসের ভয়? কেন নিচ্ছ না?" বুড়োর তখনো থতমত অবস্থা। কালো কাপড়ে ঢাকা লোকটি রুটি জড়ানোর জন্য লণ্ঠন নিয়ে কাগজের ঢাকনাটি ছিঁড়ে ফেলে। জড়ানো রুটি সে বুড়োর হাতে সঁপে দেয় এবং শয়তানী চোখে তাকিয়ে রুপোলী জিনিষগুলো নিয়ে নেয়। "বুড়ো হদ্দ......" বিড়বিড় করতে করতে সে ফিরে চলে।

"এসব কার অসুখের জন্য?" বুড়ো শুয়ানের মনে হল কেউ জিজ্ঞেস করছে, কিন্তু সে কোন জবাব দিল না। তার পুরো মনোযোগ পোটলার দিকে। এমন সাবধানে সে সেটা বহন করছে যেন তা কোন পুরনো বাড়ীর একমাত্র বংশধর। এখন আর কোনকিছু এত দামী নয়। সে তার বাড়ীতে নতুন জীবন আনবে, সুখের সন্ধান পাবে। সূর্য উঠেছে। যে রাস্তা সোজা বাড়ীর দিকে গেছে তা এখন আলোকিত। পথের শেষে পুরনো ফলকে বিবর্ণ সোনালী রংয়ে লেখা জ্বলছে: "পুরনো প্যাভিলিয়ন।"

২

বুড়ো শুয়ান বাড়ীতে পেঁাছে দেখে দোকান পরিষ্কার করা হয়েছে। চায়ের টেবিলগুলো ঝকঝক করছে, কিন্তু কোন খদ্দের তখনো আসে নি। শুধু তার ছেলে দেয়ালের কাছে বসে খাচ্ছে। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। জ্যাকেট শিরদাঁড়ার উপর ঝুলে আছে, V-এর মত কাঁধের হাড়গুলো চোখে পড়ে। ছেলেকে দেখেই আবার বুড়োর কপাল কুঁচকে যায়। রান্না ঘর থেকে তার বৌ দৌড়ে আসে। তার চোখে আশার আলো, ঠেঁাট জোড়া কাঁপছে:

"পেয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

তারা দু'জনেই রান্নাঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ যুক্তি করে। তার পর তার স্ত্রী বাইরে থেকে একটি শুকনো পদ্মপাতা এনে টেবিলের উপর বিছিয়ে দেয়। বুড়ো শুয়ান লণ্ঠনের কাগজে জড়ানো লাল রংয়ের রুটিটি খুলে পদ্মপাতার ওপর রাখে। ছোট শুয়ানের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তার মা জলদি বলে উঠে:

"বা'জান, বসে থাক। এখানে আসবি না।"

চুলোর জ্বাল ঠিক করতে করতে বুড়ো শুয়ান সবুজ পোটলা এবং লণ্ঠনের

সাদা-লাল কাগজ চুলোর ভেতর দিয়ে দেয়। আগুনের লাল-কালো শিখা উঠে আসে। একটা অদ্ভুত গন্ধে ভরে যায় সমস্ত দোকান।

"বেশ ভাল গন্ধ মনে হচ্ছে! কি খাচ্ছ তোমরা?" কুঁজো এসেছে। সে তাদের একজন যারা পুরো সময়টা চা দোকানে কাটায়। সকালে সবার আগে আসে এবং সন্ধ্যায় সবার পরে যায়। হোঁচট খেতে খেতে রাস্তার মুখোমুখি কোণার এক টেবিলে গিয়ে সে বসে। কিন্তু কেউ তার প্রশ্নের জবাব দেয় না।

"চালের খিচুড়ি?"

তবু কোন জবাব নেই। তার জন্যে চা বানাতে বুড়ো দৌড়ে আসে।

"বা'জান, এদিকে আয়।" তার মা তাকে ডেকে ভেতরের ঘরে নিয়ে যায়। ঘরের মাঝে একটি টুল দিয়ে ছেলেকে সেখানে বসায়। তারপর প্লেটে করে কালো একটি কিছু নিয়ে এসে সোহাগ করে বলে :

"খেয়ে ফেল ...... তা'হলে ভালো হয়ে যাবি।"

কালো জিনিষটি হাত দিয়ে ধরে ছোট শুয়ান সে দিকে তাকায়। তার ভেতরে একটা অদ্ভুত ভাব খেলা করতে থাকে। যেন সে নিজের জীবন হাতে ধরে আছে। তারপর সাবধানে সে সেটা খুলে ফেলে। কালো আবরণের নীচ থেকে সাদা ধোঁয়া বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ে। পড়ে থাকে দু টুকরো সেদ্ধ রুটি। খাওয়া হয়ে গেলে গন্ধ চলে যায়, পড়ে থাকে খালি থালা। তার দু পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার বাবা মা। তাদের চোখ কিছু একটা দেখছে। যেন ছেলের শরীরে কিছু একটা দিয়ে অন্য কিছু বের করে আনতে চায়। তার ছোট্ট বুক দ্রুত উঠা নামা করতে থাকে। বুকের ওপর হাত চেপে সে আবার কাশতে থাকে ।

মা বলে, "ঘুমা, তা'হলে ভালো হয়ে যাবি।"

ভালো ছেলের মত ছোট শুয়ান কাশতে কাশতে ঘুমিয়ে পড়ে। তার দম ফেলা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত মা অপেক্ষা করে। তার পর শততালি দেয়া কাঁথা দিয়ে ঢেকে দেয় তার শরীর।

৩

দোকানে লোকজন গিজগিজ করছে। বুড়ো শুয়ান ব্যস্ত। বড়ো তামার কেটলীতে করে সে খদ্দেরদের জন্য চা বানিয়ে চলেছে। তার চোখের নীচে কালো রেখা।

সাদা দাড়িওয়ালা একজন জিজ্ঞেস করে, "বুড়ো শুয়ান, তোমার কি শরীর

ভালো নেই? কি হয়েছে তোমার?”

“কিছু না।”

“কিছু না? ...... তোমার হাসি দেখে মনে হচ্ছে......” বুড়ো নিজেকে শুধরে নেয়।

কুঁজো বলে, “ওটা বুড়ো শুয়ানের ব্যস্ততা। যদি তার ছেলে......” কথা শেষ করবার আগেই দোকানে ঢুকল ভারী চোয়ালের এক লোক। তার কাঁধের উপর ঝুলছে বোতাম খোলা খয়েরী রংয়ের শার্ট, এলোমেলোভাবে ফিতে দিয়ে কোমরে বাঁধা। দোকানে ঢুকতে না ঢুকতেই সে বুড়ো শুয়ানের দিকে হাঁক মারে:

“সে কি সেটা খেয়েছে? কিছুটা ভাল হয়েছে? বুড়ো, তোমার কপাল ভালো! কি কপাল! যদি তাড়াতাড়ি না জানতাম......”

এক হাতে কেটলী ধরে, আর এক হাত ভক্তির সঙ্গে সোজা ঝুলিয়ে রেখে হাসিমুখে বুড়ো শুয়ান সব শোনে। আসলে উপস্থিত সবাই মনোযোগের সঙ্গে শুনছিল। বুড়ী, তার চোখের নীচেও কালো রেখা, চা-পাতা ও জলপাই দেয়া বাটি নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে। বুড়ো শুয়ান নতুন মানুষটির জন্য তাতে ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়।

বড়ো চোয়ালের মানুষটি বলে, “এটা একেবারে ধন্বন্তরী। অন্য জিনিষের মত নয়! একবার ভেবে দেখে, গরম গরম কেনা, গরম গরম খাওয়া।”

বুড়ী গদ গদ হয়ে বলে: “খাং চাচার সাহায্য না পেলে আমরা এটা জোগাড় করতে পারতাম না।”

“ধন্বন্তরী! গরম গরম খেয়েছে। মানুষের রক্তে ভেজা এরকম রুটি যে কোন যক্ষারোগ সারিয়ে তুলতে পারে।”

‘যক্ষারোগ’ কথাটি শুনে বুড়ীকে একটু বিচলিত ও ফ্যাকাশে মনে হয়। তবু জোর করে হেসে সে এক ছুতায় ভেতরে চলে গেল। এদিকে খয়েরী পোশাক পরা লোকটি অসভোব মত চীৎকাব কবে চলেছে যতক্ষণ না ছেলেটি ভেতরের কামরায় জেগে উঠে আবার কাশতে শুরু করে।

“তোমার ছোট্ট শুয়ানের কপাল ভালো! তার অসুখ পুরো সেরে যাবে। বুড়ো শুয়ানের হাসিতে অবাক হবার কিছুই নেই।” কথা বলার সময় সাদা দাড়িওয়ালা খয়েরী জামার কাছে এগিয়ে আসে। গলার স্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করে:

“খাং চাচা আমি শুনেছি আজকে যাকে বলি দেয়া হয়েছে সে সিয়া পরিবারের। সে কে? কেন তার বলি হয়েছে?”

“কে? বিধবা সিয়ার ছেলে, নিশ্চয়ই! একটা রাসকেল!”

তাদের শোনার ভঙ্গী দেখে মিঃ খাং-এর সাহস আরো বেড়ে যায়। তার চোয়াল কেঁপে ওঠে এবং যত জোরে সম্ভব সে তত গলা চড়িয়ে দেয়।

"বদমাশটা বাঁচতে চায় নি। এবার আমি কিছুই করি নি। এমনকি তার কাপড়গুলো পর্যন্ত জেলার নিয়ে গেছে। আমাদের বুড়ো শুয়ানের কপাল খুব ভালো এবং তারপরে কপাল ভালো তিন নম্বর চাচা সিয়ার। পুরস্কারের পঁচিশ টেল রুপা পুরোটাই সে মেরে দিয়েছে, এক পয়সাও খরচ করতে হয় নি।"

বুক চেপে ধরে কাশতে কাশতে ছোট শুয়ান ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। রান্নাঘরে গিয়ে সে একবাটি ঠাণ্ডা ভাত নিল। তারপর গরমপানি মিশিয়ে সেখানে বসে খেতে শুরু করে। মা ঝুঁকে পড়ে সোহাগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে :

"বা'জান, তোর কি ভাল লাগছে? ভুখ কি লেগেই আছে?"

"মহা ধন্বন্তরী।" খাং ছেলেটির দিকে তাকায়। তারপর মুখ ঘুরায় লোকজনদের কিছু বলার জন্য, "তিন নম্বর চাচা সত্যিই স্মার্ট। সে খবর না দিলে তার পরিবারের ফাঁসি এবং সম্পত্তি ক্রোক হয়ে যেত। কিন্তু তার বদলে? রুপা! সেই বদমাশটা সত্যিই একটা রাসকেল! সে জেলারকেও বিদ্রোহের সুড়সুড়ি দেয়।"

পেছনের সারিতে বসা বিশ বছরের বেশী একজন ক্ষেপে ওঠে, "না! এমন কথা বলবেন না।"

"তুমি জান, রক্ত-চক্ষু তাকে বাজিয়ে দেখতে যায়, কিন্তু সে তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়। সে বলে, আমরা সবাই মহান ছিং সাম্রাজ্যের মালিক। একবার ভাব : এটা কি বুদ্ধিমানের কথা? রক্ত-চক্ষু জানত বাড়ীতে তার বুড়ী মা আছে, কিন্তু ভাবতে পারে নি সে এত গরীব। সে তার কাছ থেকে কিছুই আদায় করতে পারে নি। সে ভীষণভাবে ক্ষেপে গেলো। তারপর সেই বুদ্ধু সাপের লেজ দিয়ে কান চুলকাতে চেয়েছে এবং সে তাকে দুটি চড় মেরেছে।"

দেয়ালের কোনা থেকে কুঁজো খুশীতে বলে ওঠে, "রক্ত-চক্ষু ভালো মুষ্টি-যোদ্ধা। ঐ চড়গুলোতে নিশ্চয়ই চোট লেগেছে।"

"পাজিটার মারের ভয় ছিল না। সে এমনকি তার দুঃখের কথাও বলেছে।"

সাদা দাড়িওয়ালা বলে, "এমন মন্দ লোককে মারলে তাতে দুঃখের কিছু নেই।"

খাং ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকায়। তারপর ঘৃণা ভরে বলে, "তুমি ভুল বুঝেছ। যেভাবে সে বলেছে, সে লাল-চক্ষুর জন্য দুঃখিত।"

তার শ্রোতাদের চোখ চকচক করে ওঠে। কিন্তু কেউ কিছু বলে না। ছোট শুয়ানের ভাত খাওয়া শেষ। তার গা দিয়ে দরদর করে ঘাম পড়ছে, মাথা দিয়ে ভাপ বেরুচ্ছে।

যেন হঠাৎ আলো দেখতে পেয়েছে এমনভাবে সাদা দাড়ি বলে ওঠে, "লাল-চক্ষুর জন্য খারাপ লাগে — পাগল! সে একটা আস্ত পাগল।"

বিশ বছরের যুবকটিও বলে ওঠে, "সে নিশ্চয়ই পাগল।"

খদ্দেরদের মধ্যে আবার প্রাণ ফিরে আসে। কথাবার্তা শুরু হয়। হৈচৈ-এর ভেতর ছেলেটি আবার বেদম কাশতে থাকে। খাং উঠে গিয়ে তার পিঠ চাপড়ে বলে :

"মহা ধন্বন্তরী! ছোট শুয়ান, এভাবে কাশবে না! মহা ধন্বন্তরী!"

মাথা নেড়ে কুঁজো বলে, "পাগল।"

৪

শহরের পশ্চিম ফটকের বাইরে দেয়াল ঘেষে যে জমিটুকু আছে তা একসময় খাস জমি ছিল। পথচারীরা শর্ট-কাট হিসেবে কোণাকুণি যে আঁকাবাঁকা পথ বানিয়েছে তা'ই এখন সীমানা। পথের বাম পাশে ফাঁসির আসামী বা জেলে অবহেলায় মারা যাওয়া বন্দীদের কবরস্থান। ডান পাশে ফকিরদের কবরস্থান। পথের দু'পাশে কবরের মাটির ঢিবিগুলো দেখে মনে হয় কোন বড়লোকের জন্মদিনের সাজানো রুটি।

সে বছর ছিং মিং উৎসবের সময়টা ছিল অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। শস্যকণার মত উইলো গাছে ছোট নতুন কুড়ি এসেছে। ভোরের আলো ফুটবার পরেই ডানে একটি নতুন কবরের পাশে চার থালা খাবার ও এক বাটি ভাত নিয়ে আসে বুড়ো শুয়ানের বউ। তারপর সেখানে বিলাপ করতে থাকে। কাগুজে টাকা পোড়ানোর পর সে সেখানে চুপচাপ বসে থাকে, যেন কারো জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু জানে না কার জন্য। বাতাসে তার ছোট্ট চুল উড়ছে। গতবারের চেয়ে চুল এবার আরো সাদা হয়েছে।

আর এক মহিলা এল। পাকা চুল, টুটা-ফাটা কাপড় পরণে। পুরনো, গোলাকার ঝুড়িতে ঝোলানো কাগুজে টাকা নিয়ে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। মাটিতে বসে বুড়ো শুয়ানের বউ তাকে দেখছে দেখতে পেয়ে তার ফ্যাকাশে মুখ লজ্জায় ঢেকে গেল। তবু সে সাহস করে বাম দিকের একটি কবরে গিয়ে মাটিতে ঝুড়ি রাখল।

সে কবরটি ছোট্ট শুয়ানের কবরের ঠিক উল্টো দিকে। মাঝখানে শুধু পথের ফারাক। সে মহিলাও চার থালা খাবার ও এক বাটি ভাত বিছিয়ে এবং কাগুজে

টাকা জ্বালিয়ে বিলাপ করছে দেখতে পেয়ে বুড়ো শুয়ানের বউ ভাবল : "সে কবরে নিশ্চয়ই তার ছেলে আছে।" বুড়ো মহিলা উদ্দেশ্যহীনভাবে কয়েক পা এগিয়ে চারিদিকে এলোমেলো তাকাল। তারপর হঠাৎ টলতে টলতে পিছিয়ে আসতে লাগল, যেন মাথা ঘুরছে।

বেদনায় সে ভারাক্রান্ত মনে করে বুড়ো শুয়ানের বউ পথ পেরিয়ে তার কাছে গিয়ে নীরবে বলে, "দুঃখ করো না, চল বাড়ী যাই।"

সে সায় দিল। কিন্তু তখনো একদিকে তাকিয়ে আছে। বিড় বিড়িয়ে বলে : "দেখ। ওটা কি?"

বুড়ো শুয়ানের বউ দেখতে পায় সামনের কবরে তখনো ঘাস গজায় নি। ময়লা মাটি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু একটু ভালো করে তাকাতেই তার অবাক হবার পালা। দেখতে পায় মাটির ঢিবির ওপর সাদা-লাল ফুলের তোড়া।

তাদের দু'জনেরই চোখের নজর কম। তবু তারা সাদা-লাল ফুল স্পষ্ট দেখতে পায়। খুব বেশী নয়, কিন্তু গোল করে সাজানো, খুব তাজা নয় কিন্তু সুন্দর। ছোট্ট শুয়ানের মা তাকিয়ে নিজের ছেলের কবর দেখতে পায়। প্রায় অন্যসবগুলোর মত তার ছেলের কবরেও গুটি কয়েক শুকনো ফুল। হঠাৎ তার মনে হল সবকিছুই অর্থহীন এবং ফুলের তোড়া সম্পর্কে তার উৎসাহ দমে যায়।

ইতোমধ্যে আরো খুঁটিয়ে দেখার জন্য বুড়ী কবরের কাছে গেছে। সে নিজে নিজে বলতে থাকে, "এগুলোর কোন শেকড় নেই। এগুলো এখানে জন্মাতে পারে না। কে এসেছিল? ছেলেমেয়েরা এখানে খেলতে আসে না, আত্মীয়-স্বজনরাও কখনো আসে না। ব্যাপারটা কি হতে পারে?" তার কাছে ব্যাপারটা ধাঁধার মত মনে হয়। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে এবং সে বিলাপ করতে থাকে :

"বা'জান, সবাই তোর প্রতি জুলুম করেছে। তুই তা ভুলতে পারিস নি। সে দুঃখ জানানোর জন্যই কি তুই আজ এই কেরামতি দেখিয়েছিস?"

সে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। কিন্তু দেখতে পায় শূন্য ডালে বসে আছে শুধু একটি কাক। সে বলতে থাকে : "আমি জানি। তারা তোকে খুন করেছে। কিন্তু বিচারের দিন মালিক তার বিচার করবেন। বা'জান, শান্তিতে ঘুমা ...... তুই যদি সত্যিই এখানে আমার কথা শুনে থাকিস, তা হলে ঐ কাকটি তোর কবরের উপর দিয়ে উড়ে যাক।"

বাতাস পড়ে গেছে অনেকক্ষণ। তামার তারের মত শুকনো ঘাসগুলো শক্ত ও খাড়া হয়ে আছে। একটি ক্ষীণ, ভীরু শব্দ বাতাসে ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে

যায়। চারিদিকে মৃত্যুর নীরবতা। তারা শুকনো ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি তাদের কাকটির দিকে। গাছের ডালে কাকটি লোহার মত চুপচাপ বসে আছে।

সময় কেটে যায়। ছেলে-বুড়ো সহ অনেকে আসে কবর জেয়ারতে।

বুড়ো শুয়ানের বউ-এর মনে হয় তার বুক থেকে একটি ভারী বোঝা নেমে গেছে। চলে যাবার জন্য সে বুড়ীকে বলে :

"চল যাই।"

বুড়ী দীর্ঘ শ্বাস ফেলে। তারপর উদাসভাবে তুলে নেয় খাবার ও ভাত। এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে সে ধীরে ধীরে চলতে থাকে। তখনো সে বিড় বিড় করছে :

"এর মানে কি ?"

তারা ত্রিশ কদমও যায় নি। পেছনে শুনতে পায় কাকের ডাক। থতমত খেয়ে পেছনে তাকায়। দেখতে পায় পাখা মেলে কাকটি তীরের মত, দূর দিগন্তের দিকে উড়ে যাচ্ছে।

এপ্রিল, ১৯১৯

আগামী কাল

"টু শব্দটি নেই — ছেলেটার কি হয়েছে?"

বলতে বলতে পাশের বাড়ীর দিকে মাথা ঝাঁকায় লাল নাকওয়ালা বুড়ো গোং। তার হাতে এক বাটি হলদে মদ। নীল-চামড়া আ উ নিজের বাটি রেখে বুড়ো গোং-এর পিঠে জোরে গুঁতো মারে।

সে গর্জন করে উঠে, "বাহ ...... আবার ন্যাকামি শুরু হয়েছে।"

উল্টো পথে চলে লুযেন এখনো পুরনো ঢংয়ের শহর। রাত্রি এক প্রহর হবার আগেই লোকজন দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ে। মাঝরাত পর্যন্ত জেগে থাকে দু'টি বাড়ীর লোকজন। "শুভ শুঁড়িখানা" যেখানে কিছু পেটুক ঘুর ঘুর করে এবং পাশের বাড়ী যেখানে চার নম্বর শানের বউ থাকে। দু'বছর আগে বিধবা হবার পর থেকে এই মহিলার তেমন কিছু নেই। আছে পেট চালানোর মত একটা তাঁত এবং তিন বছরের ছেলে। এজন্যেই সে রাত করে ঘুমোয়।

গত ক'দিন ধরে তাঁতের কোন শব্দ নেই। মাঝরাত অবধি দুটো বাড়ীর লোকজন জেগে থাকে বলে বুড়ো গোং এবং অন্যেরা বুঝতে পারে চার নম্বর শানের বউয়ের বাড়ী থেকে কোন শব্দ আসছে কি না।

গুঁতো খেয়েও বুড়ো গোংকে স্বাভাবিক মনে হয়। মদে বড় করে চুমুক দিয়ে সে বাঁশীতে লোকসুর বাজাতে শুরু করে।

চোখের মণি বাওএরকে কোলে নিয়ে বিছানার ধারে বসে আছে চার নম্বর শানের বউ। মেঝেতে পড়ে আছে তাঁত। টিমটিমে বাতির আলো পড়েছে বাওএর-এর মুখে। জ্বরাক্রান্ত মুখ বিবর্ণ। শানের বউ ভাবতে থাকে: "আমি মন্দিরে পুজো দিয়েছি। ভগবানের কাছে কসম খেয়েছি, সে মহা ধন্বন্তরী খেয়েছে। তবু ভালো না হলে কি করব? তাকে হো সিয়াওসিয়ান ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু রাতেই বাওএর-এর অবস্থা খারাপ হয়। কাল ভোরে সূর্য

উঠলে হয়ত তার জ্বর ছেড়ে যাবে, সে দম ফেলতে পারবে। অনেক বালাই'ই এমন।"

চার নম্বর শানের বউ সাদাসিধে মহিলা। সে জানে না 'কিন্তু' শব্দ কত ভয়ংকর। এ শব্দের জন্যেই বহু খারাপ ভালো হয় এবং বহু ভালো খারাপ হয়ে যায়। গরমের রাত ছোট। বুড়ো গোং এবং অন্যেরা গান বন্ধ করতে না করতেই পূবের আকাশ ফর্সা হয়ে ওঠে। জানালার ফাঁক দিয়ে ভেতরে আসে ভোরের আলো।

ভোরের আশায় বসে থাকা অন্যদের মত শানের বউয়ের কাছে সহজ ব্যাপার নয়। সময় যেন কাটতেই চায়না : বাওএর একবার দম ফেলে তার মনে হয় এক বছর কেটে গেল। কিন্তু অবশেষে চারদিকে ফর্সা হয়ে এসেছে। দিনের আলো গ্রাস করে বাতির আলো। দম ফেলার চেষ্টা করতেই বাওএর-এর নাক কেঁপে ওঠে।

চার নম্বর শানের বউ কান্না চেপে ধরে। সে জানে এটা অমঙ্গলের চিহ্ন। ভাবতে থাকে কি করবে? একমাত্র আশা তাকে হো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া। সাদাসিধে হলেও, তার নিজের মনোবল আছে। উঠে দাঁড়িয়ে আলমারীর কাছে গিয়ে সে পুরো টাকা বের করে—সর্বসাকুল্যে ১৩ রৌপ্যমুদ্রা ও ১৮০ তাম্রমুদ্রা।[1] টাকা পকেটে রেখে দরজা বন্ধ করে সে যত জলদি সম্ভব বাওএরকে নিয়ে যায় হো ডাক্তারের বাড়ী।

সকাল সকাল হলেও চার রোগী তখনই অপেক্ষা করছে। চল্লিশ পয়সা দিয়ে সে নাম লেখায়। পাঁচ নম্বরে বাওএর-এর পালা। ছেলের নাড়ী দেখার জন্য হো ডাক্তার হাত বাড়িয়ে দেয়। তার নখগুলো চার ইঞ্চি লম্বা। শানের বউ ভাবতে থাকে, "আমার বাওএর-এর কপালজোর, বেঁচে যাবে।" কিন্তু তার দুশ্চিন্তা আগের মতই। ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞেস না করে পারে না :

"ডাক্তার, আমার বাওএর-এর কি হয়েছে?"

"হজমের নালী বন্ধ হয়ে গেছে।"

"খুব কি কঠিন রোগ? সে কি ......?"

"এই দুই প্রেসক্রিপশন দিয়ে শুরু কর।"

"সে দম ফেলতে পারে না, তার নাক কাঁপছে।"

"আগুন ধাতুকে বশ মানায় ......"[2]

কথা শেষ না করেই হো ডাক্তার চোখ বন্ধ করেন ; চার নম্বর শানের বউয়েরও আর কিছু বলতে ইচ্ছে হয় না। ডাক্তারের উল্টো দিকে বসে আছে ত্রিশ বছরের

একজন। সে বসে বসে প্রেসক্রিপশন লিখছে।

কাগজের এক কোনায় লেখা দেখিয়ে সে শানের বউকে বলে: "প্রথমটি হচ্ছে শিশুরক্ষা বড়ি। এক মাত্র জিয়া বাড়ীর দোকানেই এগুলো কিনতে পাবে।"

কাগজটি হাতে নিয়ে চার নম্বর শানের বউ ভাবতে ভাবতে হাঁটতে থাকে। হতে পারে সে সাদাসিধে মহিলা। কিন্তু সে জানে হো ডাক্তারের বাড়ী, দোকান এবং তার বাড়ীর অবস্থান ত্রিভুজের মতো। তাই বাড়ী যাবার আগে ওষুধ কেনাই ভালো। সে তাড়াতাড়ি দোকানে যায়। ধীরে ধীরে প্রেসক্রিপশন পড়তে পড়তে দোকানদারও তার লম্বা নখ দেখায়, তারপর কাগজে মুড়ে দেয় ঔষধ। বাওএর-কে কোলে নিয়ে শানের বউ অপেক্ষা করতে থাকে। হঠাৎ ছোট্ট হাত তুলে বাওএর তার চুল ঠিক করে। সে আগে কখনো এটা করে নি। তার মা ভয়ে চুপসে যায়।

সূর্য বেশ উপরে উঠেছে। ছেলেকে কোলে নিয়ে এবং ঔষধ হাতে নিয়ে সে যত হাঁটছে ততই তার বোঝা ভারী মনে হচ্ছে। ছেলেও নড়াচড়া করছে। তাতে পথ মনে হচ্ছে আরো লম্বা। খানিক জিরিয়ে নেবার জন্য রাস্তার পাশে এক বড় বাড়ীর দুয়ারে তাকে বসতে হয়। গায়ের জামা কাপড় ঘামে লেপটে গেছে। মনে হয় বাওএর গভীর ঘুমে অচেতন। আবার উঠে দাঁড়াতেই ছেলেকে তার কাছে খুব ভারী মনে হয়। পাশ থেকে একজন বলে উঠে:

"চার নম্বর শানের বউ, তাকে আমার কাছে দাও।" মনে হল নীল-চামড়া আ উ'র গলা।

সে তাকিয়ে দেখে আ উ। ঘুম জড়ানো চোখে সে তাকে অনুসরণ করে চলেছে।

নিজেকে উদ্ধারের জন্য সে অলৌকিক কিছু ভাবলেও আ উ'কে আশা করে নি। আ উ'র ব্যবহারে একটা নাগর নাগর ভাব ছিল। সে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। অবশেষে কয়েকবার আপত্তি করে সে রাজী হয়ে যায়। বাওএরকে নেয়ার জন্য তার স্তন ও ছেলের মাঝখান দিয়ে হাত বাড়িয়ে চাপ দিতেই সে তার স্তনে একটা উষ্ণতা অনুভব করে। লজ্জায় তার কান পর্যন্ত লাল হয়ে যায়।

হাত দুয়েকের ব্যবধানে তারা হাঁটতে থাকে। আ উ অনেক কথাই বলে, যার অনেকগুলো চার নম্বর শানের বউ জবাব দেয় না। বেশী দূর না যেতেই সে ছেলেকে তার কাছে ফিরিয়ে দেয়। বলে আজ এ সময়ে এক বন্ধুর সঙ্গে খাওয়ার জন্য গতকাল তার কথা হয়েছে। শানের বউ বাওএরকে ফিরিয়ে নেয়। ভাগ্য ভালো, পথ খুব একটা বাকী ছিল না। সে দেখতে পায় পথের পাশে নয় নম্বর খালা ওয়াং বসে আছে। খালা জিজ্ঞেস করে:

"চার নম্বর শানের বউ, ছেলে কেমন আছে? ...... তুমি কি ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলে?"

"আমরা ডাক্তার দেখিয়েছি ...... খালা, তোমার ত বয়স হয়েছে এবং তুমি অনেক দেখেছ। খালা, তুমি কি তাকে একবার দেখবে এবং বলবে কি হয়েছে ......?"

"হ্যাঁ।"

"ভালো ......?"

"হ্যাঁ ......।"

বাওএরকে দেখার পর খালা ওয়াং দুবার সায় দিলেন দুবার মাথা নাড়লেন।

বাওএর ঔষধ খেতে খেতে দুপুর গড়িয়ে গেছে। চার নম্বর শানের বউ ভালো করে তাকিয়ে দেখে। ছেলেকে একটু সুস্থ মনে হয়। বিকেলে হঠাৎ চোখ মেলে সে ডাকে "মা"। তারপর আবার চোখ বন্ধ করে ফেলে। মনে হয় ঘুমুচ্ছে। ঘণ্টা খানেক ঘুমোয় নি। তার নাক ও কপাল ঘামতে থাকে। মা হাত দিয়ে দেখতেই তা আঠার মত হাতে লেগে যায়। ভয়ে সে বুকে হাত দিয়ে দেখে। তারপর ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

একটু পরেই তার দম চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। ফোঁপানো বাদ দিয়ে সে বিলাপ করতে থাকে। সহসাই লোকজন জড়ো হয়। ঘরের ভেতর আসে নয় নম্বর খালা ওয়াং, নীল-চামড়া আ উ। বাইরে জড়ো হয় শুভ শুঁড়ীখানার মালিকের মতো ভূস্বামী, লাল-নাক ওয়ালা গোং। নয় নম্বর খালা ওয়াং ফতোয়া দেয়, এক মালা কাগুজে টাকা পোড়াতে হবে। তারপর জামিন হিসেবে দুটি চৌকি ও পাঁচখানা কাপড় নিয়ে সে শানের বউয়ের জন্য দু টাকা ধার করে, যারা সাহায্য করছে তাদের খাওয়ার আয়োজন করতে।

প্রথম ঝামেলা কফিন তৈরী নিয়ে। তখনো শানের বউয়ের কাছে সোনার প্রলেপ দেয়া একটি রুপোর চুলের কাঁটা ও একজোড়া রুপোর কানের দুল আছে। সে সেগুলো শুভ শুঁড়ীখানার মালিকের হাতে তুলে দেয়। তার জন্যে জামিন হয়ে অর্ধেক নগদে এবং অর্ধেক বাকীতে একটা কফিন কেনার জন্য। নীল-চামড়া আ উ সাহায্যের হাত বাড়ায়, কিন্তু নয় নম্বর খালা ওয়াং তাতে কান দেয় না। তাকে শুধু পরদিন কফিন বহনের কাজ দেয়া হয়। "বুড়ী হারামজাদী" গাল দিয়ে সে সেখানে দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়াতে থাকে। মালিক চলে যায়। সন্ধ্যায় ফিরে এসে জানায় বিশেষভাবে কফিন তৈরী করতে হবে বলে তা কাল সকালের আগে তৈরী হবে না।

মালিক ফিরে আসতে আসতে সাহায্যকারীরা তাদের খাওয়া শেষ করেছে।

লুযেন পুরনো ঢংয়ের বলে তারা রাত্রি এক প্রহর হবার আগেই ঘুমোতে বাড়ী চলে গিয়েছে। শুধু শুভ শুঁড়ীখানায় বসে মদ টানছে আ উ আর হেঁড়ে গলায় গান গাইছে বুড়ো গোং।

বিছানার পাশে বসে কাঁদছে চার নম্বর শানের বউ। বিছানায় শুয়ে আছে বাওএর, মাটিতে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে তাঁতযন্ত্র। অনেকক্ষণ কেঁদে কেটে চোখের জল শুকিয়ে গেলে সে চোখ মেলে চারিদিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে। সব কিছু অসম্ভব! তার মনে হয় "এটা একটা স্বপ্ন! শুধুই স্বপ্ন! কাল সকালে জেগে উঠলে দেখব বাওএর আমাকে জড়িয়ে শুয়ে আছে। তার পর সে জেগে উঠে ডাকবে 'মা'। বাঘের বাচ্চার মত লাফিয়ে নীচে নামবে খেলার জন্য।"

অনেকক্ষণ আগে বুড়ো গোং গান বন্ধ করেছে। শুভ শুঁড়ীখানার বাতিও নিভে গেছে। শানের বউ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যা ঘটে গেছে তা তার বিশ্বাস হচ্ছে না। মোরগ ডাকছে। পূর্বের আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকছে দিনের আলো।

ধীরে ধীরে ভোরের রূপোলী আলো তামাটে হয়ে আসে। সূর্যের আলো এখন ঘরের চালের ওপর। চার নম্বর শানের বউ ঠায় বসে আছে। দরজায় টোকা পড়তেই সে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। পিঠে বোঝা নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে অচেনা এক লোক। তার পেছনেই নয় নম্বর খালা ওয়াং।

ওহ! তা হলে সে কফিন নিয়ে এসেছে!

সে দিন বিকেল পর্যন্ত কফিন বন্ধ করা যায় নি। কারণ শানের বউ কাঁদতে কাঁদতে এক একবার গিয়ে ছেলের মুখ দেখে আর কফিন বন্ধ করার কথা উঠলেই বারণ করে। ভাগ্যভালো, নয় নম্বর খালা ওয়াং অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে পড়ে। রেগে গিয়ে খালা তাকে টেনে সরিয়ে নেয়। তারপর তারা তাড়াতাড়ি কফিন বন্ধ করে দেয়।

বাওএর-এর জন্য যা কিছু সম্ভব, চার নম্বর শানের বউ সব করেছে। কোন কিছু বাদ রাখে নি। আগের দিন সে একমালা কাগুজে টাকা পুড়িয়েছে। আজ সকালে পুড়িয়েছে 'মহা করুণা মন্ত্রের' ৪৯টি মন্ত্র। কফিনে দেয়ার আগে সবচে নতুন কাপড় পরিয়েছে। বালিশের কাছে রেখে দিয়েছে তার প্রিয় খেলনাগুলো— ছোট্ট মাটির পুতুল, দুটো কাঠের বাটি, দুটো শিশি। নয় নম্বর খালা ওয়াং বার বার আঙ্গুলে গুণলেও, কোন কিছু বাদ পড়েছে বের করতে পারেন নি।

নীল-চামড়া আ উ সারাদিনে একবারও দেখা দেয় নি। তাই কফিন বহন ও কবর খোঁড়ার জন্য মাথাপিছু ২১০ পয়সার বিনিময়ে শুভ শুঁড়ীখানার মালিক

দু'জন লোক ভাড়া করে। খালা ওয়াং খাওয়া তৈরিতে সাহায্য করে। যারা আঙ্গুল নেড়েছে বা মুখ খুলেছে সবাই দাওয়াত পায়। সূর্য ডোবার সময় হলে মেহমানরাও বাড়ী ফেরার কথা বলে। এবং সবাই বাড়ী চলে যায়।

প্রথম দিকে চার নম্বর শানের বউয়ের মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। একটু জিরানোর পর সেটা কেটে যায়। তখনি তার কাছে সবকিছু অবাক লাগে। তার জীবনে যা কখনো ঘটে নি, যা কখনো ঘটবে বলে সে ভাবে নি, তা'ই ঘটে গেছে। যতই ভাবছে, ততই তার অবাক হবার পালা। আরেকটা জিনিষ 'তার কাছে খুব অবাক লাগছে—হঠাৎ একটা বিশাল নীরবতা নেমে এসেছে পুরো ঘরের ভেতর।

উঠে বাতি জ্বালাতেই ঘরটাকে আরো নীরব মনে হয় তার কাছে। হাতড়ে গিয়ে সে দরজা বন্ধ করে, ফিরে এসে বিছানায় বসে। মেঝের উপর পড়ে আছে তাঁতটি। সে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকার ক্ষমতা তার নেই। ঘরটা শুধু নীরব নয়, হঠাৎ বড়ো হয়ে গেছে, জিনিষপত্র কমে গেছে। এই বড়ো ঘর তাকে ঘিরে আছে। বিশাল শূন্যতায় তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

সে জানে তার বাওএর সত্যিই মরে গেছে। ঘরকে সহ্য করতে না পেরে সে ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। তারপর কাঁদতে থাকে ও ভাবতে থাকে। মনে পড়ে তাঁত বোনার সময় কেমন করে বাওএর তার পাশে বসে থাকত, মৌরী-মশলা দেয়া মটরশুঁটি খেত। ছোট্ট কালো চোখ দিয়ে সে গভীরভাবে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকত। হঠাৎ বলে উঠত, "মা! বাবা হুন ডুন[3] বিক্রী করতেন। বড় হয়ে হুন ডুন বিক্রী করে আমি অনেক টাকা পাব। সবটাকাই তোমাকে দিয়ে দেব।"

এসময় প্রতি ইঞ্চি সূতো তার কাছে দামী এবং জীবন্ত মনে হোত। কিন্তু এখন? শানের বউ কখনো বর্তমান নিয়ে ভাবে নি—কেননা সে সাদাসিধে মহিলা। কি সমাধানের কথাই বা সে ভাববে? সে শুধু জানে এই ঘর খুব বড়ো, খুব ফাঁকা এবং নীরবতায় ভরা।

চার নম্বর শানের বউ সাদাসিধে মহিলা হলেও সে জানে মৃতের দেহে আর প্রাণ আসবে না। ছেলে বাওএরকে সে আর কখনো দেখবে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলে: "বাওএর তুমি নিশ্চয়ই এখানে আছ। আমাকে স্বপ্নে দেখা দাও।" তারপর সে চোখ বন্ধ করে তখনই স্বপ্নে বাওএরকে দেখার আশায়। বিশাল নীরবতা, শূন্যতা ও বিশালত্বের মধ্যে সে নিজের নিশ্বাস শুনতে পায়।

অবশেষে চার নম্বর শানের বউ ঝিমুতে থাকে। পুরো ঘরটা নিশ্চুপ। লাল

নাকওয়ালা গোং-এর লোকগীতি অনেক আগে বন্ধ হয়ে গেছে। শুভ শুঁড়ীখানা থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে আসার সময় সে হেঁড়ে গলায় গাইছে :

"তোমার জন্য দয়া হয়
আমার প্রেমিকা
তুমি বড় একেলা......"

নীল-চামড়া আ উ বুড়ো গোং-এর ঘাড়ে হাত রাখে। তারপর দুই মাতাল হাসতে হাসতে চলে যায়।

শানের বউ ঘুমিয়ে আছে। বুড়ো গোং এবং অন্যেরা চলে গেছে। শুভ শুঁড়ী-খানার দরোজা বন্ধ। সমস্ত লুযেন শহরে এক গভীর নীরবতা। ভোরের আশায় নীরব রাত এগিয়ে চলেছে। এবং অন্ধকারে লুকানো কিছু কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।

জুন, ১৯২০

টীকা

1. ছোট্ট রৌপ্যমুদ্রা ছিল ছিং রাজবংশের সম্রাট স্যুয়ান থোং (১৯১০)-এর শাসনামলে চালু মুদ্রা। তৎকালীন দশ রৌপ্যমুদ্রা বর্তমান এক ইউয়ানের সমান। তাম্রমুদ্রা ছিং রাজবংশের সম্রাট গুয়াং স্যুর (১৯০০) শাসনামলে চালু মুদ্রা। তৎকালীন একশো তাম্রমুদ্রা বর্তমান এক ইউয়ানের সমান।

2. পুরনো চীনারা বিশ্বাস করত পাঁচটি উপাদান আছে: আগুন, কাঠ, মাটি, ধাতু এবং পানি। আগুন ধাতুকে জয় করতে পারে। ঐতিহ্যবাহী চীনা ডাক্তাররা মনে করতেন হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, প্লীহা ও মুত্রগন্থি এই পাঁচ উপাদানের অনুরূপ। এখানে হো ডাক্তার বলছেন হৃদরোগের জন্য ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

3. হুন ডুন এক ধরণের চীনা খাবার। ভেতরে মাংস ও সব্জি থাকে। স্যুপে ভিজিয়ে খেতে হয়।

একটি ছোট্ট ঘটনা

গ্রাম থেকে রাজধানীতে এসেছি ছয় বছর। এর মাঝে তথাকথিত রাষ্ট্রীয় ব্যাপার-স্যাপার অনেক দেখেছি, শুনেছি। কিন্তু কোন কিছুই আমার মনে গভীর দাগ কাটে নি। আমার ওপর এর প্রভাবের কথা বলতে গেলে এসব ঘটনায় আমার মেজাজ আরো বিগড়ে গেছে। এবং সত্যি বলতে কি মানুষের প্রতি ঘৃণাও বেড়েছে।

এর মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমার মেজাজ ঠাণ্ডা করে দেয়। আজ পর্যন্ত আমি তা ভুলতে পারি না।

ঘটনাটি ঘটেছে ১৯১৭ সালের শীতকালে। জীবন ধারণের জন্য কনকনে উত্তুরে বাতাসের মধ্যে আমাকে ভোরে উঠে বাইরে বেরুতে হোত। কদাচিৎ রাস্তায় দু' একজন চোখে পড়ত। 'S' গেটে যাবার রিকশা পাওয়া ছিল এক কষ্টকর ব্যাপার।

যেদিনের ঘটনা সেদিন বাতাস একটু পড়ে গিয়েছিল। সমস্ত ধূলো উড়ে গিয়ে রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। রিকশাওয়ালাও পা চালিয়ে দিয়েছে। 'S' গেটের কাছাকাছি আসতেই রাস্তা পেরুতে গিয়ে একজন আমাদের রিকশার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নীচে পড়ে গেল।

পথচারী একজন মহিলা। চুলে কিছু কিছু পাক ধরেছে। পরণে টুটাফাটা কাপড়। কোন ইশারা না দিয়েই সে রিকশার সামনে এসে পড়ে। রিকশাওয়ালা পথ করে দিলেও তার বোতাম খোলা ছেঁড়া জ্যাকেট হাওয়ায় রিকশার শ্যাফটে আটকে যায়। ভাগ্যভালো, রিকশাওয়ালা তাড়াতাড়ি রিকশা সরিয়ে নেয়। না হলে সে বেকায়দায় পড়ে গিয়ে আরো মারাত্মক আঘাত পেত।

মহিলা মাটিতে পড়ে আছে। রিকশাওয়ালা থেমে গেছে। আমি ভাবি নি সে আঘাত পেয়েছে। এবং এ ঘটনার কোন সাক্ষীও ছিল না। রিকশাওয়ালার

গায়েপড়া ভাব আমার কাছে ভাল লাগলো না। মনে হল সে বিপদে পড়বে এবং আমার দেরী হয়ে যাবে।

আমি বললাম : "ঠিক আছে, চল।"

সে কান দিল না। বোধ হয় শুনে নি। সে রিকশা রেখে ধীরে ধীরে মহিলাকে উঠতে সাহায্য করে। এক হাতে তাকে ধরে জিজ্ঞেস করে :

"চোট লেগেছে?"

"হ্যাঁ।"

আমি দেখেছি কত ধীরে সে পড়েছে। তাই নিশ্চিত ছিলাম চোট লাগে নি। এই ভান করা বিরক্তিকর। রিকশাওয়ালা নিজের বিপদ ডেকে এনেছে। তাকে নিজের ঝামেলা নিজে সারতে হবে।

মহিলা চোট লাগার কথা বলতেই রিকশাওয়ালা আর একমিনিটও ইতস্ততঃ করে নি। তার হাত ধরে তাকে সামনে নিয়ে যায়। আমার অবাক হবার পালা। সামনে তাকিয়ে দেখি পুলিশ ফাঁড়ি। তীব্র বাতাসের জন্য বাইরে কেউ ছিল না। তাই রিকশাওয়ালা সেই বুড়ী মহিলাকে গেটের দিকে নিয়ে যায়।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে পেয়ে বসে। মনে হল সে মুহূর্তে তার ধূলোমাখা, অপসৃত শরীর লম্বা হয়ে গেছে। যত সে হাঁটছে, ততই তাকে মরীচিকার মত মনে হচ্ছে। বাধ্য হয়ে আমাকে ভালো করে তাকাতে হল। সে সময়ে আমার মনে হল পশমের তৈরী গাউনের নীচে আমার যে স্বত্বা তাকে সে গ্রাস করবে।

পুলিশ না আসা পর্যন্ত সেখানে বসে থাকতে থাকতে মনে হল আমার জীবনীশক্তি ফুরিয়ে গেছে, মন উধাও হয়ে গেছে। তারপর আমি রিকশা থেকে নেমে পড়ি।

পুলিশ আমার কাছে এসে বলে, "আরেকটি রিকশা দেখুন। সে আর আপনাকে টানতে পারবে না।"

কিছু না ভেবেই, পকেট থেকে বেশ কিছু পয়সা বের করে পুলিশের হাতে দিয়ে বলি, "তাকে এগুলো দেবেন।"

বাতাস পুরো পড়ে গেছে। কিন্তু রাস্তা তখনো নীরব। ভাবতে ভাবতে আমি হাঁটছি, কিন্তু নিজের কথা ভাবতেই আমার খুব ভয় হচ্ছে। যা ঘটেছে তা বাদ দিয়ে, বেশী পয়সা দিয়ে আমি কি বোঝাতে চেয়েছি? এটা কি পুরস্কার? রিকশাওয়ালাকে বিচার করার আমি কে? আমি কোন জবাব খুঁজে পেলাম না।

এখন পর্যন্ত এ ঘটনা আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রায়ই আমার কষ্ট হয় এবং এটা আমাকে নিজের সম্পর্কে ভাবিয়ে তোলে।

ছোটবেলায় পড়া চিরায়ত সাহিত্যের মত সে সময়ের সামরিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী আমি সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। তবু এই ঘটনা বার বার আমার মনে ফিরে আসে। বাস্তবের চেয়েও অনেক জীবন্ত। আমাকে লজ্জা দেয়, শোধরানোর প্রেরণা দেয় এবং নতুন শক্তি ও সাহস জোগায়।

জুলাই, ১৯২০

চায়ের কাপে ঝড

নদীর কিনারায় সূর্যের উজ্জ্বল হলদে আভা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে। রিঠা গাছের রৌদ্রদগ্ধ পাতাগুলো দম ফেলার সুযোগ পায়। গাছের নীচে চিতা মশার দল ভন ভন করছে। নদীর ধারে কৃষকদের রান্নাঘরের চিমনিব ধোঁয়া মিলিয়ে যাচ্ছে। মহিলা ও শিশুরা দরোজার বাইরে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে এবং ছোট টেবিল, চৌকি বের করেছে। বোঝা যায় এখন সান্ধ্য খাবারের সময়।

বুড়ো ও পুরুষরা বসেছে চৌকির ওপর। গল্প করতে করতে তারা বাতাস করছে চেটাল পাতার পাখা দিয়ে। বাচ্চারা ঘোরাঘুরি করছে অথবা রিঠা গাছের নীচে এক্কাদোক্কা খেলছে। মহিলারা টেবিলের ওপর গরম কালো শুকনো সব্জি ও হলদে ভাত সাজিয়ে দিয়েছে। নদীতে প্রমোদতরীতে ছিল কয়েকজন পণ্ডিত। এ সব দেখে শুনে তাদের ভাব উথলে ওঠে। তারা চীৎকার করে উঠে : "আহা, কোন ঝামেলা নেই। এটাই গ্রামীণ জীবনের শান্তি।"

পণ্ডিতরা একটু বাড়িয়েই বলেছিল। তারা শুনতে পায়নি বুড়ী জিউজিন[1] কি বলছে। রাগে গরগর করতে করতে বুড়ী ছেঁড়া চেটাল পাখা দিয়ে চৌকির পায়ায় আঘাত করে বলে :

"আমি ৭৯ বছর বেঁচেছি। যথেষ্ট। বসে বসে সবকিছু গোল্লায় যাওয়া দেখতে চাইনা — তার'চে মরণ ভালো। খাওয়ার সময় হয়েছে, তবু তারা ভাজা মটর-শুঁটি খাচ্ছে, বাড়ীঘর সব খেয়ে ফেলবে।"

বুড়ীর প্রপৌত্রী লিউজিন মটরশুঁটি হাতে তার দিকেই দৌড়ে আসছিল। কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখেই আবার নদীর কিনারায় দৌড়ে গিয়ে রিঠা গাছের পেছনে লুকোয়। তারপর ছোট্ট মাথার বেণীজোড়া দুলিয়ে চীৎকার করে : "আহ, বুড়ীর মরণ নাই।"

বুড়ী জিউজিনের অনেক বয়স হলেও, সে কানে খাটো নয়। বুড়ী শুনতে

পায়নি মেয়েটি কি বলেছে। সে নিজের মনেই বিড়বিড়িয়ে বলতে থাকে: "গেছে দিন ভালো দিন।"

এ গ্রামে একটা অসাধারণ নিয়ম চালু আছে। ছেলে-মেয়ের জন্ম হলে মায়েরা ওজন করে ওজন দিয়ে নাম রাখে। ৫০ তম জন্মদিন পালন করার পর থেকে বুড়ী জিউজিন খুঁত ধরতে শুরু করেছে। সবসময় বলবে তার যৌবনে গরমের দিনে এত গরম ছিল না, মটরশুঁটিগুলো এত শক্ত ছিল না। সংক্ষেপে বলা যায়, এই কলিকালে কিছু একটা দারুণ গোলমাল লেগেছে। না হলে, লিউজিনের ওজন কেন তার প্রপিতামহের চেয়ে তিন জিন এবং বাবার চেয়ে এক জিন কম হবে? এ প্রমাণ উল্টানো যাবে না। তাই সে জোর দিয়ে বার বার বলে: "গেছে দিন ভালো দিন।"

তার পৌত্র-বধু ছিজিন সবে টেবিলে ভাতের ঝুড়ি নিয়ে এসেছে। টেবিলের ওপর তা ঢাকতে ঢাকতে সে রাগে বলতে থাকে: "তুমি আবার এসেছ? লিউ-জিনের জন্মের সময় তার ওজন হয়েছিল সাড়ে ছয় জিন, নয়কি? তোমার বাড়ীতে দাড়ি-পাল্লার পাথরের ওজন বেশী, আঠারো লিয়াং-এ এক জিন। ষোল লিয়াং-এ এক জিনের পাথর হলে লিউজিনের ওজন সাত জিনের বেশী হোত। আমার মনে হয় না দাদা এবং বাবার ওজন সত্যি নয় জিন বা আট জিন হয়েছিল। সম্ভবতঃ সে আমলে এক জিন ছিল চৌদ্দ লিয়াং......"

"গেছে দিন ভালো দিন।"

ছিজিনের বউ জবাব দেবার আগেই গলির মাথায় স্বামীকে দেখতে পায়। রাগ গিয়ে পরে স্বামীর ওপর: "ঢিলা কোথাকার, এত দেরী হল কেন? সারা দিন কোথায় ছিলে? খাওয়া নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকি তাতে তোমার কিছু যায় আসে না।"

গ্রামে থাকলেও ছিজিন সবসময় নিজের ভালো করতে চেয়েছে। দাদার আমল থেকে তিনপুরুষে তার পরিবারের কেউ নিড়ানি ধরেনি। বাপের মতই সে নৌকো চালায়। সকালে লুযেন থেকে শহরে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে আসে। তাই সে দিন দুনিয়ার খবর ভালোই জানে। যেমন, বাজ-দেবতা কোথায় কেন্নো আত্মাকে মেরেছে, কোথায় কুমারী মাতা দৈত্য প্রসব করেছে। এ নিয়ে গাঁয়ে নাম থাকলেও, তার পরিবার গাঁয়ের নিয়ম কানুন মেনে চলে এবং গরমে সান্ধ্য-ভোজের জন্য বাতি জ্বালায় না। তাই দেরী করে ফিরলে তাকে গাল শুনতে হবে।

ছিজিনের এক হাতে ফুটকি দেয়া বাঁশের লগি। ছয়ফুটের চেয়ে লম্বা। লগির মাথায় হাতির দাঁতের ও দস্তার কাজ করা। মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে হেঁটে

গিয়ে সে একটি চৌকির ওপর বসে। সুযোগ বুঝে লিউজিন বেরিয়ে এসে তার পাশে বসে পড়ে। সে কথা বলতে থাকে, কিন্তু জবাব পায় না।

বুড়ী জিউজিন বিড়বিড় করতে থাকে : "গেছে দিন ভালো দিন।"

ছিজিন ধীরে মাথা তুলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে : "সম্রাট আবার সিংহাসনে বসেছেন।"

ছিজিনের বউ হঠাৎ বোবা বনে যায়। তার পর বুঝতে পেরে আনন্দে চীৎকার করে ওঠে : "ভালো কথা! সম্রাট আবার ক্ষমা ঘোষণা করবেন, নয় কি?"

ছিজিন আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে : "আমার কোন বেণী নেই।"

"সম্রাট কি বেণী রাখতে চান?"

"হ্যাঁ।"

ছিজিনের বউ বিচলিত হয়ে পড়ে। সে জানতে চায়, "তুমি কেমন করে জান?"

"শুভ-শুঁড়ীখানায় সবাই তাই বলে।"

ছিজিনের বউ বুঝে নেয় অবস্থা বেগতিক। শুভ-শুঁড়ীখানাই সব খবরের আড্ডা। ঘৃণা এবং ক্ষোভের সঙ্গে সে স্বামীর নেড়া মাথার দিকে তাকায়। তার পর হাল ছেড়ে দিয়ে থালায় ভাত ভর্তি করে তার সামনে শব্দ করে রাখে, "তাড়াতাড়ি খাও। কাঁদলে তোমার বেণী গজাবে না।"

সূর্যের শেষ আলোটুকু মিলিয়ে গেছে। কালো জল ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। নদীর পাড়ে হাঁড়ি-পাতিলের টুংটাং শব্দ শোনা যাচ্ছে, সেখানে লোকজনের পিঠে ঘাম বেরিয়ে গেছে। ছিজিনের বউ তিন বাটি ভাত শেষ করেছে এমন সময় কিছু একটা দেখতে পেয়ে তার হৃৎকম্প বেড়ে যায়। রিঠা গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সাঁকোর ওপর মিঃ যাও-এর ছোটখাটো মোটা শরীর দেখা যাচ্ছে। তার পরণে নীল রংয়ের সুতী গাউন।

মিঃ যাও পাশের গ্রামের সমৃদ্ধ শুঁড়ীখানার মালিক। আশেপাশের দশ মাইলের মধ্যে তিনিই একমাত্র নামকরা ব্যক্তি এবং একটু লেখাপড়া জানেন। এই লেখাপড়া তাঁর বিগত যুগের এক ধরনের মেজাজের কারণ হয়েছে। তাঁর কাছে জিন শেংথান[2] এর টীকা লেখা "তিন রাজ্যের কাহিনী"-এর বারো খণ্ড বই আছে। এগুলো তিনি অক্ষর ধরে ধরে বার বার পড়েন। তিনি পঞ্চ ব্যাঘ্র সেনাপতিদের[3] নাম জানেন এবং হুয়াং যোং হানশেং হিসেবে এবং মা ছাও মেংছি হিসেবে পরিচিত একথাও বলতে পারেন। বিপ্লবের পর তাও ধর্মযাজকদের মত তিনি চুলের বেণীকে মাথার ওপর কুণ্ডলী পাকিয়েছেন এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন

যাও ইয়ুন বেঁচে থাকলে সাম্রাজ্যের এই দশা হতো না।

ছিজিনের বউয়ের চোখের নজর ভালো। তাই সে দেখতে পায় আজকে মিঃ যাও তাও ধর্মযাজকদের মত চুল বাঁধেন নি। তাঁর মাথার সামনের দিকটা নেড়া এবং বেণী দুলছে। সে বুঝতে পারে সম্রাট সিংহাসনে বসেছেন, বেণী জরুরী হয়ে পড়েছে এবং ছিজিনের মহাবিপদ। বিনাকারণে মিঃ যাও তাঁর লম্বা গাউন পরেন নি — গত তিন বছরে তিনি এটা মাত্র দুবার পরেছেন। একবার যখন তাঁর শত্রু বসন্তের দাগওয়ালা আহ্ সি রোগে পড়েছে, আর একবার যখন তাঁর শুঁড়ীখানা গুড়িয়ে দেয়া মিঃ লু মারা গেছে। আজকে তৃতীয় বারের মত পরেছেন। নিশ্চয়ই তাঁর জন্য আনন্দের এবং শত্রুদের জন্য ক্ষতিকর কিছু একটা ঘটেছে।

ছিজিনের বউয়ের মনে পড়ে দু বছর আগে মাতাল হয়ে তার স্বামী মিঃ যাওকে "হারামজাদা" বলে গাল দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারে তার স্বামীর মহাবিপদ এবং তার বুক কাঁপতে থাকে।

মিঃ যাও পাশ কাটানোর সময় লোকজন উঠে দাঁড়ায় এবং ভাতের বাটির দিকে কাঠি-তাক করে বলে : "আসুন, খেতে বসুন মিঃ যাও।"

মিঃ যাও মাথা নেড়ে সবাইকে বলেন : "আপনারা খান।" তিনি সোজা চলে যান ছিজিনের টেবিলে। তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য সবাই উঠে দাঁড়ায়। মুচকি হেসে মিঃ যাও বলেন : "খেতে থাকো।" টেবিলের ওপর খাওয়ার দিকেও তিনি একবার চোখ বুলিয়ে নেন।

"শুকনো সবজিগুলোর বেশ সুবাস — খবর শুনেছ?" ছিজিনের বউয়ের উল্টো দিকে ছিজিনের পেছনে মিঃ যাও দাঁড়িয়ে ছিলেন।

ছিজিন বলে : "সম্রাট সিংহাসনে বসেছেন।"

মিঃ যাও-র অভিব্যক্তি দেখে ছিজিনের বউ জোর করে হাসে। সে জিজ্ঞেস করে : "সম্রাট সিংহাসনে বসেছেন। কখন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করবেন?"

"সাধারণ ক্ষমা? — ঠিক সময়েই সাধারণ ক্ষমা ঘোষিত হবে।" মিঃ যাও-এর গলা কঠোর হয়ে আসে। "ছিজিনের বেণীর কি হবে? সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। তুমি জান লম্বাচুলের[4] আমলের কথা : চুল রাখ মাথা যাবে, মাথা রাখ চুল যাবে

ছিজিন এবং তার বউ কখনো লেখাপড়া করেনি, তাই তারা এসবের কিছু জানে না। তাদের মনে হয় যেহেতু মিঃ যাও বলেছেন, তাই ব্যাপারটা গুরুতর, উল্টানো যাবে না। তাদের মনে হল যেন তাদের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। তাদের কান ঝিঁ ঝিঁ করতে থাকে। তারা আর একটি কথাও বলতে পারে না।

বুড়ী জিউজিন সুযোগ বুঝে মিঃ যাও-এর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেয় : "গেছে দিন ভালো দিন। আজকাল বিদ্রোহীরা লোকজনের বেণী এমনভাবে কেটে দেয় যে তাদের বৌদ্ধ বা তাও কোনটাই দেখায় না। বিদ্রোহীরা কি আগে এমন ছিল? আমি ৭৯ বছর বেঁচেছি, যথেষ্ট। আগে বিদ্রোহীরা পায়ের গোড়া পর্যন্ত ঝোলানো লাল সাটিনে মাথা ঢেকে রাখত। রাজপুত্রের হলদে সাটিন ঝুলে থাকত ......হলদে সাটিন, লাল সাটিন, হলদে সাটিন ...... ৭৯ বছরে অনেক দেখেছি।"

দাঁড়িয়ে উঠে ছিজিনের বউ বিড় বিড় করতে থাকে : "কি করব? ছেলে বুড়ো মিলিয়ে আমাদের পরিবার এত বড়, সবাই তার ওপর নির্ভর করে ......"

মিঃ যাও-এর জবাব : "তোমাদের কিছুই করার নেই। বেণী না রাখার শাস্তি বইয়ে পরিষ্কার লেখা আছে। পরিবার বড় বা ছোট তাতে কিছু যায় আসেনা।"

বইয়ে লেখা আছে শুনে ছিজিনের বউ সব আশা ছেড়ে দেয়। উদ্বেগে সে হঠাৎ ছিজিনকে ঘৃণা করতে থাকে। তার নাকের সামনে কাঠি বাড়িয়ে চীৎকার করে : "সে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মেরেছে। আমি কি করব? বিদ্রোহের সময় আমি বলেছি, নৌকো নিয়ে যেও না, শহরে যেও না। কিন্তু সে যাবে। সে শহরে গিয়েছে, তারা তার বেণী কেটে দিয়েছে। তার চকচকে কালো বেণী ছিল, এখন তাকে বৌদ্ধ বা তাও-এর মত দেখায় না। সে নিজের কবর নিজে তৈরী করেছে, এখন তাকে শুতে হবে। আমাদের এসবে ঠেলে দেয়ায় তার কি অধিকার আছে?"

মিঃ যাও আসার পর গ্রামবাসীরা তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে ছিজিনের টেবিলের চারদিকে জড়ো হয়। ছিজিন জানে লোকের সামনে বউয়ের গাল খাওয়া মানী লোকের জন্য বেখাপ্পা দেখায়। তাই মাথা তুলে সে ধীরে ধীরে বলে : "আজ তুমি অনেক বলেছ, কিন্তু সেই সময়ে ......"

"খাঁচার বন্দী পাখী! ......"

সেখানে যারা এসেছে তাদের মধ্যে বিধবা বাই'র মনটা সবচে নরম। স্বামীর মৃত্যুর পর জন্ম হওয়া দু বছরের সন্তানকে নিয়ে ছিজিনের বউয়ের পাশে দাঁড়িয়ে সে মজা দেখছিল। বুঝতে পারে ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে। তাই শান্ত করার জন্য বলে :

"ছিজিনের বউ, কিছু মনে করো না। মানুষ ত আর দেবতা নয়, ভবিষ্যতের কথা বলবে কেমন করে? ছিজিনের বউ কি আগে বলে নি বেণী না থাকলে লজ্জার কিছু নেই? তা ছাড়া সরকারী বড়ো কর্তা এখনও কোন আদেশ দেয়নি

তার কথা শেষ করার আগেই ছিজিনের বউয়ের কান লাল হয়ে ওঠে এবং সে তার কাঠি বিধবার নাকের ডগায় তুলে ধরে। প্রতিবাদ করে ওঠে : "না, কখনো না। এটা কি বলার ব্যাপার, বাই'র বউ? আমি এখনো মানুষ — এমন একটা হাস্যকর কথা কি করে বলতে পারি? সে ঘটনার পর আমি পুরো তিন দিন কেঁদেছি, সবাই দেখেছে। এমনকি সেই শিশু লিউজিন পর্যন্ত . . . . . ." লিউজিন সবে এক বাটি ভাত শেষ করেছে। আর এক বাটির জন্য বাটি বাড়িয়ে দিয়েছে। ছিজিনের বউয়ের মেজাজ ছিল সপ্তমে। হাতের কাঠি দিয়ে বেণীজোড়ার মাঝ-খানে মেয়ের মাথায় আঘাত করে : "চুপ কর। ছোট্ট হারামজাদী।"

লিউজিনের হাত থেকে মাটিতে পড়ে বাটি ফেটে যায়। ইটের সঙ্গে লেগে বাটিটি টুকরো হয়ে যায়। ছিজিন লাফিয়ে বাটিটি তুলে নেয় এবং ভাঙা জোড়া দিতে দিতে তাকিয়ে দেখে। "যত্তোসব।" বলেই সে লিউজিনকে এমন জোরে চড় মারে যে বেচারী পড়ে যায়। সে সেখানে পড়ে কাঁদতে থাকে। বুড়ী জিউজিন তাকে তুলে সঙ্গে করে নিয়ে যায় এবং বিড়বিড়াতে থাকে : "গেছে দিন ভালো দিন।"

এবার বাই'র বিধবা বউয়ের রাগ করার পালা। সে চীৎকার করে ওঠে : "বাচ্চাকে মারধোর, ছিজিনের বউ।"

মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে সবকিছু দেখছিলেন মিঃ যাও। "সরকারী বড়ো কর্তা এখনো কোন আদেশ দেয়নি" — বিধবা বাই'র এ কথা শুনে তিনি ক্ষেপে যান। ঠিক টেবিলের কাছে এসে বলতে থাকেন : "বাচ্চাকে মারধোর করলে কি আসে যায়? রাজকীয় বাহিনী যে কোন সময় এখানে এসে পড়বে। তুমি জান, তিন রাজ্যের যাং ফেই-এর বংশধর জেনারেল যাং সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা। তার বারো হাত লম্বা বল্লম আছে এবং দশ হাজার লোককে ঠেকাতে পারে। কেউ তার সামনে দাঁড়াতে পারে না।" তার পর দু হাত উপরে তুলে, যেন বিরাট বল্লম ধরে আছেন, তিনি বিধবা বাই'র দিকে এগিয়ে যান : "তুমি কি তার সঙ্গে পাল্লা দিতে চাও?"

ছেলে কোলে বিধবা বাই রাগে কাঁপতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ চোখের সামনে ঘর্মাক্ত, চোখরাঙ্গানো মিঃ যাওকে দেখে তার ভয় ধরে যায়। যা বলার তা শেষ না করেই সে পালিয়ে যায়। মিঃ যাও-ও চলে যান। লোকজন গায়ে পড়ে কথা বলার জন্য বিধবা বাই'কে দায়ী করতে থাকে। যারা বেণী কেটেছে এবং আবার গজাতে শুরু করেছে তাদের কয়েকজন ভয়ে ভীড়ের মাঝে লুকিয়ে যায় যেন মিঃ যাও দেখে না ফেলেন। মিঃ যাও ভালো করে না তাকিয়ে ভীড় ঠেলে এগিয়ে যান। হঠাৎ তিনি রিঠা গাছের পেছনে ঘুরে দাঁড়ান। "মনে কর তোমরা

তার সমানে সমান।" বলেই সাঁকোর ওপর দিয়ে চলে যান।

গ্রামবাসীরা সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। গোটা ব্যাপারটা ভাবতে থাকে। বুঝতে পারে, তারা সত্যিই যাং ফেই-এর সমান নয় ; ছিজিনের বাঁচা-মরা সমান। যেহেতু ছিজিন রাজকীয় আইন ভেঙ্গেছে তাই তাদের মনে হয় সেই লম্বা পাইপ টেনে খবরটা বলার সময় তার এমন বাবুগিরি দেখানো উচিত হয় নি। এখন সে মুশকিলে পড়েছে, এতে তারা একটু খুশীই হয়। তারা ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চায়, কিন্তু জানে না কি বলতে হবে। তাদের আশেপাশে মশা ভন ভন করছে, তার পর আবার রিঠা গাছের নীচে গিয়ে জড়ো হচ্ছে। গ্রামবাসীরা ফিরে যায়, দরজা বন্ধ করে এবং ঘুমিয়ে পড়ে। বিড় বিড় করতে করতে ছিজিনের বউ থালাবাসন টেবিল চেয়ার গুছিয়ে ভেতরে যায়, দরজা বন্ধ করে ঘুমানোর জন্য।

ছিজিন ভাঙ্গা বাটি হাতে ভেতরে যায়, এবং দরোজায় বসে ধূমপান করতে থাকে। কিন্তু উদ্বেগে পাইপের কথা পর্যন্ত ভুলে যায়। ধীরে ধীরে তার লগির মাথায় দস্তার তৈরী পাত্রের আলো নিভে যায়। মনে হয় ব্যাপারটা খুব মারাত্মক পর্যায়ে পোঁছেছে, তাই সামলানোর বা কিছু একটা করার কথা ভাবে। কিন্তু তার চিন্তা শুধু ঘুরপাক খাচ্ছে, সে আগামাথা কিছুই ভেবে পায় না। "বেণী, আহা বেণী? বারো হাতি বল্লম। 'গেছে দিন ভালো দিন'। সম্রাট সিংহাসনে বসেছেন। সারানোর জন্য ভাঙ্গা বাটিটি শহরে নিয়ে যেতে হবে। কে তার সমান? এটা বইয়ে লেখা আছে। যত্তোসব।......"

পরদিন ভোরে আগের মতোই নৌকো নিয়ে শহরে যায় ছিজিন। সন্ধ্যায় চার হাতি বাঁশের লগি এবং বাটি নিয়ে সে লুযেন ফিরে আসে। সান্ধ্য ভোজের সময় বুড়ী জিউজিনকে বলে, বাটিটি শহর থেকে সারিয়ে এসেছে। এমনভাবে ফেটেছে যে ষোল জায়গায় তামা দিয়ে ঝালাই করতে হয়। প্রতিটি ঝালাইয়ে তিন পয়সা — সব মিলিয়ে আটচল্লিশ পয়সা।

রেগে গিয়ে বুড়ী বলে : "গেছে দিন ভালো দিন। অনেক বেঁচেছি। একবার ঝালাইয়ে তিন পয়সা। এই ঝালাই আগের মত নয়। আগের দিনে...... আহ...... ৭৯ বছর বেঁচেছি......"

আগের মতই ছিজিন প্রতিদিন শহরে গেলেও, তার বাড়ীতে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করতে থাকে। অধিকাংশ গ্রামবাসী তাকে এড়িয়ে চলে, আগের মত শহরের খবর জিজ্ঞেস করতে আসে না। ছিজিনের বউয়ের মেজাজ সব সময় খারাপ, তাই মাঝে মাঝে সে স্বামীকে ডাকে : "খাঁচার বন্দী পাখী"।

প্রায় দিন পনেরো পরে, একদিন শহর থেকে ফিরে ছিজিন দেখতে পায় বউ খোশ মেজাজে আছে। সে জিজ্ঞেস করে: "শহরে কি কিছু শুনলে?"

"না, কিছু না।"

"সম্রাট কি সিংহাসনে বসেছেন?"

"তারা বলেনি।"

"শুভ শুঁড়ীখানায় কি কেউ কিছু বলেনি?"

"না, কিছু না।"

"আমার মনে হয় না সম্রাট সিংহাসনে বসবেন। আজকে মিঃ যাও-এর শুঁড়ি-খানা পার হওয়ার সময় দেখেছি তিনি বসে বসে বই পড়ছেন। তাঁর বেণী মাথার উপর পাকানো। পরণেও লম্বা গাউন নেই।"

"......"

"তুমি কি মনে কর তিনি সিংহাসনে বসবেন না?"

"সম্ভবতঃ না।"

এখন আবার বউ এবং গ্রামবাসীরা প্রত্যেকে ছিজিনকে সমীহ করে, তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। গরমের দিনে তার পরিবারের লোকজন খাওয়ার জন্য উঠোনে বসে, পথচারীরা তাদের দেখে হাসে, সালাম করে। কয়েকদিন আগে বুড়ী জিউজিন তার ৮০তম জন্মদিন পালন করেছে। সে আগের মতই সুস্থ, সবল এবং খুঁত ধরে বেড়ায়। লিউজিনের বেণীজোড়া আরো মোটা হয়েছে। তারা তার পা বাঁধতে শুরু করলেও, সে মা'কে টুকটাক সাহায্য করে। ষোল জায়গায় ঝালাই করা ভাতের বাটি নিয়ে উঠোনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়।

অক্টোবর, ১৯২০

টীকা

1. জিন হচ্ছে চীনের ওজনের একটি পরিমাপ। এক জিন প্রায় আধা সেরের সমান। তখনকার ১৬ লিয়াং সমান ছিল এক জিন (বর্তমানে ১০ লিয়াং সমান ১জিন)।

৯কে চীনা ভাষায় জিউ বলা হয়। চীনের অংকসংখ্যা যথাক্রমে — ই (এক), এর (দুই), সান (তিন), সি (চার), উ (পাঁচ), লিউ (ছয়), ছি (সাত), বা (আট), জিউ (নয়) এবং শি (দশ)।

2. জিন শেংথান (১৬০৯—১৬৬১) ছিলেন চীনের সাহিত্যের টীকাকার।

3 "তিন রাজ্যের" সময় সু রাজত্বে (২২১—২৬৩) পাঁচজন বিখ্যাত সেনাপতি: গুয়ান ইয়ু, যাং ফেই, যাও ইয়ুন, হুয়াং যোং এবং মা ছাও।

4. কৃষক অভ্যুত্থানের (১৮৫১—১৮৬৪) থাইপিং বাহিনী। ছিং রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পর চীনারা কপালের ওপরের চুল কেটে ফেলতে এবং বেণী বাঁধতে বাধ্য হয়। যেহেতু থাইপিংরা তাদের চুল রেখেছিল, তাই তাদের বলা হত "লম্বা চুলো"।

পরনো বাড়ী

বিশ বছরের আগে যে বাড়ী ছেড়েছি, সে বাড়ীতে ফেরার জন্য তিক্ত শীতের মধ্যে সাতশো মাইলের বেশী পথ পেরিয়ে এসেছি।

তখন শীতের শেষ। পুরনো বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই দিনটা ঘোলাটে হয়ে আসে। বজরার ভেতরে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করে। বাঁশের ছইয়ের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে দূরে এবং কাছে হলদে আকাশের নীচে ছড়ানো ছিটানো জীবনের স্পন্দনহীন কয়েকটি জনশূন্য গ্রাম। মনটা বিষন্ন হয়ে ওঠে।

গত বিশ বছর ধরে যে বাড়ী আমার স্বপ্নের ভেতর এটা নিশ্চয়ই সেই পুরনো বাড়ী নয়?

যে পুরনো বাড়ী আমি মনে রেখেছি সেটা কোনমতেই এ রকম নয়। আমার পুরনো বাড়ী অনেক ভালো ছিল। কিন্তু এর মোহ বা সৌন্দর্য বলতে হলে, কোন পরিষ্কার ধারণাই আমার নেই, নেই বর্ণনা করার ভাষা। এখন মনে হয় এর সবকিছুই তাতে ছিল। আমি যুক্তি খাড়া করি: বাড়ী সবসময় এরকম ছিল, উন্নতি না হলেও, যতখানি খারাপ ভেবেছি তত নয়। শুধু আমার মন বদলেছে, কেননা কোন মোহ ছাড়াই এবার গ্রামে ফিরছি।

এবার ফিরে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য বিদায় নেওয়া। বহু বছর ধরে আমাদের গুষ্টি যে পুরনো বাড়ীতে বাস করেছে তা ইতোমধ্যে আরেক পরিবারের কাছে বিক্রী হয়ে গেছে। বছব না ঘুরতেই তা আবার হাত বদল হবে। নববর্ষের আগেই বহু চেনা পুরনো বাড়ীকে চিরদিনের জন্য বিদায় জানাতে যেতে হচ্ছে। পুরনো শহর থেকে বহু দূরে কর্মস্থলে নিয়ে আসতে হবে আমার পরিবারকে।

পরদিন ভোরে আমি বাড়ীর দরোজায় পৌছি। বাড়ীর ছাঁদে হাওয়ায় কাঁপছে কিছু বিবর্ণ ঘাস। এ বাড়ীর হাতবদল হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। সম্ভবত: আমাদের গুষ্টির অনেকেই অন্যত্র সরে গেছে। তাই একটা অস্বাভাবিক নীরবতা।

বাড়ীতে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই স্বাগত জানানোর জন্য দরজায় বেরিয়ে আসেন মা। তাঁর পেছনে ছুটতে ছুটতে আসে আমার আট বছরের ভাইপো — হোংএর।

মা খুশী হলেও, এক ধরণের দুঃখ বোধ ঢাকার চেষ্টা করছেন। আপাততঃ মালপত্র সরানো বন্ধ করে তিনি আমাকে বসে বিশ্রাম নিতে এবং চা খেতে বলেন। হোংএর আমাকে আগে কখনো দেখে নি। দূরে দাঁড়িয়ে সে আমাকে দেখতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত সরে যাওয়া নিয়ে কথা বলতেই হয়। আমি বললাম, অন্যত্র বাড়ী ভাড়া নেয়া হয়েছে, কিছু আসবাবপত্রও কিনেছি। আরো কিছু জিনিষ কেনার জন্য বাড়ীর সমস্ত আসবাবপত্র বিক্রী করতে হবে। মা সায় দিয়ে বললেন, বাঁধাছাঁদার কাজ প্রায় শেষ। সেসব আসবাবপত্র সহজে সরানো যাবে না, তার অর্ধেক বিক্রী হয়ে গেছে। শুধু খদ্দেরদের কাছ থেকে টাকা পাওয়া মুশকিল।

মা বললেন, "তুমি দু একদিন বিশ্রাম নাও। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা কর। তারপর আমরা যেতে পারব।"

"ঠিক আছে।"

"ইয়ুনথু-এর কথা মনে আছে? যতবার সে আসে, তোমার কথা জিজ্ঞেস করে এবং তোমাকে আবার দেখতে চায়। আমি তাকে তোমার বাড়ী ফেরার তারিখ বলেছি। সে হয়ত যে কোন সময় এসে পড়বে।"

এ সময়ে আমার মনের ভেতর একটা অদ্ভুত ছবি ভেসে ওঠে। নীল আকাশে সোনালী চাঁদ ঝুলে আছে। নীচে বালুকাবেলায় যতদূর চোখ যায় শুধু সবুজ তরমুজ গাছের সারি। এর মাঝে গলায় রূপোলী চেনওয়ালা এগারো কি বারো বছরের একটি ছেলে নিড়ানি হাতে সর্বশক্তি দিয়ে একটি খটাশকে আঘাত করছে। আর সেটা আঘাত এড়িয়ে তার পায়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সেই বালক ইয়ুনথু। তার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা তখন তার বয়স দশের সামান্য ওপরে। সে ত্রিশ বছর আগের কথা। বাবা তখনো জীবিত। পরিবারের অবস্থাও সচ্ছল এবং আমি সত্যি বখাটে ছেলে। সে বছর পূর্বপুরুষদের জন্য ভোগের আয়োজন করা আমাদের পরিবারের পালা। ত্রিশ বছরে একবার আসে বলেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। পয়লা মাসে পূর্বপুরুষদের মূর্তির উদ্দেশ্যে ভোগ দেয়া হয়। ভোগের পাত্র খুব সুন্দর বলে এবং পূজারীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় চুরির ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয়। আমাদের পরিবারের শুধু একজন খণ্ড-কালীন কামলা ছিল। (আমাদের জেলায় মজুরদের আমরা তিনভাগে ভাগ করি: যারা এক পরিবারের জন্য সারা বছর কাজ করে তারা সাল-মজুর, যাদের শুধু একদি-

নের জন্য ভাড়া করা হয় তারা দিন-মজুর, এবং যারা নিজেদের জমি চাষ করে এবং নববর্ষ, উৎসব অথবা খাজনা আদায়ের সময় কোন পরিবারে কাজ করে তারা খণ্ড-কালীন) অনেক কাজ করতে হবে বলে, সে বাবাকে জানায় ভোগের পাত্রের উপর নজর রাখার জন্য ছেলে ইয়ুনথুকে নিয়ে আসবে।

বাবা রাজী হলে আমার খুব খুশী লাগে। আমি বহুদিন ইয়ুনথু-এর কথা শুনেছি এবং জানতাম সে আমারই প্রায় সমবয়সী। তার জন্ম বাড়তি মাসে[1]। ভাগ্য-গণনার সময় দেখা যায় পাঁচটি উপাদানের মধ্যে তার ভাগ্যে মাটি নেই। তাই তার বাবা তার নাম রেখেছেন ইয়ুনথু (বাড়তি মাটি)। সে ফাঁদ বানিয়ে ছোট্ট পাখী ধরতে পারে।

আমি প্রতিদিন নববর্ষের আশায় থাকি। নববর্ষেই ইয়ুনথু আসবে। অবশেষে বছরের শেষে একদিন মা বললেন ইয়ুনথু এসেছে। তাকে দেখার জন্য আমি ছুটে যাই। সে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছে। তার গোলগাল লাল মুখ, মাথায় টুপি এবং গলায় উজ্জ্বল রূপোলী চেন। বোঝা যায় তার বাবা ভালো বাসায় অন্ধ। ছেলে মরে যাবে ভয়ে দেব-দেবীর কাছে কসম খেয়ে গলায় রূপোলী কবচ দিয়েছে। সে খুব লাজুক। কিন্তু একমাত্র আমাকেই ভয় পেত না। কেউ না থাকলে সে আমার সঙ্গে কথা বলত। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমরা ভালো বন্ধু হয়ে যাই।

জানি না তখন কি নিয়ে আলাপ করতাম। কিন্তু মনে পড়ে ইয়ুনথু-এর মনোবল ছিল উচুঁ। শহরে আসা অবধি সে নতুন অনেক কিছু দেখেছে।

পরদিনই আমি তাকে পাখী ধরে দিতে বলি। তার জবাব :

"হবে না। শুধু বরফ পড়লে হবে। বরফের পর আমি মাটিতে একটু জায়গা পরিষ্কার করে নেই। তারপর ছোট্ট একটা লাঠি দিয়ে বিরাট একটা ঝুড়ি খাড়া করে দেই। নীচে ছড়ানো থাকে কিছু ধান। পাখীরা ধান খেতে এলে, লাঠির সঙ্গে বাঁধা দড়ি ধরে টান দিলেই, ঝুড়ির ভেতর আটকা পড়ে। কত রকমের পাখী : বুনো রঙীন পাখী, বড়ো পাখী, কবুতর, নীলপাখী . . . . . ."

সেই থেকে আমি বরফের আশায় থাকি।

ইয়ুনথু আরেকদিন বলে : "এখন খুব ঠাণ্ডা। গরমের সময় আমাদের ওখানে তোমাকে আসতে হবে। দিনের বেলা বালুকাবেলায় আমরা ঝিনুক কুড়োতে যাব। কত রঙ বেরঙের ঝিনুক, লাল, সবুজ, পাজি, এবং 'বুদ্ধের হাত'। সন্ধ্যায় যখন বাবার সঙ্গে তরমুজ দেখতে যাই তখন তুমিও যাবে।"

"সে কি চোর ধরার জন্যে?"

"না। যদি তৃষ্ণায় পথচারীরা একটি তরমুজ তুলে নেয়, আমাদের লোকজন

সেটাকে চুরি মনে করে না। আমাদের দেখতে হয় খটাশ, সজারু আছে কিনা। চাঁদনী রাতে যখন তরমুজ খেতে শুরু করে তখন শব্দ পাওয়া যায়। তখনই তুমি নিড়ানি হাতে চুপি চুপি সেখানে যাবে ......"

তখন খটাশ সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিলনা — এখনও তা পরিষ্কার নয় — বুঝতে পারি এটা ছোট্ট কুকুরের মত, ভয়ংকর কিছু একটা।

"ওগুলো কি মানুষকে কামড়ায় না?"

"তোমার হাতে নিড়ানি আছে। তুমি যাবে, দেখতে পেলে আঘাত করবে। এটা খুব ধূর্ত প্রাণী। তোমার দিকে ছুটে এসে পায়ের ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যাবে। এর লোম তেলের মত পিছলা।"

আমি কখনো জানতাম না এসব অদ্ভুত জিনিষ আছে। বালুকাবেলায় রঙধনুর বিভিন্ন রংয়ের ঝিনুক আছে, তরমুজের বিপদ আছে। শুধু জানতাম ওগুলো মুদী দোকানে বিক্রি হয়।

"আমাদের বালুকাবেলায় জোয়ারের সময় প্রচুর উচ্ছিরিংগা মাছ আসে, ব্যাঙের মত দু পাওয়ালা ......"

ইয়ুনথু-এর মন ছিল ঐসব অদ্ভুত জিনিষের বাসা, আমার পুরনো বন্ধুদের হিসেবের বাইরে। তারা এসবের কিছুই জানত না। ইয়ুনথু সাগর তীরে বাস করত। তারা আমার মতই দেয়ালের বাইরে শুধু আকাশ দেখতে পেত।

দুঃখজনকভাবে, নববর্ষের একমাস পরে ইয়ুনথুকে বাড়ী চলে যেতে হয়। আমি কান্নায় ভেঙে পড়ি, সে রান্নাঘরে লুকোয়। না যাবার জন্য কাঁদতে থাকে। সবশেষে তার বাবা তাকে নিয়ে যায়। পরে তার বাবার হাতে সে আমার জন্য উপহার হিসেবে এক প্যাকেট ঝিনুক ও কিছু সুন্দর পালক পাঠায়। আমিও দু একবার উপহার পাঠিয়েছি। কিন্তু আর কখনো আমাদের দেখা হয় নি।

মায়ের মুখে তার কথা শুনতেই, ছেলেবেলার কথা আমার মনে বিজলীর মত চমকে উঠে। মনের পর্দায় ভেসে ওঠে পুরনো সুন্দর বাড়ী। আমি বললাম :

"খুব ভালো! সে — সে কেমন আছে?"

মা বললেন, "সে? ...... সেও ভালো নেই।" তারপর দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললেন, "ঐ লোকগুলো আবার আসছে। তারা আমাদের আসবাবপত্র কিনতে চায়। আসলে তারা দু একটা হাতাতে চায়। আমাকে গিয়ে তাদের উপর নজর রাখতে হবে।"

মা উঠে চলে গেলেন। বাইরে কয়েকজন মহিলার গলা শোনা যাচ্ছে। হোংএরকে কাছে ডেকে আমি কথা শুরু করে দেই। সে লিখতে পারে কিনা। এখান থেকে চলে গেলে খুশী হবে কিনা।

"আমরা কি রেলে চড়ে যাব?"

"হ্যাঁ।"

"নৌকো?"

"প্রথমে আমরা নৌকোয় যাব।"

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কর্কশ গলা ভেসে আসে, "ওহ! এই রকম! লম্বা গোঁফ-ওয়ালা!"

থতমত খেয়ে তাকিয়ে দেখি পঞ্চাশ বছরের এক মহিলা। চোখ ও গালের মাঝখানের হাড় উঁচু, ঠোঁটজোড়া পাতলা। নিতম্বের উপর হাত রেখে, স্কার্ট নয়, প্যাণ্ট পরা পা জোড়া ফাঁক করে জ্যামিতি বাক্সের কম্পাসের মত সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বোকা বনে যাই।

"তুমি আমাকে চেন? তোমাকে আমি কোলে রেখেছি।"

আমার আরো বোকা বনে যাবার দশা।

ভাগ্য ভালো, ঠিক তখনই মা এসে বললেন:

"সে অনেক দিন বাইরে, তাই ভুলে যাবার জন্য তাকে মাফ করে দাও।" তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "তোমার মনে রাখা উচিত, ইনি রাস্তার উল্টো পাশের মিসেস ইয়াং ...... তাঁর বিন্‌কার্ড-এর দোকান আছে।"

তখনই আমার মনে পড়ে। আমি যখন ছোট্ট ছিলাম তখন মিসেস ইয়াং নামে একজন রাস্তার উল্টো পাশের বিন্‌কার্ড-এর দোকানে সারাদিন বসে থাকতো। লোকজন তার নাম দিয়েছিল "বিন্‌কার্ড সুন্দরী"। সে মুখে পাউডার মাখত। এখনকার মত তার চোয়ালের হাড় এত উঁচু, বা ঠোঁট জোড়া পাতলা ছিল না। তাছাড়া, সে সারাদিন বসে থাকত, তাই কখনো কম্পাসের সঙ্গে মিল খুঁজে পাই নি। তখন লোকজন বলত, তার কারণেই বিন্‌কার্ড দোকানে বেচাকেনা বেশ ভালো হত। বোধ হয় বয়সের কারণে, আমার উপর তার কোন ছাপ পড়ে নি। তাই পরে তাকে পুরোপুরি ভুলে গেছি। যাহোক, কম্পাস আমার দিকে বিরক্তি ও ঘৃণার সঙ্গে তাকায় যেভাবে নেপোলিয়নের নাম না শোনা ফরাসী বা ওয়াশিংটনের নাম না শোনা মার্কিনীর দিকে কেউ তাকাবে। বিদ্রূপের হাসি হেসে সে বলে:

"তুমি ভুলে গেছ? স্বাভাবিক, আমি তোমার হিসেবের বাইরে......"

দাঁড়িয়ে গিয়ে, ঘাবড়ে গিয়ে জবাব দিলাম:

"না, না, অবশ্যই নয়...... আমি......"

"তাহলে আমার কথা শোন, মাষ্টার স্যুন। তোমার টাকা পয়সা হয়েছে। তাছাড়া ওগুলো খুব ভারী. তাই ঐ পুরনো আসবাবপত্র তোমার আর দরকার

নেই। তারচে' বরং আমি নিয়ে যাই। আমাদের মত গরীব লোকদেরই ওসব প্রয়োজন।"

"আমার টাকা পয়সা হয় নি। ...... আমাকে ওগুলো বিক্রী করতে হবে যাতে আরো কিছু ......"

"আহ, রাখ ওসব কথা। তুমি এখন সরকারী কর্মচারী, আর বলছ তোমার টাকাপয়সা নেই। তোমার তিনজন রক্ষিতা আছে। যখনই বাইরে যাও আটজন বেহারা তোমার পালকী বহন করে। তবু তুমি বলবে তুমি ধনী নও? হা। আমার কাছে কিছুই লুকোতে পারবে না।"

কিছু বলার নেই মনে করে আমি চুপ করে থাকি।

"মুখ খোল। লোকের যত টাকা হয় তত তারা কঞ্জুস হয়, যত কঞ্জুস হয় তত টাকা পায় ......" বলেই কম্পাস রাগে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে। চলে যেতে যেতে সে মায়ের একজোড়া হাতমোজা তুলে কোমরে গুঁজে।

এরপর আশেপাশের বহু আত্মীয়স্বজন দেখা করতে আসে। তাদের সঙ্গে দেখা করার ফাঁকে ফাঁকে আমি কিছু বাঁধাছাঁদার কাজ করি। তাতে তিন চার-দিন চলে যায়।

এক শীতের বিকেলে দুপুরের খাওয়ার পর বসে চা খাচ্ছি। শুনতে পেলাম কে যেন আসছে। দেখার জন্য মাথা ঘুরে তাকাই। প্রথম দেখাতেই মন বিগড়ে যায়। আমি দ্রুত উঠে গিয়ে তাকে স্বাগত জানাই।

এই নতুন লোক ইয়ুনথু। প্রথম দেখাতেই চিনতে পারলেও, এই ইয়ুনথু সেই ইয়ুনথু নয়। তার শরীর দ্বিগুণ হয়েছে। একসময়ের গোলগাল লাল মুখ হলদে হয়ে গেছে, গভীর ভাঁজ পড়েছে। চোখজোড়া তার বাবার মত হয়ে গেছে, ফোলা ও লাল। সেই সব কৃষকদের মত, যারা সারাদিন সাগর তীরে সাগরের হাওয়ায় কাজ করে। তার মাথায় একটা জীর্ণ টুপি এবং গায়ে একটা পাতলা প্যাডেড জ্যাকেট। ফলে সে ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে। তার হাতে একটা কাগজের ঠোঙা ও লম্বা পাইপ। তার হাত জোড়া আর আগের মত লাল নয়, পাইন গাছের ছালের মত পুরু ও খসখসে।

খুশীতে কি বলতে হবে বুঝতে পারি নি। শুধু বলতে পারলাম:

"ওহ। ইয়ুনথু, তুমি? ......"

এরপর কত কথা বলতে চেয়েছি, সবকিছু মালার মত বেরিয়ে আসতে চেয়েছে: বড়ো পাখী, উচ্ছিরিংগা মাছ, ঝিনুক, খাটাশ ...... কিন্তু কথা আটকে গেছে, ভাবনা আর কথা হয়ে বেরুচ্ছে না।

সে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে আনন্দ ও বেদনার অভিব্যক্তি। তার ঠোঁট কাঁপছে,

কিন্তু একটি কথাও সে বলল না। তারপর বিনয়ের সঙ্গে পরিষ্কারভাবে বলল :

"হুজুর। ......"

আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠে। আমাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠেছে। তবু আমি কিছু বলতে পারলাম না।

মাথা ফিরিয়ে সে বলল :

"শুইশেং, হুজুরকে সালাম কর।" তারপর সে পেছনে লুকানো একটি ছেলেকে সামনে নিয়ে আসে। ঠিক বিশ বছর আগের ইয়ুনথু। একটু ফ্যাকাশে, একটু পাতলা, এবং গলায় রূপোর চেন নেই। সে বলল, "এটা আমার পাঁচ নম্বর। সে লোকজনের সঙ্গে মেলে না, তাই একটু লাজুক ও ভিন্ন প্রকৃতির।"

বোধ হয় আমাদের গলা শুনতে পেয়ে মা নেমে এলেন হোংএরকে সঙ্গে করে।

ইয়ুনথু বলল, "বেগম সাহেবা, আপনার চিঠি পেয়েছি কয়েকদিন আগে। হুজুর ফিরে আসছেন জেনে কত খুশী হয়েছি ......"

মা মজা করে বললেন, "এত ভদ্রতা কিসের? আগে তোমরা খেলার সাথী ছিলে না? তুমি বরং আগের মত তাকে দাদা ডাক।"

"ওহ, আপনি সত্যিই ...... সেটা খুব খারাপ ব্যাপার হবে। তখন ছোট ছিলাম বলে বুঝতে পারি নি।" বলতে বলতে সালাম করার জন্য শুইশেংকে সামনে ঠেলে দেয় ......। কিন্তু লাজুক ছেলে বাপের পেছনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

মা জিজ্ঞেস করলেন : "সে শুইশেং? তোমার পাঁচ নম্বর? আমরা সবাই অচেনা। এজন্যে তাকে দোষ দিতে পার না। হোংএর বরং তাকে খেলতে নিয়ে যাক।"

এই কথা শুনেই শুইশেং-এর কাছে গেল হোংএর। সেও সহজেই বেরিয়ে গেল তার সঙ্গে। মা ইয়ুনথুকে বসতে বললেই সে কাঁচু-মাচু হয়ে বসল। তারপর লম্বা পাইপ টেবিলের সঙ্গে ঠেস দিয়ে কাগজের ঠোঙাটি বাড়িয়ে দিল :

"শীতকালে আনার মত তেমন কিছু নেই। কিন্তু এই মটরশুঁটিগুলো আমরা নিজেরাই শুকিয়েছি, হুজুর যদি দয়া করেন।"

দিনকাল কেমন যাচ্ছে জিজ্ঞেস করতে সে শুধু মাথা নাড়ল।

"দিনকাল খারাপ যাচ্ছে। এমনকি আমার ছয় নম্বরটা পর্যন্ত কাজ করতে পারে, তবু ভালো করে খাওয়া জোটে না ...... কোন নিরাপত্তা নেই, সব ধরণের লোক পয়সা চায়, কোন নিয়মকানুন নেই ...... ফসলও ভাল হয় না। জিনিষ ফলিয়ে বাজারে নিয়ে গেলে খাজনা দিয়ে টাকা চলে যায়। আর

বিক্রী না করলে জিনিষ নষ্ট হয়ে যায়......"

সে মাথা নেড়েই চলেছে। সারা মুখে ভাঁজ পড়ে গেলেও, একটিও নড়ছে না। যেন সে পাথরের মূর্তি। তার খুব গোস্বা, কিন্তু বোঝাতে পারছে না। কিছুক্ষণ পর পাইপ তুলে নিয়ে সে নীরবে পাইপ টানতে থাকে।

তার সঙ্গে কথা বলে মা বুঝতে পারলেন, বাড়ীতে তার অনেক কাজ, তাই পরদিন চলে যেতে হবে। তার দুপুরের খাওয়া হয় নি বলে মা বললেন রান্না ঘরে গিয়ে নিজেই কিছু ভাত ভেজে নিতে।

সে বাইরে যেতেই তার কষ্ট নিয়ে আমি ও মা দু'জনেই মাথা নাড়লাম : বহু ছেলেমেয়ে, দুর্ভিক্ষ, খাজনা, সৈন্য, দুর্বৃত্ত, বদ মাতবর, আমলা সবাই তাকে মমির মত শুকিয়ে ফেলেছে। মা বললেন, যা আমরা নেব না তা তাকে দেয়া উচিত, সে খুশীমত বেছে নেবে।

সেই বিকেলে সে কিছু কিছু জিনিষ বেছে নেয় : দুটো লম্বা টেবিল, চারটি চেয়ার, একটা ধূপদানি, মোমবাতি এবং একটি দাঁড়িপাল্লা। সে চুলার ছাইগুলোও চেয়ে নিল। (আমাদের অঞ্চলে আমরা খড় দিয়ে রান্না করি। খড়ের ছাই বালু মাটিতে সার হিসেবে কাজ করে) বলল আমরা চলে যাবার পর সে এগুলো নৌকা দিয়ে নিয়ে যাবে।

সে রাতে আমরা আবার আলাপ করি। তবে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। পরদিন সকালে সে শুইশেংকে নিয়ে চলে যায়।

আরো নয় দিন পর আমাদের যাবার সময় হয়। সকালে ইয়ুনথু আসে। শুইশেং তার সঙ্গে আসে নি — সে শুধু পাঁচ বছরের একটি মেয়েকে নিয়ে এসেছে নৌকা দেখার জন্য। সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে কেটে যায় ; আমাদের কথা বলার কোন সময় ছিল না। লোকজনও এসেছে বেশ কিছু, কেউ বিদায় জানাতে, কেউ জিনিষপত্র নিতে, কেউ দুটোই করতে। নৌকায় চড়তে চড়তে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়। তার মধ্যে সে বাড়ীর জীর্ণ, পুরনো, ছোট, বড়, হালকা, পাতলা সব জিনিষ সাফ হয়ে যায়।

সন্ধ্যায় যখন যাত্রা শুরু করি তখন নদীর উভয় তীরের সবুজ পাহাড় কালো হয়ে এসেছে, নৌকার পেছনে হারিয়ে যাচ্ছে।

হোংএর এবং আমি জানালা দিয়ে বাইরে অস্পষ্ট দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে :

"চাচা, আমরা কখন ফিরে যাব ?"

"ফিরে যাব ? তুমি কি বেরুনোর আগেই ফিরে যাবার কথা বলতে চাও ?"

উদ্বেগে কালো চোখ জোড়া বড় করে সে তাকায় : "কিন্তু শুইশেং যে আমাকে

তার বাড়ীতে দাওয়াত দিয়েছে . . . . . .”

মা এবং আমার দু’জনেরই খারাপ লাগে। আবার ইয়ুনথু-এর কথা ওঠে। মা বললেন, বাঁধাছাঁদা শুরু হবার পর থেকে বিনকার্ড দোকানের মিসেস ইয়াং প্রতিদিন আসতো। পরশু সে ছাইয়ের স্তূপ থেকে একডজন থালা-বাসন বের করে। তার যুক্তি ছিল, ইয়ুনথু ওগুলো সেখানে লুকিয়েছে, যাতে যখন ছাই নিতে আসবে তখন ওগুলো নিয়ে যেতে পারে। এই খুঁজে পাওয়ার পর মিসেস ইয়াং নিজে নিজে খুব খুশী হয়ে ওঠে এবং ‘কুত্তার-লোভ’ নিয়ে চলে যায়। (আমাদের এলাকার লোকজন ‘কুত্তার-লোভ’ রাখে। এটা এক ধরণের কাঠের খাঁচা যার ভেতর খাবার থাকে। হাঁস মুরগী গলা বাড়িয়ে তা খেতে পারে, কিন্তু কুকুর শুধু তাকিয়ে থাকতে পারে।) তার ঐ পা নিয়ে তিনি কত জোরে দৌড়াতে পারেন তা এক দেখার বিষয় ছিল।

ধীরে ধীরে আমার পুরনো বাড়ী পেছনে চলে যাচ্ছে। পাহাড়-নদী দূরে হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার কোন অনুশোচনা নেই। আমি বুঝতে পারি আমার চারদিকে গড়ে উঠেছিল বাধার দেয়াল, যা সঙ্গীদের কাছ থেকে আমাকে আলাদা করেছে। এ অবস্থা আমাকে পুরোপুরি মনমরা করে দেয়। আগে তরমুজের খেতে গলায় রুপোর চেনওয়ালা সেই ছোট্ট নায়কের উপস্থিতি ছিল দিনের মত উজ্জ্বল। এখন তা হঠাৎ হারিয়ে গেছে, আমার মনোবেদনা বেড়েছে।

মা এবং হোংএর ঘুমিয়ে পড়ে।

আমি শুয়ে থাকি। শুনতে পাই নৌকোর নীচে জলের কল ধ্বনি। বুঝতে পারি আমি নিজের পথে এগিয়ে চলেছি। আমার মনে হল : ইয়ুনথু এবং আমার মধ্যে বাধার প্রাচীর গড়ে উঠলেও, শিশুদের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। হোংএর এইমাত্র শুইশেং-এর কথা ভাবছিল। আমার বিশ্বাস, তারা আমাদের মত হবে না, নিজেদের মধ্যে বাধার দেয়াল গড়ে উঠতে দেবে না। কিন্তু আমার তাদের পছন্দ হবে না, কেননা তারা সগোত্রীয় হতে চায়, পেতে চায় আমার মত বাঁধা ধরা জীবন। বোকা বনা পর্যন্ত ইয়ুনথু-এর মত কষ্ট করতে চায় না, বা অন্যদের মত তুচ্ছ প্রমোদেও গা ভাসিয়ে দিতে চায় না। তাদের নতুন জীবন প্রয়োজন, যে জীবন আমরা ভোগ করি নি।

এই আশার আলোয় আমার হঠাৎ ভয় ধরে যায়। ইয়ুনথু যখন ধূপদানি এবং মোমবাতির কথা বলেছে তখন গোপনে আমার খুব হাসি পায়। সে এখনো মূর্তি পূজো করে এবং মন থেকে তা মুছে ফেলতে পারে না। যে আশার কথা বলেছি, তা আমার তৈরী মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। একমাত্র পার্থক্য, সে যা চায় তা হাতের কাছাকাছি, আর আমি যা চাই তা সহজে পাবার নয়।

তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সবুজ বালুকাবেলা, উপরে গভীর নীলাকাশে গোলাকার সোনালী চাঁদ। আমার মনে হল : আশা আছে কি নেই বলা যায় না। এটা পৃথিবীর ওপরে পথগুলির মত। আসলে পথ দিয়ে পৃথিবীর শুরু হয় নি। কিন্তু অনেক লোক যখন একই পথ দিয়ে যায়, তখন পথ তৈরী হয়ে যায়।

জানুয়ারী, ১৯২১

টীকা

1. চীনের প্রতিটি চান্দ্রবৎসরে ৩৬০ দিন রয়েছে। প্রত্যেক মাসে ২৯ বা ৩০ দিন, কখনো ৩১ দিন হবে না। তাই কয়েক বছর পর পর এয়োদশ মাস হিসেব করতে হয়। এই বাড়তি মাস অন্যান্য মাসগুলোর মধ্যে বিন্যস্ত।

আ' কিউ'র সত্য ঘটনা

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

গত কয়েক বছর ধরেই আ' কিউ'র সত্য ঘটনা লেখার কথা ভাবছি। কিন্তু লিখতে চাওয়ার সময় ভয়ও ছিল। এতেই বোঝা যায় আমি তাদের একজন নই যারা লিখে গৌরব অর্জন করে। কেননা অমর লোকের কীর্তি রচনার জন্য সবসময়ই অমর লেখক প্রয়োজন। উত্তর কালে লেখা মানুষটিকে পরিচিত করে এবং মানুষটি লেখাকে পরিচিত করে। — শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার বোঝা যায় না কে কাকে পরিচিত করছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেকটা শয়তানের প্রভাবে, আমি আ' কিউ'র সত্য ঘটনা লেখার প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

কিন্তু কলম হাতে নিতে না নিতেই এই অমর কীর্তির চেয়েও বড় কীর্তি সম্পর্কে লেখার মারাত্মক প্রতিকূলতা সম্পর্কে আমি সচেতন হই। প্রথম সমস্যা, কি নাম দেব? কনফুসিয়াস বলেছেন, "নাম ঠিক না হলে, কথা সত্য মনে হবে না।" এবং এই স্বতঃসিদ্ধ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে। বহু ধরণের জীবনী আছে: সরকারী জীবনী, আত্মজীবনী, অননুমোদিত জীবনী, উপকথা, সম্পূরক জীবনী, পারিবারিক ইতিহাস, নকশা ...... কিন্তু দুর্ভাগ্যএর একটাও আমার উদ্দেশ্যের সঙ্গে খাপ খায় নি। "সরকারী আত্মজীবনী"? নির্ভরযোগ্য ইতিহাসে বহু বিখ্যাত লোকের ক্ষেত্রেই তা অন্তর্ভুক্ত হবে না। "আত্মজীবনী"? কিন্তু আমি নিশ্চয়ই আ' কিউ নই। এটাকে "অননুমোদিত জীবনী" বললে তার "অনুমোদিত জীবনী" কোথায়? "উপকথার" ব্যবহার অসম্ভব, কেননা আ' কিউ উপকথার নায়ক নয়। "সম্পূরক জীবনী"? কিন্তু কোন প্রেসিডেণ্ট কখনো

জাতীয় ঐতিহাসিক ইনস্টিটিউটকে আ' কিউ'র "নমুনা জীবনী" লেখার নির্দেশ দেন নি। এটা সত্য যে নির্ভরযোগ্য ইংরেজ ইতিহাসে কোন "জুয়াড়ীর জীবনী" নেই, কিন্তু বিখ্যাত লেখক কোনান ডয়েল লিখেছেন «রডনী ষ্টোন»। বিখ্যাত লেখকের জন্য তা অনুমোদনযোগ্য হলেও আমার মত লেখকের জন্য নয়। তারপর আসে "পারিবারিক ইতিহাসের" কথা, কিন্তু আমি জানি না আমি এবং আ' কিউ একই পরিবারের কিনা এবং তার ছেলেমেয়ে অথবা নাতি-নাতিনী কখনো আমাকে এই দায়িত্ব দেয় নি। যদি "নকশা" ব্যবহার করি তাহলে হয়ত এই বলে আপত্তি উঠবে যে আ' কিউ'র কোন "পূর্ণ বিবরণ" নেই। সংক্ষেপে, এটা সত্যি একটা "জীবন", কিন্তু যেহেতু ছোট লোকদের ভাষা ব্যবহার করে আমি লিখি তাই ভারী নাম দেয়ার মত সাহস আমার নেই। তাই ঔপন্যাসিকদের জমা অর্থপঞ্জী থেকে, যারা তিন ধর্ম এবং নয় স্কুলের[1] মধ্যে বিবেচ্য নয়, "অবান্তর কথকতা অনেক হয়েছে, সত্য ঘটনায় ফিরে যাওয়া যাক!" শেষ দুটো শব্দ শিরোনাম হিসেবে গ্রহণ করব। এতে যদি পুরনো দিনের «হস্তাক্ষরের সত্য ঘটনার»[2] কথা মনে পড়ে তাহলে করার কিছু নেই।

দ্বিতীয় অসুবিধা হলো, এই ধরণের জীবনী অনেকটা এভাবে শুরু হওয়া উচিত: "অমুক, যার আর এক নাম অমুক, অমুক এলাকার অধিবাসী ছিল।" কিন্তু আমি সত্যি জানি না আ' কিউ'র পারিবারিক নাম কি? এক সময় মনে হয়েছে তার নাম যাও, কিন্তু পরদিনই এব্যাপারে আবার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। মিঃ যাও -এর ছেলে কাউন্টি পরীক্ষা পাশ করার পর এটা দেখা দেয়, ঢোল বাজিয়ে তার সাফল্যের কথা গ্রামে ঘোষণা করা হয়। সবেমাত্র দু'বাটি হলদে মদ পান করে আ' কিউ এই বলে লাফাতে থাকে যে এটা তারও গৌরব, কেননা সে ও মিঃ যাও একই গোষ্ঠীর, সঠিক হিসেবে সফল পরীক্ষার্থীর চেয়ে তিন জেনারেশন বড়। সে সময়ে বেশ কিছু পথচারী আ' কিউকে ভয় করতে শুরু করে। কিন্তু পরদিন সাধ্যপাল মিঃ যাও-এর বাড়ীতে যাওয়ার জন্য তাকে সমন পাঠায়। তাকে দেখেই বুড়ো ভদ্রলোক রেগে লাল হয়ে চীৎকার করতে থাকে:

"হারামী আ' কিউ! তুমি কি বলেছ আমরা একই গোষ্ঠীর?"

আ' কিউ কোন জবাব দেয় না।

যতই মিঃ যাও তার দিকে তাকায় ততই সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এবং কয়েক কদম এগিয়ে বলে, "এসব বাজে কথার সাহস কোথায় পাও? তোমার মত আত্মীয় আমার কেমন করে থাকতে পারে? তোমার পারিবারিক নাম কি যাও?"

আ' কিউ কোন জবাব দেয় না, চলে আসার কথা ভাবে। এমন সময় মিঃ যাও এগিয়ে এসে তাকে চড় মারে।

"তোমার নাম যাও হবে কি করে? তুমি কি মনে কর তুমি এই নামের যোগ্য?"

যাও নামের ওপর অধিকার রক্ষায় আ' কিউ কোন চেষ্টা করে নি, বাম গাল ঘষতে ঘষতে সাধ্যপালের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। বাইরে আসামাত্র তাকে সাধ্য-পালের আর এক পসলা গাল শুনতে হয় এবং নগদ দু'শ দিয়ে ছাড়া পায়। যারা এটা শুনেছে বলেছে নিজের বোকামির জন্য আ' কিউ এই মার খেয়েছে। তার নাম যাও হলেও — যেটা সম্ভব নয় — গর্ব করার চেয়ে তার ভালো করে জানা উচিত ছিল গ্রামে একজন মিঃ যাও বাস করে। এর পর আ' কিউ'র পূর্ব পুরুষদের কথা আর উঠে নি, তাই আজো জানি না তার সত্যিকারের পারিবারিক নাম কি ছিল।

এই লেখার সময় তৃতীয় অসুবিধা দেখা হয়, আ' কিউ'র ব্যক্তিগত নাম কি-ভাবে লিখতে হবে তা আমি জানি না। তার জীবদ্দশায় সবাই তাকে ডাকত আ' কু-য়েই, কিন্তু মৃত্যুর পর কেউ আ' কুয়েই-এর কথা বলে নি। কেননা সে তাদের এক-জন নয় যাদের নাম "বাঁশের ফলক এবং সিল্কের ওপর"[3] লেখা থাকে। তার নাম টিকিয়ে রাখার কোন প্রশ্ন উঠলে, এই লেখাই হবে প্রথম উদ্যোগ। তাই শুরুতেই ঝামেলা। সমস্যাটি নিয়ে আমি ভালোভাবে ভেবেছি: আ' কুয়েই — এমনকি হতে পারে "কুয়েই" মানে ক্যাসিয়া বা সম্ভ্রান্ত? যদি তার আরেকটি নাম হত "চন্দ্র প্যাভিলিয়ন" অথবা যদি চন্দ্র উৎসবের সময় সে জন্ম দিন পালন করত তাহলে অবশ্যই ক্যাসিয়ার জন্য "কুয়েই" হত। কিন্তু যেহেতু তার অন্য কোন নাম ছিল না — থাকলেও কেউ তা জানত না — এবং কবিতা উপহার পাবার জন্য সে জন্মদিনে কোন দাওয়াত পাঠায় নি, তাই আ' কুয়েই (ক্যাসিয়া) লেখা এক তরফা ব্যাপার হবে। যদি আ' ফু (ধনী) নামে তার কোন বড় বা ছোট ভাই থাকত, তাহলে তাকে নিশ্চয়ই আ' কুয়েই (সম্ভ্রান্ত) ডাকা হত। কিন্তু সে ছিল একেবারে একা; তাই আ' কুয়েই (সম্ভ্রান্ত) লেখার কোন যুক্তি নেই। "কুয়েই" শব্দের সঙ্গে অন্য যেসব অক্ষর রয়েছে সেগুলো আরো বেমানান। একবার কাউন্টি পরীক্ষা পাশ করা মিঃ যাও এর ছেলেকে এই প্রশ্ন করেছিলাম। কিন্তু তার মত একজন পড়ালেখা জানা লোকও বোকা বনে যায়। তার মতে এই নামের ইতিহাস খুঁজে বের করতে না পারার কারণ হচ্ছে পশ্চিমা বর্ণমালা ব্যবহারের সপক্ষে প্রচার চালানোর জন্য ছেন ডুসিউ «নতুন যৌবন» পত্রিকা প্রকাশ করেছে,[4] এবং জাতীয় সংস্কৃতি গোল্লায় যাচ্ছে। শেষ চেষ্টা হিসেবে, আ' কিউ'র বৈধ কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখার জন্য নিজ জেলার একজনকে অনুরোধ করি। আট মাস পরে সে চিঠি লিখে জানায় দলিলপত্রে আ' কুয়েই বলে কোন নাম নেই। এটাই সত্যি, না আমার বন্ধু কোন কাজ করে নি এই

ব্যাপারে নিশ্চিত না হলেও, এভাবে নামের ইতিহাস বের করতে ব্যর্থ হয়ে আমি কোন উপায়ের কথা ভাবতে পারি নি। ধ্বনিবিদ্যার নতুন নিয়ম এখনো সাধারণে চালু হয় নি ভয়ে পশ্চিমা বর্ণমালা ব্যবহার ছাড়া কোন উপায় নেই এবং ইংরেজী বানান অনুযায়ী আ' কুয়েই লিখে তাকে সংক্ষেপে আ' কিউ করা হয়। আনুমানিকভাবে এটা «নতুন যৌবন» পত্রিকার অন্ধ অনুকরণ, এবং আমি নিজে খুব লজ্জিত, কিন্তু যেহেতু মিঃ যাও-এর ছেলের মত একজন লেখাপড়া জানা লোক আমার সমস্যার সমাধান করতে পারে নি, আমি আর কি করতে পারি?

চতুর্থ সমস্যা দেখা দেয় আ' কিউ'র জন্মস্থান নিয়ে। তার পারিবাবিক নাম যাও হলে, জেলাওয়ারীভাবে লোকজনের শ্রেণী বিভাগের পুরনো নিয়ম অনুযায়ী «একশ পারিবারিক নামের»[5] বর্ণনায় হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে "গানসু প্রদেশের থিয়ানশুই এর অধিবাসী"। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই পারিবারিক নাম সন্দেহজনক, তাই আ' কিউ'র জন্মস্থানও অনিশ্চিত থেকে যাবে। অধিকাংশ সময় ওয়েইযুয়াং-এ বাস করলেও, সে প্রায়ই অন্যান্য জায়গায়ও থাকত। তাই তাকে ওয়েইযুয়াং এর অধিবাসী বলা ভুল হবে। বাস্তবে এটা হবে ইতিহাসের বিকৃতি।

একটা ব্যাপার শুধু আমাকে সান্ত্বনা দেয়, তাহল, "আ'" অক্ষরটি সম্পূর্ণ সঠিক। এটা নিশ্চয়ই মিথ্যা উপমার ফলশ্রুতি নয়, এবং জ্ঞানগর্ভ সমালোচনার পরীক্ষা উতরে যেতে সক্ষম। অন্যান্য সমস্যা আমার মত মূর্খ লোকের সমাধানের কাজ নয়। আমি শুধু আশা করতে পারি "ইতিহাস ও গবেষণার অনুরাগী" ডঃ হু শি'র শিষ্য ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে পথ দেখাতে পারে। আমার ভয় হয়, ততদিনে «আ' কিউ'র সত্য ঘটনা» বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে।

উপরোক্ত কথাগুলো ভূমিকা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আ' কিউ'র বিজয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

আ' কিউ'র পারিবারিক নাম, ব্যক্তিগত নাম এবং জন্মস্থান সম্পর্কে অনিশ্চিতি সত্ত্বেও তার "পটভূমি" সম্পর্কেও কিছু অনিশ্চিতি আছে। এর কারণ তার "পটভূমি" সম্পর্কে সামান্যতম মনোযোগ না দিয়ে ওয়েইযুয়াং-এর লোকজন

তাকে ব্যবহার করেছে অথবা তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করেছে। আ' কিউ এ ব্যাপারে নীরব ছিল। কারো সঙ্গে ঝগড়া বাঁধলে সে হয়ত তাকিয়ে বলত: "তোমার চেয়ে আমাদের অবস্থা অনেক ভাল ছিল। নিজেকে তুমি কি ভাব?"

আ' কিউ'র কোন পরিবার ছিল না। সে ওয়েইযুয়াং এর ভূমিদেবতার মন্দিরে বাস করত। তার কোন নিয়মিত কাজও ছিল না, শুধু অন্যদের টুকটাক কাজ করে দিত; গম কাটার কাজ হলে কাটত, ধান মাড়াইয়ের কাজ হলে ধান মাড়াত, নৌকো নামানোর দরকার হলে নামিয়ে দিত। কাজে বেশ কিছু সময় লাগলে সে অস্থায়ী মালিকের ঘরে থাকত, কিন্তু শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চলে যেত। তাই কোন কাজ করার দরকার হলেই লোকজন আ' কিউকে মনে করত, কিন্তু তারা শুধু তার কাজটাই দেখত, "পটভূমি" নয়। কিন্তু কাজ শেষ হতে না হতে আ' কিউকে ভুলে যেত, তার "পটভূমির" কথা কেউ বলত না। একবার এক বুড়ো সত্যি সত্যি বলেছিল, "আ' কিউ কত ভালো কাজের লোক!" সে সময় কোমর পর্যন্ত উলঙ্গ শুকনো, অনুভূতিহীন আ' কিউ তার সামনে দাঁড়িয়েছিল, অন্যেরা জানত না এই মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ না উপহাস করে বলা, কিন্তু আ' কিউ খুব খুশী হয়েছিল।

আবার নিজের সম্পর্কে আ' কিউ'র খুব উঁচু ধারণা ছিল। সে ওয়েইযুয়াং এর সবাইকে খাটো করে দেখত, এমনকি দুজন যুবক 'বুদ্ধিজীবী' একটু হাসির যোগ্য নয়, যদিও যুবক বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই হয়ত সরকারী পরীক্ষা পাশ করবে। গ্রামের লোকজন মিঃ যাও এবং মিঃ ছিয়ানকে খুব সম্মান করত, কেননা তারা শুধু টাকাপয়সা ওয়ালা নয়, উভয়েই যুবক বুদ্ধিজীবীর পিতা। শুধু আ' কিউ তাদেব বিশেষ খাতির দেখায় নি, নিজে নিজে ভাবত, "আমার ছেলে হয়ত আরো বড় হবে।"

উপরন্তু কয়েকবার শহরে যাবার পর আ' কিউ স্বভাবতঃই আত্মম্ভরি হয়ে ওঠে, একই সময়ে শহুরে লোকদের জন্য তার ঘৃণাও ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, কাঠের তৈরী তিনফুট লম্বা, তিন ইঞ্চি চওড়া টেবিলকে ওয়েইযুয়াং এর লোকজন "লম্বা টেবিল" বলত। আ' কিউও এটাকে "লম্বা টেবিল" বলত, কিন্তু শহুরে লোকজন বলত "সোজা টেবিল", তাই সে ভাবত, "এটা ভুল। কি হাস্যকর ব্যাপার!" আবার বড় মাথা ওয়ালা মাছ ভাজলে ওয়েইযুয়াং এর লোকজন তাতে পেঁয়াজ পাতা বড়ো বড়ো করে কেটে দিত আর শহুরে লোকেরা দিত ছোট ছোট করে কেটে। সে ভাবত, "এটাও ভুল। কি হাস্যকর ব্যাপার!" কিন্তু ওয়েইযুয়াং এর অধিবাসীরা ছিল সত্যিই অজ্ঞ, চাষাভূষা লোক, যারা কখনো শহুরে ভাজা মাছ দেখে নি।

আ' কিউ "যার অবস্থা অনেক ভালো ছিল" যে ছিল বস্তুবাদী এবং "ভালো শ্রমিক" শারীরিক কিছু ত্রুটি না থাকলে সে নিখুঁত মানুষ হতে পারত। কিন্তু সবচে বিরক্তিকর ছিল তার মাথার খুলির কয়েকটি জায়গা যেখানে কোন একসময় দাদ হয়েছিল কিন্তু এখনো দাগ আছে। এটা তার নিজের মাথায় হলেও, ব্যাপারটা আ' কিউ খুব সম্মানজনক মনে করত না, তাই সে'দাদ' বা এধরণের উচ্চারণের যে কোন শব্দ এড়িয়ে যেত। শেষে ব্যাপারটা নিয়ে সে আর একটু বাড়াবাড়ি করে, "উজ্জ্বল" এবং "আলো" নিষিদ্ধ শব্দ করে দেয় এবং আরো পরে "বাতি" এবং "মোমবাতি" শব্দ দুটোও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যখনই এই নিষেধাজ্ঞা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অমান্য করা হত, আ' কিউ রাগে ফেটে পড়ত, তার দাদের দাগ রক্তবর্ণ হয়ে যেত। সে অপরাধীর দিকে তাকাত, তর্কে দুর্বল হলে গাল দিত এবং শক্তি কম হলে আঘাত করত। এসব সংঘর্ষে আ' কিউই হেরে যেত। শেষ পর্যন্ত সে নতুন ফন্দি আঁটে। ক্ষিপ্ত চোখে তাকিয়েই তৃপ্ত থাকত।

এই ক্ষিপ্ত দৃষ্টির পর থেকে ওয়েইযুয়াং এর ভবঘুরেরা তাকে নিয়ে আরো বেশী হাসি-তামাশা করতে থাকে। তাকে দেখা মাত্রই তারা ভান করে চমকে উঠে বলত :

"দেখ! আলো জ্বলে উঠছে।"

আ' কিউ প্রতিদিনের মত ক্ষেপে যেত এবং ক্ষিপ্ত চোখে তাকাত। মোটেও ভয় না পেয়ে তারা বলে চলত, "তাহলে এটা প্যারাফিনের বাতি।"

পাল্টা কিছুর জন্য মাথা চুলকানো ছাড়া আ' কিউ'র কিছুই করার ছিল না। "তোমরা এর যোগ্য নও ......" এসময়ে মনে হত তার খুলির দাগগুলো সম্মানের ব্যাপার, সাধারণ দাদের দাগ নয়। আমরা আগেই বলেছি আ' কিউ বস্তুবাদী লোক : তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে সে নিষেধাজ্ঞা প্রায় অমান্য করে ফেলেছে, তাই আর কিছু বলা থেকে বিরত থাকে।

ভবঘুরেরা এতেও খুশী না হয়ে তাকে খোঁচাতে থাকলে ঘুষাঘুষি বেঁধে যেত। তারপর আ' কিউ পরাস্ত হলে, তার বাদামী বেণী টানা হলে, তার মাথা চার পাঁচ বার দেয়ালের সঙ্গে ঠোকা হলে বিজয়ের তৃপ্তিতে তারা হেঁটে চলে যেত। আ' কিউ সেখানে এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকত, ভাবত, "ব্যাপারটা এমন, যেন নিজের ছেলের হাতে মার খেয়েছি। দিন দুনিয়ার কি হচ্ছে ......" তারপর সেও জয়ের তৃপ্তিতে চলে যেত।

আ' কিউ যাই ভেবে থাকুক পরে সে লোকজনকে অবশ্যই বলত ; যারা আ' কিউকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করত তারা জানত মানসিক জয়ের এই একটা

উপায় তার আছে। তাই এরপর যারা তার বাদামী বেণী টানত তারা আগেভাগে বলে দিত: "আ' কিউ, এটা পুত্রের হাতে পিতার মার খাওয়া নয়, এটা মানুষের হাতে পশুর মার খাওয়া। তোমাকে বলতে শুনতে চাই: একজন মানুষ একটি পশুকে মারছে।"

তারপর বেণীর গোড়া চেপে ধরে আ' কিউ বলত: "পোকাকে মারধোর — বললে কেমন হয়? আমি একটি পোকা — তাহলে কি আমাকে যেতে দেবে?"

সে পোকা হলেও ভবঘুরেরা তাকে যেতে দেবে না। তাদের নিয়ম অনুযায়ী কাছের কোন কিছু একটার সঙ্গে পাঁচ ছয় বার তার মাথা ঠুকবে, তারপর আ' কিউ'র শিক্ষা হয়েছে ভেবে, জয়ের আনন্দে হেঁটে চলে যাবে। দশ সেকেণ্ডের কম সময়ে অবশ্য আ' কিউও জয়ের তৃপ্তিতে হেঁটে যাবে, ভাববে সে "এক নম্বর আত্মমর্যাদাহীন" এবং "আত্মমর্যাদাহীন" বাদ দিলে থাকে "এক নম্বর"। রাজকীয় পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকারী পরীক্ষার্থীও কি "এক নম্বর" নয়? "তোমরা নিজেকে কি ভাব?"

শত্রুদের হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্য এসব দুষ্ট বুদ্ধি এঁটে আ' কিউ খুশীতে মদের দোকানে যাবে কয়েক বাটি মদ পান করার জন্য ,অন্যদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করার জন্য, তাদের সঙ্গে আবার ঝগড়া করার জন্য, বিজয়ীর বেশে বেড়িয়ে আসার জন্য, তারপর মনের খুশীতে ফিরে যাবে ভূমি দেবতার মন্দিরে এবং সেখানে বালিশে মাথা রাখা মাত্রই ঘুমিয়ে পড়বে। টাকা থাকলে সে জুয়া খেলত। একদল মাটিতে বসত, তাদের মাঝখানে স্যাণ্ডউইচের মত আ' কিউ, মুখ দিয়ে ঘাম ঝরছে এবং সবচে উচ্চ শোনাচ্ছে তার গলা: "সবুজ ড্রাগনে চারশো।"

"হে — ওখানে খোল।" বাজীওয়ালা, তারও মুখ দিয়ে ঘাম ঝরছে, বাক্স খুলে চীৎকার করবে: "স্বর্গীয় দরজা — কোনায় কিছু নেই। — জনপ্রিয়তায় কোন বাজী নেই। আ' কিউ'র পয়সা দিয়ে দাও।"

"একশো — একশো পঞ্চাশ।"

এই চীৎকারে আ' কিউ'র টাকা ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় অন্যান্য ঘর্মাক্ত লোক-জনের পকেটে। শেষ পর্যন্ত সে বাধ্য হয়ে ভীড় ঠেলে বেরিয়ে গিয়ে পেছন থেকে দেখে। খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার উৎসাহ থাকবে, তার পর অনিচ্ছায় ফিরে যাবে ভূমি দেবতার মন্দিরে। পরদিন ফোলা চোখ নিয়ে কাজে যাবে।

হতভাগ্য আ' কিউ যখন জিতে তখন "হতভাগ্য গোপন আশীর্বাদ" এই প্রবাদের সত্যতা মেলে এবং শেষে সে প্রায় হেরে যায়।

এটা ওয়েইযুয়াং-এ দেবতা পূজা উৎসবের সন্ধ্যার কথা। রীতি অনুযায়ী নাটক হচ্ছে এবং রীতি অনুযায়ীই মঞ্চের কাছে অসংখ্য জুয়ার টেবিল। নাটকের ঢোল

করতালের শব্দ আ' কিউ'র কানে প্রায় তিন মাইল দূরের মনে হচ্ছে, কান শুধু জুয়াড়ীর গান শুনতে অভ্যস্ত। সে বার বার জিতছে, তার তামা পরিণত হচ্ছে রূপোয়, রূপো পরিণত হচ্ছে ডলারে এবং ডলারের সংখ্যা বাড়ছে। উত্তেজনায় সে চীৎকার করে ওঠে :

"স্বর্গীয় দরোজায় দু ডলার।"

সে জানে না প্রথম কে, কিজন্যে মারামারি বাধিয়েছে। গালাগালি, কিল ঘুষি, পায়ের লাথি সব কিছু তার কানে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এবং সে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে জুয়ার টেবিল এবং জুয়াড়ীরা উধাও হয়ে যায়। তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা করছে যেন কিল-ঘুষি লাথি খেয়েছে এবং বিস্ময়ে কিছু লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে। ভুল হয়ে গেছে মনে করে সে ভূমিদেবতার মন্দিরে ফিরে যায় এবং হুঁশ ফিরতে ফিরতে বুঝতে পারে তার ডলারগুলো উধাও হয়ে গেছে। মেলায় জুয়া চালনাকারীদের অনেকেই ওয়েইযুয়াং অধিবাসী নয়। তাই কোথায় সে অপরাধীদের খুঁজবে?

কি সাদা এবং চকচকে রূপোর স্তূপ। সবগুলো তারই ছিল...... এখন উধাও হয়ে গেছে। ছেলে চুরি করেছে ভেবেও সে শান্তি পায় না। নিজেকে পোকা হিসেবে ভেবেও সে শান্তি পায় না। এই প্রথম সে সত্যি সত্যি পরাজয়ের তিক্ততার স্বাদ পায়।

কিন্তু পরাজয়কে সে পরিবর্তন করে বিজয়ে। ডান হাত দিয়ে নিজের গালে দু'বার সে এতো জোরে চড় কষায় যে বেশ তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। তবে চড় মেরে সে কিছুটা হাল্কা বোধ করে, কারণ সে বুঝতে পারে : যে চড় মেরেছে সে অন্য কেউ নয়, সে নিজেই, এবং যে চড় খেয়েছে সে অন্যজন, কাজেই এটা যেন সত্যি যে, সে চড় মেরেছে অন্য কাউকে — যদিও ব্যথায় তার নিজের গালই জ্ব'লে যাচ্ছিলো। যেন বিজয় অর্জন করেছে এইভাবে সে শুয়ে পড়ে তৃপ্ত হ'য়ে।

আর তাড়াতাড়ি ঘুমিয়েও পড়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

আ' কিউ'র বিজয়ের আরো কিছু কাহিনী

আ' কিউ সবসময় জিতলেও, মিঃ যাও এর চড় খাবার সৌভাগ্যের পর থেকে সে বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

সাধ্যপালকে নগদ দু'শো দেয়ার পর সে ক্ষিপ্ত হয়ে শুয়ে থাকে। তারপর নিজে নিজে বলে : "দুনিয়ার কি হচ্ছে, পুত্র পিতামাতাকে মারছে......" তারপর পুত্রবৎ মিঃ যাও এর মানসম্মানের চিন্তা তার মনোবল বাড়িয়ে দেয়। সে উঠে "স্বামীর কবরের পাশে যুবতী বিধবা" গান গাইতে গাইতে মদের দোকানে যায়। এ সময়ে সে বোধ করে মিঃ যাও অনেকের চেয়েই সেরা।

অবাক ব্যাপার, এই ঘটনার পর থেকে সত্যি সত্যি সবাই তাকে অস্বাভাবিক সমীহ করতে থাকে। সম্ভবতঃ মনে করেছে সে মিঃ যাও এর বাবা, কিন্তু বাস্তবে ঘটনা তা নয়। প্রথা অনুযায়ী ওয়েইযুয়াং-এ সাত নম্বর ছেলে যদি আট নম্বর ছেলেকে অথবা অমুক অমুককে মারে তাহলে তাকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। কোন মারামারি মিঃ যাও এর মত গুরুত্বপূর্ণ লোকের সঙ্গে জড়িত হতে হবে, তাহলেই গ্রামবাসীরা এটাকে আলাপের বিষয় মনে করবে। এবং একবার এটাকে তারা আলাপের মনে করলে, এবং মার দেওয়া লোকটি বিখ্যাত বলেই মার খাওয়া লোকটি তার কিছু সম্মান ভোগ করে। আ' কিউ'র দোষ স্বাভাবিক হিসেবেই নেয়া হয়, এবং মিঃ যাও সম্ভবতঃ ভুল করতে পারেন না। কিন্তু আ' কিউ দোষী হলে সবাই তাকে অস্বাভাবিক সমীহ করবে কেন? এটা ব্যাখ্যা করা কঠিন। আমরা যুক্তি হিসেবে বলতে পারি, বোধ হয় এই কারণে যে আ' কিউ বলেছে সে ও মিঃ যাও একই গোষ্ঠীর, এবং সে মার খেলেও লোকজনের ভয় এতে কিছুটা সত্য আছে, তাই তাকে সমীহ করাই নিরাপদ। অন্যথায় এটা কনফুসীয় মন্দিরে বলির গরুর ব্যাপার হতে পারে, প্রাণী হিসেবে গরু, পাঁঠা এবং শুয়র একই শ্রেণীর হলেও, সন্ন্যাসী তা ভোগ করেছেন বলেই পরে কনফুসিয়াস তা স্পর্শ করার সাহস পান নি।

এরপর কয়েক বছর আ' কিউ উন্নতি করতে থাকে।

এক বসন্তে মনের খুশীতে হাঁটতে গিয়ে সে দেখে উদোম গায়ে, দেয়ার নীচে সূর্যের আলোয় বসে বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং উঁকুন মারছে। এই দৃশ্য দেখে তার নিজের শরীর চুলকাতে থাকে। যেহেতু বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং মামড়ি-পড়া এবং গোঁফওয়ালা, তাই সবাই তাকে ডাকত, "দাদওয়ালা বিড়াল গোঁফ ওয়াং"। আ' কিউ "দাদ" শব্দটা এড়িয়ে গেলেও, এই লোকটার জন্য তার ঘৃণা ছিল সবচে বেশী। আ' কিউ'র মনে হয় মামড়ি-পড়া লোকজন ব্যতিক্রম না হলেও, তার অতিরিক্ত লোমওয়ালা গাল খুব বেশী অস্বাভাবিক এবং তাতে শুধু ঘৃণার উদ্রেক হয়। তাই আ' কিউ তার পাশে বসে। অন্য কোন ভবঘুরে হলে আ' কিউ এত অসতর্কভাবে বসার সাহস পেত না, কিন্তু বিড়াল গোঁফওয়ালা

ওয়াং এর পাশে তার ভয়ের কি আছে? সত্যি বলতে কি, সে যে বসতে রাজী এটাই ওয়াং এর জন্য সম্মানের ব্যাপার।

আ' কিউ তার জীর্ণ জ্যাকেটটি খুলে উল্টে নেয়। কিন্তু হয় এটা সে সম্প্রতি ধুয়েছে বলে অথবা সে খুব জেবড়া-জোবড়া বলে অনেক খোঁজাখুঁজির পর মাত্র তিন চারটে উঁকুন পাওয়া যায়। সে দেখে বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং দ্রুত একটার পর একটা ধরছে এবং পট্‌পট্‌ শব্দে দাঁত দিয়ে মারছে।

আ' কিউ প্রথমে হতাশ হয়, তারপর রেগে যায় ; জঘন্য বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং এতগুলো ধরতে পেরেছে আর সে কিনা ধরেছে সামান্য কটি — কি লজ্জার ব্যাপার! একটা বা দুটো বড় ধরার জন্য সে প্রতীক্ষা করতে থাকে, কিন্তু একটাও নেই, এবং অনেক কষ্টের পর সে মাঝারি একটা ধরে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত-ভাবে সে সেটা মুখে পুরে দেয় এবং পশুর মত কামড়াতে থাকে ; কিন্তু হাল্কা পট্‌পট্‌ শব্দ শুধু হয়, আবার বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং-এর শব্দের চেয়ে নীচু মানের।

আ' কিউ'র কপাল লাল হয়ে ওঠে। মাটিতে জ্যাকেট ছুঁড়ে সে থুথু ছিটিয়ে বলে, "লোমশ পোকা!"

বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং ঘৃণাভরে তাকায়, "পাঁচড়াওয়ালা কুত্তা, তুমি কাকে গাল দিচ্ছ?"

গত কয়েক বছরের সমীহ আ' কিউ'র গর্ব বাড়িয়ে দিলেও, মারামারিতে অভ্যস্ত — ভবঘুরেদের সঙ্গে দেখা হলেই সে বরং একটু ভয় পায়। এবার সে একটু অস্বাভাবিক ঝগড়াটে বোধ করছে। এরকম একটা লোমওয়ালা প্রাণী তাকে অপমান করার সাহস পায় কোথায়?

পাছার ওপর হাত রেখে আ' কিউ উঠে দাঁড়ায় "যাকে খাটে, তাকে।"

কোট চাপিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং বলে : "পিঠ সুড়সুড় করছে বুঝি?"

ওয়াং পালিয়ে যাচ্ছে মনে করে ঘুষি তুলে আ' কিউ এগিয়ে যায়। কিন্তু সে ঘুষি মারবার আগেই ওয়াং তাকে ধরে এমন হেঁচকা টান মারে যে সে টলতে থাকে। তারপর বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং তার বেণী টানতে টানতে মাথা ঠোকার জন্য দেয়ালের দিকে নিয়ে যেতে থাকে।

মাথা একদিকে কাৎ করে আ' কিউ প্রতিবাদ জানায়, "ভদ্রলোক হাত নয়, মুখ ব্যবহার করে।"

বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং ভদ্রলোক নয়। আ' কিউ'র কথায় কোন কান না দিয়ে সে পর পর পাঁচবার দেয়ালের সঙ্গে তার মাথা ঠুকে এবং এমন জোরে

ধাক্কা মারে যে সে টলতে টলতে দুগজ দূরে গিয়ে পড়ে। তার পরে বিড়াল গোঁফ-ওয়ালা ওয়াং মনের তৃপ্তিতে চলে যায়।

যতদূর মনে পড়ে, এই প্রথমবার এতখানি হেনস্তা হয়েছে আ' কিউ। কেননা সবসময় বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াংকে তার কুৎসিৎ গালের জন্য ব্যঙ্গ করেছে। ওয়াং তাকে ব্যঙ্গ করে নি, মার খাওয়া দূরে থাক। এখন, সবকিছু উল্টে দিয়ে বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং তাকে মেরেছে। বোধ হয় বাজারে লোকজন যা বলেছে সত্যি : "সম্রাট রাজকীয় পরীক্ষা তুলে দিয়েছেন, তাই পরীক্ষা পাশ করা পণ্ডিতদের কোন চাহিদা নেই।" এ কারণে যাও পরিবার মানমর্যাদা হারিয়েছে। একারণেই কি লোকজন তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে?

অস্থিরভাবে আ' কিউ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে।

দূর থেকে আ' কিউ'র আর এক শত্রু এগিয়ে আসে। সে মিঃ ছিয়ান-এর বড় ছেলে যাকে আ' কিউ ঘৃণা করে। শহরে একটি বিদেশী স্কুলে পড়াশোনা করার পর মনে হয় সে জাপান গিয়েছে। ছয়মাস পরে যখন সে ফিরে আসে তার বেণী উধাও হয়ে গেছে এবং পা সোজা হয়ে গেছে। তার মা বহু কান্নাকাটি করেছে এবং বউ তিনবার কূয়ায় ঝাপ দিতে চেয়েছে। পরে তার মা সবাইকে বলেছে : "সে যখন মাতাল ছিল তখন কোন হারামজাদা তার বেণী কেটে দিয়েছে। সে সরকারী আমলা হতে পারত, কিন্তু এখন তাকে অপেক্ষা করতে হবে তা গজানোর জন্য।" আ' কিউ এসব বিশ্বেস করে নি এবং সবসময় তাকে বলত : "মেকী বিদেশী শয়তান" এবং "দালাল বিশ্বাসঘাতক।" তাকে দেখামাত্রই আ' কিউ পুরো দমে তাকে মনে মনে গাল দিতে শুরু করত।

তার নকল বেণী আ' কিউ সবচে বেশী ঘৃণা ও অপছন্দ করত। নকল বেণী লাগাতে হলে একজন মানুষকে মানুষ গণ্য করা যায় না, এবং যেহেতু তার বউ চতুর্থ বার কূয়ায় ঝাপ দিতে যায় নি তাই তাকেও ভালো মেয়েমানুষ বলা যায় না।

এখন এই মেকী বিদেশী শয়তানটা এগিয়ে আসছে।

"টেকো মাথা — গাধা —" অতীতে আ' কিউ তাকে মনে মনে গাল দিয়েছে, যা শোনা যায় নি, কিন্তু আজ মেজাজ খারাপ থাকায় এবং মনের ভাব প্রকাশ করতে চাওয়ায় কথাগুলো মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ে।

কপাল খারাপ, এই টেকো মাথার হাতে ছিল চকচকে, বাদামী একটি লাঠি, আ' কিউ যেটাকে বলেছে 'শোকার্তদের লাঠি।' সে আ' কিউ'র ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মার আসছে বুঝতে পেরে আ' কিউ তাকে জড়িয়ে ধরে। এমন জোরে লাঠির শব্দ হয় যেন তা আ' কিউ'র মাথার ওপরেই পড়েছে।



এখন এই মেকী বিদেশী শয়তান এগিয়ে আসছে।

পাশেই একটি শিশুকে দেখিয়ে আ' কিউ বলে : "তাকে বলেছি।"

ফট্! ফট্! ফট্!

যতদূর মনে করতে পারে এটাই আ' কিউ'র জীবনের দ্বিতীয় বারের হেনস্তা। কপাল ভালো, লাঠির বাড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তার মনে হয় ব্যাপারটা শেষ এবং সেও কিছুটা স্বস্তি বোধ করে। উপরন্তু পূর্বপুরুষদের শিখিয়ে দেওয়া "ভুলে যাওয়ার ক্ষমতা" তাকে ভালো সুবিধে দেয়। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় এবং শুঁড়ীখানার দরোজার কাছে পেঁাছুতে পেঁাছুতে আবার খুশী বোধ করে।

ঠিক সে সময়ে "আত্ম উন্নতি কনভেণ্ট" থেকে এক ছোট্ট সন্ন্যাসিনী তার দিকে এগিয়ে আসে। সন্ন্যাসিনী দেখলেই সবসময় আ' কিউ'র মেজাজ বিগড়ে যায়, তার ওপর এই হেনস্তার পর। যা যা ঘটেছে মনে করতেই তার রাগ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

সে মনে মনে ভাবে, "আজ তোমাকে দেখেছি বলেই কপাল খারাপ।"

সে তার দিকে এগিয়ে শব্দ করে থুথু ফেলতে থাকে, "থু . . . . . .থু!"

সন্ন্যাসিনী তার দিকে কোন নজর না দিয়ে মাথা নীচু করে এগিয়ে যায়। আ' কিউ তার কাছে যায়, সদ্য নেড়া করা মাথায় হাত বুলিয়ে বোকার মত হেসে ওঠে, "নেড়া মাথা! তাড়াতাড়ি ফিরে যাও . . . . . . তোমার সন্ন্যাসী তোমার জন্য অপেক্ষা করছে . . . . . ."

লজ্জায় লাল হয়ে দ্রুত চলে যেতে যেতে সন্ন্যাসিনী জানতে চায়, "তুমি কাকে হাত বুলাচ্ছ? . . . . . ."

শুঁড়ীখানার লোকজন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। তার কাজ প্রশংসিত হয়েছে দেখতে পেয়ে আ' কিউ গর্ব বোধ করে।

সন্ন্যাসিনীর গাল টিপে সে বলে : "সন্ন্যাসী তোমাকে হাত বুলাতে পারলে আমি পারব না কেন?"

আবার শুঁড়ীখানার লোকজন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। আ' কিউ আরো তৃপ্ত বোধ করে, এবং যারা সায় জানাচ্ছে তাদের খুশী করার জন্য তাকে চলে যেতে দেয়ার আগে জোরে চিমটি কাটে।

এই ঘটনার সময় সে বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং এবং মেকী বিদেশী শয়তানকে ভুলে যায় যেন সারা দিনের দুর্ভাগ্যের প্রতিশোধ নেয়া হয়ে গেছে। আরো অবাক ব্যাপার, মার খাওয়ার পরের চেয়ে সে আরো বেশী হাল্কা বোধ করে, এত হাল্কা যেন বাতাসে উড়ে যেতে তৈরী।

দূর থেকে ছোট সন্ন্যাসিনীর অশ্রুভেজা কন্ঠ ভেসে আসে, "আ' কিউ, তোমার নির্বংশ মরণ হোক!"

আ' কিউ মনের খুশীতে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

কম তৃপ্তিতে শুঁড়ীখানার লোকজনও অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রেমের ট্র্যাজেডী

বলা হয় এমন অনেক বিজেতা আছে যারা বিজয়ে কোন আনন্দ পায় না যদি তাদের প্রতিপক্ষ বাঘ অথবা ইগলের মত হিংস্র না হয়; তাদের প্রতিপক্ষ যদি ভেড়া বা মুরগীর মত নিরীহ হয় তাহলে বিজয়টা তাদের কাছে শূন্য মনে হয়। অনেক বিজেতা আছে যারা সব শেষ হয়ে গেলে, শত্রু নিহত অথবা আত্মসমর্পণ করলে, ভীষণ ভয়ংকর হলে উপলব্ধি করে কোন শত্রু বা মিত্র অবশিষ্ট নেই — শুধু তারাই আছে, সার্বভৌম, নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত এবং অভাগা। তখন তাদের কাছে বিজয়টা মনে হয় ট্র্যাজেডী। কিন্তু আমাদের নায়ক এতটা মেরুদণ্ডহীন নয়। সে সবসময় মহোল্লসিত। সারা বিশ্বের ওপর চীনের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের এটা একটা প্রমাণ হতে পারে।

আ' কিউ'র দিকে দেখুন, হাল্কা এবং গর্বিত, যেন উড়ে যেতে তৈরী!

অবশ্য এ বিজয় অদ্ভুত পরিণতিহীন নয়। বেশ কিছু সময় ধরে তার উড়ে যাবার কথা মনে হয়েছে এবং সে ভূমি দেবতার মন্দিরে উড়ে গেছে, যেখানে শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে নাক ডাকতে শুরু করবে। আজ সন্ধ্যায় চোখ বন্ধ করাটা তার কাছে খুব কষ্টকর মনে হয়, মনে হয় তার বুড়ো আঙ্গুল এবং তর্জনীতে কিছু একটা ঘটেছে, অন্য দিনের চেয়ে বেশী মসৃণ। বলা শক্ত ছোট সন্ন্যাসিনীর মুখ থেকে নরম এবং মসৃণ কিছু তার আঙ্গুলে লেগে গেছে কিনা অথবা আঙ্গুল তার গালে মসৃণভাবে বুলিয়েছে।

"আ' কিউ, তোমার নির্বংশ মরণ হোক!"

শব্দগুলো আবার তার কানে বাজে। সে ভাবে, "সত্যিই তো, আমার বউ আনা উচিত, কেননা পুত্রহীন কোন পুরুষ মারা গেলে আত্মার জন্য ভাতের ভোগ দেয়ার কেউ থাকবে না . . . . . . আমার একটা বউ আনা উচিত।" কথায় বলে,

"তিনধরণের পাপ আছে, এর মধ্যে সবচে খারাপ হচ্ছে কোন বংশধর না থাকা।" এবং জীবনের একটি ট্র্যাজেডী হচ্ছে "বংশধরহীন আত্মা উপবাসী থাকে।"[6] তাই তার চিন্তা সাধু ও সন্ন্যাসীদের চিন্তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত এবং এটা খারাপ যে সে পরে পাগলের মত ছুটোছুটি করবে।

সে ভাবে, "নারী, নারী! ......"

"......সন্ন্যাসী হাত বুলোয় ......নারী! নারী! ...... নারী!" সে আবার ভাবে।

আমরা কখনো জানবো না সে সন্ধ্যায় আ' কিউ কখন শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ে। এরপর, সম্ভবতঃ সবসময় তার আঙ্গুলগুলো মনে হয়েছে নরম এবং মসৃণ এবং মাথা ঝিম ঝিম করেছে। "নারী ......" সে ভেবেই চলে।

এ থেকে আমরা দেখতে পাই নারী মানবজাতির জন্য একটা সর্বনাশ।

নারীজাতি দ্বারা ধ্বংস না হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ চীনা পুরুষ সন্ন্যাসী এবং সাধু হতে পারত। ডা জি ধ্বংস করে শাং রাজবংশ, যৌ রাজবংশের মান সম্মান বিসর্জন দেয় বাও সি, আর ছিন রাজবংশের ব্যাপারে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। যদি আমরা ধরে নেই কোন মহিলার কারণে এর পতন হয়েছে তাহলে হয়ত আমরা খুব ভুল হব না। এবং এটা সত্য যে ডোং যুও-র মৃত্যুর কারণ ডিয়াও ছান।[7]

শুরুতে আ' কিউ'র নীতিজ্ঞানও ছিল খুব টনটনে। যদিও আমরা জানি না কোন ভাল শিক্ষক তাকে পথ দেখিয়েছেন কিনা, কিন্তু সে সবসময় "নারী-পুরুষের বিভক্তিতে" বিশ্বাস করত এবং ছোট সন্ন্যাসিনী ও "মেকী বিদেশী শয়তান" কে নিন্দার ব্যাপারে ছিল যথেষ্ট নিরপেক্ষ। তার ধারণা ছিল "সব সন্ন্যাসিনী নিশ্চয়ই গোপনে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে। কোন মহিলা যদি রাস্তা দিয়ে একা চলাফেরা করে তাহলে সে নিশ্চয়ই মন্দলোকদের প্রলুব্ধ করতে চায়। একজন মহিলা ও একজন পুরুষ যখন একসঙ্গে কথা বলে তখন নিশ্চয়ই মিলনের ব্যবস্থা করতে চায়।" এ ধরণের লোকজনকে সংশোধন করার জন্য সে কড়া করে তাকাবে, চীৎকার করে গাল দেবে এবং জায়গাটা নির্জন হলে পেছন থেকে ছোট্ট পাথর ছুড়বে।

কে ভাবতে পেরেছিল ত্রিশের কোঠায় যখন একজনের "দৃঢ় থাকা"[৮] উচিত তখন সে ছোট্ট এক সন্ন্যাসিনীকে নিয়ে মাথা খোয়াবে। চিরায়ত নিয়ম অনুযায়ী এই ধরণের চিত্তচাঞ্চল্য সবচে নিন্দনীয়। মহিলারা ঘৃণ্য প্রাণী। ছোট সন্ন্যাসিনীর মুখমণ্ডল নরম ও মসৃণ না হলে সে আ' কিউকে যাদু করতে পারত না, ছোট সন্ন্যাসিনীর মুখ কাপড়ে ঢাকা থাকলেও এমনটা ঘটত না। পাঁচ ছয়

বছর আগে একবার মুক্তাঙ্গন অপেরা দেখার সময় সে এক দর্শক মহিলার পায়ে চিমটি কেটেছিল, কিন্তু মহিলার পরণে প্যাণ্ট থাকায় পরে তার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে নি। ছোট সন্ন্যাসিনী তার মুখ কাপড়ে ঢাকে নি এবং এটা বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের দোষের আর একটি প্রমাণ।

আ' কিউ ভাবে, "নারী ......"

যে সব মহিলারা "খারাপ পুরুষদের বশ করতে চায়" সে তাদের ওপর কড়া নজর রাখে, কিন্তু তারা তাকে দেখে হাসে না। সে সব মহিলা তার সঙ্গে কথা বলে তা সে খুব মনোযোগের সঙ্গে শোনে, কিন্তু তাদের কেউ গোপন অভিসারের কথা বলে না। আহ! এটা নারীর ভণিতার আর একটি উদাহরণ, তারা সবাই নকল বিনয়ের ভান করে।

মিঃ যাও এর বাড়ীতে ধান মাড়াইয়ের সময় একদিন সন্ধ্যায় খাবারের পর আ' কিউ পাইপ টানার জন্য রান্নাঘরে বসেছে। অন্য কারো বাড়ী হলে সে সান্ধ্য খাবারের পর বাড়ী চলে যেতে পারত, কিন্তু যাও পরিবারে তাড়াতাড়ি খাওয়া হয়। যদিও নিয়ম ছিল বাতি জ্বালানো চলবে না, খাওয়ার পরই বিছানায় যেতে হবে, নিয়মের কিছু কিছু ব্যতিক্রমও ছিল। মিঃ যাও এর ছেলে কাউন্টি পরীক্ষা পাশ করার আগে পরীক্ষার পড়া তৈরির জন্য তাঁর বাতি জ্বালানোর অনুমতি ছিল এবং আ' কিউ যখন খুচরো কাজে যেত তখন সে ধান মাড়াইয়ের জন্য বাতি জ্বালাতে পারত। নিয়মের এই পরবর্তী ব্যতিক্রমের জন্য কাজ করার আগে আ' কিউ রান্নাঘরে বসে পাইপ টানছিল।

যাও পরিবারের একমাত্র চাকরানী আমা উ থালাবাসন ধোয়ার পর লম্বা বেঞ্চির ওপর বসে আ' কিউ'র সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেয় :

"আমাদের গিন্নী দুদিন কিছু খান নি কেননা কর্তা একজন রক্ষিতা আনতে চান ......"

আ' কিউ ভাবে, "নারী ...... আমা উ ...... এই ছোট বিধবা।"

"অষ্টম চাঁদে আমাদের ছোট গিন্নীর বাচ্চা হবে।"

"নারী ......" আ' কিউ ভাবে।

পাইপ রেখে আ' কিউ উঠে দাঁড়ায়।

আমা উ বলে চলে, "আমাদের ছোট গিন্নী ......"

"আমার সঙ্গে শুবি!" আ' কিউ হঠাৎ এগিয়ে নিজেকে তার পায়ে ছুড়ে দেয়।

এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ নীরবতা নেমে আসে।

"অ্যা!" একমুহূর্তের জন্য বোবা বনে গিয়ে আমা উ হঠাৎ কাঁপতে থাকে,

তারপর চেঁচাতে চেঁচাতে বেরিয়ে যায় এবং সহসাই তার ফোঁপানি শোনা যায়।

দেয়ালের উল্টো দিকে হাঁটু গেড়ে বসা আ' কিউও বোবা বনে যায়। দুহাতে খালি বেঞ্চি ধরে সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়, বুঝতে পারে কিছু একটা গোল-মাল হয়েছে। আসলে, এই সময়ে সে নিজেই নার্ভাস হয়ে পড়েছে। চোখের পলকে সে কোমরের বেল্টের সঙ্গে পাইপ গুঁজে ধানের কাছে যাওয়া ঠিক করে কিন্তু — ধপাস — তার মাথার ওপর একটি বিরাট ঘুষি নেমে আসে এবং সে ঘুরে তাকিয়ে দেখতে পায় সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থী তার সামনে দাঁড়িয়ে বিরাট বাঁশের লাঠি ঘোরাচ্ছে।

"তুই . . . . . . তুই সাহস পেলি কোথায় . . . . . ."

বিরাট বাঁশের লাঠি ঘাড়ের অপর দিকে নেমে আসে। দুহাতে মাথা ঠেকাতে গেলে আঘাতটা আঙুলের গিঁটের ওপর পড়ে, যথেষ্ট ব্যথা লাগে। রান্নাঘরের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাবার সময় মনে হয় একটা বাড়ি তার পিঠেও পড়েছে।

"কচ্ছপের ডিম।" সফল কাউণ্টি পরীক্ষার্থী চীৎকার করে, পেছন থেকে কথ্য চীনা ভাষায় গালাগাল করতে থাকে।

ধান মাড়াইয়ের জায়গায় পালিয়ে গিয়ে আ' কিউ একলা দাঁড়িয়ে থাকে। আঙুলের গিঁটে ব্যথা করছে এবং "কচ্ছপের ডিম" শব্দটা সে ভাবতে থাকে কেননা ওয়েইযুয়াং এর অধিবাসীরা কখনো তা ব্যবহার করে নি, শুধু যারা সরকারী জীবন দেখেছে সেই ধনীরা ব্যবহার করে। এতে সে আরো ভয় পেয়ে যায়। এবং মনের ওপর একটা বিরাট প্রভাব ফেলে। ততক্ষণে "নারী . . . . . ." সব চিন্তা উবে গেছে। এই গালাগালি ও পিটুনির পর মনে হয় কিছু একটা হয়ে গেছে এবং সে হাল্কা মনে আবার ধান মাড়াইয়ের কাজ শুরু করে। কিছুক্ষণ পর তার গরম লাগে এবং জামা খোলার জন্য সে কাজ বন্ধ করে।

জামা খুলতে খুলতে সে বাইরে বিরাট হৈ চৈ শুনতে পায়। আ' কিউ সবসময় উত্তেজনায় যোগ দিতে পছন্দ করে বলে শব্দের খোঁজে যায়। সে ধীরে ধীরে বুঝতে পারে শব্দটা আসছে মিঃ যাও-এর ভেতরের উঠোন থেকে। সন্ধ্যা হলেও অনেককেই সেখানে দেখতে পায়, দুদিন উপবাসী গিন্নী সহ যাও পরিবারের সবাই। এ ছাড়া আছে প্রতিবেশী মিসেস জৌ এবং তাদের আত্মীয় যাও বাইইয়ান, যাও সিছেন।

চাকরানীর ঘর থেকে আমা উকে বের করে নিয়ে আসতে আসতে ছোট গিন্নী বলে :

"বাইরে আয় . . . . . . নিজের ঘরে বসে চিন্তা করবি না।"

পাশ থেকে ফোড়ন কাটে মিসেস জৌ: "সবাই জানে তুমি ভালো মহিলা। তুমি আত্মহত্যার কথা চিন্তা করবে না।"

আমা উ বিলাপ করতেই থাকে, অস্পষ্ট কিছু বিড়বিড়িয়ে বলে।

আ'কিউ ভাবে, "বেশ মজার ব্যাপার। এই ছোট বিধবা আবার কি ঝামেলা বাধিয়েছে?" ব্যাপারটা জানার জন্য সে যাও সিছেন-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় হঠাৎ দেখতে পায় মিঃ যাও-এর বড় ছেলে তার দিকে দৌড়ে আসছে, হাতে বাঁশের বিরাট লাঠি। বাঁশের বিরাট লাঠি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় সে এটার মার খেয়েছে এবং আপাততঃ বুঝতে পারে এই উত্তেজনার সঙ্গে সে কোন না কোন ভাবে জড়িত। মাড়াইয়ের জায়গায় পালানোর আশায় সে ঘুরে দৌড়াতে থাকে, বুঝতে পারে নি বাঁশের লাঠি তার পালানো বন্ধ করে দেবে, তাই সে ঘুরে আবার উল্টো দিকে দৌড়াতে থাকে এবং বিনা কষ্টে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ভূমি দেবতার মন্দিরে ফিরে আসে।

কিছুক্ষণ বসার পর আ' কিউ'র চামড়া শির শির করতে থাকে এবং সে ঠাণ্ডা বোধ করে। বসন্ত হলেও রাতগুলো একটু ঠাণ্ডা এবং খালি গায়ের জন্য নয়। মনে পড়ে সে যাও বাড়ীতে শার্ট ফেলে এসেছে, কিন্তু ভয় হয় আনতে গেলে আবার সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থীর বাঁশের লাঠির স্বাদ পাবে।

তারপর আসে সাধ্যপাল।

সাধ্যপাল বলে: "আ' কিউ, তোর নিকুচি করি। তুই দাগী, যাও বাড়ীর চাকরানীদের থেকে দূরে থাকতে পারিস না। তুই আমার ঘুম নষ্ট করেছিস, তোর নিকুচি করি। . . . . . ."

এই গালাগালিতে আ' কিউ'র কিছুই বলার ছিল না। রাত বলে আ' কিউকে দ্বিগুণ অর্থাৎ সাধ্যপালকে নগদ চার'শ দিতে হয়। কোন নগদ টাকা ছিল না বলে সে জামিন হিসেবে তার হ্যাটটি দেয় এবং পাঁচটি শর্তে রাজী হয়:

১. দুষ্কর্মের জন্য পরদিন ভোরে আ' কিউ এক পাউণ্ড ওজনের দুটি লাল মোমবাতি এবং এক প্যাকেট আগরবাতি যাও পরিবারে নিয়ে যাবে।

২. যাও পরিবার ভূত তাড়ানোর জন্য যে তাও গুরুকে আনবে তার খরচ আ' কিউকে দিতে হবে।

৩. আ' কিউ আর কখনো যাও বাড়ীতে পা রাখবে না।

৪. আমা উ'র কোন কিছু ঘটলে আ' কিউ দায়ী হবে।

৫. আ' কিউ তার মজুরি বা শার্টের জন্য ফিরে যাবে না।

আ' কিউ সব ব্যাপারে রাজী হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য তার কোন নগদ টাকা ছিল না। কপাল ভালো, বসন্ত বলে লেপের দরকার ছিল না এবং শর্ত মেটানোর

জন্য নগদ দু'হাজারের বিনিময়ে সে তা বন্ধক দিতে পেরেছিল। খালি পিঠে প্রণাম করার পরও তার কাছে কিছু নগদ টাকা ছিল, কিন্তু হ্যাটের বদলে তা সাধ্যপালকে দেয়ার চেয়ে সে পুরোটাই মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয়।

আসলে, যাও পরিবার আগরবাতিও জ্বালায় নি, মোমও পোড়ায় নি কেননা গিন্নী যখন বুদ্ধের পূজা করেন তখনই এগুলো ব্যবহার করা যায় এবং সে উদ্দেশ্যেই রেখে দেয়া হয়। অষ্টম চাঁদে ছোট গিন্নীর যে বাচ্চা হয় তার কাঁথার জন্য জীর্ণ শার্টের অনেকখানি ব্যবহার করা হয়। বাকীটা আমা উ ব্যবহার করে জুতোর তলি হিসেবে।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবনধারণের সমস্যা

প্রণাম করা ও যাও পরিবারের শর্ত পূরণ করার পর নিয়মমাফিক আ' কিউ ফিরে যায় ভূমি দেবতার মন্দিরে। সূর্য অস্ত গেছে এবং তার মনে হতে থাকে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। ভালোভাবে চিন্তা করে সে এই সিদ্ধান্তে পেঁ ৗছে এর কারণ উদাম পিঠ। একটি জীর্ণ জ্যাকেট এখনো আছে মনে করে সে সেটা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে। যখন আবার চোখ খোলে তখন পশ্চিম দেয়ালের ওপর সূর্য জ্বলছে। সে বলতে বলতে উঠে বসে, "নিকুচি করি . . . . . ."

ওঠার পর সে আগের মতই রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে থাকে। একসময় বুঝতে পারে কিছু একটা গড়বড় হয়েছে, কিন্তু সেটা উদাম পিঠের শারীরিক অস্বস্তির সঙ্গে তুলনীয় নয়। আপাততঃ সেই থেকে ওয়েইযুয়াং-এর সব মহিলাই আ' কিউকে দেখে লজ্জা পায়। তাকে আসতে দেখলেই দরোজার পেছনে লুকোয়। এমনকি পঞ্চাশ বৎসরের বুড়ী মিসেস জৌও দ্বিধায় অন্যদের সঙ্গে পিছিয়ে যায়, তার এগারো বছরেব মেয়েকে বলে ভেতরে যেতে। এটা আ' কিউ'র কাছে খুব অদ্ভুত মনে হয়। সে ভাবে, "হারামজাদী সব। হঠাৎ করে যুবতী নারীর মত লজ্জাবতী হয়ে গেছে।"

বেশ কিছুদিন পর তার আরো বেশী করে মনে হতে থাকে কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। প্রথমতঃ, শুঁড়ীখানা তাকে বাকী দেয়া বন্ধ করে; দ্বিতীয়তঃ, ভূমি দেবতার মন্দিরের বুড়ো কিছু অবাঞ্ছিত মন্তব্য করে যেন আ' কিউকে

চলে যেতে বলতে চায়, এবং তৃতীয়তঃ, অনেকদিন — মনে করতে পারে না কতদিন — কেউ তাকে ভাড়া করতে আসে নি। শুঁড়ীখানার বাকী না দেওয়াটা হজম করতে পারে, বুড়ো চলে যেতে বলতে থাকলে সে তা অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু কেউ তাকে কাজে না লাগালে উপোস করতে হবে, এবং এটা সত্যিই "নিকুচি" করার অবস্থা।

ব্যাপারটা যখন সহ্যের বাইরে তখন আ' কিউ পুরনো মালিকের বাড়ীতে যায় ব্যাপারটা খোঁজ নেয়ার জন্য। কিন্তু মিঃ যাও এর বাড়ীর চৌকাঠ মাড়ানোর অনুমতি তার নেই। কিন্তু সে একটা অদ্ভুত সম্বর্ধনার মুখোমুখি হয়। মুখে বিরক্তির ছাপ নিয়ে একজন লোক বেরিয়ে আসে। যেন আ' কিউ ভিখিরী এভাবে তাকে তাড়িয়ে দিতে দিতে বলে:

"কিছুই নাই, কিছুই নাই! দূর হয়ে যাও!"

আ' কিউ'র কাছে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক থেকে অস্বাভাবিক মনে হয়। সে ভাবে, "অতীতে এসব লোকজনের সবসময় সাহায্য দরকার হত। হঠাৎ করে তাদের কিছু করার নেই এটা হতে পারে না। ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হয়।" ভালো করে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে যখনই তাদের ছুটা কাজের দরকার হয় তখন তারা সিয়াও ডি'কে ডাকে। এই সিয়াও ডি রোগা, পাতলা দেউলিয়া, আ' কিউ'র চোখে বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং এর চেয়েও ছোট লোক। কে ভাবতে পেরেছিল এই ছোট লোকটি তার রুটি-রুজি কেড়ে নেবে? এবার আ' কিউ'র মেজাজ আরো চড়ে যায়, রাগে গজ গজ করতে করতে সে হঠাৎ হাত তুলে বলে, "লোহার ডাণ্ডা মেরে তোমাকে গুড়িয়ে দেব[৭] ......"

কয়েকদিন পর মিঃ ছিয়ান এর বাড়ীর সামনে সত্যি সত্যি সে সিয়াও ডি এর দেখা পায়। "যখন দু'শত্রু মুখোমুখি হয়, তখন তাদের চোখে আগুন জ্বলে ওঠে।" আ' কিউ তার দিকে এগিয়ে যায়, সিয়াও ডি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

"গাধা!" আ' কিউ ফোঁস করে ওঠে, তার দিকে ক্ষিপ্তভাবে তাকায়, মুখে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে।

সিয়াও ডি জিজ্ঞেস করে: "আমি পোকা — তাতে চলবে?"

এই বিনয়ে আ' কিউ'র মেজাজ আরো বিগড়ে যায়। কিন্তু তার হাতে লোহার ডাণ্ডা না থাকায় সে শুধু দু'হাত মেলে সিয়াও ডি'র বেণী ধরার জন্য তার দিকে দৌড়ে যায়। এক হাতে বেণী রক্ষা করে সিয়াও ডি আর এক হাতে আ' কিউ'র বেণী ধরার চেষ্টা করে। আর আ' কিউও আর এক হাতে তার বেণী বাঁচানোর চেষ্টা করে। আগে কখনো সিয়াও ডিকে পাত্তা দেয়ার কথা ভাবে নি আ' কিউ। কিন্তু উপোস করে এখন সে প্রতিপক্ষের মত রোগা, পাতলা হয়ে গেছে, তাই

তাদের ব্যাপারটা সমানে সমানে লড়াই মনে হয়। চার হাত দু'মাথা ধরে আছে, দু'জনেই কোমরের কাছে বাঁকা, আধ ঘণ্টার বেশী ছিয়ান পরিবারের সাদা দেয়ালে একটা নীল রং ধনু আকারের ছায়া পড়ে।

বোধ হয় মিটিয়ে দেয়ার জন্য কিছু পথচারী বলে, "ঠিক আছে, ঠিক আছে।"

অন্যেরা চেঁচিয়ে ওঠে, "ভালো, ভালো!" কিন্তু সেটা কি মিটিয়ে দেয়ার জন্য, না বাহবা দেয়ার জন্য না আরো একটু বাঁধিয়ে দেয়ার জন্য তা নিশ্চিত নয়।

কিন্তু দু'জনের কেউই এসব কথায় কান দেয় না। আ' কিউ তিন কদম এগোলে, সিয়াও ডি তিনবার পাক খাবে, তাই তারা দাঁড়িয়ে থাকবে। সিয়াও ডি তিন কদম এগোলে, আ' কিউ তিনবার পাক খাবে, তাই তারা দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রায় আধ ঘণ্টা পর — ওয়েইযুয়াং গ্রামে খুব অল্প কটি ঘন্টিওয়ালা ঘড়ি ছিল, তাই সময় বলা কষ্টকর, বিশ মিনিটও হতে পারে — যখন তাদের মাথা ও নাক মুখ দিয়ে ঘাম ঝরছে, আ' কিউ হাত নামিয়ে নেয় এবং একই মুহূর্তে সিয়াও ডি'রও হাত পড়ে যায়। তারা একই সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, এবং জনতার ভীড় ঠেলে একই সঙ্গে পিছিয়ে যায়।

মাথা ঘুরিয়ে আ' কিউ বলে: "আবার দেখা হবে, তোর নিকুচি করি!

"নিকুচি করি। আবার দেখা হবে......" মাথা ঘুরিয়ে সিয়াও ডিও পাল্টা জবাব দেয়।

আপাততঃ না বিজয়, না পরাজয়ের মধ্যে এই সংগ্রামের অবসান ঘটে, এবং জানা নেই দর্শকরা খুশী হয়েছে না হয় নি, কেননা তাদের কেউ কোন মন্তব্য করে নি। কিন্তু তবু কেউ আ' কিউকে ভাড়া করতে আসে নি।

এক গরম দিনে যখন সুগন্ধী বাতাসে গরমের আভাস, আ'কিউ ঠাণ্ডা বোধ করে, কিন্তু সে সেটা সামলাতে পারত — কিন্তু তার প্রধান চিন্তা খালি পেট। তার তুলোর লেপ, হ্যাট এবং শার্ট অনেক আগে উধাও হয়ে গেছে, এবং তারপর সে তুলা কোট বেচে দিয়েছে। এখন প্যাণ্ট ছাড়া আর কিছু নেই, এবং এগুলো সে খুলে ফেলতে পারে না। এটা সত্যি, তার একটি জীর্ণ জ্যাকেট ছিল, কিন্তু জুতোর তলি তৈরির জন্য দিয়ে না দিলে সেটা ছিল একেবারেই অকেজো। বহুদিন ধরে তার আশা রাস্তায় এক থোক টাকা পাবে কিন্তু কখনো তা সফল হয় নি; সে আরো আশা করেছিল ঘরে এক থোক টাকা পেয়ে যাবে, এবং পাগলের মত তা খুঁজেছে কিন্তু ঘরটা ফাঁকা, একেবারেই ফাঁকা। তার পর সে খাবারের সন্ধানে বাইরে যেতে ঠিক করে।

"খাবারের সন্ধানে" রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার চোখে পড়ে বহু পরিচিত

শুঁড়ীখানা, সেদ্ধ রুটি, কিন্তু এক মুহূর্ত সেদিকে না তাকিয়ে সে চলে যায়, এমনকি লালসাও বোধ হয় নি। এগুলো সে চায় না, যদিও সে নিজে জানে না ঠিক কি চায়?

ওয়েইযুয়াং খুব বড় জায়গা নয় বলে সহসাই সে তা পেছনে ফেলে আসে। গ্রামের বাইরে মূলতঃ ধান ক্ষেত। যতদূর চোখ যায় শুধু সবুজের মেলা, কচি ধান গাছ গজিয়েছে, এখানে সেখানে গোলাকার চলমান বস্তুর মত কর্মরত কৃষক। কিন্তু গ্রামজীবনের প্রতি অন্ধ আ' কিউ এগিয়ে চলে, কেননা সে জানে এটা তার "খাবারের সন্ধান" থেকে অনেক দূরে। শেষ পর্যন্ত সে আসে শান্ত আত্ম-উন্নতির কনভেণ্টের দেয়ালের কাছে।

কনভেণ্টের চারদিকে ধান ক্ষেত। নতুন সবুজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এর সাদা দেয়াল এবং পেছনে নীচু মাটির দেয়ালের ভেতরে সবজি বাগান। আ' কিউ এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে, নিজের চারদিকে তাকায়। কেউ চোখে না পড়ায় সে হোশৌউ লতা ধরে নীচু দেয়ালের ওপর উঠেছে। মাটির দেয়াল কাঁপতে থাকে, আ' কিউ ভয় পেয়ে যায়, যাহোক তুঁত গাছের ডালা চেপে সে লাফিয়ে যায়। ভেতরে হরেক রকমের শাক সবজি কিন্তু হলদে মদ, সেদ্ধ রুটি বা অন্য কোন খাবারের কোন চিহ্ন নেই। কচি ডগা ওয়ালা এক ঝাড় বাঁশ। পশ্চিম দেয়ালের কাছে গজিয়েছে, কিন্তু সেগুলো রান্না করা নয়। রাই সরিষার বীজ পেকেছে। শর্ষে গাছে ফুল গজাচ্ছে এবং ছোট বাঁধাকপিগুলো বেশ পাকা মনে হচ্ছে।

পরীক্ষায় ফেল করা পণ্ডিতের মত আ' কিউ'র নিজেকে বিক্ষুব্ধ মনে হয়। বাগানের গেটের দিকে ধীরে ধীরে হেঁটে যাবার সময় সে হঠাৎ আনন্দ বোধ করে কেননা সেখানে তার চোখে পড়ে এক সারি মূলা। সে হাঁটু গেড়ে তুলতে শুরু করে। এমন সময় গেটের পেছন থেকে হঠাৎ এক গোল মাথা দেখা দেয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সরে যায়। আর কেউ নয় সেই ছোট সন্ন্যাসিনী। এই ছোট সন্ন্যাসিনীদের মত লোকজনের জন্য আ' কিউ'র যথেষ্ট উপেক্ষা থাকলেও কখনো কখনো "সাহসিকতার ভালো দিক হচ্ছে সতর্কতা।" সে তাড়াতাড়ি চারটি মূলা তোলে, পাতা ছিঁড়ে ফেলে এবং জ্যাকেটের পকেটে ঢোকায়। ইতোমধ্যে একজন বয়স্কা সন্ন্যাসিনী বেরিয়ে এসেছে।

"আ' কিউ, বুদ্ধ আমাদের রক্ষা করুন! মূলা চুরি করার জন্য কেন তুমি আমাদের বাগানে ঢুকেছ! ...... হায় ভগবান, কি খারাপ কাজ! বুদ্ধ, আমাদের রক্ষা করুন! ......"

"আমি আবার কখন আপনাদের বাগানে ঢুকে মূলা চুরি করলাম?" তখনো

তার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে পাল্টা জবাব দেয় আ' কিউ।

"এখন — তুমি?" জ্যাকেটের ভাঁজের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে বয়স্কা সন্ন্যাসিনী।

"এগুলো আপনার? বলতে পারবেন এগুলো আপনার? আপনি ......"

কথা শেষ না করেই আ' কিউ হনহনিয়ে চলতে শুরু করে, পেছনে পেছনে আসে একটি বিরাট, কালো কুকুর। প্রথমে কুকুরটি সামনের দরজায় ছিল, কিন্তু কেমনে পেছনের বাগানে পেঁৗছেছে সেটা রহস্যময়। ঘেউ করে কুকুরটি তাড়া করে এবং আ' কিউ'র পা কামড়ে দিতে চাচ্ছিল, কপাল ভালো, এমন সময় তার জ্যাকেট থেকে একটি মূলা পড়ে যায়। এবং অবাক হয়ে কুকুরটি এক মুহূর্ত থমকে যায়। এই সময়ে তুঁতগাছ দিয়ে আ' কিউ মাটির দেয়াল ডিঙিয়ে মূলা সমেত কনভেণ্টের বাইরে পড়ে যায়। সে শুনতে পায় তুঁতগাছের পাশে কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করছে এবং সন্ন্যাসিনী মন্ত্র পড়ছে।

সন্ন্যাসিনী আবার কালো কুকুরটি লেলিয়ে দেবে ভয়ে আ' কিউ মূলাগুলো তুলে দৌড়াতে শুরু করে। যেতে যেতে কিছু ছোট পাথর তুলে নেয়। কিন্তু কালো কুকুরটি আর আসে নি। পাথরগুলো ফেলে আ' কিউ এগিয়ে যায়। মূলা খেতে খেতে ভাবে, "এখানে পাওয়ার মত কিছু নেই, শহরে যাওয়াই ভালো ......"

তৃতীয় মূলাটি শেষ করতে করতে সে শহরে যাবার ব্যাপারে মন ঠিক করে ফেলে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উত্থান ও পতন

সে বছরের চান্দ্র উৎসবের পর পর্যন্ত ওয়েইযুয়াং আর আ' কিউকে দেখে নি। তার ফিরে আসায় সবাই অবাক হয়ে যায় এবং পুরোটা সময় সে কোথায় ছিল এ নিয়ে ভাবনায় পড়ে যায়। আগে যে কয়বার আ' কিউ শহরে গিয়েছে মনের খুশীতে লোকজনকে আগেই জানিয়েছে কিন্তু এবার সেটা করেনি বলে তার যাওয়াটা কারো নজরে পড়ে নি। সে হয়ত ভূমি দেবতার মন্দিরের বুড়োকে বলে থাকবে কিন্তু ওয়েইযুয়াং-এর রীতি অনুযায়ী শুধু মিঃ যাও, মিঃ ছিয়ান

অথবা সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থী শহরে গেলে সেটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। এমনকি 'মেকী বিদেশী শয়তানের' যাওয়াটাও আলোচিত হয় না, আ' কিউ'র ব্যাপারটা আরো পরের কথা। এতে বোঝা যায় কেন বুড়ো তার হয়ে খবরটা ছড়ায় নি। তাই গ্রামবাসীদের জানার কোন রাস্তা ছিল না।

এবার আ' কিউ'র ফিরে আসা আগের চেয়ে ভীষণ আলাদা এবং বাস্তবে যথেষ্ট বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে এমন সময় সে ঘুম জড়ানো চোখে শুঁড়ীখানার দরজার সামনে আসে, কাউণ্টারের দিকে হেঁটে যায়, কোমরের বেল্ট থেকে বেশ কিছু তামা ও রূপো বের করে কাউণ্টারের ওপর ছুড়ে দেয়। বলে, "নগদ। মদ আন।" তার পরনে একটি নতুন জ্যাকেট, কোমরে ঝুলে আছে বিরাট থলি, এর ভারেই বেল্টটা বাঁকা হয়ে গেছে। ওয়েইযুয়াং-এর রীতি অনুযায়ী কখনো কাউকে অস্বাভাবিক মনে হলে তার সঙ্গে অপমানজনক নয় ভদ্র ব্যবহার করা উচিত। যদিও তারা জানে এ সেই আ'কিউ তবু সে জীর্ণ কোটের আ' কিউ'র চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। পুরনো কথা আছে "পণ্ডিতব্যক্তি তিনদিন দূরে থাকলে তাকে নতুন চোখে দেখা উচিত।" তাই বেয়ারা, মালিক, খদ্দের, পথচারী সবাই স্বভাবতঃই সন্দেহ মেশানো সম্মান প্রকাশ করে। মাথা নেড়ে স্বাগত জানিয়ে মালিক বলে :

"আ কিউ, তাহলে তুমি ফিরে এসেছ!"

"হ্যাঁ, ফিরে এসেছি।"

"তুমি টাকা বানিয়েছ, ... অ্যাঁ ...... কোথায়?"

"আমি শহরে গিয়েছিলাম।"

পরদিন এই খবরটা পুরো ওয়েইযুয়াং-এ ছড়িয়ে পড়ে। যেহেতু শুঁড়ীখানা, চা দোকান, সর্বত্র লোকজন এই আ' কিউ'র নগদ টাকা, নতুন জ্যাকেটের সাফল্যের কাহিনী শুনতে চায় তাই গ্রামবাসীরা ধীরে ধীরে খবরটা ছড়িয়ে দেয়। ফল হল, তারা আ'কিউকে সম্মানের সঙ্গে খাতির করতে শুরু করে।

আ'কিউ'র কথানুযায়ী, সে সফল এক প্রাদেশিক পরীক্ষার্থীর বাসায় চাকর ছিল। গল্পের এটুকু শুনে সবাই ভয় পেয়ে যায়। এই সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থীর নাম বাই। কিন্তু পুরো শহরে সে একমাত্র সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী বলে তার পদবি ব্যবহারের প্রয়োজন নেই; যখনই কেউ সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থীর কথা বলেছে, তাকেই বোঝানো হয়েছে। এটা শুধু ওয়েইযুয়াং-এ নয়, ত্রিশ মাইলের মধ্যে একই ব্যাপার, যেন সবাই তার নাম কল্পনা করে নিয়েছে "মিঃ সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী।" এ ধরণের একজনের বাড়ীতে কাজ করা স্বভাবতঃই সম্মানের ব্যাপার; কিন্তু আ' কিউ'র আরো কথা অনুযায়ী সে এই কাজ আর

করতে চায় নি কেননা এই সফল পরীক্ষার্থী সত্যি সত্যি "কচ্ছপের ডিম।" গল্পের এটুকু শুনে সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিন্তু আনন্দের সঙ্গে, কেননা এতে বোঝা যায় আ' কিউ এ ধরণের লোকের বাড়ীতে কাজের উপযুক্ত নয়, দয়ার কথা দূরে থাক।

আ' কিউ'র কথানুযায়ী তার ফিরে আসার আরো কারণ হচ্ছে সে শহরবাসীদের ব্যাপারে খুশী নয়। কেননা তারা লম্বা বেঞ্চিকে সোজা বেঞ্চি বলে, ভাজা মাছে পেঁয়াজ পাতার কুচি ব্যবহার করে। আর একটা দোষ সে সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে — হাঁটার সময় শহুরে নারীদের চালচলন ভালো নয়। যা হোক, শহরের ভালো দিকও আছে : যেমন ওয়েইযুয়াং-এ সবাই বাঁশের বত্রিশগুটি দিয়ে খেলে, শুধু 'মেকী বিদেশী শয়তান' মাজিয়াং খেলতে পারে, কিন্তু শহরের দুরন্ত শিশুরা পর্যন্ত মাজিয়াং খেলতে পারে। অল্প বয়সের এই যুবক রাস্কেলদের হাতে 'মেকী বিদেশী শয়তানকে' ছেড়ে দেবে, এবং সে সোজাসুজি "নরকরাজার সামনে ছোট্ট শয়তান" বনে যাবে। গল্পের এ অংশ শুনে সবাই লাল হয়ে যায়।

"তোমরা কেউ ফাঁসি দেখেছ?" আ' কিউ জিজ্ঞেস করে, "আহ, সে এক মজার দৃশ্য ...... যখন তারা বিপ্লবীদের ফাঁসি দেয় ...... আহ, সে এক মজার দৃশ্য, এক মজার দৃশ্য ......" মাথা নাড়তে নাড়তে ঠিক উল্টো দিকে দাঁড়ানো যাও সিছেনের মুখে তার থুথু পড়ে। গল্পের এটুকু যারা শুনেছে, তারা ভয়ে কাঁপতে থাকে। তার পর চার দিকে একবার তাকিয়ে সে হঠাৎ তার ডান হাত তুলে, সামনে মাথা বাড়িয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে গল্পের শ্রোতা বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং-এর ঘাড়ের ওপর ফেলে।

"হত্যা কর!" আ' কিউ চীৎকার করে ওঠে।

বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং চমকে যায়, তার পর বিজলীর চমকের মত মাথা সরিয়ে নেয় এবং উপস্থিত সবাই আশঙ্কার আনন্দে কেঁপে ওঠে। এর পর বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং বহুদিন নেশাগ্রস্তের মত কাটায়, আ' কিউ'র কাছে যাবার তার এবং অন্যান্যেরও সাহস হয় নি।

যদিও আমরা বলতে পারি না এ সময়ে ওয়েইযুয়াং-এর লোকজনের চোখে আ'কিউ'র মর্যাদা মিঃ যাও-এর চেয়ে বেশী ছিল কিনা, কিন্তু সত্যের অপলাপ না করে বলতে পারি তা প্রায় সমান ছিল।

কিছুদিনের মধ্যে আ' কিউ'র খ্যাতি হঠাৎ ওয়েইযুয়াং-এর মহিলা মহলেও ছড়িয়ে পড়ে। ওয়েইযুয়াং-এ ছিয়ান ও যাও পরিবার ছিল দুয় হংকারী এবং বাকী দশ ভাগের নয় ভাগ গরীব। তবু মহিলা মহল তো মহিলা মহল এবং অনেকটা যাদুর মত আ' কিউ'র খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। মহিলারা দেখা হলেই

একজন আর একজনকে বলত, "মিসেস জৌ আ' কিউ'র কাছ্ থেকে একটি নীল সিল্কের জামা কিনেছেন। পুরনো হলেও দাম মাত্র নব্বই পয়সা। এবং সাদা চোখওয়ালা যাও-এর মা (এটা যাচাই করা বাকী, কেননা কেউ বলে এটা যাও সিছেনের মা) বিদেশী গোলাপী ক্যালিকোর তৈরী বাচ্চাদের পোশাক কিনেছেন। প্রায় নতুন, দাম মাত্র নগদ তিনশ, শতকরা আটভাগ বাটা বাদে।"

তারপর, যাদের সিল্কের জামা ছিল না বা বিদেশী ক্যালিকোর প্রয়োজন ছিল তারা কেনার জন্য আ' কিউকে দেখতে খুব উদগ্রীব হয়ে পড়ে। তাকে এড়ানো দূরে থাক, এখন তাকে যেতে দেখলে তারা তার পিছু পিছু গিয়ে তাকে থামতে বলে।

তারা হয়ত জিজ্ঞেস করবে, "আ' কিউ, তোমার কাছে কি আর সিল্কের জামা আছে? না? আমরা বিদেশী ক্যালিকোও চাই। তোমার কাছে কি আছে?"

পরে এই খবর গরীব ঘর থেকে ধনীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কেননা মিসেস জৌ তার সিল্কের জামা নিয়ে এত খুশী হয়েছিলেন যে অনুমোদনের জন্য মিসেস যাও এর কাছে নিয়ে যান। মিসেস যাও মিঃ যাও-এর কাছে এর খুব প্রশংসা করেন।

সেই সন্ধ্যায় খাওয়ার সময় মিঃ যাও তার ছেলে, সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থীর সঙ্গে ব্যাপারটি আলোচনা করেন, তাঁর মতে আ' কিউ'র ব্যাপারটা সন্দেহজনক এবং দরজা জানালার ব্যাপারে তাদের আরো সতর্ক হওয়া উচিত। তারা অবশ্য জানে না আ' কিউ'র কাছে আর কিছু আছে কিনা এবং ভাবে হয়ত ভালো কিছু থেকে থাকবে। যেহেতু মিসেস যাও-এর একটা ভালো, সস্তা ফার জ্যাকেট প্রয়োজন তাই পারিবারিক সলাপরামর্শের পর ঠিক হয় মিসেস জৌকে বলা হবে এখনই আ' কিউ'র খোঁজ নেয়ার জন্য। এ জন্য নিয়মের তৃতীয় ব্যতিক্রম করা হয়, বিশেষ অনুমতি দেয়া হয় সে সন্ধ্যায় বাতি জ্বালানোর।

প্রচুর তেল জ্বলে তবু আ' কিউ'র কোন দেখা নেই। পুরো যাও পরিবার অধৈর্য হয়ে হাই তুলছে, কেউ কেউ আ' কিউ'র বিশৃংখল নিয়মের সমালোচনা করছে, কেউ কেউ রাগে মিসেস জৌকে দায়ী করছে আরো ভালো করে খুঁজে না দেখার জন্য। মিসেস যাও-এর ভয় সেই বসন্তের শর্তাবলীর জন্য আ' কিউ আসতে সাহস পাচ্ছে না, কিন্তু মিঃ যাও এটাকে চিন্তার কারণ মনে করেন না, কারণ তাঁর মতে "এবার তার জন্যে আমি লোক পাঠিয়েছি।" সত্যি সত্যি এবার মিঃ যাও নিজেকে অন্তর্দৃষ্টির মানুষ হিসেবে পরিচয় দেন, শেষ পর্যন্ত মিসেস জৌ-এর সঙ্গে হাজির হয় আ' কিউ।

ভেতরে ঢোকার সময় হাঁফাতে হাঁফাতে মিসেস জৌ বলে: "সে বলছে

তার কাছে কিছু নেই। যখন তাকে বলি এসে নিজে আপনাকে বলার জন্য তখন সে কথা বলেই চলেছে। আমি তাকে বলেছি ......"

"স্যার।" হাসার চেষ্টা করে আ' কিউ বলে, থমকে যায় কার্ণিসের নীচে।

এগিয়ে গিয়ে ভালো করে তাকিয়ে মিঃ যাও বলেন: "আ' কিউ, শুনেছি তুমি অনেক টাকা পয়সা বানিয়েছ। খুব ভালো। এখন ...... তারা বলে তোমার কাছে কিছু পুরনো জিনিষ আছে ...... আমাদের দেখার জন্য ওগুলো সব এখানে নিয়ে আস ......এর কারণ আমি চাই ......"

"আমি মিসেস জৌ'কে বলেছি — কিছুই বাকী নেই।"

"কিছুই নেই?" হতাশ হওয়া ছাড়া মিঃ যাও-এর কিছুই করার থাকে না। "এত তাড়াতাড়ি শেষ হল কি করে?"

"সেগুলো এক বন্ধুর, এবং শুরুতে তেমন বিশেষ কিছু ছিল না। লোকজন কিছু কিনেছে ......"

"নিশ্চয়ই কিছু বাকী আছে। ......"

"শুধু দরজার একটা পর্দা আছে।"

মিসেস যাও সঙ্গে সঙ্গে বলেন: "তাহলে আমাদের দেখার জন্য দরজার পর্দাটাই নিয়ে আস।"

খুব একটা গা না করে মিঃ যাও বলেন: "ঠিক আছে, কাল আনলে ঠিক আছে? আ' কিউ, ভবিষ্যতে কিছু থাকলে প্রথমেই সেগুলো আমাদের কাছে নিয়ে আসবে ......"

"আমরা অবশ্যই অন্যদের চেয়ে কম দেব না।" বলে সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থী। প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য দ্রুত আ' কিউ'র ওপর চোখ ঝুলায় তার স্ত্রী।

মিসেস যাও বলেন: "আমার একটি ফার জ্যাকেট প্রয়োজন।"

আ' কিউ রাজী হলেও সঙের মত এমন ভাব দেখায় যে তারা জানে না তাদের নির্দেশ সে মন দিয়ে গ্রহণ করেছে কি না। এতে মিঃ যাও এত হতাশ, বিরক্ত এবং চিন্তিত হয়ে পড়েন যে হাই তোলা বন্ধ হয়ে যায়। সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থীও আ' কিউ'র আচরণে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। বলে: "এধরণের কচ্ছপের ডিমের ব্যাপারে লোকজনের সতর্ক থাকা উচিত। সবচে ভালো হবে সাধ্যপালকে বলে তার ওয়েইযুয়াং-এ থাকা নিষিদ্ধ করে দেয়া।"

মিঃ যাও রাজী হন না, বলেন, তার হয়ত প্রতিহিংসা থাকবে সে ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দাঁড়াবে "ইগল নিজের বাসায় শিকার করে না।" তার নিজ গ্রামের চিন্তার কারণ নেই, তাদের শুধু রাতের বেলা একটু সতর্ক হতে হবে। পিতার এই নির্দেশে মুগ্ধ হয়ে সফল পরীক্ষার্থী আ' কিউকে তাড়িয়ে দেয়ার প্রস্তাব

প্রত্যাখ্যান করে এবং মিসেস জৌকে সতর্ক করে দেয় যাতে কোনভাবেই সে যা বলেছে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

যাহোক, পরদিন যখন মিসেস জৌ তার নীল স্কার্টকে কালো রং করানোর জন্য নিয়ে যায় তখন আ'কিউ সম্পর্কে এই কটাক্ষগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটায় যদিও সে বলে নি সফল পরীক্ষার্থী আ' কিউকে তাড়িয়ে দেয়ার কথা বলেছে। তবুও এটা আ' কিউ'র জন্য ক্ষতিকর হয়। প্রথমে, সাধ্যপাল তার দরজায় এসে দরজার পর্দাটি নিয়ে নেয়। মিসেস যাও দেখতে চেয়েছে বলে আ' কিউ প্রতিবাদ জানালেও সাধ্যপাল ফেরত দেয়না বরং মুখ বন্ধ রাখার জন্য মাসিক ঘুষ দাবী করে। দ্বিতীয়তঃ, তার জন্যে গ্রামবাসীদের সমীহ হঠাৎ বদলে যায়। তারা যা খুশী করার স্বাধীনতা না দেখালেও তাকে যতখানি সম্ভব এড়িয়ে চলে। এটা তার আগের "খুন কর।" ভয়ের চেয়ে আলাদা হলেও, আত্মার প্রতি পুরনোদের মনোভাবের পর্যায়ে দাঁড়ায় ; তারা সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে চলে।

ব্যাপারটা জানতে কিছু ভবঘুরে সতর্কতার সঙ্গে আ' কিউকে প্রশ্ন করতে যায়। এবং কোন কিছু লুকানোর চেষ্টা না করে আ' কিউ সগর্বে তার অভিজ্ঞতার কথা বলে। তারা জানতে পায় সে ছিঁচকে চোর ছিল, দেয়ালে উঠতে পারত না, গর্ত দিয়েও ঢুকতে পারত না, শুধু চোরাই মাল গ্রহণ করত।

এক রাতে সে একটা পোটলা পেয়েছে এবং তার সর্দার আবার চুরি করতে গেছে। এমন সময় ভেতরে একটা বিরাট হৈচৈ শুনতে পেয়ে সে যত দ্রুত সম্ভব পালিয়ে যায়। সেই রাতেই সে শহর থেকে পালিয়ে ওয়েইযুয়াং-এ ফিরে আসে, তারপর আর ওকাজে ফিরে যাওয়ার সাহস হয় নি। এ গল্প আ' কিউ'র জন্য আরো ক্ষতিকর কেননা গ্রামবাসীরা তার কাছ থেকে সম্মানজনক দূরত্ব রেখেছিল, তার শত্রুতা পেতে চায় নি ; কে ভাবতে পেরেছিল সে একটা চোর যার আর চুরি করার সাহস নেই? এখন তারা জানে তাকে তেমন ভয় পাওয়ার কিছুই নেই।

সপ্তম অধ্যায়

বিপ্লব

সম্রাট স্যুয়ান থুং-এর রাজত্ব কালে তৃতীয় বৎসরের নবম চাঁদের চতুর্দশদিনে — যে দিন যাও বাইইয়ান-এর কাছে আ' কিউ তার টাকার ব্যাগ বিক্রী করে — সেদিন মাঝরাতে, তৃতীয় প্রহরের চতুর্থ ঘণ্টার পর কালো ছইওয়ালা এক বিরাট

নৌকা এসে থামে যাও পরিবারের ঘাটে। গ্রামবাসীরা যখন গভীর ঘুমে অচেতন তখন অন্ধকারে নৌকাটি আসে, তাই তারা এসম্পর্কে কিছুই জানতে পারে নি। কিন্তু ভোরবেলা আবার সেটা চলে যায় এবং অনেকেই তা দেখে। তদন্তে জানা যায় এই নৌকার সত্যিকারের মালিক সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী।

এই ঘটনা ওয়েইযুয়াং বিরাট অস্বস্তি সৃষ্টি করে এবং দুপুরের আগেই সকল গ্রামবাসীর বুকের ধুকধুকানি বেড়ে যায়। নৌকার গতিবিধি সম্পর্কে যাও পরিবার চুপচাপ থাকে কিন্তু চা দোকান ও শুঁড়ীখানার গুজব অনুযায়ী বিপ্লবীরা শহরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে এবং লুকানোর জন্য সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী গ্রামে এসেছিলেন। একমাত্র মিসেস জৌ অন্যকথা ভেবেছিলেন। তাঁর মতে সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী ওয়েইযুয়াং গ্রামে কিছু ভাঙা বাক্স রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মিঃ যাও সেগুলো ফিরিয়ে দিয়েছেন। আসলে সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী এবং যাও পরিবারের সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থীর মধ্যে সদ্ভাব ছিল না, তাই দুঃ-সময়ে তাদের বন্ধু হওয়াটাও খুব অস্বাভাবিক, উপরন্তু মিসেস জৌ যাও পরিবারের প্রতিবেশী বলে কি ঘটছে তা তারই ভালো জানার কথা।

তার পর আর একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ে। বলা হয় নিজে না এলেও যাও পরিবারের সঙ্গে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত করে পণ্ডিত একটি দীর্ঘ চিঠি পাঠিয়েছেন এবং অনেক ভাবনা চিন্তার পর মিঃ যাও বুঝতে পারেন যে এতে কোন ক্ষতি হবে না এবং এগুলো এখন তাঁর স্ত্রীর বিছানার নীচে জড়ো করা। বিপ্লবীদের ব্যাপারে কেউ কেউ বলে তারা সে রাতেই সম্রাট ছোং যেং[10] -এর জন্য শোকের পোশাক — সাদা হ্যালমেট ও সাদা শিরস্ত্রাণ পরে শহরে প্রবেশ করেছে।

আ' কিউ বহুদিন ধরে বিপ্লবীদের কথা জানে এবং এ বছর সে নিজের চোখে বিপ্লবীদের শিরশ্ছেদ হতে দেখেছে। কিন্তু যেহেতু তার মনে হয়েছে বিপ্লবীরা বিদ্রোহী এবং বিদ্রোহ হলে তার জন্য ব্যাপার স্যাপার কষ্টকর হয়ে যাবে, তাই সে সবসময় তাদের ঘৃণা করেছে এবং দূরে থেকেছে। কে ভাবতে পেরেছিল তারা ত্রিশ মাইল জুড়ে পরিচিত একজন সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থীকে ঘাবড়ে দিতে পারে? পরিণতিতে তাদের সম্পর্কে জানতে আ' কিউ'র বেশ কিছু "উদগ্রীব"। সকল গ্রামবাসীর ভীতি তাকে আনন্দ দেয়।

আ' কিউ ভাবে, "বিপ্লব খারাপ জিনিষ নয়। তাদের সবগুলোকে শেষ করে দাও ...... নিকুচি করি তাদের! ...... নিজেই বিপ্লবীদের পক্ষে চলে যেতে চাই।"

সম্প্রতি আ' কিউ কষ্টে আছে এবং সম্ভবতঃ অসন্তুষ্ট, এর ওপর দুপুর বেলা

খালি পেটে দু বাটি মদ টেনেছে। সহসাই সে মাতাল হয়ে পড়ে এবং ভাবতে ভাবতে হাঁটতে গিয়ে মনে হয় বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ, অদ্ভুতভাবে তার মনে হয় সে নিজেই বিপ্লবীদের একজন এবং ওয়েইযুয়াং গ্রামের জনগণ তার হাতে বন্দী। আনন্দে নিজেকে সংযত করতে না পারে সে চীৎকার না করে পারে না :

"বিদ্রোহ! বিদ্রোহ!"

গ্রামবাসীরা আতঙ্কে তার দিকে তাকায়। আ' কিউ আগে কখনো এই করুণ চাহনি দেখে নি এবং তাদেরকে তার কাছে যেন মধ্যগ্রীষ্মে বরফদেয়া জল পানের মত মনে হয়। সুতরাং আরো আনন্দে সে চীৎকার করতে করতে হাঁটতে থাকে :

"ঠিক আছে ...... যা চাই তা নেব। যাকে ইচ্ছা তাকে পছন্দ করব।

"লা, লা, লা, লা!

"ভুল করে ধর্মভাই যেংকে খুন করেছি,

"ভুল করে খুন করেছি ...... হা, হা, হা,

"লা, লা, লা, লা!

"লোহার ডাণ্ডা মেরে তোমাকে গুড়িয়ে দেব।"

ছেলের সঙ্গে দরোজায় দাঁড়িয়ে মিঃ যাও দুজন আত্মীয়ের সঙ্গে বিপ্লব নিয়ে আলোচনা করছিলেন। মাথা হেলিয়ে "লা, লা, লা, লা" গান গাইতে গাইতে চলে যাওয়ার সময় আ' কিউ তাদের দেখে নি।

নীচু স্বরে মিঃ যাও ডাকেন : "বুড়ো কিউ।"

"লা, লা" আ' কিউ গেয়েই চলে, বুঝতে পারে না তার নামের সঙ্গে "বুড়ো" শব্দটি যুক্ত হতে পারে। ভুল শুনেছে মনে করে এবং তার নামের সঙ্গে যুক্ত নয় নিশ্চিত হয়ে, সে গেয়েই চলে "লা, লা, লা, লা।"

"বুড়ো কিউ!"

"ভুল করে খুন করেছি ......"

"আ কিউ!" সফল পরীক্ষার্থী তার নাম ধরে ডাকতে বাধ্য হয়।

শুধু তার পরেই আ' কিউ থামে। "কি?" একদিকে মাথা কাত করে সে জিজ্ঞেস করে।

"বুড়ো কিউ ...... এখন ......" কিন্তু মিঃ যাও-এর কথা আবার হারিয়ে যায়। "তুমি কি এখন ধনী হচ্ছ?"

"ধনী? নিশ্চয়ই। যা পছন্দ তা নেই ......"

"আ' — কিউ, বুড়ো, আমাদের মত তোমার গরীব বন্ধুদের বোধহয় মূল্য

নেই ......" একটু ভয়ে ভয়েই বলে যাও বাইইয়ান, যেন বিপ্লবীকে বাজিয়ে দেখছে।

"গরীব বন্ধু? আপনি অবশ্যই আমার চেয়ে ধনী" জবাব দিয়ে হেঁটে চলে যায় আ' কিউ।

হতাশ, বাকহীন তারা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। তার পর মিঃ যাও ও তার ছেলে বাড়ীর ভেতর চলে যান এবং সান্ধ্যবাতি জ্বালার সময় না হওয়া পর্যন্ত প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করেন। বাড়ী ফিরে গিয়ে যাও বাইইয়ান কোমর থেকে টাকার থলি বের করে বউয়ের হাতে দেয় এবং বাক্সের তলায় লুকিয়ে রাখতে বলে।

কিছু সময় ধরে আ' কিউ'র মনে হয় সে বাতাসে হাঁটছে। ভূমি দেবতার মন্দিরে পেঁাছুতে পেঁাছুতে সে আবার শান্ত হয়ে আসে। সেই সন্ধ্যায় মন্দিরের বুড়োও অপ্রত্যাশিতভাবে তার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করে এবং তাকে চা খেতে দেয়। তার পর আ' কিউ দুটো কেক দাবী করে এবং এগুলো খাওয়ার পর একটা চার আউন্সের ব্যবহৃত মোমবাতি ও একটি মোমদানি দাবী করে। মোম বাতি জ্বালিয়ে সে একা তার ঘরে শুয়ে থাকে। তার নিজেকে অব্যক্ত সতেজ ও সুখী মনে হয় এবং লণ্ঠন উৎসবের মত মোমবাতি জ্বলতে থাকে, সেই সঙ্গে ভেসে চলে তার কল্পনা :

"বিদ্রোহ? মজা হবে ...... সাদা হ্যালমেট ও শিরস্ত্রাণ পরা একদল বিপ্লবী আসবে, হাতে থাকবে তলোয়ার, লোহার ডাণ্ডা, বোমা, বিদেশী বন্দুক, দু'দিকে ধারওয়ালা ছুরি এবং আংটা লাগানো বর্শা। ভূমি দেবতার মন্দিরে এসে তারা চীৎকার করবে : 'আ' কিউ! আমাদের সঙ্গে আস! আমাদের সঙ্গে আস!' এবং তারপর আমি তাদের সঙ্গে যাব ......

"তখন গ্রামবাসীদের হাস্যকর করুণ অবস্থা হবে, হাঁটু গেড়ে তারা মিনতি করবে : 'আ' কিউ, আমাদের জীবন রক্ষা কর।' কিন্তু কে তাদের কথা শুনবে? প্রথম মারা পড়বে সিয়াও ডি এবং মিঃ যাও, তার পর সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থী এবং 'মেকী বিদেশী শয়তান' ...... কিন্তু বোধহয় কয়েকজনকে রক্ষা করব। একসময় বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াংকে রক্ষা করতাম. কিন্তু এখন তাকে চাই না ......

"জিনিষগুলো ...... সোজা গিয়ে বাক্সগুলো খুলব : রূপোর পাত, বিদেশী মুদ্রা, বিদেশী ক্যালিকো জ্যাকেট ...... প্রথমে সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থীর স্ত্রীর 'নিংবো' বিছানাটি মন্দিরে নিয়ে আসব, এবং ছিয়ান পরিবারের টেবিল, চেয়ারও নিয়ে আসব,—অথবা শুধু যাও পরিবারের গুলো ব্যবহার করব।

নিজে একটা আঙ্গুলও নাড়ব না, কিন্তু সিয়াও ডিকে আদেশ দেব আমার জন্য সেগুলো বহন করতে। সে না চাইলে বাবুগিরি দেখিয়ে চড় মারব ......

"যাও সিছেন এর ছোট বোন খুব কুৎসিত। কয়েক বছরে মিসেস জৌ এর মেয়ে বিবেচনার মত হবে। 'মেকী বিদেশী শয়তানের' বউ বেণী ছাড়া পুরুষের সঙ্গে ঘুমুতে রাজী, হা! সে ভালো মেয়ে মানুষ হতে পারে না! সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থীর বউয়ের চোখের পাতায় কাটা দাগ আছে ...... অনেকদিন আমা উকে দেখি নি, জানি না সে কোথায় আছে — কি করুণ, তার পা জোড়া কত বড়!"

আ' কিউ একটা সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগেই, নাক ডাকার শব্দ হতে থাকে। চার আউন্সের মোমবাতিটি মাত্র আধইঞ্চি পুড়েছে এবং মোমের লাল আলোয় তার হা করা মুখ আলোকিত হয়ে আছে।

মাথা তুলে পাগলের মত চারদিকে তাকিয়ে আ' কিউ হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে "হো, হো!" কিন্তু চার আউন্সের মোমবাতিটি দেখে সে শুয়ে পড়ে এবং আবার ঘুমোতে শুরু করে।

পর দিন ভোরে সে খুব দেরী করে ওঠে, এবং রাস্তায় বেরিয়ে সবকিছু একই রকম দেখতে পায়। সে তখনো ক্ষুধার্ত, কিন্তু মাথা চুলকিয়েও কোন কিছু মনে করতে পারে না। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে, এবং উদ্দেশ্য অথবা উদ্দেশ্যহীনভাবে শান্ত আত্মউন্নতির কনভেণ্টে না পৌঁছা পর্যন্ত ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে।

সেই বসন্তে যেমন ছিল সেই সাদা দেয়াল ও চকচকে কালো দরজার কনভেণ্টটি তেমনি শান্ত। এক মুহূর্ত ভেবে সে দরজায় আঘাত করে, ভেতরে একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। সে তাড়াতাড়ি কিছু ভাঙ্গা ইটের টুকরো তুলে নেয়, তার পর জোরে আঘাত করতে থাকে, দরোজায় কিছু ছোট দাগ না হওয়া পর্যন্ত আঘাত করতেই থাকে। তার পর শুনতে পায় দরজা খোলার জন্য কেউ আসছে।

ভাঙ্গা ইটের টুকরো হাতে আ' কিউ পা জোড়া ফাঁক করে দাঁড়ায়, কালো কুকুরটার সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত। কনভেণ্টের দরজা একটু খোলে, কিন্তু কোন কালো কুকুর বেরিয়ে আসে না। ভেতরে তাকিয়ে সে শুধু বুড়ী সন্ন্যাসিনীকে দেখতে পায়।

চমকে ওঠে সে জিজ্ঞেস করে: "আবার কেন এসেছ?"

আ' কিউ অস্পষ্ট জবাব দেয়, "বিপ্লব হচ্ছে ...... তুমি জান না?"

"বিপ্লব, বিপ্লব ...... একটা'ত হয়ে গেছে।" জবাব দেয় বুড়ী সন্ন্যাসিনী,

কান্নায় তার চোখ লাল "তোমাদের বিপ্লবের ফলে আমাদের অবস্থা কি হবে মনে হয়?"

অবাক হয়ে আ' কিউ জবাব দেয়, "কি?"

"তুমি জান না? বিপ্লবীরা এখানে এসেছিল।"

"কে?" আ' কিউ'র আরো অবাক হবার পালা।

"সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থী এবং 'মেকী বিদেশী শয়তান'।"

ব্যাপারটা আ' কিউ'র কাছে খুব অবাক মনে হয়, সে বোকা বনে যায়। উন্মত্ততা হারিয়ে ফেলেছে দেখে সন্ন্যাসিনী দ্রুত দরোজা বন্ধ করে দেয়, পরে ধাক্কা দিয়ে আ' কিউ একটুও নাড়াতে পারে না। এবং যখন সে আবার আঘাত করে, কোন জবাব আসে না।

এটা সেই সকালে ঘটে। যাও পরিবারের সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থী দ্রুত খবরটা শোনে। আগের রাতে বিপ্লবীরা শহরে প্রবেশ করেছে শোনা মাত্রই বেণী গুটিয়ে সে ছিয়ান পরিবারের 'মেকী বিদেশী শয়তান'-এর সঙ্গে দেখা করতে যায়, যার সঙ্গে তার আগে কখনো সদ্ভাব ছিল না। যেহেতু সবাই মিলে সংস্কারের জন্য কাজ করার এটাই সময়, তাই তারা খুব অন্তরঙ্গ আলাপ করে, কমরেড বনে যায় এবং বিপ্লবী হবার শপথ গ্রহণ করে।

কিছুক্ষণ মাথা ঘামানোর পর তাদের মনে পড়ে শান্ত আত্ম উন্নতির কনভেণ্টে "সম্রাট দীর্ঘজীবী হোক" লেখা একটি রাজকীয় ফলক রয়েছে। তাদের মনে হয় এটা তখুনি সরিয়ে ফেলা উচিত। তার পর বিপ্লবী কার্যক্রম সমাধা করার জন্য কোন সময় নষ্ট না করে তারা কনভেণ্টে যায়। যেহেতু বুড়ী সন্ন্যাসিনী তাদের থামাতে চেষ্টা করে এবং কিছু কথা বলে তাই তারা তাকে ছিং সরকার মনে করে ঘুষি ও লাঠি দিয়ে তার মাথায় অনেকবার আঘাত করে। তারা চলে যাবার পর নিজেকে গুটিয়ে সে একবার পরিদর্শন করে। রাজকীয় ফলকটি স্বভাবতঃই গুড়ো হয়ে মাটিতে পড়ে আছে এবং দয়ার দেবী গুয়ানইন মূর্তির সামনে মূল্যবান স্যুয়ান ডে[11] ধূপদানিও উধাও হয়ে গেছে।

পরে এটা আ' কিউ জানতে পারে। সে সময় ঘুমিয়ে থাকার জন্য তার দুঃখ হয় এবং তারা তাকে ডাকতে আসে নি বলে রাগ হয়। তাব পর নিজে নিজে বলে, "বোধহয় তারা এখনো জানে না আমি বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছি।"

অষ্টম অধ্যায়

বিপ্লব করতে বারণ

দিনে দিনে ওয়েইযুয়াং-এর লোকজন আশ্বস্ত হয়ে ওঠে। খবর শুনে তারা জানতে পারে বিপ্লবীরা শহরে প্রবেশ করলেও, তাদের আগমনে বড়ো রকমের পরিবর্তন হয় নি। ম্যাজিস্ট্রেট এখনো সর্বোচ্চ কর্মচারী, শুধু তার পদবী বদলেছে, সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থীরও একটা পদ মিলেছে। ওয়েইযুয়াং-এর অধিবাসীরা এই নামগুলো পরিষ্কারভাবে মনে রাখতে পারে না — কোন ধরণের সরকারী পদ, এবং সেনাবাহিনীর প্রধান সেই পুরনো ক্যাপ্টেন। শুধু একমাত্র ভয়ের কারণ হচ্ছে তাদের উপস্থিতির পরদিন কিছু খারাপ বিপ্লবী লোকজনের বেণী কেটে গোলমাল সৃষ্টি করেছে। বলা হয় পাশের গ্রামের 'ছি জিন' মাঝি তাদের হাতে পড়েছে এবং তার পর তাকে আর ভালো দেখায় নি। তবু এই বিপদটা মারাত্মক নয়, কেননা শুরুতে ওয়েইযুয়াং-এর গ্রামবাসীরা খুব কমই শহরে যায় এবং যারা শহরে যাবার কথা ভাবছিল, এই বিপদ এড়ানোর জন্য সঙ্গে সঙ্গে মত পাল্টে ফেলে। পুরনো বন্ধুদের খোঁজ করার জন্য আ' কিউ শহরে যাবার কথা ভেবেছিল, কিন্তু খবর শোনা মাত্রই নেতিয়ে যায় এবং চিন্তা ছেড়ে দেয়।

ওয়েইযুয়াং-এ কোন সংস্কার হয় নি বলা ভুল হবে। পরবর্তী কয়েকদিনে মাথার ওপর বেণী পেঁচিয়ে রাখা লোকজনের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ে, এবং স্বভাবতঃই সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থী প্রথমে তা করে। তার পরে যাও সিছেন এবং যাও বাইইয়ান এবং তাদের পরে আ' কিউ। গরম কাল হলে মাথার ওপর বেণী জড়ানো অথবা গিঁট দিয়ে বাধা অদ্ভুত মনে হত না, কিন্তু তখন হেমন্তের শেষ। হেমন্তে গ্রীষ্মের চর্চা হিসেবে যারা বেণী পেঁচিয়েছে, সেটা বীরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত না বললে চলে না। ওয়েইযুয়াং সম্পর্কে যতদূর বলা যায় তাতে এটা সংস্কারের সঙ্গে জড়িত নয় বলা যায় না।

খোলা ঘাড়ে যাও সিছেন এগিয়ে এলে লোকজন মন্তব্য করে, "আহ! একজন বিপ্লবী আসছে!"

এটা শুনে আ' কিউ মুগ্ধ হয়ে যায়। যদিও সে অনেক আগেই শুনেছে কিভাবে সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থী মাথার ওপর বেণী পেঁচিয়েছে, তবু নিজে এটা করার কথা কখনো তার মনে হয় নি। এখন যাও সিছেন এটা করেছে দেখে তার নিজেরও এটা করার ইচ্ছা জাগে। সে তাদের নকল করা ঠিক করে। মাথার

ওপর বেণী পেঁচানোর জন্য সে বাঁশের কাঠি ব্যবহার করে, এবং একটু ইতস্ততঃ করার পর বাইরে যাবার সাহস সঞ্চয় করে।

রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় লোকজন তার দিকে তাকিয়ে দেখে, কিন্তু কেউ কিছু বলে না। আ' কিউ প্রথমে খুব অসন্তুষ্ট হয়, তার পর ক্ষেপে যায়। সম্প্রতি সহজেই তার মেজাজ বিগড়াচ্ছে। বাস্তবে, তার জীবন বিপ্লবের আগের চেয়ে কষ্টকর নয়, লোকজন তাকে সমীহ করে, এবং দোকানপাট আর নগদ টাকা পয়সা দাবী করে না, তবু আ' কিউ অসন্তুষ্ট। তার মনে হয় যেহেতু বিপ্লব হয়েছে, তাই আরো কিছু হওয়া উচিত। সিয়াও ডিকে দেখতে পেয়ে তার মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায়।

সিয়াও ডিও মাথার ওপর বেণী পেঁচিয়েছে এবং এ কাজে সত্যি সত্যি বাঁশের কাঠি ব্যবহার করেছে। আ' কিউ কখনো ভাবে নি সিয়াও ডি'র একাজ করার সাহস হবে। সে এটা সহ্য করতে পারে না। সিয়াও ডি কে? নিজের অবস্থা ভুলে বিপ্লবী হবার সাহস দেখানোর ব্যাপারে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তখনই তাকে ধরে তার বাঁশের কাঠি ভেঙ্গে ফেলতে, তার বেণী নামিয়ে দিতে এবং মুখে বার বার চড় মারতে তার ইচ্ছে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তাকে ছেড়ে দেয়, শুধু রাগত চোখে তাকায়, থুথু দেয় এবং বলে, "বাহ!"

গত কয়েকদিনে একমাত্র 'মেকী বিদেশী শয়তান' শহরে গিয়েছে। জমা করা বাক্সগুলো ছুতা হিসেবে ব্যবহার করে সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থীর সঙ্গে দেখা করার কথা ভেবেছে যাও পরিবারের সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থী, কিন্তু তার বেণী কাটা যাবে ভয়ে সফর স্থগিত রেখেছে। সে ভীষণ আনুষ্ঠানিক একটা চিঠি লেখে এবং তা শহরে নিয়ে যাবার জন্য 'মেকী বিদেশী শয়তানকে' বলে, তাকে 'স্বাধীনতা দলের' কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কথাও বলে। 'মেকী বিদেশী শয়তান' ফিরে এসে সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থীর কাছে চার টাকা দাবী করে এবং তার পর সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থী তার বুকে একটি রূপোর ব্যাজ পরে। ওয়েইযুয়াং-এর গ্রামবাসীরা অতিসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং বলে এটা "গাব তেল দলের"[12] ব্যাজ, হান লিনের[13] মর্যাদার সমান। এতে হঠাৎ করে মিঃ যাও-এর সম্মান খুব বেড়ে যায়, তার ছেলের চেয়েও বেশী — যখন তার ছেলেই প্রথম রাজকীয় পরীক্ষা পাশ করেছে। ফলে সে সবাইকে খাটো করে দেখতে থাকে এবং আ' কিউকে দেখলে একটু উপেক্ষা করার চেষ্টা করে।

প্রতিনিয়ত উপেক্ষার ফলে আ' কিউ সম্পূর্ণ অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে, এবং এই রূপোর ব্যাজের কথা শোনা মাত্র সে বুঝতে পারে কেন তাকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। গিয়েছ, শুধু এটা বলে একজনকে বিপ্লবী বানানো যায় না, মাথার

ওপর বেণী পেঁচানোও যথেষ্ট নয়, সবচে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসা। তার সারা জীবনে সে মাত্র দু'জন বিপ্লবীকে জানে, এদের একজন ইতোমধ্যেই শহরে মাথা হারিয়েছে, অন্যজন 'মেকী বিদেশী শয়তান'। এখনই গিয়ে 'মেকী বিদেশী শয়তানের' সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা না করলে, তার কাছে কোন পথ খোলা থাকবে না।

ছিয়ান পরিবারের দরজা খোলাই ছিল। আ' কিউ চুপি চুপি ঢুকে পড়ে। ভেতরে ঢুকে সে চমকে ওঠে। দেখতে পায় পুরো বিদেশী কালো কাপড় পরনে 'মেকী বিদেশী শয়তান' উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। সন্দেহ নেই বিদেশী পোশাক, এবং সেই রূপোলী ব্যাজও আছে। তার হাতে লাঠি, যার সঙ্গে আ' কিউ পরিচিত, এবং তার গজানো একফুট বা তার চেয়ে বেশী লম্বা চুল ঘাড়ের ওপর, সন্ন্যাসী লিউ হাইর[14] মত এলোমেলো। তার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যাও বাইইয়ান ও আরো তিনজন। সবাই 'মেকী বিদেশী শয়তানের' কথা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছে।

পা টিপে টিপে ভেতরে গিয়ে আ' কিউ যাও বাইইয়ানের পেছনে দাঁড়ায়। স্বাগত জানানোর জন্য কিছু একটা বলতে চায়, কিন্তু জানে না কি বলতে হবে। এটা পরিষ্কার, সে লোকটিকে 'মেকী বিদেশী শয়তান' ডাকতে পারে না, এবং 'বিদেশী' অথবা 'বিপ্লবী' কোনটাই মানানসই মনে হয় না। বোধহয় সবচে ভালো সম্বোধন হবে "মিঃ বিদেশী।"

কিন্তু 'মিঃ বিদেশী' তাকে দেখে নি, কেননা চোখ তুলে গভীর উদ্দীপনার সঙ্গে সে বলে যাচ্ছে :

"আমি এত আবেগপ্রবণ ছিলাম যে দেখা হবার পর বলে চলি, 'বুড়ো হোং, এর সঙ্গে আমাদের তাল মেলাতে হবে!' কিন্তু সে সবসময় জবাব দেয় 'NO!' — সেটা বিদেশী শব্দ যেটা তোমরা বুঝবে না। না হলে অনেক আগেই আমরা সফল হতাম। এতে বোঝা যায় সে কতখানি সতর্ক। হুবেই যাওয়ার জন্য সে বার বার অনুরোধ করে, কিন্তু আমি রাজী হই নি। কে ছোট শহরে কাজ করতে চায়? ......"

"ওহ ...... এটা ....." আ' কিউ তার বিরতির জন্য অপেক্ষা করে, তারপর কথা বলার জন্য সাহস সঞ্চয় করে। কিন্তু কোন না কোন কারণের জন্য সে তাকে 'মিঃ বিদেশী' সম্বোধন করে নি।

চারজন শ্রোতা চমকে ওঠে এবং আ' কিউ'র দিকে অবাক হয়ে তাকায়। 'মিঃ বিদেশীও' প্রথম বারের মত তার দিকে তাকায়: "কি?"

"আমি ......"

"বাইরে যাও।"

"আমি যোগ দিতে চাই ......"

'শোকের লাঠি' তুলে 'মিঃ বিদেশী' বলেন: "বেরিয়ে যাও!"

তার পর যাও বাইইয়ান এবং অন্যেরা চেঁচিয়ে ওঠে: "মিঃ ছিয়ান তোমাকে বেরিয়ে যেতে বলছেন, শুনতে পাও না?"

মাথা বাঁচানোর জন্য আ' কিউ হাত তোলে এবং কি করছে না ভেবেই গেট দিয়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু 'মিঃ বিদেশী' তাকে তাড়া করেন নি। ষাট কদম দৌ-ড়ানোর পর আ' কিউ গতি কমিয়ে দেয় এবং খুব অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। কেননা 'মিঃ বিদেশী' তাকে বিপ্লবী হওয়ার অনুমতি না দিলে তার জন্য অন্য কোন পথ খোলা নেই। ভবিষ্যতে সে কখনো আশা করতে পারে না সাদা হ্যাল-মেট ও শিরস্ত্রাণ পরা লোক তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। এক আঘাতে তার সকল ইচ্ছা, আশা, স্বপ্ন এবং ভবিষ্যৎ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। লোকজন যে খবরটা ছড়াতে পারে এবং সিয়াও ডি ও বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং এর খুশির জন্য তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতে পারে সেটা দ্বিতীয় ব্যাপার।

আগে কখনো সে এতটা খারাপ মনে করে নি। এমন কি মাথার ওপর বেণী পেঁচানোও তার কাছে উদ্দেশ্যহীন এবং হাস্যকর মনে হয়। প্রতিহিংসা হিসেবে তখনই তার বেণী নামাতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সে তা করে না। সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়, তার পর বাকীতে দু'বাটি মদ পান করার পর ভাল বোধ করে এবং মনের আলোয় আবার দেখতে পায় সাদা হ্যালমেট ও শিরস্ত্রাণের টুকরো টুকরো দৃশ্য।

একদিন সে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়। যখন শুঁড়ীখানা বন্ধ হয়ে আসছে শুধু তখনই ভূমিদেবতার মন্দিরের দিকে পা বাড়ায়।

ফটাশ ......!

সে হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক শব্দ শুনতে পায়, যেটা বাজির শব্দ হতে পারে না। যে সবসময় উত্তেজনা পছন্দ করে এবং অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে ভাল-বাসে সেই আ' কিউ অন্ধকারে গোলমালের খোঁজে এগিয়ে যায়। মনে হয় সামনে পদশব্দ শুনতে পাচ্ছে। সতর্কতার সঙ্গে শুনছিল, এমন সময় একজন হঠাৎ তার সামনে দৌড়ে আসে। আ' কিউ তাকে দেখা মাত্রই সে ঘুরে দাঁড়ায় এবং যত দ্রুত সম্ভব চলতে থাকে। যখন সে ঘোরে, আ' কিউও ঘোরে, এবং এক মোড়ে ঘোরার পর লোকটি থেমে যায়, আ' কিউও থামে। সে পেছনে কাউকে দেখতে পায় না, এবং দেখে লোকটি সিয়াও ডি।

রেগে আ' কিউ জিজ্ঞেস করে: "কি ব্যাপার?"

হাঁফাতে হাঁফাতে সিয়াও ডি বলে: "যাও...... যাও বাড়ীতে চুরি হয়েছে।"

আ' কিউ'র বুক ধড়ফড় করে ওঠে। তাকে এটুকু বলেই সিয়াও ডি চলে যায়। আ' কিউ দৌড়ায়, তার পর দু বা তিনবার থামে। যেহেতু একবার সে এই পেশায় ছিল, তাই নিজেকে খুব সাহসী মনে হয়। রাস্তার মোড় থেকে বেরিয়ে সে সতর্কতার সঙ্গে শোনে এবং মনে হয় চীৎকার শুনছে, সেও মনোযোগের সঙ্গে তাকায় এবং মনে হয় দেখতে পাচ্ছে সাদা হ্যালমেট ও শিরস্ত্রাণধারী অসংখ্য লোক, বাক্স, আসবাবপত্র এমনকি সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থীর স্ত্রীর নিংবো বিছানা পর্যন্ত বহন করছে, কিন্তু সে তাদের পরিষ্কার দেখতে পায় না। সে কাছে যেতে চায়, কিন্তু পা যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেছে।

সে রাতে কোন চাঁদ ছিল না। গভীর অন্ধকারে ওয়েইযুয়াং খুব নীরব। প্রাচীন সম্রাট ফু সি'র শান্তিপূর্ণ দিনগুলোর মত নীরব। উৎসাহ না হারানো পর্যন্ত আ' কিউ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে, তবু সব কিছু আগের মতই মনে হয়। দূরে লোকজন চলাচল করছে, জিনিষপত্র, বাক্সপেটরা, আসবাবপত্র, সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থীর স্ত্রীর নিংবো বিছানা বহন করছে...... নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে না পারা পর্যন্ত বহন করছে। কিন্তু সে ঠিক করে কাছে যাবে না এবং মন্দিরে ফিরে যায়।

ভূমি দেবতার মন্দিরে আরো অন্ধকার। বড় দরোজা বন্ধ করে সে তার ঘরে যায় এবং কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর এটা তাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা ভাবার মত শান্ত বোধ করে। সাদা হ্যালমেট ও শিরস্ত্রাণধারী লোকজন নিশ্চয়ই এসেছে কিন্তু তাকে ডাকতে আসে নি, তারা বহু জিনিষ নিয়ে গেছে, কিন্তু তার জন্য কোন ভাগ নেই — সবটাই 'মেকী বিদেশী শয়তানের' দোষ, যে তাকে বিদ্রোহ থেকে বাদ দিয়েছে। অন্যথায় এ সময়ে সে ভাগ থেকে বঞ্চিত হয় কি-ভাবে?

যত ভাবে, আ' কিউ তত রেগে যায়, একসময় সে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। হিংসায় মাথা নাড়তে নাড়তে সে বলে, "তাহলে আমার জন্য বিদ্রোহ নয়, শুধু তোমার জন্য? 'মেকী বিদেশী শয়তান', তোমার নিকুচি করি — ঠিক আছে, বিদ্রোহী বনে যাও! বিদ্রোহীর শাস্তি শিরশ্ছেদ। আমি দালাল বনে যাব, দেখব শিরশ্ছেদের জন্য তোমাকে শহরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, — তুমি এবং তোমার গোটা পরিবার...... খতম কর, খতম কর!"

নবম অধ্যায়

মহা মিলন

যাও পরিবারে চুরি হবার পর ওয়েইযুয়াং-এর অধিকাংশ লোকজন খুশীই হয়, আবার ভয়ও করে, এবং আ' কিউও ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু চারদিন পর হঠাৎ গভীর রাতে আ' কিউ'কে শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। এক স্কোয়াড সৈন্য, এক স্কোয়াড মিলিশিয়া, এক স্কোয়াড পুলিশ এবং পাঁচজন গোয়েন্দা চুপি চুপি ওয়েইযুয়াং প্রবেশ করে এবং প্রবেশপথের উল্টোদিকে মেশিন গান বসিয়ে অন্ধকারে ভূমি দেবতার মন্দির ঘেরাও করে। আ' কিউ ছুটে বেরোয় নি। অনেক-ক্ষণ মন্দিরে কিছুই ঘটে নি। ক্যাপ্টেন অস্থির হয়ে ওঠে এবং নগদ বিশ হাজার পুরস্কার ঘোষণা করে। শুধু তখনই দু'জন মিলিশিয়া সাহসে ভর করে দেয়াল ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। ভেতর থেকে তাদের সহযোগিতায় অন্যেরা ভেতরে ঢোকে এবং আ' কিউ'কে বাইরে নিয়ে আসে। মন্দিরের বাইরে মেশিন গানের কাছে না নেওয়া পর্যন্ত সে সচেতন হয় না।

তারা শহরে পৌঁছুতে পৌঁছুতে দুপুর হয়ে যায়। আ' কিউ দেখতে পায় তাকে একটা জীর্ণ আদালতে নেয়া হয়েছে, যেখানে পাঁচ অথবা ছয়বার পাক খাওয়ার পর তাকে একটি ছোট্ট ঘরে ঠেলে দেয়া হয়। টলতে টলতে কাঠের তৈরী দরজা পেরোতে না পেরোতে তার পেছনে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। ঘরের তিনদিকে সাদা দেয়াল। ভালো করে তাকিয়ে সে ঘরের কোণায় আরো দুজনকে দেখতে পায়।

আ' কিউ একটু অস্বস্তি বোধ করলেও, মোটেও মন খারাপ করে না। সে ভূমি দেবতার মন্দিরে যে ঘরে ঘুমোত তা কোনভাবেই এর চেয়ে ভালো নয়। অন্য দু'জন লোককেও গ্রামবাসী মনে হয়। তারা ধীরে ধীরে তার সঙ্গে আলাপ জমায়। তাদের একজন তাকে বলে যে তার দাদার খাজনার জন্য সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী তাকে শিক্ষা দিতে চেয়েছে, আরেকজন জানে না কেন সে এখানে। যখন তারা আ' কিউ'কে প্রশ্ন করে, সে পরিষ্কার জবাব দেয়, "কারণ আমি বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলাম।"

সে বিকেলে বন্ধ দরোজার বাইরে আ' কিউ'কে এক বিরাট হলঘরে নিয়ে যাওয়া হয়, শেষ প্রান্তে বসে আছে এক ন্যাড়া মাথা বুড়ো। প্রথমে আ' কিউ'র কাছে তাকে সন্ন্যাসী মনে হয়। কিন্তু যখন দেখতে পায় সৈন্যরা গার্ড হিসেবে

দাঁড়িয়ে আছে এবং উভয় পাশে একডজন লম্বাকোট পরিহিত লোক, কারো মাথা এই বুড়োর মত ন্যাড়া, কারো কারো চুল 'মেকী বিদেশী শয়তানের' মত ঘাড়ের ওপর ঝুলে আছে এবং সবাই তার দিকে বিরক্তি সহকারে তাকাচ্ছে, তখন সে বুঝতে পারে সে কোন গুরুত্বপূর্ণ লোক হবে। সঙ্গে সঙ্গে আপনাআপনি তার হাঁটুর জোড়া খুলে যায় এবং সে নতজানু হয়ে পড়ে।

"কথা বলার জন্য উঠে দাঁড়াও! নতজানু হয়ো না" লম্বাকোটের সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে।

বুঝতে পারলেও আ' কিউ দাঁড়ানোর শক্তি পায় না, তার দেহ অনিচ্ছায় উপুড় অবস্থায় চলে গেছে এবং টাল সামলে সে শেষ পর্যন্ত নতজানু হয় :

"দাস! ......" অবজ্ঞাভরে বলে লম্বাকোটের মানুষগুলো। তারা অবশ্য আর দাঁড়ানোর জন্য চাপাচাপি করে না।

আ' কিউ'র ওপর দৃষ্টি রেখে নীচু অথচ পরিষ্কার গলায় ন্যাড়া মাথা বুড়ো বলে :

"সত্য কথা বল, তাহলে কম শাস্তি হবে। আমি সবকিছু জানি। স্বীকার করলে তোমাকে যেতে দেব।"

লম্বাকোটওয়ালা লোকগুলো চীৎকার করে, "স্বীকার কর!"

একমুহূর্তের এলোমেলো চিন্তার পর আ' কিউ বিড়বিড়িয়ে বলে : "সত্য হচ্ছে, আমি চেয়েছিলাম ...... হতে ......"

বুড়ো নরমভাবে জিজ্ঞেস করে : "তাহলে তুমি আস নি কেন?"

" 'মেকী বিদেশী শয়তান' আমাকে আসতে দেবে না।"

"ননসেন্স! এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তোমার সাঙ্গোপাঙ্গরা কোথায়?"

"কি? ......"

"সে রাতে যারা যাও বাড়ীতে চুরি করেছে।"

"তারা আমাকে ডাকতে আসে নি। তারা নিজেরাই জিনিষগুলো সরিয়ে নিয়েছে।" এর উল্লেখ আ' কিউ'কে ক্ষুব্ধ করে তোলে।

"তারা কোথায় গেছে? বললে তোমাকে যেতে দেব।" আরো নরম করে বলে বুড়ো।

"আমি জানি না, তারা আমাকে ডাকতে আসে নি।"

তার পর বুড়োর ইঙ্গিতে আ' কিউ'কে সেই নিষিদ্ধ দরজা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন সকালে আবার তাকে বের করা হয়।

বড় হলঘরের কিছুই বদলায় নি। ন্যাড়া মাথার সেই বুড়ো তখনো সেখানে

বসে আছে এবং আগের মতই আ' কিউ নতজানু হয়।

বুড়ো ধীরে জিজ্ঞেস করে, "তোমার আর কিছু বলার আছে?"

আ' কিউ ভাবে, এবং ঠিক করে আর কিছুই বলার নেই, তাই জবাব দেয়: "কিছুই না।"

তার পর লম্বা কোটের একজন লোক একটি কাগজ ও তুলি নিয়ে এসে আ' কিউ'র সামনে ধরে, সে সেটা তার হাতে গুঁজে দিতে চেয়েছিল। আ' কিউ ভয়ে প্রায় হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল, কেননা জীবনে এই প্রথম তার হাত লেখার তুলির সংস্পর্শে এসেছে। কিভাবে ধরবে সে ভাবছে এমন সময় লোকটি কাগজের এক জায়গা দেখিয়ে তার নাম সই করতে বলে।

লজ্জায়, ভয়ে তুলি ধরে আ' কিউ বলে:

"আমি — আমি — লিখতে পারি না।"

"সে ক্ষেত্রে, সহজ করার জন্য একটা বৃত্ত আঁক।"

আ' কিউ একটা বৃত্ত আঁকার চেষ্টা করে, কিন্তু যে হাতে তুলি ধরেছে তা কাঁপতে থাকে, তাই লোকটি তার জন্যে কাগজটি মাটির ওপর বিছিয়ে দেয়। আ' কিউ নত হয় এবং যেন তার জীবন এর ওপর নির্ভর করছে সেই কষ্টের সঙ্গে একটা বৃত্ত আঁকে। লোকজন হাসবে ভয়ে সে বৃত্তটিকে গোল করা ঠিক করে, কিন্তু সেই তুলিটাই শুধু ভারী ছিল না, এটা তার কথাও শুনবে না। পাল্টা তুলিটি এদিক সেদিক চলতে থাকে। লাইন বন্ধ হবে ঠিক এমন সময় তুলিটি নড়ে গিয়ে একটা তরমুজের বিচির আকাব তৈরী করে।

গোলবৃত্ত আঁকতে না পারার লজ্জায় যখন আ' কিউ লজ্জিত তখন লোকটি কোন কথা ছাড়াই কাগজ এবং তুলিটি নিয়ে গেছে। তৃতীয় বারের মত কিছু লোকজন তাকে ঠেলে দরজা দিয়ে নিয়ে যায়।

এবার সে বিশেষভাবে বিরক্ত বোধ করে না। তার মনে হয় এই পৃথিবীতে কোন না কোন সময়ে এটা প্রত্যেকের ভাগ্য জেলের বাইরে ও ভেতরে আসা-যাওয়া, এবং কাগজে বৃত্ত আঁকা, এবং তার বৃত্তটা গোল হয় নি বলে মনে হয় তার সম্মানে কালি পড়েছে। ভাবতে ভাবতে সে সুস্থির হয়ে ওঠে: "একমাত্র বোকারাই গোলবৃত্ত আঁকতে পারে।" এবং এই ভাবনা নিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

সে রাতে অবশ্য সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী ঘুমোতে যেতে পারে না, কেননা সে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী গোঁ ধরে চোরাই মাল উদ্ধার করাই গুরুত্বপূর্ণ, আর ক্যাপ্টেন বলে জনগণের সামনে উদাহরণ সৃষ্টি করাই গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি ক্যাপ্টেন সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থীর সঙ্গে বেশ অবজ্ঞা ভরে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। সুতরাং টেবিলে ঘুষি মেরে

সে বলে, "একশ জনকে ভয় দেখানোর জন্য একজনকে শাস্তি দেয়া! দেখ, বিশ দিনের কম আমি বিপ্লবী পার্টির সদস্য, কিন্তু চুরির একডজন ঘটনা ঘটেছে, কোনটার এখন পর্যন্ত সমাধান হয় নি, ভেবে দেখ তাতে আমার সম্মানের কত-খানি ক্ষতি হচ্ছে। এখন এটার সমাধান হয়েছে, আর তুমি এসে পণ্ডিতের মত তর্ক করছ। তাতে চলবে না! এটা আমার ব্যাপার!"

সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী খুব বেশী বিপর্যস্ত, কিন্তু সে গোঁ ধরেই আছে। বলে চোরাই মাল উদ্ধার না হলে সে সঙ্গে সঙ্গে সহকারী বেসামরিক প্রশাসকের পদে ইস্তফা দেবে। ক্যাপ্টেন বলে, "আপনার যেমন খুশী।"

পরিণতিতে সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী সেরাতে ঘুমায় নি, কিন্তু পরদিন তার পদত্যাগ পত্রও পেশ করে নি।

যে রাতে সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী ঘুমোতে পারে নি তার পরদিন ভোরে তৃতীয় বারের মত আ' কিউ'কে বন্ধ দরজার বাইরে আনা হয়। বড় হলঘরে পেঁাছে সে দেখতে পায় ন্যাড়া মাথা বুড়ো প্রতিদিনের মত সেখানে বসে আছে। আ'কিউও আগের মতই নতজানু হয়।

খুব ভদ্রভাবে বুড়ো তাকে প্রশ্ন করে, "তোমার আর কিছু বলার আছে?"

আ' কিউ ভাবে এবং ঠিক করে তার কিছু বলার নেই, তাই জবাব দেয়: "কিছুই না।"

লম্বা ও খাটো কোটের একদল লোক তাকে বিদেশী কাপড়ের একটা সাদা ফতুয়া পরিয়ে দেয়। আ' কিউ বেশ হতাশ বোধ করে কেননা এটা শোকের পোশাকের কাছাকাছি এবং শোকের পোশাক পরা দুর্ভাগ্যজনক। একই সময়ে হাত পেছনে বেঁধে তাকে কোর্টের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়।

আ' কিউ'কে একটা খোলা গাড়ীতে তোলা হয় এবং খাটো জ্যাকেটের কিছু লোক তার সঙ্গে বসে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী চলতে শুরু করে। সামনে বেশ কিছু সৈন্য ও মিলিশিয়া, তাদের কাঁধে বিদেশী বন্দুক, এবং উভয় পাশে দর্শক, এবং পেছনে কি আ' কিউ তা দেখতে পায় না। হঠাৎ তার মনে হয় — "আমার শিরশ্ছেদের জন্য কি আমি যাচ্ছি?" তার ভয় ধরে এবং চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে যায়। কানের কাছে একটা গুঞ্জন হতে থাকে যেন সে মূর্ছা যাচ্ছে। কিন্তু সে সত্যি মূর্ছা যায় নি। কিছু সময় তার ভয় করলেও, বাকীটা সময় সে শান্ত থাকে। তার মনে হয় এই পৃথিবীতে কখনো কখনো প্রত্যেকের শিরশ্ছেদ-টাই ভাগ্য।

সে তখনো রাস্তা চিনতে পারছে এবং কিছুটা অবাক লাগে: কেন তারা বধ্যভূমিতে যাচ্ছে না? সে জানত না গণ দৃষ্টান্ত হিসেবে তাকে পথে পথে

ঘোরানো হচ্ছে। কিন্তু সে জানলেও একই অবস্থা হোত, সে হয়ত ভাবত না, এই পৃথিবীতে কোন না কোন সময় গণ দৃষ্টান্ত হওয়া প্রত্যেকের ভাগ্য।

তার পর সে বুঝতে পারে তারা বধ্যভূমিতে যাওয়ার জন্য মোড় নিচ্ছে, তাহলে অবশ্যই তার শিরশ্ছেদ হতে যাচ্ছে। পিপীলিকার মত তার পেছনে আসা লোকজনের দিকে সে দুঃখের সঙ্গে তাকায় এবং অপ্রত্যাশিতভাবে রাস্তার পাশে জনতার ভীড়ে আমা উকে দেখতে পায়। এজন্যেই অনেকদিন তাকে দেখে নি : সে শহরে কাজ করছে।

আ' কিউ হঠাৎ উদ্যমহীনতায় লজ্জা পায়, কেননা সে অপেরা থেকে একটি লাইনও গায় নি। ঘূর্ণির মত তার চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে : «স্বামীর কবরের পাশে যুবতী বিধবা» যথেষ্ট বীরত্বপূর্ণ নয়। «বাঘ ও ড্রাগনের যুদ্ধে» "ভুল করে খুন করেছি" শব্দগুলোও দুর্বল। "লোহার ডাণ্ডা মেরে মাথা গুড়িয়ে দেব" এখনো সবচে সেরা। কিন্তু হাত তুলতে গিয়ে সে বুঝতে পারে সেগুলো বাঁধা, সুতরাং সে "তোমাকে গুড়িয়ে দেব" গায় না।

"বিশ বছরে আমি আরেক হয়ে যাব . . . . . ." উত্তেজনায় আ' কিউ অর্ধেক উচ্চারণ করে যেটা সে নিজে আবিষ্কার করেছে কিন্তু আগে কখনো ব্যবহার করে নি। লোকজনের "ভালো, ভালো!" চীৎকার নেকড়ের চীৎকারের মত শোনায়।

গাড়ী ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে চলে। চীৎকারের সময় আ' কিউ'র চোখ আমা উকে খোঁজে, কিন্তু মনে হয় সে তাকে দেখে নি কেননা সে গভীরভাবে সৈন্যদের বিদেশী রাইফেলগুলো দেখছে।

সুতরাং আ' কিউ আর একবার উল্লসিত জনতার দিকে তাকায়।

সেই মুহূর্তে তার চিন্তা আবার ঘূর্ণির মত ঘুরপাক খেতে থাকে। চার বছর আগে পাহাড়ের পাদদেশে সে এক নেকড়ের দেখা পেয়েছিল, যেটা তাকে খেয়ে ফেলার জন্য নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে অনুসরণ করেছে। ভয়ে মরেই যাচ্ছিল। কিন্তু কপালভালো, হাতে কুড়াল থাকায় সে ওয়েইযুয়াং গ্রামে ফিরে আসতে পেরেছে। সে কখনো নেকড়ের চোখ ভোলে নি, উন্মত্ত অথচ ভীত, দুটো আলেয়ার মতো জ্বলছে, যেন দূর থেকে তাকে ছিদ্র করছে। এখন সে নেকড়ের চেয়ে আরো মারাত্মক চোখ দেখতে পাচ্ছে, মরা অথচ তীক্ষ্ণ, তার কথা খেয়ে ফেলার পর যেন তার রক্ত মাংস ছাড়া আরো কিছু খেয়ে ফেলতে আগ্রহী। এবং এই চোখগুলো তাকে একটা বিশেষ দূরত্ব থেকে অনুসরণ করছে।

মনে হয় এই চোখগুলো এক হয়ে গেছে, তার হৃদয় ছিঁড়ে খাচ্ছে।

"বাঁচাও, বাঁচাও!"

কিন্তু আ' কিউ কখনো শব্দগুলো উচ্চারণ করে নি। তার চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার, কানে গুঞ্জন, মনে হয় পুরো শরীরটা হালকা ধূলোর মত ছড়িয়ে পড়ছে।

চুরির প্রতিক্রিয়া হিসেবে সবচে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী, কেননা চোরাই মালগুলো কখনো উদ্ধার করা হয় নি। তার পুরো পরিবার তিক্তভাবে শোকাহত। তার পরে আসে যাও পরিবার : কেননা সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থী চুরির ব্যাপারটা জানাতে শহরে গেলে খারাপ বিপ্লবীরা শুধু তার বেণী কেটে দেয় নি, পণ হিসেবে তাকে নগদ বিশ হাজার দিতে হয়েছে, সুতরাং যাও পরিবারও খুব তিক্তভাবে শোকাহত। সেই থেকে তারা পরাজিত বংশের টিকে থাকা বংশধরের ভূমিকা গ্রহণ করে।

ঘটনার আলোচনায় ওয়েইযুয়াং-এ কোন প্রশ্ন ওঠে নি। স্বভাবতঃই সবাই স্বীকার করে আ' কিউ খারাপ লোক, প্রমাণ হচ্ছে তার মৃত্যুদণ্ড। খারাপ লোক না হলে তার মৃত্যুদণ্ড হবে কিভাবে? কিন্তু শহরে জনমত ছিল উল্টো। অধিকাংশ লোক অসন্তুষ্ট, কেননা গুলী করে মৃত্যু শিরশ্ছেদের মত সুন্দর দৃশ্য নয় ; এবং সে কি ধরণের হাস্যকর অপরাধী, অপেরা থেকে একটি লাইন না গেয়ে এতগুলো রাস্তা ঘুরেছে। তারা শুধুশুধি তাকে অনুসরণ করেছে।

ডিসেম্বর, ১৯২১

টীকা

1. তিন ধর্ম হল কনফুসীয় মতবাদ, তাওবাদ এবং বৌদ্ধ ধর্ম। কনফুসিয়াস, ত্যাও গুরু, আইনসম্মত গুরু, মোহ গুরু এবং অন্যান্য ধর্মীয় গুরুবা নয়টি স্কুলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

2. হস্তাক্ষত সম্পর্কিত এটি একটি বই, ছিং রাজবংশের ফেং উ লিখিত। এর মধ্যে দশ খণ্ড আছে। "সত্য ঘটনা"-র অর্থ "সঠিক ভাবে শিখিয়ে দেওয়া"।

3. অতীতে, কাগজ আবিষ্কারের আগে লেখার জন্য বাঁশ ফলক এবং সিল্ক ব্যবহার করা হত।

4. ছেন ডুসিউ ছিলেন ‹নতুন যৌবন› পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। পত্রিকায় চীনা ভাষার বদলে পশ্চিমা বর্ণমালা ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়েছিল।

5. প্রাথমিক স্কুলের পাঠ। এর মধ্যে পারিবারিক নাম মিলিয়ে কবিতা লেখা হয় যাতে সহজে পড়া যায়।

6. এই উদ্ধৃতি চিরায়ত গ্রন্থ ‹জুও যুয়ান› থেকে নেয়া। ছু রাজ্যের যুদ্ধমন্ত্রী জি ওয়েন

(পারিবারিক নাম রে আও) তার ছোট ভাই জি লিয়াংকে আদেশ দিয়েছিল ইয়ুয়ে জিয়াওকে (জি লিয়াং-এর পুত্র) হত্যা করতে। কেননা ইয়ুয়ে জিয়াও এর চেহারা বাঘের মত, আর গলার স্বর নেকড়ের গর্জনের মত। তাকে হত্যা না করলে, রে আও ধ্বংস হবে এবং বংশধর না থাকায় তার আত্মাও উপবাসী থাকবে।

7. ডা জি শাং রাজবংশের শেষ রাজার রক্ষিতা। বাও সি পশ্চিমা যৌ রাজবংশের শেষ রাজার রক্ষিতা। ডিয়াও ছান চীনা ঐতিহাসিক উপন্যাস ‹তিন রাজ্যের কাহিনী› -এর একজন নায়িকা। হান রাজবংশের শেষ আমলে ডিয়াও ছান ওয়াং ইয়ুনকে সাহায্য করার জন্য নির্মম ও নিষ্ঠুর মন্ত্রী ডোং য়ুও-এর রক্ষিতা হয়। তারপর ডোং য়ুও এবং ল্যু বু-এর মধ্যে গোলমাল বাধিয়ে দেয়। অবশেষে তার উস্কানিতে ল্যু বু ডোং য়ুওকে খতম করে।

8. কনফুসিয়াস বলেছেন, ত্রিশ বছর বয়সে তিনি "দৃঢ়"। পরে একজন লোকের ত্রিশ বছর বয়স বোঝানোর জন্য এই প্রবাদ ব্যবহার করা হত।

9. শাও সিং-এর স্থানীয় অপেরা ‹ড্রাগন এবং বাঘের সংগ্রাম› -এর একটি বাক্য।

10. ছোং যেং ছিলেন মিং আমলের শেষ সম্রাট (১৬২৮—১৬৪৪)। বিদ্রোহী কৃষক বাহিনীর নেতা লি জিছেং রাজধানী বেইজিং দখলের আগে তিনি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

11. মিং সম্রাট স্যুয়ান ডে'র (খৃঃ ১৪২৬—১৪৩৫) শাসনামলে তামার মহা ধূপদানি তৈরী হয়।

12. "স্বাধীনতা দল" চীনা ভাষায় "জি ইয়ৌ ডাং" উচ্চারণ করা হয়। গ্রামবাসীরা "স্বাধীনতা" -র অর্থ না বুঝার কারণে "জি ইয়ৌ" বদলে "শি ইয়ৌ" বলে যা গাব তেল বোঝায়।

13. ছিং রাজবংশের(১৬৪৪—১৯১১)সর্বোচ্চ সাহিত্য উপাধি ছিল হান লিন।

14. সন্ন্যাসী লিউ হাই ছিলেন চীনের কিংবদন্তিতে একজন অমরাত্মা। তাঁর চুলের এক গুচ্ছ সবসময় কপালের ওপর ঝুলে পড়ে।

গ্রাম্য অপেরা

গত বিশ বছরে মাত্র দু'বার চীনা অপেরা দেখতে গিয়েছি। প্রথম দশ বছরে কখনো যাইনি। ইচ্ছেও হয়নি, সময় সুযোগও হয়নি। গত দশ বছরে মাত্র দু বার গিয়েছি এবং প্রতিবারই কিছু না দেখে চলে এসেছি।

প্রথমবার ১৯১২ সালের কথা। তখন বেইজিং-এ নতুন এসেছি। এক বন্ধু বলে, বেইজিং-এর অপেরা সবচে ভালো এবং এটা দেখার সুযোগ হারানো উচিত নয়। আমার মনে হয়েছিল অপেরা দেখা বিশেষ করে বেইজিং-এ, হয়ত মজার ব্যাপার হবে। তাই তাড়াতাড়ি এক থিয়েটারে যাই। সে থিয়েটারের নাম ভুলে গেছি। অভিনয় শুরু হয়ে গেছে। এমনকি বাইরে থেকে ড্রামের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঠেলাঠেলি করে ঢুকতেই উজ্জ্বল রং-এ চোখে ধাঁধাঁ লেগে যায়, চোখে পড়ে শুধু দর্শকদের মাথা। সারা থিয়েটারে চোখ বুলিয়ে দেখি মাঝখানে কি সীট খালি পড়ে আছে। কষ্ট করে গিয়ে বসতেই কে একজন কিছু বলে ওঠে। কানের ভেতর ঝিঁঝিঁ করছিল। মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয় সে কি বলছে— "দুঃখিত, এই সীটগুলো দখল হয়ে গেছে।"

আমরা পেছনে যাই। তার পর চকচকে বেণীওয়ালা একজন এসে আমাদের পাশে সরিয়ে খালি সীট দেখিয়ে দেয়। একটি বেঞ্চি। আমার উরুর চার ভাগের এক ভাগ চওড়া, কিন্তু পায়ের উচ্চতা আমার পায়ের প্রায় দ্বিগুণ। আমার ওঠার সাহস হয় নি। তারপর মনে হয় এটা শাস্তি দেয়ার যন্ত্র। কাঁপতে কাঁপতে আমি পালিয়ে যাই।

কিছুদূর চলে গিয়েছি। এমন সময় বন্ধুর গলা শুনতে পাই, "কি হয়েছে?" পেছনে তাকিয়ে দেখি সে আমার পিছু পিছু এসেছে। মনে হল খুব অবাক হয়েছে। জানতে চাইল, "কোন কিছু না বলে বেরিয়ে এসেছ কেন?"

আমি বললাম: "আমি দুঃখিত। আমার কানে এমন তালা লেগে গিয়েছিল

যে তোমাকে শুনতে পাইনি।"

এই ঘটনার কথা যখনই ভাবি খুব অবাক লাগে। মনে হয় অপেরাটা হয়ত খুব খারাপ ছিল — অথবা থিয়েটার আমার জন্যে নয়।

দ্বিতীয়বার কখন গিয়েছি সে কথা মনে নেই। কিন্তু হুবেই-এর বন্যাকবলিত-দের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং থান সিনপেই[1] তখনো জীবিত। দু টাকা দিয়ে একটা টিকেট কেনা মানে চাঁদা দেয়া। আর সে টিকেট দিয়ে এক নম্বর থিয়েটারে অপেরা দেখতে যাওয়া যায়। অভিনেতা-অভিনেত্রী সবাই বিখ্যাত, এদের একজন থান সিনপেই। মূলতঃ চাঁদা আদায়কারীদের খুশী করার জন্যই একটি টিকেট কিনি। তার পর সুযোগ বুঝে একজন আমাকে বলে কেন শুধু থান সিনপেই দেখা উচিত। এতে কয়েক বছর আগে কানে তালা লাগার ব্যাপারটা ভুলে থিয়েটারে যাই। আরেকটা ব্যাপার ছিল এত দাম দিয়ে টিকেট কিনেছি যে, না দেখলে খারাপ লাগত। শুনেছি থান সিনপেই শেষের দিকে মঞ্চে আসে এবং এক নম্বর থিয়েটার আধুনিক থিয়েটার বলে সীট নিয়ে ঠেলাঠেলি করতে হয় না। এতে স্বস্তি পাই এবং বেরুনোর আগে রাত নয়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করি। অবাক ব্যাপার। আগের মতই থিয়েটারে লোক ভর্তি। দাঁড়ানোর জায়গা পর্যন্ত নেই। ভিড় ঠেলে পেছনে গিয়ে দাঁড়াই। দেখতে পাই একজন অভিনেতা এক বুড়ীর অভিনয় করছে। তার মুখের প্রত্যেক কোনায় কাগজের পাতলা ছিলকা জ্বলছে এবং পাশে দাঁড়িয়ে আছে 'শয়তানী-সৈন্য'। ভেবে চিন্তে মনে হয় এটা মৌদ্গলয়ানার[2] মা, কেননা তার পরেই আসে এক সন্ন্যাসী। অভিনেতাকে চিনতে না পেরে আমার বাম দিকে দাঁড়ানো এক মোটা ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করি। চোখেব কোনে অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে তিনি জবাব দেন, "গোং ইয়ুনফু"[3]। অজ্ঞতার লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে যায়। মনে মনে ঠিক করি যেভাবেই হোক আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব না। তার পর দেখি নায়িকা ও তার সখী গান গাইছে, তার পরে আসে এক বুড়ো এবং আরো কিছু চরিত্র। কাউকেই চিনতে পারি নি। তার পর দেখি একদল খুশী মত লড়াই করছে, তার পর দু'জন বা তিন জন লড়াই করছে। নয়টা থেকে দশটা, দশটা থেকে এগারোটা, এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটা, সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটা : থান সিনপেই-র কোন চিহ্ন নেই।

জীবনে কোন কিছুর জন্য কখনো এত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করিনি। পাশের ভদ্রলোকের ফোঁস ফোঁসানি, মঞ্চের ওপর ঢং ঢং আওয়াজ, টুং টাং শব্দ, ঢোল-ঘণ্টার শব্দ, উজ্জ্বল রংয়ের মেলা, রাত্রির বিলম্ব — সব কিছু মিলিয়ে মনে হয় এ জায়গা আমার জন্য নয়। যন্ত্রের মত ঘুরে দাঁড়িয়ে সর্বশক্তি দিয়ে বেরিয়ে

যাবার চেষ্টা করি। বুঝতে পারি সঙ্গে সঙ্গে পেছনের জায়গায় লোক এসে যায় — নিঃসন্দেহে সেই মোটা আমার খালি জায়গা দখল করেছে। পেছনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সামনে এগোনো ছাড়া কোন উপায় ছিলনা। ঠেলতে ঠেলতে শেষ পর্যন্ত দরোজার বাইরে চলে যাই। দর্শকদের জন্য অপেক্ষমাণ রিক্সা ছাড়া বাস্তবে বাইরে কেউ ছিল না। গেটের কাছে একদল লোক দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান-সূচী দেখছে। আরেকদল এমনি দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল, অপেরা শেষে বে-রিয়ে আসা মহিলাদের দেখার জন্য তারা দাঁড়িয়ে আছে। থান সিনপেই কোন দেখা নেই।

রাতের মুক্ত বাতাস দেহের ভেতরে নাড়া দিয়ে যায়। মনে হল এই প্রথম-বারের মত বেইজিং-এ এধরণের মুক্ত বাতাস দেখেছি।

সে রাতেই চীনা অপেরাকে বিদায় জানাই। আর কখনো এ নিয়ে ভাবি নি। ঘটনাচক্রে যখনই কোন থিয়েটার পার হয়েছি কিছুই মনে হয়নি। মনে হয়েছে আমাদের অবস্থান দুই মেরুতে।

কয়েকদিন আগে একটি জাপানী বই পড়ার সুযোগ হয়েছিল — দুর্ভাগ্যবশতঃ বইয়ের নাম এবং লেখকের নাম ভুলে গেছি, কিন্তু বইটি চীনা অপেরা নিয়ে লেখা। এক অধ্যায়ে বলা হয়েছে চীনা অপেরার ঢোল-ঘণ্টা, নাচনকোঁদন — চীৎকারের শব্দে দর্শকদের মাথা ঘুরে যায়। এটা থিয়েটারে প্রদর্শনের অনুপ-যোগী। কিন্তু মুক্তাঙ্গনে প্রদর্শিত হলে এবং দূর থেকে দেখলে ভালো লাগে। আমার মনে হল, যে কথা আমার মনে আসেনি তা'ই এখানে বলা হয়েছে। আমার মনে পড়ে গ্রামে দেখা একটি খুব ভালো অপেরার কথা। সম্ভবতঃ এর প্রভাবেই বেইজিং আসার পর দু'বার অপেরা দেখতে গিয়েছি। খারাপ লাগছে, কেন, ঐ বইয়ের নাম ভুলে গেছি।

ঐ ভালো অপেরা যখন দেখেছি, সেটা অনেক অনেক আগের কথা। আমার বয়স বড়জোর এগারো বা বারো বছরের বেশী হবে না। আমাদের শহর লুযেনে একটা প্রথা ছিল। বিবাহিতা মেয়েরা, যারা শ্বশুরবাড়ীতে দায়িত্ব পায়নি, গরমের সময় বাপের বাড়ী ফিরে যেত। আমার দাদী তখনো বেশ শক্তসমর্থ হলেও মা'কে ঘরের কিছু কাজ করতে হত। গরমের দিনে মা নানাবাড়ীতে খুব একটা থাকতে পারতেন না। পূর্বপুরুষদের কবর জেয়ারতের পর মাত্র কয়েকদিন থাকতে পারতেন। সে সময় আমি মায়ের সঙ্গে নানার বাড়ী গিয়ে থাকতাম। সে গ্রামের নাম পিংছিয়াও। সাগর থেকে খুব দূরে নয়। নদীর তীরে বিচ্ছিন্ন একটি ছোট্ট গ্রাম। ছোট্ট একটি মুদীখানা, জেলে-চাষী মিলিয়ে ত্রিশ পরিবারের বাস। আমার চোখে তা ছিল স্বর্গ। কেননা আমাকে শুধু সম্মানিত অতিথি হিসেবেই তারা দেখে

নি, এসময়ে আমাকে গীতিমালার বইও পড়তে হত না।

খেলার সাথী অনেক ছেলেমেয়ে ছিল। অতদূর থেকে বেড়াতে আসায় কাজ কম করে আমার সঙ্গে খেলার জন্য তারা বাবামায়ের কাছ্ থেকে ছুটি পেত। ছোট্ট গ্রামে এক পরিবারের অতিথি আসলে সব পরিবারের অতিথি। আমরা প্রায় সমবয়েসী ছিলাম। বংশের তালিকায় পুরুষদের খোঁজ নিলে দেখা যেত অনেকেই আমার মামা বা মা'র চাচা। কেননা গ্রামের প্রত্যেকের একই পারিবারিক নাম এবং সবাই একই গোষ্ঠীর। কিন্তু আমরা খুব ভালো বন্ধু ছিলাম। তাই কখনো ঝগড়া করে যদি মা'র চাচাকে আঘাত করতাম তাহলে গ্রামের ছেলেবুড়োরা একে "বড়দের অপমান করা" বলত না। একশজনের মধ্যে তাদের ৯৯ জন লিখতে বা পড়তে পারত না।

আমাদের সময় কাটত কেঁচো খুঁড়ে তা বড়শিতে আটকিয়ে বাগদা চিংড়ি ধরার জন্য নদীর তীরে শুয়ে থেকে। বাগদা চিংড়ি সবচে বোকা জলজ প্রাণী। নিজেরাই বড়শি গিলে ফেলে। তাই কয়েকঘণ্টায় আমাদের ঝুড়ি ভরে যেত বাগদা চিংড়িতে। নিয়ম ছিল, সবাই সেগুলো আমাকে দেবে। অন্যসময় হয়ত আমরা মহিষ চরাতে নিয়ে যেতাম। হয়ত একটু উন্নত জাতের বলে, অচেনা লোক দেখে গরু-মহিষ ক্ষেপে যায়। তারা আমার সঙ্গে এমন আচরণ করত যে আমি কখনো তাদের কাছে যাবার সাহস পেতাম না। দূরে দাঁড়িয়ে দেখা বা অনুসরণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। এসময় চিরায়ত কবিতা আবৃত্তির ক্ষমতা দিয়ে আমি ছোট বন্ধুদের মুগ্ধ করতে পারতাম না বরং তারা হেসে কুটোকুটি হয়ে যেত।

আমার মন পড়ে থাকত যাওয়ুয়াং গিয়ে অপেরা দেখার জন্য। দু'মাইল দূরের যাওয়ুয়াং সামান্য বড়ো গ্রাম। অপেরার আয়োজন করার জন্য পিংছিয়াও খুব ছোট্ট গ্রাম ছিল বলে প্রতিবছর যাওয়ুয়াং-এ অপেরার আয়োজনের জন্য কিছু চাঁদা দিত। প্রতিবছর কেন অপেরার আয়োজন করতে হবে এটা জানার জন্য তখন কোন আগ্রহ ছিল না। এখন ভাবলে মনে হয় হয়ত শেষ বসন্ত উৎসব বা গ্রামের উৎসর্গ পূজোর জন্য এটা প্রয়োজন ছিল।

সে বছর যখন বয়স এগারো কি বারো, তখন সেই বহু প্রতীক্ষিত দিনটি আসে। কিন্তু কপাল খারাপ। সে সকালে ভাড়া করার মত নৌকা ছিল না। পিং-ছিয়াও গ্রামে শুধু একটি পাল তোলা নৌকা ছিল। সকালে যেত আর সন্ধ্যায় ফিরে আসত। এটা বড় নৌকা, তাই ভাড়া করার প্রশ্নই ওঠেনা। অন্যগুলো ছিল খুব ছোট, তাই অনুপযোগী। আশেপাশের গ্রামে লোক পাঠিয়েও কোন নৌকা পাওয়া গেল না — সবগুলো ভাড়া হয়ে গেছে। নানীর মেজাজ বিগড়ে

যায়। আগে নৌকা ভাড়া না করার জন্য ভাইবোনদের দোষ দেন এবং খুঁত খুঁত করতে থাকেন। তাঁকে ঠাণ্ডা করার জন্য মা বলেন এসব ছোট্ট গ্রামের অপেরার চেয়ে লুযেন-এর অপেরা অনেক ভালো। প্রতিবছরই কয়েকবার হয়, তাই আজ যাবার দরকার নেই। কিন্তু হতাশায় আমার কেঁদে ফেলার অবস্থা। আমাকে বোঝানোর জন্য মা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। বলেন, আমার এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে নানীর মেজাজ আরো বিগড়ে যায়। আমার অন্যদের সঙ্গেও যাওয়া উচিত নয়, তাহলে নানী চিন্তা করতে থাকবেন।

এক কথায়, সবশেষ। দুপুরের খাওয়ার পর, যখন বন্ধুরা চলে গেছে এবং অপেরা শুরু হয়ে গেছে, আমার মনে হল ঢোল-করতালের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি তারা মঞ্চের সামনে বসে সোয়াবীনের দুধ কিনছে।

সেদিন আমি বাগদা চিংড়ি ধরি নি, বা খুব একটা খাই নি। মা'র মন খুব খারাপ, কিন্তু করার কিছুই ছিলনা। সন্ধ্যায় খাবারের সময় নানী বুঝতে পারেন আমার অবস্থা। বললেন, আমার রাগ হওয়াটা ঠিক, তারা অবহেলা করেছে এবং অতীতে মেহমানদের সঙ্গে কখনো এমন ব্যবহার করা হয়নি। খাওয়ার পর অপেরা থেকে ফিরে আসা ছেলেমেয়েরা আমাদের ঘিরে বসে মনের আনন্দে তা ব্যাখ্যা করে। একমাত্র আমি চুপ; হাই তুলে বলেছে আমার জন্য তারা খুব দুঃখিত। হঠাৎ তাদের মধ্যে সবচে বুদ্ধিমান শুয়াংসীর মাথায় বুদ্ধি খেলে যায়: "বড় নৌকা? আট নম্বর দাদুর নৌকা কি ফিরে আসেনি?" মুহূর্তে আরো কয়েকজন ব্যাপারটা গ্রহণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নৌকা করে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গোঁ ধরে। আমিও খুশী হয়ে উঠি। নানী ভয় পেয়ে যান, আমরা সবাই ছোট এবং নির্ভরযোগ্য নয়। মা বললেন, বয়স্কদের প্রত্যেকে কাল কাজ করবে, তাই আমাদের সঙ্গে তাদের সারা রাত জেগে থাকার কথা বলা ঠিক হবে না। আমাদের ব্যাপারটা ঝুলছে এমন সময় শুয়াংসী প্রশ্নের মানে বুঝতে পেরে বলে: "কথা দিচ্ছি সব ঠিক থাকবে। এটা বড় নৌকা। দাদা স্যুন কখনো লাফালাফি করে না এবং আমরা সবাই সাঁতার জানি।"

সত্যি কথা। বারো জনের মধ্যে এমন কোন ছেলে নেই যে জলে মাছের মত নয়। দু-তিন জন আবার পাকা সাঁতারু।

নানী ও মায়ের সন্দেহ ঘুচে যায়। তারাও আর আপত্তি করে নি। তাদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি।

মনটা হঠাৎ হাল্কা হয়ে যায়। মনে হয় বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছি। বাইরে বেরিয়ে দেখতে পাই ছইওয়ালা নৌকো চাঁদের আলোয় সাঁকোর সঙ্গে নোঙর করা। আমরা নৌকায় লাফিয়ে উঠি। শুয়াংসী ধরে সামনের এবং আফা ধরে পেছ-

নের লগি। অল্পবয়েসীরা আমার সঙ্গে মাঝখানে বসে আর বড়োরা যায় পেছনের দিকে। "সাবধানে যেও" এই কথা বলার জন্য মা বেরিয়ে আসার আগেই আমাদের নৌকো ছেড়ে দিয়েছে। আমরা সাঁকো থেকে কয়েক হাত পেছনে গিয়ে তার পর সাঁকোর নীচ দিয়ে এগিয়ে যাই। চার ছেলে দুটি দাঁড় টানছে। একমাইলের একতৃতীয়াংশ যাবার পর পালা বদল হচ্ছে! কথা, হাসি, চীৎকার সব মিলে যাচ্ছে নদীর কলধ্বনির সঙ্গে। নদীর দু'ধারে মটরশুঁটি আর গমের সবুজ খেত। পাশ কেটে নৌকা উড়ার মত যাওয়ুয়াং-এর দিকে যাচ্ছে।

নদীর ওপর কুয়াশার পর্দা। বাতাসে ভেসে আসছে মটরশুঁটি, গম, জলজ লতার গন্ধ। কুয়াশার অন্ধকার ভেদ করে উঁকি দিচ্ছে চাঁদের আলো। মনে হচ্ছে, দূরে, পালিয়ে যাওয়া বন্যপশুর মত ধূসর পাহাড় আমাদের পাশ কেটে যাচ্ছে। তবু মনে হচ্ছে আমাদের গতি খুব কম। চারবার দাঁড়ের পালা বদলের পর যাও-য়ুয়াং অস্পষ্ট তটরেখা দেখা দেয়। সেই সঙ্গে ভেসে আসে গানের শব্দ। বেশ কিছু বাতিও দেখা যাচ্ছে। মনে হল জেলেদের বাতি না হলে, এগুলো নিশ্চয়ই মঞ্চের ওপর।

আমরা যে শব্দ শুনেছি সেটা সম্ভবতঃ বাঁশীর। বাঁশির সুরে সুরে রাত্রিটাও যেন ছন্দায়িত হয়ে উঠেছে। একটা স্বপ্নের পরিবেশ ; মনে হল মটরশুঁটি, গম আর জলজ লতার গন্ধে ভারী বাতাসের মধ্যে ভেসে বহু দূরে চলে যাচ্ছি।

আলোর কাছাকাছি যেতেই বুঝতে পারি ওগুলো জেলেদের আলো। বুঝতে পারলাম এতক্ষণ যা দেখেছি এটা সেই যাওয়ুয়াং নয়। ঠিক নৌকার সামনেই পাইনের বন। এখানে গত বছর খেলেছি, দেখেছি পড়ে আছে ঘোড়ার পাথুরে মূর্তি, তার পাশেই ঘাসের ওপর বসে আছে পাথুরে ভেড়া। বন পেরিয়ে আমা-দের নৌকো বাঁকঘুরে এক খাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে। আর ঠিক সামনেই ধরা দেয় যাওয়ুযাং গ্রাম।

আমাদের চোখ গ্রামের বাইরে খোলা মাঠে বসানো মঞ্চের ওপর। চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট, আশে পাশের অন্য কিছু থেকে আলাদা করা কষ্টকর। মনে হল ছবিতে দেখা রূপকথার জগৎ এখানে সত্য হয়ে ধরা দিয়েছে। নৌকো এখন দ্রুত চলছে। মঞ্চের ওপর লোকজন এবং চোখ ধাঁধানো আলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মঞ্চের কাছে নোঙর করা ছইওয়ালা নৌকার ফলে নদী কালো হয়ে গেছে।

আফা প্রস্তাব করে, "মঞ্চের কাছে জায়গা নেই। চল আমরা দূর থেকে দেখি।"

নৌকোর গতি কমে গেছে। সহসাই আমরা পৌঁছে যাই। মঞ্চের কাছে

যাওয়া সত্যিই অসম্ভব। মঞ্চের উল্টো দিকে মন্দির থেকে আমাদের নৌকো আরো দূরে নিয়ে যেতে হয়। আমাদের মন খারাপ হয় নি। আমরা চাইনি আমাদের সাদা ছইওয়ালা নৌকো সাধারণ কালো নৌকোর সঙ্গে মিলে যাক, তা ছাড়া আমাদের জন্য জায়গাও ছিল না ......

তাড়াতাড়ি নোঙর করার সময় মঞ্চের উপর আসে লম্বা কালো দাড়িওয়ালা এক লোক। তার পিঠে চারটি পতাকা বাধা। একটি বর্শা দিয়ে সে একদল নিরস্ত্র লোকের সঙ্গে লড়ছে। শুয়াংসী বলে সে খুব বিখ্যাত একরোব্যাট, একটানা ৮৪টি ডিগবাজী খেতে পারে। দিনের বেলা সে নিজে সেটা গুনেছে।

লড়াই দেখার জন্য আমরা নৌকোর সামনের দিকে জড়ো হই, কিন্তু একরোব্যাট একটি ডিগবাজীও খায়নি। নিরস্ত্র কয়েকজন গোড়ালির উপর কয়েকবার মাথা দোলায়, তার পর রণে ভঙ্গ দেয়। তারপর একটি মেয়ে এসে টানা সুরে গান গাইতে থাকে। শুয়াংসী বলে : "সন্ধ্যায় খুব বেশী লোকজন নেই। একরোব্যাটও ব্যাপারটা সহজে নিয়েছে। দর্শক না থাকলে কেউ খেলা দেখাতে চায় না।" ব্যাপারটা বোধগম্য। ততক্ষণে অভিনয় দেখার মত লোকজন আর বেশী নেই। গাঁয়ের লোকজনের পরদিন কাজ আছে, তাই রাত জাগার সুযোগ নেই। তারা ঘুমোতে চলে গেছে। যাওয়ুয়াং এবং আশেপাশের গ্রামের কিছু বেকার লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। স্থানীয় টাকা-পয়সা ওয়ালাদের পরিবার তখনো কালো ছইয়ের নীচে নৌকোর ওপর, কিন্তু অপেরায় তাদের তেমন উৎসাহ নেই। তাদের অনেকেই মঞ্চের কাছে গিয়েছে কেক, ফল অথবা তরমুজের বীজ খাবার জন্য। কাজেই সবমিলিয়ে এদের দর্শক বলা যায় না।

আসলে ডিগবাজীতে আমার খুব একটা আগ্রহ ছিল না। আমি দেখতে চেয়েছিলাম সাদা কাপড়ে জড়ানো সেই সাপের আত্মা যার দু হাত হয়েছে মাথার ওপর, আর সেই হাতে সাপ মাথা লাঠি। দ্বিতীয় পছন্দ হলদে পোশাক পরা বাঘের লাফ। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেও এগুলো আসে নি। মেয়েটির পেছনে পেছনে আসে একবুড়ো, যে যুবকের অভিনয় করছে। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং গুইশেংকে কিছু সোয়াবীন দুধ কিনে দিতে বলি। একটু পরেই ফিরে এসে সে বলে : "নাই। যে বধির লোকটি বিক্রী করে সে চলে গেছে। দিনের বেলা ছিল, তখন আমি দু'বোতল পান করেছি। তোমার জন্য পানি নিয়ে আসছি।"

আমি পানি পান করিনি, যতক্ষণ পারি ঠেকিয়ে রাখি। বলতে পারব না কি দেখেছি, কিন্তু মনে হল অভিনেতাদের চেহারা ধীরে ধীরে অদ্ভুত হয়ে গেছে, চেহারার বৈশিষ্ট্যগুলো মুছে গিয়ে সমতল হয়ে গেছে। অধিকাংশ যুবক হাই

তুলছে এবং বুড়োরা নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। এমন সময় লাল জামা পরা একজন ক্লাউনকে এক পিলারের সঙ্গে বেঁধে এক সাদা দাড়িওয়ালা চাবুক মারতে শুরু করলে আমরা সজাগ হয়ে দেখতে শুরু করি এবং হাসতে থাকি। আমার মনে হয় সেটাই সে সন্ধ্যার সবচে শ্রেষ্ঠ দৃশ্য।

কিন্তু তার পর সেই বুড়ী আসে। এই চরিত্রকে আমার সবচে বড়ো ভয়, বিশেষ করে সে যখন গাইতে বসে। অন্যদের হতাশা দেখে মনে হল আমার মতই তাদের অবস্থা। প্রথমে বুড়ী চলে ফিরে গাইতে থাকে, তারপর মঞ্চের মাঝখানে চেয়ারে বসে পড়ে। আমার অবস্থা কাহিল হয়ে যায়। শুয়াংসী এবং অন্যেরা গালাগালি করতে থাকে। আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকি। অনেকক্ষণ পর বুড়ী তার হাত তোলে। আমার মনে হল সে দাঁড়াবে। কিন্তু আমার আশা সত্ত্বেও, সে নিজের হাত আগের জায়গায় নিয়ে আসে এবং আগের মতই গাইতে থাকে। নৌকোর ভিতর কয়েকজন বালক চীৎকার করতে থাকে এবং অন্যেরা আবার হাই তুলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত শুয়াংসী-এরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। সে বলে, তার ভয় হয় বুড়ী ভোর পর্যন্ত গাইবে। আমাদের বরং চলে যাওয়া ভালো। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যাই এবং বেরুনোব সময়কার উৎসাহ ফিরে আসে। তিন অথবা চারজন নৌকোর মাথার দিকে যায়, গলুই ধরে নৌকো ঘুরায়। বুড়ী গায়িকাকে গাল দিতে দিতে তারা দাঁড় ধরে পাইন বনের দিকে চলতে শুরু করে।

চাঁদের অবস্থা থেকে বোঝা যায়, আমরা খুব একটা দেখি নি। এবং যাওয়ুয়াং ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল মনে হয়। লণ্ঠন-জ্বালা মঞ্চের দিকে ফিরে তাকাতেই মনে হয় আগের মতই আছে, রূপকথার মঞ্চের মত অস্পষ্ট, গোলাপী কুয়াশায় ঢাকা। আবার বাঁশীর সুরেলা শব্দ কানে ভেসে আসে। আমার মনে হল, বুড়ীর গান নিশ্চয়ই শেষ, কিন্তু আবার দেখার জন্য যেতে বলার ইচ্ছে হয় না।

সহসাই পাইন বন পেছনে চলে যায়। নৌকো বেশ দ্রুত চলছে। কিন্তু চারিদিকে এত গভীর অন্ধকার যে, বলা যায় বেশ রাত হয়েছে। তারা অভিনেতাদের নিয়ে গল্প বলা, হাসাহাসি বা গালাগালি করার সময় দাঁড়বাহীরা জোরে দাঁড় টানতে থাকে। নৌকোর সঙ্গে জলের শব্দ এখন আরো পরিষ্কার। নৌকাটাকে মনে হচ্ছে পিঠে একদল ছেলে নিয়ে ফেনার ভেতর ভেসে যাওয়া বিরাট সাদা মাছ। সারা রাত মাছ ধরায় ব্যস্ত কিছু জেলে তাদের ডিঙ্গি থামিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে।

পিংছিয়াও তখনো একতৃতীয়াংশ মাইল দূরে। আমাদের নৌকোর গতি

কমে আসে। দাঁড়বাহীরা জানায় এতক্ষণ দাঁড় টেনে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ আমাদের কোন খাওয়া জোটে নি। হঠাৎ শুইশেংর মাথায় এক চমৎকার বুদ্ধি খেলে যায়। সে বলে লুওহান মটরশুঁটিগুলো পেকে গেছে, নৌকায়ও সামান্য জ্বালানী কাঠ রয়েছে। তাই মটরশুঁটি রান্না করা যেতে পারে। সবাই রাজী হয়ে যায় এবং আমরা তীরের দিকে রওনা হই। নিকষ অন্ধকারে ঢাকা মাঠে শুধু মটরশুঁটি আর মটরশুঁটি।

সবার আগে তীরে লাফিয়ে নেমে শুয়াংসী চীৎকার করতে থাকে, "হে, আফা! এখানে তোমাদের ক্ষেত। ওখানে বুড়ো লিউইর ক্ষেত। আমরা কোন-খান থেকে নেব?"

আমরা সবাই তীরে লাফিয়ে নামতে আফা বলে: "এক মিনিট, আমি একটু দেখে নেই" মটরশুঁটি দেখার জন্য সে একটু ঘোরাঘুরি করে, তার পর সোজা হয়ে বলে: "আমাদের গুলোই নাও, ওগুলো বেশ বড়।" চীৎকার দিয়ে আমরা সবাই আফা পরিবারের ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ি। সবাই গোছা গোছা মটরশুঁটি নিয়ে নৌকায় ছুড়ে মারে। শুয়াংসী ভাবে আরো নিলে এবং আফার মা জানতে পারলে বিপদ হবে। তাই সবাই বুড়ো লিউইর ক্ষেতে যাই আরো কিছু মটরশুঁটির জন্যে।

তার পর আর একদল ছেলে দাঁড় বাইতে শুরু করে। অন্যেরা নৌকোর মাথার কাছে চুলো জ্বালায়। আমি এবং আরো কয়েকজন মটরশুঁটি ভাঙতে থাকি। রান্না হয়ে গেলে নৌকোর হাল ছেড়ে দেই। সবাই মিলে মটরশুঁটি খেতে লেগে যাই। খাওয়া শেষে পাতিল ধুয়ে ফেলি, মটরশুঁটির দানা, খোসা নদীতে ছুড়ে ফেলি, যাতে কোন চিহ্ন না থাকে। শুয়াংসী খচ্খচ্ করতে থাকে। আমরা আট নম্বর দাদুর নৌকোর কাঠ-নুন খরচ করে ফেলেছি। বুড়ো এত সজাগ যে ব্যাপারটা ধরে ফেলবে এবং আমাদের গাল দেবে। কিন্তু কিছু কথা-বার্তার পর ঠিক হলো আমাদের ভয়ের কিছুই নেই। সে আমাদের গাল দিলে আমরা তাকে গত বছর নদীর তীব থেকে নেয়া পাইন ফিরিয়ে দিতে বলব এবং তার মুখের উপর বলব "বুড়োশয়তান।"

নৌকার দিক থেকে হঠাৎ শুয়াংসীর গলা ভেসে আসে, "আমরা ফিরে এসেছি। কোন কিছুই হয় নি। আমি বলি নি, সব ঠিক থাকবে?"

তার মাথার উপর দিয়ে তাকিয়ে দেখি আমরা পিংছিয়াও পেঁৗছে গেছি। সাঁকোর কাছে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে — আমার মা। শুয়াংসী মা'র উদ্দেশ্যেই ওসব কথা বলেছে। ঘাটের কাছে যাবার সময় নৌকাটি সাঁকোর নীচ দিয়ে গিয়ে থেমে যায়, তার পর আমরা সবাই তীরে নেমে যাই। মা একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

জানতে চান কেন এত দেরী হল — মাঝ রাত পার হয়ে গেছে। কিন্তু সহসাই তাঁর মুখে হাসি ফিরে আসে এবং তিনি সবাইকে সেদ্ধ ভাত খাওয়াব আমন্ত্রণ জানান।

তারা জানায় আমরা সবাই কিছু খেয়েছি এবং আমাদের ঘুম পাচ্ছে। তাই ঘুমুতে যাওয়াই ভালো এবং সবাই যার যার বাড়ী চলে যায়।

পরদিন দুপুর পর্যন্ত আমি ঘুম থেকে উঠিনি। আট নম্বর দাদুও কাঠ-নুন নিয়ে কোন ঝামেলা বাধান নি। বিকেলে আগের মতই আমরা বাগদা চিংড়ি ধরতে যাই।

"এই ছোট্ট রাসকেল, শুয়াংসী, তুমি কাল আমার মটরশুঁটি চুরি করেছ। তুমি ঠিকমত সেগুলো তোল নি, কিছু পায়ে দলেছ।" তাকিয়ে দেখি মটরশুঁটি বিক্রি করে ডোঙ্গা করে ফিরে আসছে বুড়ো লিউই। ডোঙ্গার তলায় তখনো বেশ কিছু মটরশুঁটি পড়ে আছে।

শুয়াংসী বলে : "হ্যাঁ, আমরা একজন মেহমানকে খাইয়েছি। আমরা তোমার গুলো দিয়ে শুরু করতে চাইনি। দেখ, তুমি আমার বাগদা চিংড়িগুলোকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ।"

আমাকে দেখতে পেয়ে ডোঙা থামিয়ে বুড়ো মুখ টিপে হাসে, "মেহমান? তোমাদের তাই করা উচিত।" তার পর সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, "কালকের অপেরা কি ভালো ছিল?"

আমি সায় দেই, "হ্যাঁ।"

"মটরশুঁটি ভালো লেগেছে?"

আমি আবার সায় দেই, "খুব ভালো।"

আমাকে অবাক করে বুড়ো খুব খুশী হয়ে যায়। আঙ্গুল উল্টে সে তৃপ্তির সঙ্গে বলতে থাকে, "শহরে যারা পড়াশোনা করেছে তারা আসলে জানে কোনটা ভাল। আমি একটি একটি করে মটরশুঁটির বীজ বাছাই করি। গাঁয়ের লোকজন ভালো-মন্দ বিচার করতে পারে না এবং বলে আমার মটরশুঁটি অন্যদের চেয়ে খারাপ। আজ তোমার মা'কে কিছু দেব যাচাই করে দেখার জন্য......" তার পর সে ডোঙা নিয়ে চলে যায়।

সন্ধ্যার খাবারের জন্য মা বাড়ীতে ডাকলে দেখতে পাই টেবিলের ওপর এক বিরাট বাটি ভর্তি সেদ্ধ মটরশুঁটি। আমার এবং মায়ের খাওয়ার জন্য বুড়ো লিউ-ই সেগুলো এনেছে। আমি শুনতে পাই মায়ের কাছে সে আমার খুব প্রশংসা করেছে, "সে এত ছোট, তবু জানে কোনটা কি। ভবিষ্যতে সে সব পরীক্ষা পাস করবে। তোমার কপাল ভালো।" কিন্তু মটরশুঁটি খেতে গিয়ে দেখি গত

রাতের মত এত মজা লাগছে না।

আজ পর্যন্ত, সত্যি বলতে কি সে রাতের মত এত মজার মটরশুঁটি কখনো খাই নি বা এত ভালো অপেরা কখনো দেখি নি।

অক্টোবর, ১৯২২

টীকা

1. আর এক নাম থান জিয়াওথিয়ান। তিনি বেইজিং অপেরার বিখ্যাত অভিনেতা।

2. মৌদ্গলয়ানা গৌতম বুদ্ধের শিষ্য ছিলেন। কথিত আছে পাপের অপরাধে তাঁর মা নরকবাসী হয় এবং তিনি তাঁকে উদ্ধার করেন।

3. বেইজিং অপেরার অন্য এক নামকরা অভিনেতা—বুড়ী চরিত্রে অভিনয় করতেন।

নববর্ষে আত্মদান

পুরনো ক্যালেণ্ডারের নববর্ষের পূর্বসন্ধ্যা নতুন ক্যালেণ্ডারের নববর্ষের পূর্বসন্ধ্যার মতই। গ্রাম-গঞ্জের কথা বাদই দিলাম, এমনকি বাতাসেও নববর্ষের আমেজ এসে যায়। সন্ধ্যায় নেমে আসা ধূসর মেঘে ঘনঘন বিজলীর চমক, দেবতাকে বিদায় জানানোর বাজির শব্দ। আশেপাশে সশব্দে পটকা ফোটে, এবং সে শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই বাতাস ভরে যায় বারুদের গন্ধে। এমনি এক রাতে আমি ফিরে আসি আমার গ্রাম, লুযেনে। নিজের গ্রাম হলেও, বেশ কিছু দিন সেখানে আমার কোন বাড়ীঘর ছিল না। তাই এক পরিবারের চার নম্বর ছেলে লু সাহেবের সঙ্গে আপাততঃ থাকতে হয়। তিনি আমাদের একই গোষ্ঠীর এবং আমার পূর্ব জেনারেশনের। তাই তাঁকে চার নম্বর চাচা ডাকতাম। রাজকীয় কলেজের[1] পুরনো ছাত্র এবং নয়া-কনফুসীয় মতবাদে বিশ্বাসী হলেও, তাঁর মাঝে আমি সামান্যই পরিবর্তন দেখেছি। শুধু বয়সে সামান্য বড়, কিন্তু গোঁফ পর্যন্ত নেই। দেখা হওয়ার পর, সামান্য শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর তিনি বললেন আমি মুটিয়ে গেছি। তারপর পরই সংস্কারকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান। আমি জানতাম এটা আমার বিরুদ্ধে নয়, তখনো এই আক্রমণের লক্ষ্য খাং ইয়ৌওয়েই[2]। তবু কথাবার্তা ঠেকে যায়, এবং সহসাই বসার ঘরে আমি একা হয়ে পড়ি।

পরদিন খুব দেরী করে ঘুম থেকে উঠি এবং দুপুরের খাওয়ার পর কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তার পরদিনও একই কাজ করি। তাদের কেউই খুব একটা বদলায় নি, সামান্য বুড়িয়ে গেছে। কিন্তু প্রতিটি পরিবারই "ভোগের" আয়োজনে ব্যস্ত। এটাই লুযেনের বর্ষশেষের সবচে বড়ো উৎসব, যখন লোকজন শ্রদ্ধার সঙ্গে সৌভাগ্য দেবতাকে স্বাগত জানায় এবং নববর্ষের জন্য সৌভাগ্য কামনা করে। তারা হাঁস-মুরগী জবাই করে, শূয়রের মাংস কেনে। পানিতে মেয়েদের হাত লাল না হওয়া পর্যন্ত ধোয়া-মোছা, মাজা-ঘষার কাজ

চলতে থাকে। তাদের কেউ কেউ আবার রূপোলী ব্রেসলেট পরে। মাংস রান্না হয়ে গেলে তার মাঝে এলোমেলোভাবে কিছু কাঠি গুঁজে দেয়া হয়। এটাকেই "ভোগ" বলে। ধূপের শিখা এবং মোমের আলোয় ভোরবেলা এই ভোগ পরিবেশন করা হয়। তার পর তারা সৌভাগ্য দেবতার কাছে মিনতি জানায় এই ভোগ গ্রহণের। শুধু পুরুষরাই পূজারী হতে পারে। ভোগের পর আবার আগের মতই ফুটতে থাকে পটকা। প্রতিবছর, প্রতিপরিবারে এই ঘটনা ঘটে যদি তারা ভোগের সামগ্রী এবং পটকা কিনতে পারে। এ বছরও তারা পুরনো রীতি মেনে চলেছে।

দিনটা ঘোলাটে হয়ে আসে। বিকেলের মধ্যে সত্যি সত্যি বরফ পড়তে শুরু করে। প্লাম-ফুলের পাপড়ির মত বড় একেকটা তুষার-কণা আকাশে ছুটোছুটি করছে। আয়োজনের চাঞ্চল্যে গোটা লুযেন যেন জেগে উঠেছে। চাচার পড়ার ঘরে যখন ফিরে আসি তখন বাড়ীর ছাদ সাদা বরফে ঢেকে গেছে। কামরাটা অনেক উজ্জ্বল মনে হল। দেয়ালে ঝুলছে তাও ধর্মযাজক ছেন থুয়ান[3] এর লেখা "দীর্ঘজীবী" অক্ষরওয়ালা স্ক্রোল। একজোড়া স্ক্রোলের একটি খুলে গিয়ে লম্বা টেবিলের ওপর পড়ে আছে। অন্যটি তখনো দেয়ালে ঝুলছে। তাতে লেখা : "যুক্তি দিয়ে আমরা মনের শান্তি পাই।" জানালার নিচের টেবিলে রাখা বইগুলি আমি আনমনে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম, কিন্তু সেখানে "খাংসী-র অভিধানের[4] " একটি অসম্পূর্ণ সেট, জিয়াং ইয়োং-এর "যু সীর দার্শনিক রচনাবলীর টীকা"-র এক খণ্ড, "চার মহাগ্রন্থের টীকা[5] "-র এক খণ্ড প্রভৃতি এক রাশ বই পেলাম দেখতে। যাই ঘটুক না কেন, কালই চ'লে যাবো ব'লে আমি মন স্থির করলাম।

তাছাড়া, গতকাল সিয়াংলিনের বউয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার ব্যাপারটি অস্বস্তিতে ফেলেছে। বিকেলে তা ঘটে। শহরের পূব এলাকায় এক বন্ধুর কাছে গিয়েছি। বেরিয়ে আসার সময় নদী তীরে তার সঙ্গে দেখা। যে ভাবে আমার দিকে তাকিয়েছে তাতে বুঝতে পারি সে কিছু একটা বলতে চায়। লুযেনে যত লোকের সঙ্গে এবার দেখা হয়েছে কেউ তার মত এত খানি বদলে যায় নি। পাঁচ বছর আগে তার যে চুলে পাক ধরেছিল, এখন তা পুরোপুরি সাদা হয়ে গেছে, চল্লিশের কোঠায় এটা অস্বাভাবিক। মুখ শুকিয়ে হলদে হয়ে গেছে, বেদনার সেই ছাপ আর নেই। দেখে মনে হয় যেন কাঠ খোদাই করা। মাঝে মাঝে চোখের পলক পড়লে বোঝা যায় দেহে এখনো প্রাণ আছে। তার একহাতে ঝুড়ি, তাতে ভাঙ্গা একটি বাটি, আর এক হাতে তার'চে লম্বা বাঁশের খুঁটি, নীচের দিকটা ফাটা। এটা পরিষ্কার : সে ভিখারিণী হয়ে গেছে।



এটা পরিষ্কার : সে ভিখারিণী হয়ে গেছে।

এসে কিছু পয়সা চাইবে এজন্যে আমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি।

সে প্রথমে জিজ্ঞেস করে, "আপনি ফিরে এসেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"খুব ভালো কথা। আপনি লেখাপড়া জানেন, অনেক ঘুরেছেন, অনেক দেখেছেন। আমি আপানাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই।" তার দীপ্তিহীন চোখে হঠাৎ দীপ্তি ফিরে আসে।

কখনো ভাবি নি সে এভাবে কথা বলবে। অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি।

সে দু'পা এগিয়ে আসে। তারপর গোপনে ফিসফিসিয়ে বলে: "ব্যাপারটা হচ্ছে মরণের পর কেউ কি ভূত হয়ে যায়?"

আমার ওপর চোখ রাখতেই একটা অমঙ্গলের ইঙ্গিত দেখতে পাই। স্কুলে অপ্রত্যাশিত পরীক্ষার সময় শিক্ষক পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে যে অবস্থা হয় আমি তার চেয়েও একটা ভীতিকর অবস্থায় পড়ে যাই, মেরুদণ্ডের ভেতর কাঁপুনি ধরে যায়। ব্যক্তিগতভাবে আমি কখনো আত্মার অস্তিত্বের বিষয়টি ভেবে দেখি নি। এখন তাকে কেমন করে জবাব দেব? একটু ইতস্তত: করে আমার মনে হল, এখনকার ঐতিহ্য হচ্ছে আত্মা বিশ্বাস করা, তবু তাকে সন্দেহবাদী মনে হচ্ছে—সম্ভবত: সে আশা করে এটা বলা সঙ্গত হবে, আশা হয়ত অমরত্ব আছে, হয়ত নেই। দুর্দশাগ্রস্তদের দু:খ বাড়িয়ে কি লাভ? একটা অবলম্বনের জন্য আত্মা আছে এটা বলাই বোধ হয় ভাল।

একটু ইতস্তত: করে তাকে বলি: "আমার মনে হয় হয়ত আছে।"

"তাহলে'ত নরকও থাকবে?"

"কি, নরক?" চমকে উঠে শুধু প্রশ্নটি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কবি, "নরক? যুক্তি হিসেবে থাকা উচিত—কিন্তু প্রয়োজন হিসেবে নয়। এ নিয়ে কে মাথা ঘামায়? ......"

"তাহলে এক পরিবারের যারা মারা গিয়েছে তাদের কি একে অপরের সঙ্গে আবার দেখা হবে?"

"একে অপরের সঙ্গে দেখা হবে কি না ......" বুঝতে পারি আমি একটা বোকা। সকল দ্বিধা ও চিন্তা সত্ত্বেও আমি তার তিনটি প্রশ্নের জবাব দিতে ব্যর্থ হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলি এবং আগে যা ভেবেছি ঠিক তার উল্টোটা বলতে ইচ্ছে করে, "এ ক্ষেত্রে ...... বলতে কি, আমি নিশ্চিত নই ...... বাস্তবে, ভূতের ব্যাপারটি নিয়েও আমি খুব একটা নিশ্চিত নই।"

আরো কিছু উত্ত্যক্তকর প্রশ্ন এড়ানোর জন্য সরে যাই। অস্বস্তি বোধ করতে

করতে দ্রুত চাচার বাড়ী ফিরে আসি। মনে ভয় ধরে, "আমার জবাব তার জন্যে বিপজ্জনক হবে। হয়ত যখন সবাই আনন্দে মেতে উঠেছে, সে খুব একা বোধ করছে, এ ছাড়া আর কি কোন কারণ থাকতে পারে? তার কি কোন পূর্বাশংকা আছে? যদি অন্য কোন কারণ থাকে, এবং কিছু ঘটে, তাহলে আমার জবাবের জন্য আমি কিছুটা দায়ী হব।" শেষ পর্যন্ত নিজে নিজে হেসে উঠি, মনে হয় এ সব কাকতালীয় ব্যাপারের কোন গুরুত্ব নেই, তবু তা মনে গেঁথে রেখেছি; হয়ত এজন্যেই কোন কোন শিক্ষাবিদ আমাকে পাগল বলে। তাছাড়া আগের জবাব পাল্টে আমি পরিষ্কার বলেছি: "আমি নিশ্চিত নই।" তাই যদি কিছু ঘটেও, আমার করার কিছুই থাকবে না।

"আমি নিশ্চিত নই" এটা খুব উপযোগী কথা।

অনভিজ্ঞ এবং হঠকারী যুবকরা প্রায়ই অন্যের সমস্যা নিজের মাথায় তুলে নেয়, অথবা ডাক্তার বাছাই করে, যদি কোন কারণে কিছু উল্টো ঘটে তাহলে হয়ত তাদের দায়ী করা হয়। কিন্তু 'আমি নিশ্চিত নই' একথা বলে একজন সব দায়দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে। এ সময়ে এরকম একটি কথার প্রয়োজনীয়তা আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করি, এমনকি ভিখারিণীর সঙ্গে কথা বলার সময়ও এ ব্যাপারে মাফ নেই।

তবু মনটা খচ্ খচ্ করতে থাকে। এমনকি একরাতের বিশ্রামের পরও ব্যাপারটা মনে গেঁথে থাকে, যেন কোন অস্বাভাবিক ঘটনার পূর্বাশঙ্কা পেয়ে বসেছে। সেই পীড়াদায়ক বরফ আবহাওয়ায়, অন্ধকার পড়ার ঘরে এই অস্বস্তি বেড়েই চলে। চলে যাওয়াই ভালো হবে, কাল আমার শহরে ফিরে যাওয়া উচিত। ফু সিং রেস্তোরায় এক থালা সেদ্ধ হাঙ্গরের ডানার দাম ছিল ১ টাকা। ভাবছি সেই সস্তা ও সুস্বাদু খাবারের দাম বেড়েছে কিনা। যদিও পুরনো সাথীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে, যদিও আমি একা, তবু হাঙ্গরের ডানার স্বাদ নেয়া উচিত। যে ভাবেই হোক, পরদিন চলে যাবার জন্য আমি মন ঠিক করে ফেলি।

আমার জীবনে বহুবার এমন ঘটেছে। যা ভেবেছি ঘটবে তা ঘটে নি, যা ভেবেছি ঘটবে না তাই ঘটেছে। আমার খুব ভয় হয়ত আবার তেমনি কিছু হবে। এবং সত্যি সত্যি অদ্ভুত জিনিষ ঘটতে শুরু করে। সন্ধ্যার দিকে ভেতরের ঘরে আলোচনার মত কথা শুনতে পাই—সহসা কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু শুনতে পাই বেরিয়ে যাবার সময় চাচার চড়াগলা, "আগেও নয়, পরেও নয়, ঠিক এসময়ে—খারাপ চরিত্রের লক্ষণ।"

প্রথমে অবাক, তার পর খুব অস্বস্তি বোধ করি। মনে হয় এ সব কথা আমাকেই উদ্দেশ্য করে বলা। দরজার বাইরে তাকিয়ে দেখি, সেখানে কেউ নেই। সান্ধ্য

খাবারের আগে চা বানানোর জন্য চাকর ছেলেটা আসা পর্যন্ত খুব অস্বস্তির ভেতর কেটে যায়। শেষ পর্যন্ত কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ পাই।

জিজ্ঞেস করি: "এই মাত্র লু সাহেব কার সঙ্গে মেজাজ দেখিয়েছেন?"

"কেন. সিয়াংলিনের বউয়ের সঙ্গে।" সে সংক্ষেপে জবাব দেয়।

আবার জিজ্ঞেস করি: "সিয়াংলিনের বউ? কি হয়েছে?"

"সে মারা গেছে।"

"মারা গেছে?" হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে আসে। চমকে উঠি, হয়ত রংও বদলে যায়। কিন্তু যেহেতু সে মুখ তোলে নি, তাই আমার অনুভূতি বুঝতে পারেনি। নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করি:

"সে কখন মরেছে?"

"কখন? কাল রাতে বা আজকে, আমি নিশ্চিত নই।"

"কেমন করে মরেছে?"

"কেমন করে মরেছে? কেন, দারিদ্রের কারণে।" সে শান্তভাবে জবাব দেয় এবং মাথা তুলে আমার দিকে না তাকিয়েই চলে যায়।

যাহোক, আমার উত্তেজনা খুব একটা স্থায়ী হয় নি। অবশ্যম্ভাবী যা ভেবেছি তা ঘটেছে। "আমি নিশ্চিত নই" আমাকে আর একথার আশ্রয় নিতে হবে না অথবা "দারিদ্রের কারণে" চাকর ছেলেটার এই উক্তিতে স্বস্তি পেতে হবে না। মনটাও হাল্কা হয়ে গেছে। শুধু মাঝে মাঝে কিছু একটা ভারী মনে হচ্ছে। খাওয়ার টেবিলে চাচা গম্ভীরভাবে আমাব সঙ্গে খেতে বসেন। সিয়াংলিনের বউ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম। "ভূত-প্রেত প্রকৃতির সম্পদ"[৩] যদিও তিনি এ কথা পড়েছেন তবু জানি তিনি অনেক কুসংস্কারে বিশ্বাসী এবং এই ভোগের আগে মৃত্যু অথবা অসুস্থতার কথা বলার কোন প্রশ্নই ওঠে না। প্রয়োজন হলে কেউ রেখে ঢেকে ঘুরিয়ে বলতে পারে। কিন্তু কেমন করে করতে হয় জানি না বলে, জিহ্বার কাছে প্রশ্ন আসতে থাকলেও তা আটকে রাখতে হয়। তার গম্ভীর চেহারা দেখে হঠাৎ সন্দেহ হয়, আগেও নয়, পরেও নয়, কিন্তু ঠিক এ সময়ে তাকে বিরক্ত করার জন্য তিনি আমাকে খারাপ চোখে দেখছেন, এবং আমিও বাজে লোক। তাই তার মনকে শান্ত করার জন্য তখনি বলি যে কাল লুযেন ছেড়ে শহরে ফিরে যেতে চাই। তিনিও আর থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন না। চুপচাপ আমরা খাওয়া শেষ করি।

শীতকালে এমনিতে দিন ছোট। এখন বরফ পড়ছে বলে গোটা শহরটা অন্ধকারে ঢেকে গেছে। বাতির আলোর নীচে সবাই ব্যস্ত, কিন্তু জানালার বাইরে সব নীরব। জমা বরফের ওপর নতুন করে বরফ পড়ছে, যেন ফিসফিসিয়ে কথা বলছে,

গোটা ব্যাপারটা আমাকে আরো নিঃসঙ্গ করে দেয়। হারিকেনের হলদে আলোর শিখার পাশে বসে মনে হয় : "বিরক্তিকর, ভাঙ্গা খেলনার মত এই দুঃখী মহিলাকে লোকে ধূলায় ফেলে দিয়েছে, একসময় ধূলায় সে নিজের ছাপ রেখেছে। যারা জীবনকে নিয়ে মেতে আছে তারা তার জীবনকে টেনে চলার এই আকুতিতে অবাক হয়েছে। কিন্তু এখন মরণ তাকে টেনে নিয়েছে। আত্মা আছে কি নেই আমি জানি না। কিন্তু বর্তমান সংসারে যখন কোন অর্থহীন অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায়, যাকে দেখার ব্যাপারে সবাই ক্লান্ত, অথচ তাকে আর দেখা যায় না, সেটা ব্যক্তি ও অন্যের জন্য ভালো।" কান পেতে দেখি জানালার বাইরে বরফ পড়ার শব্দ শোনা যায় কিনা, কিন্তু মনের ভেতর সেই চিন্তা বাসা বেধে থাকে। এক সময় অস্বস্তিও কমে আসে।

শোনা অথবা দেখা তার জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনা পূর্ণঘটনা হিসেবে ফিরে আসে।

সে লুযেনের নয়। এক বছর শীতের শুরুতে আমার চাচার পরিবার যখন চাকরাণী বদল করার চেষ্টা করছে তখন সালিস বুড়ী ওয়েই তাকে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দেয়। সাদা ফিতে দিয়ে তার চুল বাঁধা, পরণে কালো স্কার্ট, নীল জ্যাকেট এবং বিবর্ণ সবুজের কাঁচুলি। বয়স ছাব্বিশের মত, গায়ের চামড়া শুকিয়ে গেছে অথচ গালে গোলাপী আভা। বুড়ী ওয়েই তাকে ডাকে সিয়াংলিনের বউ। সে তার মায়ের প্রতিবেশী। স্বামীর মৃত্যুতে কাজের সন্ধানে ঘুরছে। চাচা ভ্রূ কুটি করেন। সঙ্গে সঙ্গে চাচী বুঝতে পারেন স্বামী বিধবাকে কাজ দিতে রাজী নয়। তাকে বেশ উপযুক্ত মনে হয়। পায়ের পাতা বড় এবং হাত জোড়া মজবুত। দেখে মনে হয় পরিশ্রমী এবং সহজেই বশ মানবে। তাই চাচার ভ্রূকুটিতে নজর না দিয়ে চাচী তাকে রেখে দেন। শিক্ষানবিসীর সময় সে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করে। যেন বিশ্রামে তার কোন আনন্দ নেই। সে শক্তসবল এবং একাই এক পুরুষের কাজ করে। কাজেই তৃতীয় দিনে তার কাজ পাকা হয়ে যায়, মাসিক পঞ্চাশ পয়সার বিনিময়ে।

সবাই তাকে ডাকে সিয়াংলিনের বউ। তারা তার নাম জিজ্ঞেস করে নি। যেহেতু ওয়েই গ্রামের একজন তাকে প্রতিবেশী বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, তাই তার নামও বোধ হয় ওয়েই। সে কথা কম বলে, জিজ্ঞেস না করলে বলে না, তারপরেও জবাব খুবই ছোট্ট। দিন পনেরো পরে ধীরে ধীরে জানা যায় তার বাড়ীতে রয়েছে দজ্জাল শাশুড়ি এবং দশ বছরের ছোট্ট দেবর। সে কাঠ কাটতে পারে। বয়সে দশ বছরের ছোট তার কাঠুরিয়া স্বামী[7] মারা গেছে সে বছরের

বসন্তকালে। লোকজন শুধু তার কাছ থেকে এটুকুই জানতে পারে।

দিন কেটে যায়। সে আগের মতই কঠোর খাটুনি খাটে। যা পায় তাই খায়, নিজেকে বাঁচিয়ে চলে না। সবাই বলে, লু পরিবার খুব ভালো চাকরাণী পেয়েছে, সে সক্ষম পুরুষের চেয়েও বেশী কাজ করে। বছরের শেষে সে একাই ঘরদোর পরিষ্কার, হাঁস-মুরগী জবাই এবং নববর্ষের ভোগের আয়োজন করে যাতে তার মালিককে বাড়তি লোক ভাড়া করতে না হয়। সেও সন্তুষ্ট, ধীরে ধীরে তার মুখে হাসি ফোটে। মেদ জমে শরীরে। ফিরে আসে ত্বকের সৌন্দর্য।

নববর্ষের পর, একদিন নদীতে চাল ধুতে গিয়ে গোমড়া মুখে ফিরে আসে সিয়াংলিনের বউ। জানায়, নদীর অপর পাড়ে দেখতে মৃত স্বামীর চাচাত ভাইয়ের মত একজনকে ঘুরতে দেখছে। সম্ভবতঃ সে তার খোঁজে এসেছে। ভয় পেয়ে চাচী আরো জানতে চান, কিন্তু আর কোন কথা বের করতে পারেন না। এ কথা শোনা মাত্রই চাচা রেগে গিয়ে বলেন :

"এত ভালো কথা নয়। সে নিশ্চয়ই তার স্বামীর বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে।"

কিছুদিনের মধ্যেই তার পালিয়ে আসার ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যায়।

প্রায় পনেরো দিন পর যখন কি ঘটেছে সবাই ভুলে গেছে, হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় বুড়ী ওয়েই। সঙ্গে নিয়ে আসে চাকরাণীর শাশুড়ি পরিচয়ে এক মহিলাকে — যার বয়স ত্রিশের বেশী। দেখতে গ্রাম্য-নারীর মত হলেও, মাথায় বুদ্ধি পরিষ্কার। বিনয়ের পর সে পুত্রবধূকে নিয়ে যাবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। বলে, বসন্তের শুরুতে অনেক কাজ করতে হবে, অথচ বাড়ীতে শুধু ছেলে বুড়ো রয়েছে, তাই কাজের লোক নেই।

চাচা বলেন : "তার শাশুড়ী তাকে নিয়ে যেতে চায, তাতে আর আমাদের বলার কি আছে?"

তারপর তার পাওনা মিটিয়ে দেয়া হয়। সব মিলিয়ে এক হাজার সাত শত পঞ্চাশ পয়সা, এক পয়সাও সে খরচ করেনি। চাচী পুরো টাকাটা তার শাশুড়ীর হাতে দিয়ে দেয়। সিয়াংলিনের বউ-এর শাশুড়ি চাচা-চাচীকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যায়। ততক্ষণে দুপুর হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পর চাচী চীৎকার করে ওঠেন : "চাল কোথায়? সিয়াংলিনের বউ কি চাল ধুতে যায় নি?" বোধ হয় ক্ষিদে পাওয়ায় তার দুপুরের খাওয়ার কথা মনে হয়েছে।

সবাই চালের ঝুড়ি খুঁজতে লেগে যায়। চাচী রান্নাঘর থেকে শোবার ঘর পর্যন্ত খোঁজ করেন, কিন্তু কোথাও কোন চিহ্ন নেই। চাচাও বাইরে যান। কিন্তু

ঝুড়ি নেই। শেষ পর্যন্ত নদীর ঘাটে গিয়ে দেখতে পান চালের ঝুড়ি। পাশে পড়ে আছে কিছু শাক-সবজি।

আশে পাশের লোকজন তাকে বলে সেখানে সকাল বেলা নোঙর করে ছিল এক সাদা ছইওয়ালা সাম্পান। ছইয়ের ভেতর কারা ছিল তারা তা জানে না এবং এ ঘটনার প্রতি কেউ কোন নজর দেয় নি। সিয়াংলিনের বউ চাল ধোয়ার জন্য উপুড় হলে সাম্পান থেকে দু'জন লোক লাফিয়ে নামে। জোর করে তারা তাকে সাম্পানে তুলে নেয়। কিছুক্ষণ চেঁচামেচির পর সিয়াংলিনের বউয়ের গলা আর শোনা যায় নি, বোধ হয় তারা তার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়েছিল। এ সময় নদীর ঘাটে উঠে আসে দু'জন মহিলা, একজন অচেনা, অন্যজন বুড়ী ওয়েই। প্রত্যক্ষ-দর্শীরা জানায় তারা সাম্পানের ভেতর তাকিয়ে খুব একটা পরিষ্কার দেখতে পায় নি, তবে মনে হয়েছে পাটাতনের উপর বন্দী হয়ে পড়ে আছে সিয়াংলিনের বউ।

চাচা বললেন: "মান-ইজ্জত সব গেছে। তবু ......"

সেদিন চাচী নিজেই দুপুরের খাওয়া তৈরী করেন। চুলা ধরায় তাঁদের ছেলে আনিউ।

দুপুরের খাওয়ার পর আবার আসে বুড়ি ওয়েই।

চাচা বললেন: "মান-ইজ্জত সব গেছে।"

চাচী থালা-বাসন ধোয়ার কাজ করছিলেন। তাকে দেখতে পেয়েই গাল দিতে শুরু করেন: "এর মানে কি? কোন সাহসে আবার এখানে এসেছ? তুমিই তাকে এনে দিয়েছ, আবার ফুসলিয়ে নিয়ে গেছ। লোকজন কি ভাববে? তুমি কি চাও সবাই আমাদের পরিবারকে নিয়ে হাসাহাসি করুক?"

"আমি সত্যিই ঠকেছি। এখন ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে এসেছি। সে যখন কাজের কথা বলেছিল তখন কি আমি জানতাম সে শাশুড়ীর মত না নিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়েছে? আমি খুব দুঃখিত। আমি বুড়িয়ে বোকা হয়ে গেছি, কোন কিছুর বালাই করি না, তাই আপনাদের দুঃখ দিয়েছি। আমার কপাল ভালো আপনারা খুব দয়ালু এবং আমাদের মত ছোটলোকদের কষ্ট দেন না। ভুলের মাশুল হিসেবে এবার আমি আপনাদের একটি ভালো কাজের মেয়ে খুঁজে দেব।"

চাচা বললেন: "তবু ......"

তারপরে সিয়াংলিনের বউয়ের ব্যাপারটা মিটে যায়। অল্পদিনের মধ্যে সবাই ভুলেও যায়।

শুধু চাচী প্রায়ই সিয়াংলিনের বউয়ের কথা বলতেন। কেননা পরে যেসব চাকরাণী এসেছে তারা হয় অলস, নয়ত চুরি করে খায়, অথবা দুটোই, একটাও

ভালো জুটেনি। কাজের বেলায় তিনি বলতেন : "জানিনা তার কি হয়েছে?" ভাবটা, তাকে ফিরে পেতে চান। কিন্তু পরবর্তী নববর্ষের মধ্যে তিনিও আশা ছেড়ে দেন।

নববর্ষের ছুটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় আধা মাতাল অবস্থায় ভক্তি জানানোর জন্য আসে বুড়ী ওয়েই। বলে, ওয়েই গ্রামে মায়ের বাড়ীতে কয়েকদিন থেকেছে বলে তার আসতে দেরী হয়েছে। কথাবার্তার ফাঁকে তারা সিয়াংলিনের বউকে নিয়েও আলোচনা করে।

খুশীতে বুড়ী ওয়েই বলে : "সে? সে এখন সুখে আছে। যখন শাশুড়ী তাকে বাড়ীতে ধরে নিয়ে গেছে, তখন সে তাকে হে গ্রামের হে পরিবারের ছয় নম্বর ছেলের কাছে বিয়ে দেবার কথা দিয়েছে। বাড়ীতে পৌঁছতে না পৌঁছতেই সবাই তাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে তাড়িয়ে দেয়।"

চাচী অবাক হয়ে যান, "কি ধরণের শাশুড়ি!"

"আপনি বড় লোকের মত কথা বলেন। আমরা গেঁয়ো গরীব মেয়েলোক, আমরা ওসব মানি না। তার ছোট দেবর রয়েছে, যার বিয়ে হতে হবে। স্বামী না পেলে, দেবরের বিয়ের যৌতুক কোথায় জুটবে? কিন্তু তার শাশুড়ী চালাক-চতুর, দর কষাকষি করতে জানে, তাই তাকে পাহাড়ী এলাকায় বিয়ে দিয়েছে। একই গাঁয়ের কারো সঙ্গে বিয়ে দিলে এত টাকা পেত না। খুব কম মেয়েই দূর পাহাড়ে কাউকে বিয়ে করতে রাজী হয় বলে সে নগদ ৮০ হাজার পেয়েছে। এখন ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে, উপহারের জন্য খরচ হয়েছে পঞ্চাশ হাজার, বিয়ের খরচ দিয়ে এখনো হাতে দশ হাজার রয়েছে। ভেবে দেখুন, সে দরাদরি করতে কত পাকা।......"

"কিন্তু সিয়াংলিনের বউয়ের কি মত ছিল?"

"এটা রাজী হওয়া বা না হওয়ার কথা নয়। অবশ্য যে কেউ আপত্তি করত। তারা তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে পালকিতে তুলে, বরের বাড়ী নিয়ে যায়। তার পর, বউ সাজিয়ে বিয়ে পড়িয়ে ঘরে বন্দী করে দেয়। ব্যস। কিন্তু সিয়াংলিনের বউ ভিন্ন জাতের মেয়ে লোক। আমি শুনেছি সে অনেক কষ্ট করেছে, পণ্ডিতের বাড়ীতে কাজ করেছে বলে অন্যদের চেয়ে আলাদা। আমরা ঘটকালি করি, অনেক কিছু দেখেছি। বিধবাদের যখন বিয়ে হয়, কেউ কেউ চেচাঁমেচি, কান্না-কাটি করে, কেউ গলায় দড়ি দেয়ার হুমকি দেয়, কেউ স্বামীর বাড়ীতে নেয়ার পর পিঁড়িতে বসতে চায় না, কেউ কেউ বিয়ের বাতি পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলে। কিন্তু সিয়াংলিনের বউ অন্যদের চেয়ে আলাদা। তারা বলেছে, পুরো পথ গালা-গাল দিতে দিতে ও চীৎকার করতে করতে যখন সে হে গ্রামে পৌঁছে, তখন

তার গলা ভেঙ্গে গেছে। তাকে পালকি থেকে জোর করে বার করা হয়। বেহারা দু'জন এবং তার দেবর সর্বশক্তি দিয়েও তাকে বিয়েতে রাজী করাতে পারেনি। ঠিক যখন তারা বাধন শিথিল করেছে — হায় বুদ্ধ — তখনই সে টেবিলের কোণায় মাথা ঠুকে মাথা ফাটিয়ে ফেলে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। দু মুঠো ধূপের ছাই এবং দু'পলতে লাল কাপড়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়েও তারা রক্ত বন্ধ করতে পারেনি। সবশেষে সবাই মিলে জোর করে তাকে স্বামীর সঙ্গে বাসরঘরে বন্দী করে দেয়। সে গালাগাল দিতে থাকে। কি ভয়ংকর ব্যাপার!" সে মাথা নাড়ে, চোখ নামিয়ে নেয়, আর কোন কথা বলে না।

চাচী জিজ্ঞেস করে : "তার পর কি ঘটেছে?"

চোখ তুলে বুড়ী ওয়েই বলে : "তারা বলে পর দিন সে ওঠেনি।"

"এবং তার পর?"

"তার পর? তার পর সে ওঠে। বছরের শেষে সে ছেলের মা হয়। নতুন বছরে তার বয়স হয়েছে দু বছর।[৪] বাড়ীতে যখন ছিলাম তখন কেউ কেউ হে গ্রামে যায়। ফিরে এসে বলে তারা তাকে এবং তার ছেলেকে দেখেছে। মা-ছেলে দু'জনেরই শরীর ভালো। বাড়ীতে কোন শাশুড়ি নেই। জীবন যাপনে তার স্বামী শক্তসমর্থ পুরুষ। বাড়ীটা নিজের। ভালো, ভালো, সে এখন সুখে আছে।"

এরপর আমার চাচীও সিয়াংলিনের বউয়ের কথা বলা ছেড়ে দেন।

কিন্তু সিয়াংলিনের বউয়ের সুখের কাহিনী শোনার দু বছর পর, এক হেমন্তে সে চাচার বাড়ীর চৌকাঠে দেখা দেয়। টেবিলের ওপর রাখে গোলাকার ঝুড়ি, কার্নিশের নীচে বিছানার পুঁটলি। আগের মত চুলে সাদা ফিতে, পরণে কালো স্কার্ট, নীল জ্যাকেট, বিবর্ণ সবুজ কাঁচুলি। তার চামড়া শুকিয়ে গেছে, গালের গোলাপী আভাও নষ্ট হয়ে গেছে। তার চোখজোড়া আধবোজা, কাঁদতে কাঁদতে চোখের সেই আভা নেই। ঠিক আগের মতই, দয়া দেখিয়ে বুড়ী ওয়েই তাকে নিয়ে আসে, চাচীর কাছে সব কিছু খুলে বলে :

"এটা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ব্যাপার। তার স্বামী এত শক্তসমর্থ ছিল, কেউ ভাবতেই পারেনি সে টাইফয়েডে মারা যাবে। প্রথমে একটু ভাল বোধ হলে সে এক থালা ঠাণ্ডাভাত খায় এবং আবার জ্বর আসে। ভাগ্যভালো তার ছেলে ছিল। সে কাজ করতে পারে, তা কাঠ কাটা হোক, চা-পাতা তোলা হোক অথবা রেশমী পোকার চাষ হোক। তাই সে প্রথমে চালিয়ে নেয়। কিন্তু তার পর কে ভেবেছে তার ছেলেকেও নেকড়ে নিয়ে যাবে? বসন্তের শেষ হলেও, গ্রামে প্রায়ই নেকড়ে আসে — কিন্তু তবু কেউ সেটা ভাববে কি করে? এখন সে একে-

বারে একা। বাড়ী দখল করতে এসে স্বামীর বড় ভাই তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে। তাই পুরনো মালিকের কাছে ফিরে আসা ছাড়া তার কোন পথ নেই। এবার তাকে বাধা দেয়ার কেউ নেই, আপনাদেরও নতুন চাকরানী দরকার, তাই তাকে এখানে নিয়ে এসেছি। আমার মনে হয়, নতুন চাকরানীর চেয়ে, আপনাদের কাজকাম জানা পুরনো চাকরানীই ভালো।......"

উদাস চোখ তুলে সিয়াংলিনের বউ বলে: "আমি সত্যি একটি বোকা, সত্যিই...... আমি শুধু জানতাম বরফ পড়ার সময় গুহায় খাবার থাকে না বলে বুনো পশুরা গ্রামে আসে। আমি জানতাম না এগুলো বসন্তেও আসে। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে আমি দরজা খুলে দেই। এক ঝুড়ি মটরশুঁটি দিয়ে চৌকাঠের কাছে বসিয়ে আমাও'কে খোসা ছড়াতে বলি। সে খুব শান্ত ছেলে এবং যা বলেছি সবসময় তা করেছে; সে বাইরে যায়। তার পর বাড়ীর পেছনে গিয়ে কাঠ কাটি, চাল ধুয়ে আনি। চাল যখন চুলোর ওপর তখন মটরশুঁটি সেদ্ধ করার জন্য আমাও'কে ডাকি। কিন্তু কোন জবাব নেই। বাইরে খুঁজতে গিয়ে দেখি মাটিতে ছড়িয়ে আছে মটরশুঁটি, কিন্তু আমাও নেই। সে খেলবার জন্য কখনো কারো বাড়ীতে যায়নি। যেখানেই তার খোঁজে গিয়েছি, কোথাও তার দেখা মেলেনি। পাগল হয়ে ছেলের জন্য সকলের হাতে পায়ে ধরতে থাকি। সর্বত্র খোঁজাখুঁজির পর সন্ধ্যায় সবাই পাহাড়ে খুঁজতে যায়। কাঁটা ঝোপে আটকে আছে আমাওয়ের এক পাটি ছোট্ট জুতো। সবাই বলে: 'সর্বনাশ, তাকে নিশ্চয়ই নেকড়ে খেয়েছে।' একটু এগিয়ে সবাই দেখতে পায় তার হাড়গোড় পড়ে আছে নেকড়ের গুহায়। তখনো ছোট্টহাতে শক্তভাবে ধরা আছে সেই ঝুড়ি। ......" এই বলে সে কাঁদতে থাকে, কথা আর শেষ করতে পারে না।

চাচী প্রথমে মন ঠিক করতে না পারলেও গল্প শেষ হতে হতে তাঁর চোখের কোণা লাল হয়ে ওঠে। খানিক চিন্তা করে চাকরদের ঘরে তার জিনিসপত্র রাখতে বলেন চাচী। বুড়ী ওয়েই এমনভাবে দম ফেলে যেন বিরাট বোঝা নেমে গেছে। প্রথমবারের চেয়ে সিয়াংলিনের বউকে একটু সহজ মনে হয়। পথ দেখানো ছাড়াই সে জিনিষপত্র নিয়ে যায়। সেই থেকে সে আবার লুযেনে চাকরানীর কাজ করতে থাকে।

সবাই আগের মত তাকে ডাকে সিয়াংলিনের বউ।

সে অনেক বদলে গেছে। তিন দিনও যায়নি। তার কর্তা ও গিন্নী উপলব্ধি করে সে আর আগের মত চটপটে নেই। তার স্মৃতিশক্তি আরো খারাপ হয়ে গেছে। ভাবলেশহীন মুখে কোন হাসি নেই। চাচীও বিরক্তি প্রকাশ করতে শুরু করেন। সে যখন আসে চাচা আগের মত ভ্রূ কুঁচকালেও, খুব একটা আপত্তি

তোলেন নি। কেননা চাকরানী পাওয়া কষ্টকর ব্যাপার। শুধু চাচীকে গোপনে সাবধান করে দিয়েছিলেন সিয়াংলিনের বউদের মত মহিলাদের দেখতে দুঃখী মনে হলেও, তাদের আত্মার প্রভাব খুব খারাপ। সে সাধারণ কাজ করলে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু পূর্বপুরুষদের ভোগের কোন কিছু ছুঁতে পারবে না। তাদের নিজেদেরই সব কাজ করতে হবে। সে স্পর্শ করলেই সবকিছু অপবিত্র হয়ে যাবে এবং পূর্বপুরুষরা তা গ্রহণ করবে না।

আমার চাচার বাড়ীতে সবচে বড়ো ঘটনা "পূর্বপুরুষদের জন্য ভোগের" অনুষ্ঠান এবং এ সময়েই সবচে ব্যস্ত থাকতে হত সিয়াংলিনের বউকে। কিন্তু এখন তার হাতে কাজ খুব কম। ঘরের মাঝখানে খাবার টেবিল রেখে তার সামনে পর্দা টাঙিয়ে সে আগের মতই মদের পাত্র এবং খাবার কাঠি সাজাতে শুরু করে।

চাচী তাড়াতাড়ি চীৎকার করে ওঠে: "সিয়াংলিনের বউ, তুমি রেখে দাও। আমিই ওগুলো সাজাব।"

সে ভয়ে হাত সরিয়ে মোমবাতি আনতে যায়।

চাচী আবার চীৎকার করে ওঠে: "রেখে দাও সিয়াংলিনের বউ। আমিই ওগুলো আনব।"

কয়েকবার ঘোরাঘুরি করে কোন কাজ না পেয়ে সিয়াংলিনের বউ ইতস্ততঃ করে চলে যায়। সেদিন সারা দিন সে চুলোর কাছে বসে আগুন জ্বালায়।

শহরের লোকজন তাকে আগের মতই ডাকে সিয়াংলিনের বউ, কিন্তু আগের চেয়ে ভিন্ন স্বরে। এবং তারা কথা বললেও তাদের ব্যবহার আলাদা। এতে তার খারাপ লাগে না। শুধু উদাস নয়নে সকলকে এ কাহিনী বলে। যা দিনে-রাতে কখনোই তার মন থেকে মুছে যায় না।

সে বলতে শুরু করে: "আমি সত্যি একটা বোকা, সত্যিই ...... আমি শুধু জানতাম বরফ পড়ার সময় গুহায় খাবার থাকে না বলে বুনো পশুরা গ্রামে আসে। আমি জানতাম না এগুলো বসন্তেও আসে। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে আমি দরজা খুলে দেই। এক ঝুড়ি মটরশুঁটি দিয়ে চৌকাঠের কাছে বসিয়ে আমাও'কে খোসা ছড়াতে বলি। সে খুব শান্ত ছেলে এবং যা বলেছি সবসময় তা করেছে; সে বাইরে যায়। তারপর বাড়ীর পেছনে গিয়ে কাঠ কাটি, চাল ধুয়ে আনি। চাল যখন চুলোর ওপর তখন মটরশুঁটি সেদ্ধ করার জন্য আমাও'কে ডাকি। কিন্তু কোন জবাব নেই। বাইরে খুঁজতে গিয়ে দেখি মাটিতে ছড়িয়ে আছে মটরশুঁটি, কিন্তু আমাও নেই। সে খেলবার জন্য কখনো কারো বাড়ীতে যায় নি। যেখানেই তার খোঁজে গিয়েছি, কোথাও তার দেখা মেলে নি। পাগল

হয়ে ছেলের জন্য সকলের হাতে পায়ে ধরতে থাকি। সর্বত্র খোঁজাখুঁজির পর সন্ধ্যায় সবাই পাহাড়ে খুঁজতে যায়। কাঁটা ঝোপে আটকে আছে আমাওয়ের এক পাটি ছোট্ট জুতো। সবাই বলে: 'সর্বনাশ, তাকে নিশ্চয় নেকড়ে খেয়েছে।' একটু এগিয়ে সবাই দেখতে পায় তার হাড়গোড় পড়ে আছে নেকড়ের গুহায়। তখনো ছোট্টহাতে শক্তভাবে ধরা আছে সেই ঝুড়ি।. . . . .'' তার পরেই সে কাঁদতে শুরু করে এবং তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

এ কাহিনী আবেগময়। পুরুষরা শুনে হাসি বন্ধ করে বিষন্নভাবে চলে যায়। মহিলারা শুনে শুধু তার অপরাধই ক্ষমা করে না, সেই দুঃখে মুখে বিদ্রূপাত্মক ভাব সরিয়ে কাঁদতেও শুরু করে। কিছু কিছু বুড়ী যারা রাস্তায় তার কাহিনী শোনেনি, তার দুঃখের কাহিনী শুনতে তার খোঁজ করে। যখন তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, সে কাঁদতে শুরু করে তখন তাদেরও চোখের কোণে জমা জল পড়তে থাকে। তার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সন্তুষ্ট হয়ে মন্তব্য করতে করতে চলে যায়।

নিজের দুঃখের কাহিনী বার বার বলতে তার ভালো লাগে। প্রায়ই তিন চার জন জড়ো হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই এ কাহিনী সকলের মুখস্থ হয়ে যায়। এমনকি বুদ্ধের ভয়ে ভীত বুড়ীদের চোখেও একফোটা জল দেখা যেত না। শেষ পর্যন্ত, সবাই তার কাহিনী মুখস্থ বলতে পারত। তাই সে কথা বলতে শুরু করলেই তারা বিরক্ত এবং উত্ত্যক্ত বোধ করত।

সে বলত: ''আমি সত্যিই বোকা, সত্যিই . . . . . .''

''তুমি শুধু জানতে বরফ পড়ার সময় পাহাড়ে খাবার কিছু থাকেনা বলে বুনো পশুরা গ্রামে নেমে আসে।'' এই বলে তারা তাকে থামিয়ে দিত এবং চলে যেত।

সে সেখানে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। তার পর চলে যেত, যেন সেও মুষড়ে পড়েছে। কিন্তু এ চিন্তা তার মাথায় বার বার ঘুরে আসত। ছোট্ট ঝুড়ি, মটরশুঁটি, লোকজনের ছেলেমেয়ে দেখলেই সে আমাওয়ের গল্প বলতে শুরু করত। দু তিন বছরের বাচ্চাকে দেখলেই সে বলত: ''আহা, আমার আমাও যদি আজ বেঁচে থাকত, তাহলে সেও এতো বড় হত . . . . . .''

ছেলেমেয়েরা তার চোখ দেখে ভয় পেত এবং মায়েদের আঁচল টেনে ধরে বাড়ীতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করত। তার পর সে সেখানে একা দাঁড়িয়ে থাকত এবং হতাশ হয়ে হেঁটে চলে যেত। শেষ পর্যন্ত সবাই জেনে যায় তার ব্যাপারটা কি। শুধু একটা ছেলে উপস্থিত থেকে একটু হেসে বললেই হত ''সিয়াংলিনের বউ তোমার আমাও বেঁচে থাকলে কি সে এত বড় হত না?''

সে বোধ হয় বুঝতে পারেনি বার বার বলার পর লোকজনের কাছে তার কাহিনী পুরনো হয়ে গেছে, শুধু ঘৃণা ও বিরক্তি বাড়ায়। লোকজন যেভাবে হাসত তাতে সে বুঝতে পারত তাদের কোন আগ্রহ নেই এবং তারও এ গল্প বলার আর প্রয়োজন নেই। সে শুধু তাদের দিকে তাকিয়ে থাকত একটা কথাও বলত না।

লুযেনের লোকজন জাঁকজমকের সঙ্গে নববর্ষ উদ্‌যাপন করে। ২০শে ডিসেম্বর থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়। সে বছর চাচার বাড়ীতে অস্থায়ীভাবে এক চাকর নিয়োগ করা হয়। তার পরেও কাজ থাকায় চাকরানী হিসেবে আসে লিউ-মা। হাঁস-মুরগী জবাই করতে হবে, কিন্তু লিউমা নিরামিষাশী। মাছমাংস ছোঁবে না, হাঁস-মুরগী জবাই করবে না, শুধু থালাবাসন ধুতে পারবে। চুলোর আগুন দেয়া ছাড়া সিয়াংলিনের বউয়ের অন্য কোন কাজ নেই। সে বসে বসে লিউমা'র থালাবাসন ধোয়া দেখে। হাল্কা বরফ পড়তে থাকে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে হাই তুলে সিয়াংলিনের বউ বলতে শুরু করে। যেন নিজের কাছেই বলছে : "আমি সত্যিই বোকা ছিলাম।"

অধৈর্য হয়ে তাকিয়ে লিউমা বলে : "সিয়াংলিনের বউ, তুমি আবার শুরু করেছ। জিজ্ঞেস করি তোমার কপালের এই কাটা দাগ, ওটা কি ঐ সময়ের নয়?"

সে অস্পষ্ট জবাব দেয় : "অ্যা, হ্যাঁ।"

"বলি, রাজী হলে কেমন করে?"

"আমি?"

"হ্যাঁ। আমি মনে করি তোমার নিশ্চয়ই মত ছিল, না হলে......"

"ওহ, তুমি জান না সে কত শক্তিশালী ছিল।"

"আমি বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি না, সে এত শক্তিশালী ছিল যে তুমি তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পার নি। তোমার নিশ্চয়ই মত ছিল, আর এখন তার শক্তির অজুহাত দিচ্ছ।"

"ওহ...... একবার চেষ্টা করে দেখ, তাহলে দেখবে।" সে হেসে ওঠে।

লিউমা'র ভাঁজপড়া মুখে হাসি ফোটে, দেখতে আখরোটের মত। তার বিচির মত চোখজোড়া সিয়াংলিনের বউয়ের কপাল থেকে চোখের ওপর এসে থামে। যেন অস্বস্তিতে পড়েছে, সিয়াংলিনের বউ সঙ্গে সঙ্গে হাসি বন্ধ করে দেয়, চোখজোড়া সরিয়ে নেয়। তাকিয়ে থাকে তুষার কণার দিকে।

লিউমা বলতে থাকে : "সিয়াংলিনের বউ, সেটা খুব খারাপ কাজ হয়েছে। যদি নিজেকে ধরে রাখতে অথবা মরে যেতে ভালো হত। দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে দু বছরের কম ঘর করে তুমি পাপিষ্ঠা হয়েছ। একবার ভেবে দেখ, পরলোকে

যখন দু'জনের ভূত তোমাকে নিয়ে ঝগড়া করবে তখন তুমি কার সঙ্গে যাবে? নরকের যম তখন বাধ্য হয়ে তোমাকে দু'টুকরো করে ওদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন। আমার মনে হয়, সত্যিই ......"

তার চেহারায় ভয় ফুটে উঠে। একথা সে পাহাড়ে কখনো শোনেনি।

"আমার মনে হয় এই বিপদ এড়ানোর জন্য আগেভাগে তোমার কিছু ব্যবস্থা নেয়া উচিত। ভূমি দেবতার মন্দিরে গিয়ে নিজের নামে একটি চৌকাঠ কিনে দরজায় রেখে এস। হাজার হাজার লোক এই কাঠ মাড়িয়ে মন্দিরে প্রবেশ করবে। তাহলে তোমার পাপ মোচন হবে, পরলোকে আর কোন দুঃখ কষ্ট হবে না।"

সে সময় সিয়াংলিনের বউ কোন কথা বলেনি। কিন্তু সেটা মনে রেখেছে। কেননা পরদিন ঘুম থেকে ওঠার পর তার চোখের নীচে দেখা যায় কালো দাগ। নাস্তার পর সে গ্রামের পশ্চিম সীমানায় ভূমি দেবতার মন্দিরে যায় চৌকাঠ কিনতে। প্রথমে পুরোহিত রাজী হন নি। কিন্তু সিয়াংলিনের বউ কাঁদতে শুরু করলে তিনি ইচ্ছের বিরুদ্ধে রাজী হলেন। দাম হাঁকলেন বার টাকা।

সে অনেক আগেই লোকজনের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছে, কেননা আ-মাও'র গল্প সবাই ঘৃণা করে। কিন্তু লিউমা'র সঙ্গে তার কথাবার্তা সেদিন ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে তার ব্যাপারে নতুন করে উৎসাহ দেখায় এবং তাকে কথা বলাতে আসে। পুরো বিষয়টা এখন তার কপালের কাটা দাগ নিয়ে।

কেউ হয়ত একজন চেঁচিয়ে বলে: "সিয়াংলিনের বউ, বলি এত কিছুর পর রাজী হলে কি করে?"

আরেকজন তার কাটা দাগের দিকে তাকিয়ে বলবে: "দেখে দয়া হয়, শুধুশুধি ঐ আঘাতটা পেয়েছ।"

সম্ভবতঃ তাদের হাসি এবং গলার স্বরে সে বুঝতে পেরেছিল তারা তাকে নিয়ে মজা করছে। তাই টু শব্দ না করে তাদের দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকত। শেষ পর্যন্ত মাথাও ঘোরাত না। সারাদিন সে মুখ বন্ধ রাখে। তার কপালের কাটা দাগ সবাই লজ্জার বিষয় মনে করে। সে নীরবে বাজার করে, ঝাড়ু দেয়, তরি-তরকারী ধোয়, ভাত রাঁধে। প্রায় এক বছর পর সে চাচীর কাছ থেকে বেতনের জমা টাকা নিয়ে বার টাকায় পরিবর্তন করে। এবং ছুটি নিয়ে আবার গ্রামের পশ্চিম সীমানায় যায়। খাওয়ার চেয়েও কম সময়ে তৃপ্ত চিত্তে ফিরে আসে, চোখে মুখে অভাবনীয় প্রশান্তি। খুশী মনেই ভূমি দেবতার মন্দিরে চৌকাঠ কিনে দেয়ার কথা চাচীকে জানায়।

দক্ষিণায়নের দিকে পূর্বপুরুষদের স্মরণ করার সময় সে আগের চেয়েও বেশী কাজ করে। চাচীকে ভোগের থালাবাসন সাজাতে দেখে এবং আনিউ'র

সঙ্গে টেবিল টানতে দেখে সেও নিশ্চিত মনে মদের গ্লাস আর খাবারের কাঠি আনতে যায়।

চাচী চেঁচিয়ে ওঠে : "ওগুলো রেখে দাও, সিয়াংলিনের বউ।"

আগুনে ছ্যাঁকা খাওয়ার মত এক ঝটকায় সে হাত সরিয়ে নেয়, ফ্যাকাশে হয়ে যায় মুখ। মোমবাতি আনতে যাবার বদলে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে হতভম্ব হয়ে। ধূপ জ্বালাতে এসে চাচা সরে যেতে বললে শুধু তখনই সে বাইরে যায়। এই বার সে অনেকখানি বদলে যায়। পরদিন শুধু তার চোখ দুটোই বসে যায়নি মনোবলও সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যায়। অন্ধকার আর ছায়া দেখে নয়, লোকজন দেখেও সে ভয় পায়। এমনকি নিজের কর্তা ও গিন্নীকে দেখেও দিনের বেলায় গর্ত থেকে বের করা ইঁদুরের মত সে ভীতু হয়ে পড়ে। সারাদিন কাঠের পুতুলের মত বসে থাকতো। ছয় মাস যেতে না যেতেই তার চুল পেকে যায় এবং স্মৃতি এতো দুর্বল হয়ে যায় যে সে প্রায়ই কাজের কথা এমনকি ভাত ধোয়ার কথা ভুলে যেত।

"সিয়াংলিনের বউয়ের কি হয়েছে? তখন তাকে না রাখলেই ভালো হত।" কখনো কখনো তার সামনে এসব বলে চাচী তাকে হুঁশিয়ার করে দিতেন।

কিন্তু সে একইরকম থাকে। তার অবস্থা ভালো হবার কোন আশা থাকে না। শেষ পর্যন্ত তারা তাকে তাড়িয়ে দেয়া ঠিক করে এবং বুড়ী ওয়েই-এর কাছে চলে যেতে হবে। আমি লুযেনে থাকার সময় তারা শুধু এ নিয়ে কথা বলত। কিন্তু পরে যা ঘটেছে তাতে বোঝা যায় তারা এই কাজ করেছে। আমার চাচার বাড়ী থেকে যাবার পর সে ভিখারিণী হয়েছে না বুড়ী ওয়েই-এর কাছে যাবার পর ভিখারিণী হয়েছে, আমি জানি না।

কানের কাছে বাজী পোড়ানোর শব্দে জেগে ওঠি। চোখে পড়ে মটরশুঁটির মত বড় হলদে বাতির শিখা। চাচার বাড়ীতে ভোগের উৎসবের বাজী পোড়ানোর শব্দও কানে আসে। বুঝতে পারি ভোর হয়ে এসেছে। আমি বোকা বনে যাই। দূরে এলোমেলো বাজীর শব্দ আকাশে গোলমেলে মেঘের স্তূপের মত মনে হয়, যেন গোটা শহরকে ঢেকে দেয়ার জন্য তুষার কণার সঙ্গে মিলেছে। এই সব শব্দের ভেতরে. সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত যে সন্দেহ আমার মনে দানা বেঁধেছিল তা উৎসবের আনন্দে হারিয়ে যায়। মনে হয় স্বর্গ মর্ত্যের দেবতারা ভোগ ও ধূপ গ্রহণ করেছেন, এবং লুযেনবাসীদের অফুরন্ত সৌভাগ্য দেয়ার জন্য আকাশে বসে মাথা নাড়ছেন।

ফেব্রুয়ারী ৭, ১৯২৪

টীকা

1. ছিং রাজবংশের সর্বোচ্চ শিক্ষালয়।

2. খাং ইয়ৌওয়েই, বিখ্যাত সংস্কারক, তিনি সাংবিধানিক রাজতন্ত্রেব প্রবক্তা ছিলেন!

3. ছেন থুয়ান, দশম শতাব্দীর প্রথমদিককার নির্জনবাসী সন্ন্যাসী।

4. সম্রাট খাং সী-এর (১৬৬২–১৭২২) উদ্যোগে সংকলিত চীনা অভিধান। ১৬৬২–১৭২২ সাল পর্যন্ত রাজত্বকারী ছিং বংশীয় সম্রাট খাং সী-এর উদ্যোগে প্রণীত একটি চীনা অভিধান।

5. কনফুসিয়াসের গ্রন্থাবলী (রচনাবলী)।

6. কনফুসিয়াসের বাণী।

7. পুরনো চীনের গ্রামের নিয়ম অনুযায়ী এগার বার বছরের কিশোরের সঙ্গে যুবতী নারীব বিয়ে হত। যাতে শ্বশুর বাড়ীতে বউয়ের শ্রম ব্যবহার করা যায়।

8. চীনের পুরনো প্রথানুযায়ী জন্মের বাচ্চার বয়স এক বছর হিসেব করা হত এবং নববর্ষে তার বয়সের সঙ্গে এক বছর যোগ করা হত।

শুঁড়ীখানায়

উত্তর থেকে দক্ষিণপূর্বে যাওয়ার সময় আমি বাড়ী ও S শহর যাবার জন্য পথ পরিবর্তন করি। শহরটি আমার আদি শহর থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে এবং ডিঙি নৌকায় অর্ধেক দিনে পৌঁছে যাওয়া যায়। এখানে একটি স্কুলে প্রায় একবছরের মত মাষ্টারী করেছি। বরফের পর শীতের তীব্রতায় প্রকৃতি এখন ধূসর। আলসেমি আর মন পোড়ানি থেকে কয়েকদিন আমি S শহরের "লুওসি" সরাইখানায় থাকি। আগে সেটা এখানে ছিল না। শহরটি ছোট। পেয়ে যাব মনে করে পুরনো কয়েকজন সহকর্মীর খোঁজ করি। কিন্তু কেউ সেখানে ছিল না। অনেক আগেই তারা যার যার পথে চলে গেছে। স্কুলের সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখি স্কুলের নাম ও চেহারা বদলে গেছে, নিজেকে বিদেশীর মত মনে হয়। দু ঘণ্টার কম সময়ে সব উৎসাহ উবে যায় এবং আসার জন্য নিজেকে গাল দিতে থাকি।

আমি যে সরাইখানায় ছিলাম সেখানে ঘর ভাড়া নেয়া যায়, খাওয়া মেলে না। বাইরে থেকে খাবার আনানো যায়, কিন্তু মোটেও সুস্বাদু নয়, মাটির মত স্বাদ। জানালার বাইরে ময়লা, দাগওয়ালা দেয়ালে শেওলা পড়েছে। উপরে অসীম আকাশ সাদা, ফ্যাকাশে, এবং বিবর্ণ। উপরন্তু হাল্কা বরফ পড়তে শুরু করেছে। দুপুরের খাওয়াটা ভালো হয় নি। সময় কাটানোর মতও কিছু ছিল না। তাই অতীতের বহু চেনা শুঁড়ীখানা "এক ব্যারেল হাউজ"র কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে হোটেল থেকে খুব দূরে হবে না। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে শুঁড়ীখানার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি। আসলে একঘেয়েমি কাটাতে চেয়েছিলাম। মদ পান করতে চাই নি। "এক ব্যারেল হাউজ" তখনো সেখানে আছে। সরু, কারুকার্য খচিত সম্মুখভাগ, পুরনো সাইনবোর্ড বদল হয় নি। কিন্তু মালিক থেকে শুরু করে বেয়ারা পর্যন্ত এমন কেউ ছিল না যাকে আমি জানি— "এক

ব্যারেল হাউজও" পুরো বিদেশী বনে যাই। তবু ঘরের কোনায় বহু চেনা সিঁড়ি টপকে আমি ছোট্ট দোতলায় উঠে যাই। সেখানে সেই পাঁচটি কাঠের টেবিল তেমনি আছে। শুধু পেছনের জানালার আগে ছিল কাঠের জাফরি কাটা, এখন তার বদলে এসেছে কাঁচ।

"এক ক্যাটি হলদে মদ। খাবার? দশটুকরো ভাজা বিনকার্ড, সঙ্গে মরিচের ঝোল।"

আমার সঙ্গে ওপরে উঠে আসা বেয়ারাকে আদেশ দিয়ে পেছনে গিয়ে জানালার ধারে এক টেবিলে বসি। উপরতলায় কামরাটা একেবারে খালি। তাই সবচে ভালো সীটে বসে নীচের পরিত্যক্ত আঙ্গিনা দেখার সুযোগ হয়। সম্ভবতঃ আঙ্গিনাটি শুঁড়ীখানার নয়। অতীতে বহুবার এর দিকে তাকিয়েছি, কখনো কখনো বরফ পড়ার সময়। এখন উত্তরের দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত চোখের কাছে দৃশ্যটা অদ্ভুত ঠেকছে, কয়েকটি পুরনো প্লাম গাছ, বরফের প্রতিদ্বন্দ্বী। ফুলে ফুলে ভরে আছে, যেন শীতের কথা জানে না। প্রায় ভেঙ্গেপড়া প্যাভিলিয়নের পাটে দাঁড়িয়ে আছে একটি ক্যামেলিয়া। গাঢ় সবুজ গায়ে তার লাল ফুলের মেলা। বরফের ভেতর আগুনের মত জ্বলছে, যেন রাগী, বিক্ষুব্ধ, দর্শকের তৃষ্ণাকে অবজ্ঞা করছে। হঠাৎ এখানে স্তূপীকৃত বরফের স্যাঁৎসেঁতে কথা মনে পড়ে। চকচকে, জমাটবাধা, উত্তরের শুকনো বরফের মত নয়, যা হঠাৎ দমকা বাতাসে উড়তে শুরু করে এবং কুয়াশার মত আকাশ ঢেকে দেয়। ......

"স্যার. আপনার মদ ......" অসতর্কভাবে বলে কাপ, কাঠি, মদের পাত্র এবং খাবার নামিয়ে রাখে বেয়ারা। মদ এসে গেছে। আমি টেবিলের দিকে ঘুরে সবকিছু ঠিকঠাক করে কাপ ভর্তি করে নেই। মনে হল উত্তর অবশ্যই আমার বাড়ী নয়, তবু দক্ষিণে এসে নিজেকে বিদেশী হিসেবে গণ্য করতে পারি। সেখানে পাউডারের মত উড়ে যাওয়া বরফ, এখানে জমাটবাধা নরম বরফ দুটোই আমার কাছে অচেনা মনে হয়। বিষণ্ন মনে, আলসে ভঙ্গীতে আমি এক চুমুক মদ পান করি। মদ একেবারে খাঁটি, ভাজা বিনকার্ড রান্নাও চমৎকার। একমাত্র দুর্ভাগ্য মরিচের ঝোল খুব হাল্কা, কিন্তু S শহর-এর লোকেরা কখনো এই তীব্র গন্ধ বুঝতে পারে নি।

বোধ হয় বিকেল বলে, শুঁড়ীখানার পরিবেশ ছিল না। তিন কাপ মদ পান করেছি। কিন্তু আমি ছাড়া সেখানে কাঠের মাত্র চারটি খালি টেবিল পড়ে আছে। পরিত্যক্ত আঙ্গিনার দিকে তাকিয়ে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হল, তবু অন্য কোন খদ্দের আসুক চাই নি। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে খুব অস্বস্তি লাগে, কিন্তু

বেয়ারাকে দেখতে পেয়ে সে ভাবটা কেটে যায়। তাই আরো দু'কাপ মদ পান করি।

ভাবি, "এবার নিশ্চয়ই খদ্দের," কেননা পায়ের শব্দ বেয়ারার চেয়ে অনেক মন্থর। যখন বুঝতে পারি সে সিঁড়ির শেষ মাথায় উঠে এসেছে তখন এই অনাহূত সঙ্গীকে দেখার জন্য মাথা তুলি। চমকে দাঁড়িয়ে যাই। আমি কখনো ভাবি নি সব জায়গা বাদ দিয়ে এখানে অপ্রত্যাশিতভাবে কোন বন্ধুর দেখা পাব —যদি সে এখনো আমাকে বন্ধু ডাকতে দেয়। নবাগত আমার পুরনো সহপাঠী, যখন শিক্ষক ছিলাম তখন সহকর্মী ছিল। অনেক খানি বদলে গেলেও তাকে দেখা মাত্রই চিনতে পারি। তার চলার গতি মন্থর হয়ে এসেছে, আগেকার চটপটে, তৎপর ল্যু ওয়েইফু-এর মত নয়।

"আহ—ওয়েইফু, তুমি? তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হওয়ার কথা কখনো ভাবিনি।"

"ওহ, তুমি? আমিও কখনো ভাবি নি......"

তাকে আমার সঙ্গেই বসতে বলি। একটু ইতস্ততঃ করে, মনে হল সে বসতে রাজী। প্রথমে ব্যাপারটা আমার কাছে খুব অবাক লেগেছে, তারপর দুঃখ পেয়েছি, রাগও হয়েছে। তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখি চুল দাড়ি আগের মত উসকো খুসকো, মুখ ফ্যাকাশে এবং আয়ত, কিন্তু সে আরো শুকিয়ে গেছে এবং দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাকে খুব শান্ত মনে হল অথবা সম্ভবতঃ উদ্যমহীন, কালো ভুরুর নীচে তার চোখ জোড়া সতর্কতা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু যখন সে ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত আঙ্গিনার দিকে তাকাল তখন তার চোখে হঠাৎ ভেসে উঠল সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যা স্কুলে বহুবার দেখেছি।

খুশীতে ও কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে আমি বললাম, "প্রায় দশবছর আমরা একে অপরকে দেখি নি। বহুদিন আগে শুনেছি তুমি জিনান-এ থাকতে কিন্তু এত আঁটকুড়ে ছিলাম যে কখনো লিখি নি......"

"আমারও একই অবস্থা। মা'র সঙ্গে আমি দুবছরের বেশী থাইইউয়ানে আছি। যখন তাকে নিতে এসেছি তখন শুনেছি তুমি চলে গেছ, চিরতরে।"

জিজ্ঞেস করলাম, "থাইইউয়ান-এ তুমি কি করছ?"

"এক দেশীর বাড়ীতে মাষ্টারী করছি।"

"এবং তার আগে?"

"তার আগে?" সে পকেট থেকে একটি সিগারেট বের করে, ধরিয়ে মুখে নিল। তার পর ধোঁয়ার দিকে তাকাতে তাকাতে চিন্তা করে বলল, "শুধু তুচ্ছ কাজ, কিছু না করার সমান।"

আরো জিজ্ঞেস করল দুজনের ছাড়াছাড়ির পর আমার কি হয়েছে! আমি তাকে মোটামুটি একটা ধারণা দেই, বেয়ারাকে ডেকে একটা কাপ ও কাঠি আনতে বলি যাতে সে আমার মদে ভাগ বসাতে পারে। সেই সঙ্গে আরো দু ক্যাটি মদ গরম করতে বলি। খাওয়ার অর্ডারও দেই। অতীতে আমরা কখনো ভদ্রতা দেখাই নি, কিন্তু এখন এত ভদ্রতা দেখানো শুরু হল যে কেউই কোন খাবার পছন্দ করবে না। শেষ পর্যন্ত বেয়ারার সুপারিশে চার ধরনের খাবার ঠিক হয় : মৌরি মসলা দেয়া মটর শুঁটি, ঠাণ্ডা মাংস, ভাজা বিনকার্ড এবং নোনা মাছ।

"ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারি আমি একটা বুদ্ধু!" একহাতে সিগারেট, অন্য হাতে মদের কাপ নিয়ে সে কষ্টের হাসি হেসে বলে, "যখন যুবক ছিলাম তখন মৌমাছি অথবা মাছির থেমে যাওয়া দেখেছি। ভয় পেলে উড়ে যায়, কিন্তু ছোটবৃত্তে একটু উড়ে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসে। আমি ভেবেছিলাম এটা খুবই বোকামি এবং করুণ। কিন্তু ভাবি নি আমি নিজে ফিরে আসব, শুধু ছোট একটা বৃত্তে ওড়ার পর। ভাবি নি তুমিও ফিরে আসবে। তুমি কি আর একটু উড়তে পারতে না?"

"সেটা বলা শক্ত। বোধ হয় আমিও শুধু ছোটবৃত্তে উড়েছি।" কষ্টের হাসি হেসে বললাম, "কিন্তু তুমি ফিরে এলে কেন?"

"খুব তুচ্ছ একটা কারণে।" এক চুমুকে মদের কাপ শেষ করে, সিগারেটে কয়েকটা টান দিল এবং চোখ আর একটু মেলল, "তুচ্ছ — কিন্তু তুমি সেটাও শুনতে পার।"

গরম গরম খাবার এবং মদ এনে টেবিলের ওপর রাখে বেয়ারা। ভাজা বিনকার্ডের ধোঁয়া ও সুবাসে পুরো দোতলা ভরে ওঠে, বাইরে বরফ পড়তে থাকে আরো তীব্রভাবে।

সে বলে চলে, "বোধ হয় তুমি জানতে, আমার একটা ছোটভাই তিন বছর বয়সের সময় মারা যায় এবং গ্রামেই তার কবর হয়। আমি পরিষ্কার মনে করতে পারি না সে দেখতে কেমন ছিল, কিন্তু মা'কে বলতে শুনেছি সে খুব আদরের সন্তান ছিল। এবং আমার খুব ভক্ত ছিল। এখনো তার কথা বলতে মায়ের চোখে জল আসে। এবার বসন্তে চাচাত ভাই আমাদের লেখে তার কবরের পাশে মাটি ধীরে ধীরে প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে, তার ভয় সহসাই সেটা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে, আমাদের এখনই কিছু একটা করা উচিত। একথা জানতে পেরেই মা খুব বিচলিত হয়ে পড়েন এবং কয়েকরাত ঘুমোতে পারেন নি — তুমি জান তিনি চিঠি পড়তে পারেন। কিন্তু আমি কি করতে পারি? আমার টাকা নেই, সময় নেই : করার কিছুই ছিল না।

"এখন নববর্ষের ছুটি উপলক্ষে দক্ষিণে আসতে পেরেছি, তার কবর সরানোর জন্য।" আর এক কাপ মদ শেষ করে সে জানালা দিয়ে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "উত্তরে কি কখনো এমন জিনিষ পাবে? গভীর বরফে ফুল, এবং বরফের নীচে তাজা মাটি। তাই পরশু আমি ছোট্ট একটি কফিন কিনি। আমার ধারণা মাটির নীচে যেটা আছে সেটা অনেক আগে পচে গেছে। তুলা ও বিছানা নিয়ে চারজন কামলা ভাড়া করি এবং কবর সরানোর জন্য গ্রামে যাই। হঠাৎ নিজেকে খুব সুখী মনে হয়, কবর খোঁড়ায় উদগ্রীব, যে ছোট্ট ভাই আমার ভক্ত ছিল তার মৃতদেহ দেখায় উদগ্রীব, সেটা ছিল আমার জন্য এক নতুন অনুভূতি। কবরে পৌঁছে দেখি মাত্র দু'ফুট দূরে নদীর জল এসে গেছে। গরীব গোরে দুবছর কোন মাটি দেয়া হয় নি, তাই ডুবে গেছে। বরফের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি চারজন কামলাকে বলি, 'ওটা খোঁড়।'

"আমি সত্যিই নিরীহ লোক। বুঝতে পারি সে মুহূর্তে আমার গলা ছিল একটু অস্বাভাবিক এবং সারাজীবনে এরকম একটা আদেশই আমি দিয়েছি। কিন্তু কামলাদের কাছে তা মোটেও অদ্ভুত মনে হয় নি এবং তারা খোঁড়ার কাজে লেগে যায়। তারা কফিনের কাছে পৌঁছতেই আমি একবার তাকিয়ে দেখি। সত্যি সত্যিই কফিনের কাঠ পচে গেছে শুধু কিছু কাঠের টুকরো পড়ে আছে। আমার বুকের ধুক ধুকানি বেড়ে যায় এবং ছোট্ট ভাইকে দেখার জন্য সতর্কতার সঙ্গে সেগুলো সরাই। অবাক হয়ে যাই। বিছানা, কাপড়চোপড়, হাড় কিছুই নেই। ভাবলাম 'সবকিছু পচে গেছে, কিন্তু শুনেছি চুল পচা সবচে কষ্টকর, বোধ হয় কিছু চুল আছে।' তাই সতর্কতার সঙ্গে মাটির দিকে তাকাই যেখানে বালিশ থাকার কথা, কিন্তু কিছুই নেই। সামান্যতম চিহ্নও নেই।"

হঠাৎ লক্ষ্য করি তার চোখের কোনা লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি এটা মদের প্রভাব। সে খুব সামান্যই খেয়েছে, কিন্তু একটানা মদ পান করে চলেছে। তাই সে এক ক্যাটিরও বেশী পান করেছে এবং তার দৃষ্টি ও অঙ্গভঙ্গি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে আমার চেনা ল্যু ওয়েইফু-এর মত। আমি বেয়ারাকে ডেকে আরো দু ক্যাটি মদ গরম করতে বলি। তার পর ফিরে মদের কাপ নিয়ে তার মুখোমুখি বসে নীরবে তার যা বলার তা শুনতে থাকি।

"আসলে এটা আবার সরানোর দরকার ছিল না। দরকার ছিল মাটি সমান করা, কফিন বিক্রী করা, তাহলেই ব্যাপারটা চুকে যেত। অবশ্য কফিন বিক্রী করার সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব বাধলেও, দাম খুব কম হলে যে দোকান থেকে কিনেছি তারা ফেরত নিত। এবং কমপক্ষে মদের জন্য কিছু পয়সা বাঁচাতে পারতাম।

কিন্তু তা করি নি। আমি তবু বিছানা পাতি, যেখানে তার মৃতদেহ ছিল সেখান থেকে কিছু মাটি নিয়ে তুলায় জড়াই, নতুন কফিনে রাখি। তার পর বাবাকে যেখানে কবর দেয়া হয়েছে সেই কবর স্থানে নিয়ে যাই এবং তাঁর পাশেই কবর দেই। কফিনের চারদিকে ইট দিয়েছি বলে কাজ তদারকের জন্য কাল প্রায় সারাদিন ব্যস্ত ছিলাম। এভাবেই বলতে পারি কাজটা শেষ, অন্ততঃপক্ষে মা'কে ধোকা দেয়া ও তাঁর মনকে শান্ত করার জন্য যথেষ্ট। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি এভাবেই আমার দিকে তাকাবে। এতখানি বদলে যাওয়ার জন্য কি তুমি আমাকে দোষ দাও? আমার এখনো মনে পড়ে সে সময়ের কথা যখন আমরা একসঙ্গে ভূমি দেবতার মন্দিরে যেতাম মূর্তির দাড়ি টেনে তোলার জন্য, কিভাবে এমনকি হাতাহাতি হওয়া পর্যন্ত আমরা চীনের বিপ্লবীকরণের প্রক্রিয়া নিয়ে সারাদিন আলোচনা করেছি। কিন্তু আমি এখন এমন, পাশ কাটাতে এবং আপোষ করতে রাজী। কখনো কখনো ভাবি: 'যদি পুরনো বন্ধুরা এখন আমাকে দেখত তা হলে বন্ধু হিসেবে স্বীকার করত না।' কিন্তু আমি এখন এধরণের।"

সে আরেকটি সিগারেট ধরায়।

"তোমার ভাব দেখে মনে হয় এখনো আমার ওপর আশা রাখ। স্বভাবতঃই আমি আগের চেয়ে অনেক অনুভূতিহীন, কিন্তু এখনো কিছু কিছু ব্যাপার বুঝতে পারি। এজন্যেই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করি, একই সঙ্গে অস্বস্তিও লাগে। ভয় হয়, এখনো আমার উপর আশা আছে এমন বন্ধুদের হতাশ করছি ......" সে থামে। সিগারেটে কয়েক টান দিয়ে ধীরে ধীরে বলতে থাকে, "মাত্র আজ, ঠিক এই 'এক ব্যারেল হাউজ' আসার আগে আমি তুচ্ছ একটা কাজ করেছি। তবু এটা করতে পেরে আমি খুশী। পূব সীমানায় আমার পুরনো প্রতিবেশীর নাম ছাংফু। সে ছিল মাঝি এবং তার মেয়ের নাম ছিল আশুন। সে সময় যখন আমার বাড়ীতে আসতে তখন তাকে দেখে থাকবে। নিশ্চয়ই চোখ পড়ে নি কেননা সে তখন খুব ছোট ছিল। বড় হতে হতে সে সুন্দরী হয় নি, সাধারণ গোলাকার মুখ এবং গায়ের চামড়া শুকনো। শুধু তার চোখজোড়া ছিল অস্বাভাবিক রকমের বড়, চোখের অক্ষিপক্ষ্ম খুব লম্বা এবং সাদাটে অংশ মেঘহীন রাতের আকাশের মত পরিষ্কার — মানে বাতাস না থাকলে উত্তরের মেঘহীন আকাশ যেমন। এখানে এতটা পরিষ্কার নয়। সে খুব কাজের ছিল। ছোটবেলায় মা'কে হারিয়েছে। তার কাজ ছিল ছোটভাই ও বোনকে দেখাশোনা করা, এবং বাপকেও তাকে শুশ্রূষা করতে হত। সবকিছুই সে ভালোভাবে করত। সে খুব হিসেবীও ছিল, তাই ধীরে ধীরে সংসারের অবস্থাও ফিরে আসে। এমন কোন প্রতিবেশী ছিল না যে তার প্রশংসা করত না, এমনকি ছাংফুও প্রায়ই তার প্রশংসা করত।

এবার যখন বেড়াতে বেরিয়েছি তখন তার কথা মায়ের মনে পড়ে—বুড়ো মানুষের স্মৃতি বড় টনটনে। তার মনে পড়ে একবার কাউকে মাথায় কৃত্রিম লাল ফুল পরতে দেখে আশুনেরও নিজের পরতে ইচ্ছে হয়েছিল। না পেয়ে সে সারারাত কাঁদে এবং বাপের মার খায়। এজন্যে দু বা তিন দিন তার চোখ ফোলা ও লাল ছিল। এ লাল ফুলগুলো অন্য প্রদেশের এবং S শহরে কেনা যায় না। তাই সে কখনো পাওয়ার আশা কেমন করে করে? এবার দক্ষিণে আসার সময় মা বলেছেন তার জন্য দুজোড়া কিনতে।

"একাজে জ্বালাতনের চেয়ে আমি বরং খুশীই হয়েছিলাম। আশুন এর জন্য কিছু একটা করতে পেরে আমি খুব খুশী হয়েছিলাম। পরশু বছর মা'কে নেয়ার জন্য আমি আসি। এবং একদিন ছাংফুকে বাড়ীতে পেয়ে তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেই। সে সাদা ময়দার পায়েস খাওয়ার জন্য আমাকে দাওয়াত করতে চায় এবং বলে এর সঙ্গে চিনি মিশিয়েছে। দেখ, যে মাঝির বাড়ীতে চিনি আছে সে নিশ্চয়ই গরীব নয় এবং নিশ্চয়ই ভালো খায়। গড়িমসি করে রাজী হই কিন্তু অনুরোধ করি যেন আমাকে সামান্য খেতে দেয়। সে বুঝতে পারে এবং আশুনকে বলে, 'এসব পণ্ডিতদের ক্ষিধে নেই। তুমি ছোট বাটি ব্যবহার করতে পার কিন্তু চিনি বেশী দেবে।' যাহোক যখন সে পায়েস তৈরী করে নিয়ে আসে দেখতে পাই বড় বাটি, যা সারাদিনের খাবার। এটা সত্য ছাংফু-এর বাটির তুলনায় এটাকে ছোটই দেখায়। সারাজীবনে আমি ময়দার পায়েস খাই নি। স্বাদ নিতে গিয়ে দেখি সত্যিই বিস্বাদ, যদিও খুব মিষ্টি। আমি অমনোযোগের সঙ্গে কয়েক বার খাই, তার পর ঠিক করি আর খাবনা। সে সময়েই চোখে পড়ে ঘরের কোনায় দূরে দাঁড়ানো আশুন। তারপর কাঠি রেখে দেওয়ার সাহস আমার আর নেই। তার মুখে ভয় ও আশার চিহ্ন—ভয় এইজন্যে যে রান্না খারাপ হয়েছে, আশা এই জন্যে যে তা আমাদের ভালো লাগবে। আমি বুঝতে পারি প্রায় সবটা পড়ে থাকলে সে হতাশ হবে, দুঃখ পাবে। তাই সাহসে ভর করে মুখ হা করে ভেতরে ঢেলে দেই, ঠিক ছাংফু-এর মত দ্রুত খাওয়া। তখনই কাউকে জোর করে খাওয়ানোর কষ্ট বুঝতে পারি। আমার মনে পড়ে ছোটবেলায় গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে কৃমির ঔষধ খাওয়ার কথা। তখন এরকম কষ্ট হত।আমার কোন ক্ষোভ হয় নি। খালি বাটি নিতে এসে তার মুখের আধো হাসি আমার সব অস্বস্তি ভুলিয়ে দেয়। সে রাতে বদহজমের কারণে ভালোভাবে ঘুমোতে না পারলেও, দুঃস্বপ্ন দেখলেও কামনা করেছি তার জীবন সুখী হোক, তার ভালোর জন্য পৃথিবীটা বদলে যাক। এসব চিন্তা অতীতের স্বপ্নের অবশেষ। পরমুহূর্তে নিজে হেসে উঠি এবং তাড়াতাড়ি সেগুলো ভুলে যাই।

"আগে জানতাম না সে কৃত্রিম ফুলের জন্য মার খেয়েছে। কিন্তু মায়ের কাছে শুনতেই পায়েসের কথা মনে পড়ে এবং আমি অহেতুক মনোযোগী হয়ে উঠি। প্রথমে থাইইউয়ান শহরে খোঁজ করি, কিন্তু কোন দোকানে সেগুলো ছিল না। শুধু জিনান শহরে যাবার পর ......"

ক্যামেলিয়ার বাঁকানো ডাল থেকে বরফ ঝরে পড়ায় জানালার বাইরে একটা মর্মর শব্দ ওঠে। তারপর গাছের ডালগুলো সোজা হয়ে যায়। মোটা ও কালো পর্ণরাজি এবং রক্ত রাঙা ফুল আরো বেশী চোখে পড়ে। আকাশের রং আরো পরিষ্কার হয়ে যায়। বোধহয় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় ছোট্ট চড়ুই কিচির মিচির করতে থাকে। বরফ ঢাকা মাটিতে তাদের খাওয়ার কিছু নেই তাই হয়ত তাড়াতাড়ি নীড়ে ফিরে যাবে।

সে একমুহূর্ত জানালা দিয়ে তাকায়। ফিরে এক কাপ মদ পান করে। সিগারেটে কয়েকটি টান মারে। তারপর বলতে থাকে, "শুধু জিনান যাবার পর আমি কিছু কৃত্রিম ফুল কিনি। জানতাম না এ ধরণের ফুলের জন্যই সে মার খেয়েছে কিনা, কিন্তু এগুলোও ভেলভেটের তৈরী। জানতাম না তার গভীর না হাল্কা রং পছন্দ। তাই একগোছা লাল ও একগোছা গোলাপী ফুল কিনি এবং সবগুলো এখানে নিয়ে আসি।

"ঠিক আজ বিকেলে দুপুরের খাওয়ার পর পরই আমি ছাংফুকে দেখতে যাই। এজন্যেই এক দিন বেশী থেকেছি। তার বাড়ী সেখানে ঠিকই আছে, শুধু একটু অন্ধকার দেখাচ্ছে। অথবা সেটা শুধু কল্পনাও হতে পারে। তার ছেলে এবং দ্বিতীয় মেয়ে আযাও গেটে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনেই বড়ো হয়েছে। আযাও বোনের চেয়ে বেশ আলাদা এবং তাকে ফ্যাকাসে দেখায়। কিন্তু আমাকে তাদের বাড়ীর দিকে আসতে দেখেই দৌড়ে ভেতরে চলে যায়। ছোট ছেলেকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি ছাংফু বাড়ীতে নেই। 'আর তোমার বড়দি?' সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ বড় হয়ে যায়, জানতে চায় কেন তার খোঁজ করছি। উপরন্তু তাকে খুব ক্ষিপ্ত মনে হয়, যেন আমাকে মারবে। ইতস্ততঃ করে সরে যাই। আজকাল আমি আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাই না ......

"আগের চেয়ে এখন লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে আমার কতখানি ভয় সে সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই। ভালোকরেই জানি আমি কত খানি অনাহূত, কেন জোর করে নিজেকে অন্যের ওপর চাপাব? কিন্তু এবার বুঝতে পারি আমার দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হবে। তাই একটু ভেবে তাদের বাড়ীর উল্টো দিকের লাকড়ির দোকানে যাই। দোকানীর মা বুড়ী ফা তখনো সেখানে আছে, এবং আমাকে চিনতে পারে। সে আমাকে দোকানের ভেতর বসতে

বলে। সামান্য কুশলাদির পর তাকে বলি কেন S শহরে ফিরে এসেছি এবং ছাংফুর খোঁজ করছি। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতেই আমার টনক নড়ে :

" 'কি দুর্ভাগ্য, আপনার আনা ফুলগুলো পরার কপাল নেই আশুন-এর।'

"তারপর আমাকে সে পুরো ঘটনাটা বলে। বলে, 'বোধহয় গত বসন্তের কথা। আশুন শুকনো এবং মনমরা দেখাতে থাকে। তারপর প্রায়ই সে হঠাৎ হঠাৎ কেঁদে ওঠে এবং জিজ্ঞেস করলেও কিছু বলে না। কখনো কখনো সে সারারাত কাঁদত। শেষ পর্যন্ত ছাংফু মেজাজ হারিয়ে তাকে গাল দিত, বলত বিয়ের জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে পাগল হয়ে গেছে। হেমন্তে, প্রথমে তার ঠাণ্ডা লাগে, তারপর বিছানা নেয়। এরপর আর কখনো ওঠে নি। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে সে ছাংফুকে বলে, অনেক আগেই সে তার মায়ের মত হয়ে গেছে। প্রায়ই কাশির সঙ্গে রক্ত আসে এবং রাতের বেলা ঘাম হয়। সে এটা লুকিয়ে রাখে এই ভয়ে যে সে তার জন্য চিন্তা করবে। এক সন্ধ্যায় তার চাচা ছাংগেং এসে টাকা দাবী করে। — সে প্রায়ই তা করত। না দিলে সে হেসে বলত, "বড়াই করো না। তোমার মানুষটি আমার সমান নয়।" এটা তাকে বিচলিত করে। লজ্জায় সে জিজ্ঞেস করতে পারত না, শুধু কাঁদত। একথা জানা মাত্রই ছাংফু তাকে বলে তার হবু বর কত ভালো মানুষ; কিন্তু ততদিনে অনেক দেরী হয়ে গেছে। তাছাড়া সে তাকে বিশ্বেসও করত না। সে বলত, "ভালোই হয়েছে আমার এ দশা হয়েছে। এখন আর কিছুই যায় আসে না।" '

"বুড়ী আরো বলে, 'তার বর যদি ছাংগেং-এর মত এত ভালো না হয় তাহলে খুব দুঃখজনক ব্যাপার হবে। সে মুরগী চোরও হবে না, তাহলে কেমনতরো মানুষ হবে? কিন্তু যখন সে তার শেষকৃত্যে আসে তখন নিজের চোখে আমি তাকে দেখেছি, তার কাপড় চোপড় পরিষ্কার এবং সে খুব সুদর্শন। কাঁদতে কাঁদতে বলেছে বিয়ের জন্য এ কয়বছর নৌকায় অনেক কষ্ট করে সে পয়সা জমিয়েছে, কিন্তু এখন কনেই মরে গেছে। বোঝা যায় সে খুব ভালো মানুষ এবং ছাংগেং যা বলেছে সব মিথ্যা। দুঃখ হয় আশুন এমন একটা রাসকেল মিথ্যাবাদীকে বিশ্বাস করেছিল এবং বিনা কারণে মরেছে। কিন্তু আমরা কাউকে দোষ দিতে পারি না, এটা আশুন এর কপাল।'

"এই যেহেতু ঘটনা, তাই আমার কাজও ফুরিয়ে যায়। কিন্তু যে দু গোছা ফুল এনেছি তার কি হবে? সেগুলো আযাওকে দেয়ার জন্য তাকে বলি। এই আযাও আমাকে দেখা মাত্রই পালিয়ে যায়, যেন আমি নেকড়ে অথবা দৈত্য। আমি সত্যিই সেগুলো তাকে দিতে চাই নি। যাহোক, আমি সেগুলো তাকে দেই। মা'কে বলি আশুন সেগুলো পেয়ে খুশী হয়েছে এবং তাই হবে। এসব

তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে কে মাথা ঘামায়? যে কেউ কোনভাবে সেটা কাটাতে চায়। নববর্ষ কাটানোর পর আগের মতই কনফুসীয় মতবাদ পড়ানোর জন্য আমি ফিরে যাব।"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, "তুমি কি তা পড়াচ্ছ?"

"নিশ্চয়ই। তুমি কি ভেবেছিলে আমি ইংরেজী পড়াচ্ছি? প্রথমে আমার দু'জন ছাত্র ছিল, একজন পড়ত «গানের বই», অন্যজন«মেনসিয়াস»। সম্প্রতি একজন ছাত্রী পেয়েছি, যে «মেয়েদের নীতিমালা» পড়ছে। আমি এমনকি অংকও পড়াই না। এই নয় যে পড়াব না, কিন্তু তারা তা চায় না।"

"আমি সত্যি কখনো ভাবতে পারি নি তুমি এমন বই পড়াবে।"

"তাদের বাবা চায় তারা এগুলো পড়ুক। আমি বিদেশী, তাই সবকিছু আমার কাছে সমান। এসব তুচ্ছ ব্যাপারে কে মাথা ঘামায়? এসব বিষয়ে গুরুত্ব দেয়ার কোন দরকার নেই।"

তার মুখ এত লাল হয়ে উঠেছে যেন সে যথেষ্ট মাতাল, কিন্তু তার চোখের সে দীপ্তি আর নেই। আমার হাই উঠল, কিন্তু কিছুক্ষণ বলার কিছুই পেলাম না। কয়েকজন খদ্দের ওঠার সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল। প্রথম জন বেঁটে, গোলগাল ও ফোলা মুখ, দ্বিতীয় জন লম্বা, লাল নাক। তাদের পেছনে আছে আরো কয়েকজন। তারা আসার সময় পুরো দোতলা নড়ে ওঠে। ল্যু ওয়েইফু-র দিকে তাকাই, তার চোখ আমাকেই খুঁজছে। তারপর বেয়ারাকে বললাম বিল আনতে।

যাবার জন্য তৈরী হতে হতে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার বেতন কি বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট?"

"মাসে পাই বিশ টাকা, যথেষ্ট নয়।"

"ভবিষ্যতে কি করতে চাও?"

"ভবিষ্যতে? আমি জানি না। শুধু একবার ভাব : অতীতে আমরা যেভাবে ভেবেছি সেভাবে কি কোন জিনিষ ঘটেছে? আমি কোন ব্যাপারে নিশ্চিত নই, এমনকি কাল কি করব সে ব্যাপারেও না, এমনকি পরমুহূর্তে কি করব সে ব্যাপারেও না ......"

বেয়ারা বিল এনে আমাকেই দেয়। ল্যু ওয়েইফু আর আগের মত ভদ্রতা দেখাল না, শুধু আমার দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর সিগারেট পান করতে করতে আমাকেই বিল দেয়ার সুযোগ দিল।

শুঁড়ীখানা থেকে আমরা একসঙ্গে বেরিয়ে যাই। তার হোটেল আমার যাবার পথের উল্টো দিকে, তাই দরজায় আমরা বিদায় জানাই। হোটেলের দিকে

যেতে যেতে ঠাণ্ডা বাতাস এবং বরফ এসে মুখে লাগে। তবু নিজেকে বেশ সতেজ মনে হয়। আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে সাদা, ভেসে যাওয়া গভীর বরফের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার বাড়ী ও রাস্তা।

ফেব্রুয়ারী ১৬, ১৯২৪

সুখী পরিবার

—স্যু ছিনওয়েন এর রীতি অনুযায়ী

"......একজন যা ভাবে তাই লেখে : অনেকটা সূর্যালোকের মত, অফুরন্ত ঔজ্জ্বল্য থেকে উৎসারিত, লোহা বা পাথরে আঘাত করলে উৎসারিত স্ফুলিঙ্গের মত নয়। এটাই একমাত্র সত্যিকারের শিল্প। এ ধরণের লেখকই সত্যিকারের শিল্পী...... কিন্তু আমি...... আমি কোন পর্যায়ের?"

এ পর্যন্ত ভেবেই সে হঠাৎ বিছানা থেকে লাফিয়ে নামে। তার মনে হয় সংসার চালানোর জন্য লিখে অবশ্যই কিছু পয়সা রোজগার করা উচিত। ইতোমধ্যেই সে "সুখী মাসিক" মুদ্রাকরের কাছে পাণ্ডুলিপি পাঠানো ঠিক করেছে, কেননা সম্মানীর হার বেশ উচুঁ। কিন্তু সেক্ষেত্রে বিষয়বস্তু হবে সীমিত, না হলে লেখাই গৃহীত হবে না। ঠিক আছে সীমিতই হোক। 'ইয়াং জেনারেশনের' মনে কোন প্রশ্নটাগুলি সবচে বেশী স্থান দখল করে আছে?...... নিশ্চয়ই গুটিকয়েক নয়, হয়ত অনেকগুলো, প্রেম, বিয়ে, পরিবার সম্পর্কে...... নিশ্চয়ই বহু লোক এসব প্রশ্ন নিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে আছে, এমনকি এখন আলোচনাও করছে। তাহলে, পরিবার নিয়ে লেখা যাক! কিন্তু কিভাবে লেখা যায়?...... অন্যথায় তা গৃহীত হবে না! কুলক্ষণে কিছু ভেবে লাভ কি? তবু......

বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে চার পাঁচ কদমে সে টেবিলের কাছে পেঁৗছে যায়। বসে সবুজ লাইনওয়ালা কাগজ নিয়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে শিরোনামা লেখে : "সুখী পরিবার"।

সঙ্গে সঙ্গে তার কলম থেমে যায়। মাথা তুলে সে সিলিং-এর দিকে চোখ রাখে এবং এই সুখী পরিবারের জন্য একটা পরিবেশ ভাবার চিন্তা করে।

তার মনে হল "বেইজিং? তাতে হবে না। এটা খুব মৃত শহর, এমনকি আবহাওয়া পর্যন্ত। এমনকি এই পরিবারের চারদিকে উচুঁ দেয়াল তুললেও বাতাসকে ঠেকানো যাবে না। না, তাতে চলবে না। জিয়াংসু এবং যেজিয়াং যেকোন দিন যুদ্ধ শুরু করতে পারে, এবং ফুজিয়ান প্রশ্নের বাইরে। সিচুয়ান? গুয়াংডোং? এগুলোও যুদ্ধের ভেতর। শানডোং অথবা হোনান হলে কেমন হয়? ......না, এর যেকোন একটা অপহৃত হতে পারে, তাহলে সুখী পরিবার অসুখী হয়ে যাবে। শাংহাই এবং থিয়ানজিন-এর 'বিদেশী এলাকায়' ভাড়া খুব বেশী ......বিদেশে কোথাও? হাস্যকর। আমি জানি না ইয়ুন্নান এবং গুইযৌ কেমন, যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব দুর্বল ......"

সে মাথা ঘামাতে থাকে। ভালো জায়গার কথা চিন্তা করতে না পেরে মোটামুটি ঠিক করে A। যাহোক, তার পর সে ভাবে: আজকাল স্থান ও লোকের নামের বানানের ব্যাপারে ইংরেজী বর্ণমালা ব্যবহারে অনেকেই আপত্তি জানায়, কারণ তাতে পাঠকের উৎসাহ কমে যায়। বোধ হয় সুবিধের জন্য গল্পে এবার তা ব্যবহার না করাই ভালো। তা হলে কোনটা ভালো জায়গা হবে? হুনানেও যুদ্ধ চলছে, ডালিয়ানে আবার ভাড়া বেড়েছে। শুনেছি ছাহার, জিলিন এবং হেইলোং-জিয়াং-এ রাহাজানি হয়, তাহলে তাতেও চলবে না ......"

আরেকটি ভালো জায়গার জন্য সে আবার মাথা ঘামাতে থাকে, কিন্তু কোন লাভ হয় না। তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক করে A হবে সেই জায়গা যেখানে তার সুখী পরিবার বাস করবে।

"যাহোক, এই সুখী পরিবারকে A -এই থাকতে হবে। এ নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। স্বভাবতঃই পরিবারে রয়েছে স্বামী ও স্ত্রী — কর্তা ও গিন্নী — যারা ভালোবেসে বিয়ে করেছে। তাদের বিয়ের কাবিননামায় চল্লিশটির বেশী শর্ত রয়েছে, তাই তাদের রয়েছে বিশেষ সমতা ও পূর্ণ স্বাধীনতা। উপরন্তু তারা দু'জনেই উচ্চ শিক্ষিত এবং 'সংস্কৃত এলিট' গোষ্ঠীর ......। জাপান ফেরতা ছাত্র আর ফ্যাশন নয়, তাই ধরা যাক তারা পশ্চিম ফেরতা ছাত্র। বাড়ীর কর্তা সবসময় বিদেশী স্যুট পরে, তার কলার বরফের মত সাদা। তার স্ত্রীর চুল সামনের দিকে চড়ুই-এর বাসার মত কোঁকড়ানো, তার মুক্তার মত সাদা দাঁত সবসময় উঁকি মারে, কিন্তু সে চীনা পোশাক পরে ......"

"তাতে হবে না, তাতে হবে না। পঁচিশ ক্যাটি!" জানালার বাইরে পুরুষের গলা শুনতে পেয়ে সে অনিচ্ছাভরে তাকায়। জানালার পর্দা দিয়ে আসা সূর্যের আলো তার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, শুনতে পায় লাকড়ির বোঝা ফেলার শব্দ। আবার ফিরে সে ভাবে, "এতে কিছু যায় আসে না। 'পঁচিশ ক্যাটি', কিসের?

— তারা 'সংস্কৃত এলিট', শিল্পের জন্য নিবেদিত। যেহেতু তারা উভয়েই সুখী পরিবেশে গড়ে উঠেছে তাই রুশীয় উপন্যাস পছন্দ করে না। অধিকাংশ রুশীয় উপন্যাসে নীচু শ্রেণীর বর্ণনা, তাই সেগুলো এমন পরিবারের উপযুক্ত নয়। 'পঁচিশ ক্যাটি?' কুছ পরোয়া নেই। তাহলে তারা কি ধরণের বই পড়ে? — বায়রণের কবিতা? কীটস? তাতে চলবে না, কোনটাই নিরাপদ নয় — আহ, পেয়েছি! তাদের দু'জনেই পড়তে পছন্দ করে «আদর্শ স্বামী»। যদিও নিজেও এবই পড়িনি, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা এই বইয়ের এত প্রশংসা করে যে আমি নিশ্চিত এই দম্পতিও তা উপভোগ করে। এবই তুমি পড়, আমি পড়ি — তাদের প্রত্যেকের এক কপি বই আছে, পরিবারে সর্বমোট দু কপি বই . . . . . ."

পেটের ভেতর শূন্যতা বোধ করতেই সে কলম রেখে দেয়। হাতের ওপর মাথা রাখে, অক্ষধূরার উপর দাঁড়ানো ভূমণ্ডলের মত।

সে ভাবে, ". . . . . . তাদের দু'জন মাত্র দুপুরের খাওয়া খাচ্ছে। তুষার শুভ্র কাপড়ে টেবিল ঢাকা, বাবুর্চি খাওয়া নিয়ে আসছে — চীনা খাবার। 'পঁচিশ ক্যাটি' কিসের? কুছ পরোয়া নেই। চীনা খাবার হবে কেন? পশ্চিমারা বলে চীনা খাবার সবচে প্রগতিশীল, খেতে সবচে মজা, সবচে স্বাস্থ্যসম্মত ; তাই তারা চীনা খাবার খায়। প্রথম বাটি আনা হয়েছে, কিন্তু এই প্রথম বাটিতে কি আছে?

"লাকড়ী . . . . . ."

চমকে উঠে সে মাথা ঘুরায়। দেখতে পায় নিজের গিন্নী তার বাঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঘোলাটে চোখজোড়া তার মুখের ওপর।

"কি" সে ক্ষেপে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, বুঝতে পারে গিন্নী আসায় তার কাজের ক্ষতি হয়েছে।

"সব লাকড়ী শেষ, তাই আজকে আরো কিছু কিনেছি। গত বার পর্যন্ত দশ ক্যাটির দাম ছিল নগদ দু'শ চল্লিশ, কিন্তু আজকে সে দাবী করছে দু'শ ষাট। ধর যদি তাকে আড়াই'শ দেই?"

"ঠিক আছে, আড়াই'শ হোক।"

"সে ওজনে খুব ফাঁকি দিয়েছে। সে বলছে সাড়ে চব্বিশ ক্যাটি, কিন্তু ধর যদি আমি গুনি সাড়ে তেইশ?"

"ঠিক আছে। সাড়ে তেইশ ক্যাটি গোন।"

"তাহলে পাঁচে পাঁচে পঁচিশ, তিন পাঁচে পনেরো . . . . . ."

"ওহ, পাঁচে পাঁচে পঁচিশ, তিন পাঁচে পনেরো . . . . . ." সে আরো এগোতে

পারে না। একমুহূর্ত থেমে যে সবুজ লাইনওয়ালা কাগজে লিখেছিল "সুখী পরিবার" তাতে কলম দিয়ে অংক কষতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর বলার জন্য সে মাথা তোলে : "নগদ পাঁচ'শ আশি।"

"তাহলে আমার কাছে যথেষ্ট নেই। আরো আশি বা নব্বই কম......"

সে টেবিলের ড্রয়ার খুলে সমস্ত টাকা বের করে — বিশ এবং ত্রিশ তাম্রমুদ্রার মাঝামাঝি — তারপর গিন্নীর বাড়ানো হাতে তা দেয়। তারপর তাকে চলে যেতে দেখে এবং টেবিলে ফিরে বসে। যেন মাথার ভেতর লাকড়ি ঢুকেছে। পাঁচে পাঁচে পঁচিশ — যত্রতত্র আরবী সংখ্যা তার মগজে তখনো আটকে আছে। সে হাই তুলে আবার জোরে দম ফেলে, যেন এভাবে সে 'লাকড়ী' পাঁচে পাঁচে পঁচিশ, এবং মাথায় আটকে থাকা আরবী সংখ্যা দূর করে দিতে পারবে। দম ফেলার পর মনে হয় বুক একটু হাল্কা হয়েছে। তারপর সে আবার এলোমেলো ভাবতে থাকে :

"কোন ডিশ? যতক্ষণ উল্টো কিছু হবে, ততক্ষণ কিছু যায় আসে না। ভাজা শূয়রের মাংস অথবা চিংড়ি, সামুদ্রিক শসা খুব সাধারণ খাবার। আমি তাদের 'ড্রাগন ও বাঘ' খাওয়ানো উচিত। কিন্তু সেটা কি ঠিক? কেউ কেউ বলে এটা সাপ এবং বিড়ালের তৈরী, গুয়াংডোং-এর উঁচু শ্রেণীর খাবার। শুধু বিশেষ ভোজে খাওয়া হয়। এক জিয়াংসু রেস্তোরার খাবার তালিকায় এই নাম দেখেছি। জিয়াংসুর লোকজনের সাপ অথবা বিড়াল খাওয়ার কথা নয়। ঐ যে একজন বলেছে, এটা নিশ্চয়ই ব্যাঙ ও বান মাছের তৈরী। তা হলে এখন এই দম্পতি দেশের কোন অঞ্চলের হবে? কুছ পরোয়া নেই। দেশের যে কোন অঞ্চলের লোক তাদের সুখী পরিবারের ক্ষতি না করে সাপ ও বিড়াল ডিশ খেতে পারে (অথবা ব্যাঙ ও বান মাছের)। যেভাবেই হোক, প্রথম ডিশটা হতে হবে 'ড্রাগন এবং বাঘ' তাতে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

"এখন টেবিলের মাঝখানে রয়েছে এই 'ড্রাগন ও বাঘ' খাবারের পাত্র। তারা একসঙ্গে কাঠি তোলে, খাবারের দিকে তাক করে, একে অপরের দিকে মিষ্টি করে হাসে, বিদেশী ভাষায় বলতে থাকে :

" 'My dear, please.'

" 'Please you eat first, my dear.'

" 'oh no, please you !.'

"তারপর তারা একসঙ্গে কাঠি তোলে এবং একসঙ্গে সাপের একটুকরো মাংস তোলে — না, না, সাপের মাংস খুব অদ্ভুত শোনায়, বান মাছের টুকরো বলাই ভালো হবে। তা হলে, ঠিক হয়ে গেল 'ড্রাগন ও বাঘ' খাবার ব্যাঙ ও বান



"তাহলে আমার কাছে যথেষ্ট নেই।
আরো আশি বা নব্বই কম......"

মাছের তৈরী। তারা একসঙ্গে বান মাছের দু'টুকরো তুলে নেয়, ঠিক একই আয়তনের। পাঁচে পাঁচে পঁচিশ, তিন পাঁচে . . . . . . কুছ্ পরোয়া নেই। একই সঙ্গে তারা মুখে পোরে . . . . . .'' ইচ্ছের বিরুদ্ধে সে ঘুরতে চায় কেননা পেছনে সোরগোল ও আসা-যাওয়া সম্পর্কে সে সচেতন। সে ঘেমে ওঠে এবং চিন্তা করতে থাকে :

''এটা ভাবাবেগপূর্ণ মনে হচ্ছে। কোন পরিবার এভাবে ব্যবহার করবে না। কিসের জন্য আমার মন এত আনচান করছে? ভয় হয় এমন ভালো বিষয় কখনোই লেখা হবে না — অথবা বোধ হয় তাদের ফেরত্তা ছাত্র হবার প্রয়োজন নেই, যারা চীনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছে তারাও এমনি আচরণ করবে। তারা দু'জনেই বিশ্ববিদ্যালযের গ্রাজুয়েট, 'সংস্কৃত এলিট,' এলিট, ... লোকটি একজন লেখক, মহিলাও একজন লেখিকা অথবা সাহিত্য প্রেমিক। অথবা মহিলা একজন কবি, লোকটি কবিতা প্রেমিক, নারীত্বকে সম্মান করে। অথবা

শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না, ফিরে তাকায়।

তার পেছনে বইয়ের শেলফের পাশে বাঁধাকপির স্তূপ দেখা যাচ্ছে। নীচে তিনটা, তার উপর দুটো, সবচে উপরে একটা। অনেকটা ইংরেজী A -র মত।

''ওহ'' চমকে উঠে সে হাই তোলে। মনে হচ্ছে গাল পুড়ে যাচ্ছে, শিরদাঁড়ায় কাঁটা উঠা নামা করছে। ''আহ।'' শিরদাঁড়ায় কাঁটার অনুভূতি থেকে রেহাই পাবার জন্য সে বড় করে দম ফেলে, তারপর ভাবতে থাকে, ''সুখী পরিবারের বাড়ীতে অবশ্যই অনেক কামরা থাকতে হবে। গুদামে বাঁধাকপির মত জিনিষ রাখা হয়। কর্তার পড়ার ঘর আলাদা, দেয়াল জুড়ে বইয়ের শেলফ, স্বভাবতঃই সেখানে কোন বাঁধাকপি নেই। বইয়ের শেলফগুলো চীনা ও বিদেশী বইয়ে ভর্তি, অবশ্যই 'আদর্শ স্বামী' বইটিও আছে — সবমিলিয়ে দু কপি। শোবার ঘর আলাদা, ঘরে একটি তামার খাট বা প্রথম জেলের কয়েদীদের তৈরী একটি সাধারণ এলম কাঠের খাট হলেও চলবে। বিছানার নীচ খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন . . . . . .।'' সে নিজের বিছানার নীচে তাকায়। সব লাকড়ী শেষ, মরা সাপের মত পেঁচানো কিছু খড়ের দড়ি পড়ে আছে।

''সাড়ে তেইশ ক্যাটি। . . . . . .'' তার মনে হয় বিছানার নীচে লাকড়ীর অন্তহীন পাহাড় গড়ে উঠছে। তার মাথা আবার ব্যথা করে। সে উঠে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে যায় দরজা বন্ধ করার জন্য। দরজায় হাত রাখা মাত্র বুঝতে পারে বাড়াবাড়ি হচ্ছে। ধুলাভর্তি পর্দা টানতে গিয়ে সে ভাবে, ''এর সাহায্যে একজনকে বন্দী করা এড়ানো যায়, আবার দরজা খোলা রাখার অস্বস্তিও এড়ানো যায়।

এটা 'মধ্যপন্থার'[1] সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।"

"......তাহলে, কর্তার পড়ার ঘরের দরজা সবসময় বন্ধ থাকে।" সে ফিরে গিয়ে বসে ভাবতে থাকে, "যে কেউ কোন কাজে এলে অবশ্যই প্রথমে দরজায় আঘাত করবে, ভেতরে ঢোকার জন্য অনুমতি নেবে। এটাই একমাত্র কাজ যা করা উচিত। এখন ধরা যাক, কর্তা তাঁর পড়ার ঘরে বসে আছেন এবং সাহিত্য নিয়ে আলোচনার জন্য এলেন গিন্নী, তিনিও আঘাত করবেন...... অবশ্য একজন আশ্বস্ত হতে পারে— তিনি কোন বাঁধাকপি ভেতরে আনবেন না।

"'Come in, please, my dear.'

"সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য কর্তার সময় না থাকলে কি হবে? দরজার মৃদু আঘাত শুনে তিনি কি তাঁকে উপেক্ষা করবেন? তাতে বোধ হয় চলবে না। বোধ হয় এর সব কিছুই 'আদর্শ স্বামী' বইতে বলা আছে— সেটা নিশ্চয়ই চমৎকার উপন্যাস। এ লেখার টাকা পেলে আমাকে অবশ্যই ঐ বইয়ের একটি কপি কিনতে হবে পড়ার জন্য।"

চড়!

তার পিঠ শক্ত হয়ে যায়। অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে তাদের তিন বছরের মেয়ের মাথায় স্ত্রীর আঘাতের ফলেই এই শব্দ।

তার পিঠ তখনো শক্ত। মেয়ের ফোঁপানি শুনতে শুনতে সে ভাবে, "সুখী পরিবারে...... দেরীতে ছেলেমেয়ের জন্ম হয়। হ্যাঁ, দেরীতে। অথবা কোন ছেলেমেয়ে না থাকাই বোধ হয় ভালো হবে, বন্ধনহীন মাত্র দুজন— অথবা হোটেলে থাকাই বোধ হয় ভালো হবে, কোন কিছু ছাড়াই একজন লোক......" মেয়ের ফোঁপানি বাড়ায় উঠে দাঁড়িয়ে পর্দা সরিয়ে সে ভাবে, "ছেলে-মেয়েরা যখন চারপাশে কাঁদছে তখন 'পুঁজি' বইটি লিখেছিলেন কার্ল মার্কস। তিনি নিশ্চয়ই মহান লোক......" সে বাইরে যায়। বাইরের দরজা খোলে এবং তার নাকে এসে লাগে প্যারাফিনের তীব্র গন্ধ। মুখ নীচু করে মেয়েটি দরোজার দক্ষিণে শুয়ে আছে। তাকে দেখতে পেয়েই সে আরো জোরে কাঁদতে থাকে।

"সেখানে, সেখানে সব ঠিক আছে। কেঁদো না, কেঁদো না। লক্ষী মেয়ে।" তাকে তোলার জন্য সে নীচু হয়।

এটা করে সে ঘুরে তাকিয়ে দেখে দরজার বাম পাশে তার ক্ষিপ্ত বউ দাঁড়িয়ে, তার পিঠও টান করা, হাতজোড়া নিতম্বের উপর, যেন ব্যায়াম করতে যাচ্ছে।

"তোমাকে এসেও আমাকে গাল দিতে হয়। তুমি কোন কাজ করো না,

শুধু ঝামেলা বাড়াও — এমনকি প্যারাফিন বাতিটিও উল্টে গেছে। আজ সন্ধ্যায় কি জ্বালাব? ......"

"সব, সব ঠিক আছে! কেঁদো না, কেঁদো না।" স্ত্রীর কাঁপা গলা উপেক্ষা করে সে মেয়েকে ঘরের ভেতর নিয়ে যায় এবং মাথায় হাত বুলাতে থাকে। সে আবার বলে, "লক্ষী মেয়ে।" তারপর সে তাকে নামিয়ে দেয়, একটি চেয়ার টানে এবং বসে পড়ে। পায়ের মাঝখানে তাকে রেখে সে হাত তোলে। বলে, "কেঁদো না, লক্ষী মেয়ে। বাবা তোমার জন্য 'বিড়াল' খেলবে।" একই সময়ে সে ঘাড় বাঁকায়, জিহ্বা বের করে দূর থেকে দুবার হাতের তালু চাটে, তার পর গোলাকারভাবে সেগুলো মুখের কাছে নিয়ে আসে।

"আহা! পুসি।" মেয়েটি হাসতে শুরু করে।

"এইত, এইত, পুসি।" সে আরো কয়েকবার হাত ঘোরায়, তার পর বন্ধ করে। চোখে জল নিয়ে মেয়েটি তখনো হাসছে। হঠাৎ তার মনে হয় তার মিষ্টি, নির্দোষ মুখ পাঁচ বছর আগে ঠিক তার মায়ের মুখের মত, বিশেষ করে তার উজ্জ্বল ঠোঁট জোড়া, যদিও সেগুলো আরো ছোট। সে এক উজ্জ্বল শীতের দিন যখন সে তার জন্য সব বাধা অতিক্রমের, সব কিছু বিসর্জনের সিদ্ধান্ত শুনতে পায়, চোখে জল নিয়ে হাসতে হাসতে সেও ঠিক এমনিভাবে তার দিকে তাকিয়ে ছিল । সে হতাশ হয়ে বসে পড়ে, যেন একটু নেশাগ্রস্ত।

ভাবে, "আহা, মিষ্টি ঠোঁট।"

হঠাৎ দরজার পর্দা সরে গিয়ে ভেতরে ঢোকানো হয় লাকড়ী।

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে এলে সে দেখতে পায় তখনো চোখে জল নিয়ে লাল ঠোঁট জোড়া ফাঁক করে মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে আছে। "ঠোঁট ......" সে পাশ কাটিয়ে তাকায় লাকড়ী কোথায় আনা হচ্ছে দেখার জন্য। "বোধ হয় এটা কিছু না, পাঁচে পাঁচে পঁচিশ, নয়-এ নয়-এ একাশি, সেই একই কথা! ...... এবং এক জোড়া বিষন্ন চোখ ......" একথা ভাবতে ভাবতে শিরোনাম ও সংখ্যা লেখা সবুজ লাইন দেয়া কাগজটি ছিনিয়ে নেয়, মুড়ে ফেলে, আবার খোলে মেয়ের নাক ও চোখ মুছে দেয়ার জন্য। "লক্ষী মেয়ে, গিয়ে নিজে নিজে খেলা কর।" বলতে বলতে সে তাকে সরিয়ে দেয় এবং কাগজের দলাটি আবর্জনার ঝুড়িতে ছুড়ে মারে।

তৎক্ষণাৎ মেয়ের জন্য তার দুঃখ হয়। তার চোখজোড়া চলে যাওয়া মেয়েটিকে অনুসরণ করে, কানে আসে লাকড়ীর শব্দ। মনোযোগ দেয়ার জন্য সে ফিরে চোখ বন্ধ করে, সকল এলোমেলো চিন্তা হটিয়ে দেয়ার জন্য, চুপচাপ ও শান্তভাবে সেখানে বসে থাকে।

দেখতে পায় একটি গোল, কালো বর্ডার দেয়া, মাঝখানে গোলাপী ফুল তার বাম চোখের বাম দিক থেকে ঠিক উল্টো দিকে গিয়ে হারিয়ে গেল, তার পর আসে মাঝখানে গভীর সবুজ ওয়ালা একটি উজ্জ্বল সবুজ ফুল, সবশেষে এক বোঝা বাঁধাকপি যেগুলো তার চোখের সামনে বিরাট ইংরেজী অক্ষর A -র মত ধরা দেয়।

ফেব্রুয়ারী ১৮, ১৯২৪

টীকা

1 কনফুসিয়াসের বাণী।

সাবান

পড়ন্ত আলোয় উত্তরের জানালার দিকে পিঠ দিয়ে আট বছরের মেয়ে সিউ-এরকে নিয়ে মৃতদের জন্য কাগুজে টাকা লাগাচ্ছিল সিমিং-এর বউ। তখনই সে শুনতে পায় কাপড়ের জুতো পায়ে কারো মন্থর ও ভারী পায়ের শব্দ। বুঝতে পারে স্বামী ফিরে এসেছে। কোন নজর না দিয়েই সে টাকা লাগাতে থাকে। কিন্তু কাপড়ের জুতোর শব্দ ক্রমেই কাছে আসতে থাকে, শেষ পর্যন্ত তার কাছে এসে থামে। তখন সে চোখের সামনে সিমিংকে না দেখে পারে না। ঘাড় কুঁজো করে জ্যাকেটের নীচে কাপড়ের গাউনের পকেটে সে এলোমেলো কি যেন হাতড়াচ্ছে।

আঁতিপাঁতি করে খোঁজার পর অবশেষে ছোট্ট আয়তাকার একটি প্যাকেট বের করে সে স্ত্রীর হাতে দেয়। নিতে নিতে একটা অচেনা গন্ধ তার নাকে লাগে, অনেকটা জলপাইয়ের মত। সবুজ মোড়কের ওপর ছোট্ট ছোট্ট নকশাওয়ালা একটি সোনালী সীল। নেয়ার জন্য ও দেখার জন্য সামনে এগিয়ে আসে সিউএর, কিন্তু দ্রুত তাকে সরিয়ে দেয় তার মা।

প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, "কেনাকাটা করছিলে?

"হ্যাঁ।" সে তার হাতের প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সবুজ মোড়কটি খোলা হয়। তার নীচে আর একটি খুব পাতলা কাগজ, সেটাও সবুজ। কাগজটা খুলে না ফেলা পর্যন্ত জিনিষটা চোখে পড়ে নি। চকচকে ও শক্ত, সবুজ, কিন্তু খুব সুন্দর নকশা করা। পাতলা কাগজটি ঘিয়ে রংয়ের। জল-পাইয়ের মত অথচ অজানা গন্ধটা আরো তীব্র হয়ে ওঠে।

"এটা সত্যিই খুব ভালো সাবান।"

সে সাবানটা ছোট্ট শিশুর মত তার নাকের কাছে তুলে ধরে এবং বলতে

বলতে শুঁকে দেখে।

"ওহ . . . . . . হ্যাঁ। ভবিষ্যতে শুধু এটা ব্যবহার করবে . . . . . ."

কথা বলার সময় বউ লক্ষ্য করে স্বামী তার ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। কখনো কখনো ঘাড় ঘষতে গিয়ে আঙুলে কর্কশ লেগেছে। জানে এটা বহুদিনের জমা ময়লা, কিন্তু কখনো তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। এখন চোখের সামনে এই অচেনা গন্ধের বিদেশী সবুজ সাবানের দিকে তাকিয়ে সে লজ্জায় লাল না হয়ে পারে না, লজ্জায় তার কানের লতি পর্যন্ত লাল হয়ে যায়। মনে মনে সে সন্ধ্যায় খাবারের পর এই সাবানটি দিয়ে ভালো করে গোসল করার কথা ঠিক করে।

নিজে নিজে বিড়বিড়িয়ে বলে : "কিছু কিছু জায়গা আছে যেগুলো রিঠা দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা যায় না।"

"মা, আমি ওটা নেই?" সবুজ কাগজের দিকে সিউএর হাত বাড়াতেই, বাইরে খেলা করা ছোট্ট মেয়ে যাওএর-ও দৌড়ে আসে। সিমিং-এর বউ জলদি তাদের সরিয়ে দেয়, ভাঁজ মত পাতলা কাগজটি ভাঁজ করে, আগের মতই সবুজ কাগজটি জড়ায়, তার পর ধোয়ামোছার স্ট্যাণ্ডের উপর সর্বোচ্চ তাকে রাখার জন্য কান্ত হয়। পুরো একবার তাকিয়ে সে কাপড়ে টাকার দিকে ফেরে।

"স্যুয়েছেং!" মনে হয় সিমিং-এর কিছু একটা মনে পড়েছে। বউয়ের উল্টো দিকে উচঁ চেয়ারে বসে সে একটা লম্বা-ক্লান্ত শব্দ করে।

"স্যুয়েছেং!" বউ তাকে ডাকতে সাহায্য করে।

সে টাকা লাগানো বন্ধ করে, কিন্তু টু শব্দটি শুনতে পায় না। যখন দেখে স্বামী মাথা ঘুরিয়ে অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছে, তখন নিজেকে অপরাধী মনে হয়।

কর্কশ গলায় সমস্ত জোরে সে চীৎকার করে ওঠে : "স্যুয়েছেং!"

চীৎকারে কাজ হয়। তারা শুনতে পায় চামড়ার জুতোর শব্দ কাছে আসছে এবং স্যুয়েছেং তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার পরনে হাফপ্যাণ্ট, গোল মুখ ঘামে চিক চিক করছে।

সে রেগে জিজ্ঞেস করে : "কি করছিলে? বাবা ডাকছিল শুনতে পাও নি কেন?"

"আমি বাগুয়া (হেক্সিগ্রাম) বক্সিং চর্চা করছিলাম . . . . . ." সে সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বাবার দিকে তাকায়, যেন তার কি প্রয়োজন জিজ্ঞেস করতে চায়।

"স্যুয়েছেং, আমি তোমাকে এ-ডু-ফু-র অর্থ জিজ্ঞেস করতে চাই।"

"এ-ডু-ফু? ...... এর মানে কি ক্ষিপ্ত রমণী নয়?"

"যত্ত সব বাজে কথা। কি চিন্তা।" সিমিং হঠাৎ ক্ষেপে যায়। "আমি কি মহিলা প্রাণী?"

স্যুয়েছেং দু পা ঘুরে আগের চেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। যদিও কখনো কখনো বাবার হাঁটার ভঙ্গি তাকে বেইজিং অপেরার বুড়ো মানুষদের হাঁটার কথা মনে করিয়ে দেয়, সে কখনো সিমিংকে নারী হিসেবে গণ্য করে নি। এখন সে বুঝতে পারে তার জবাবটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে।

"যেন আমি জানি না 'এ-ডু-ফু'র অর্থ ক্ষিপ্ত রমণী। তোমাকে কি সেটা জিজ্ঞেস করতে হবে? তোমাকে বলছি এটা চীনা নয়, বিদেশী শয়তানদের ভাষা। তুমি জান এর অর্থ কি?"

"আমি ...... আমি জানি না।" স্যুয়েছেং আরো অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

"বাহ! এমন একটা ছোট্ট জিনিষ না জানলে এত টাকা পয়সা খরচ করে তোমাকে স্কুলে পাঠাচ্ছি কেন? তোমার স্কুল বড়াই করে যে তারা উচ্চারণ ও উপলব্ধিতে গুরুত্ব দেয়, তবু তারা তোমাকে কিছুই শেখায়নি। যে এই শয়তানের ভাষা বলে তার বয়স চৌদ্দ পনেরোর বেশী হবে না। তোমার চেয়ে সামান্য ছোট, তবু তারা এসব নিয়ে কথা বলে, আর তুমি আমাকে মানেটা পর্যন্ত বলতে পারনা। আবার মুখ ফুটে বলছ 'আমি জানি না।' এখনই গিয়ে আমার জন্য মানে জেনে দাও।"

"হ্যাঁ!" গলার ভেতর থেকে জবাব দেয় স্যুয়েছেং, তারপর সসম্ভ্রমে চলে যায়।

একটু বিরতি দিয়ে গদগদ কণ্ঠে সিমিং বলে: "বুঝি না, আজকাল ছাত্র-ছাত্রীরা কি করে? বলতে কি, গুয়াংস্যু-এর সময়ে আমি স্কুল খোলার পক্ষে ছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারি নি কত বড় পাজি হবে। আমরা কি ধরনের 'স্বাধীনতা' ও 'মুক্তি' পেয়েছি? সত্যিকারের লেখা পড়া উঠে গেছে, সব আজগুবি ব্যাপার। স্যুয়েছেং-র জন্য বেশ কিছু পয়সা খরচ করেছি, কিন্তু সব জলে গেছে। তাকে এই আধা-বিদেশী, আধা-চীনা স্কুলে পাঠাতে কম ঝামেলা হয় নি, যেখানে তারা ইংরেজী বলার ও বুঝার উপর গুরুত্ব দেয়। তুমি মনে করবে সব ঠিক হওয়া উচিত। কিন্তু — বাহ! — এক বছর পড়ার পর সে এ-ডু-ফু পর্যন্ত বুঝতে পারে না। সে নিশ্চয়ই এখনো পুরনো বই পড়ছে। বলি, এমন স্কুল দিয়ে কি লাভ? সবগুলো বন্ধ করে দাও।"

কাগুজে টাকা তৈরী করতে করতে বউ সহানুভূতির সঙ্গে বলে, "হ্যাঁ,

সবগুলো বন্ধ করে দেওয়াই ভালো।”

“সিউএর এবং তার বোনের স্কুলে যাবার দরকার নেই। নয় নম্বর দাদু বলেছেন, ‘মেয়েদের লেখাপড়া করে কি লাভ?’ যখন তিনি মেয়েদের স্কুলের বিরোধিতা করেছিলেন তখন আমি তাঁর সমালোচনা করেছিলাম, এখন বুঝতে পারি বুড়োদের কথাই ঠিক। ভেবে দেখ, কি রকম নোংরাভাবে মেয়েরা রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, এখন তারা চুলও কেটে ফেলতে চায়। (এই ছোট চুলওয়ালা স্কুলের ছাত্রীদের চেয়ে আর কোন কিছুই আমাকে এত বিরক্ত করে না)। বলি: সৈন্য এবং দুর্বৃত্তদের একটা ওজর আছে, কিন্তু এই মেয়েরা সবকিছুকে উল্টে দেয়। তাদের সত্যিই খুব কড়া শাসন দরকার ......”

“হ্যাঁ, যেন পুরুষদের সন্ন্যাসী হলেই যথেষ্ট নয়, মেয়েদেরও সন্ন্যাসিনীর মত দেখাতে হবে।”

“স্যুয়েছেং!”

একটি বাঁধানো, ছোট্ট বই হাতে দৌড়ে আসে স্যুয়েছেং। বইটি বাবার হাতে দেয়।

এক জায়গায় দেখিয়ে বলে, “এটা দেখতে এমন। এখানে ......”

সিমিং নিয়ে তা দেখে। সে জানে এটা অভিধান, কিন্তু অক্ষরগুলো খুব ছোট এবং অনুভূমিকভাবে ছাপানো। ভুরু কুঁচকে সে জানালার কাছে গিয়ে স্যুয়েছেং-এর দেখানো অধ্যায়টি পড়ার জন্য চোখ ঘোরায়।

“‘পারস্পরিক সাহায্যের জন্য ১৮ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা।’ — না, তা হতে পারে না — এটা উচ্চারণ করে কি ভাবে?” সে সামনে “শয়তানের” শব্দের দিকে নির্দেশ করে।

“অদ্ভুতলোক” (oddfellows)

“না, না, তা নয়।” সিমিং আবার হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে ফেলে। “আমি তোমাকে বলেছি এটা খারাপ ভাষা, এক ধরনের গালি, আমার মত কাউকে গাল দেয়ার জন্য। বুঝতে পার? গিয়ে দেখ।”

স্যুয়েছেং তার দিকে কয়েকবার তাকায়, কিন্তু নড়েনা।

“এটা ধাঁধার মত। সে এটার আগামাথা বের করবে কি করে? সে ভালোভাবে দেখার আগে তোমার সবকিছু তাকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয়া উচিত।” স্যুয়েছেং দোটানায় পড়েছে দেখে তার মায়ের খারাপ লাগে এবং ছেলের পক্ষ হয়ে সে হস্তক্ষেপ করে।

স্ত্রীর দিকে ফিরে সিমিং দীর্ঘশ্বাস ফেলে, “বড়ো রাস্তায় যখন গুয়াংরুনসিয়াং-এ সাবান কিনছিলাম তখন এটা ঘটে। তিনটি ছাত্রও তখন সেখানে কেনাকাটা

করছিল। তাদের কাছে হয়ত আমাকে খুঁৎখুঁতে মনে হয়েছে। আমি চল্লিশ পয়সার দামের বেশী পাঁচ ছয়টি সাবান দেখি, এবং সবগুলো ফিরিয়ে দিই। তারপর দশ পয়সা দামের একটি দেখি, কিন্তু সেটা খুব বাজে, একেবারেই গন্ধ নেই। গড়পড়তা হিসেব করতে গিয়ে ২৪ পয়সায় এই সবুজটা কেনাই ভাল মনে করি। দোকান-দার সেই উন্নাসিক যুবকদের একজন, যাদের চোখ কপালে, তাই সে কুত্তার মত মুখ লম্বা করে। সে সময় সেই হঠকারী ছাত্রগুলো একে অপরকে ইশারা করতে থাকে এবং শয়তানের ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। পয়সা দেয়ার আগে আমি সাবানটি খুলে দেখতে চেয়েছিলাম — কে জানে ঐ বিদেশী কাগজে মোড়া জিনিষ খারাপ না ভাল? কিন্তু সেই উন্নাসিক ছোকরা শুধু বারণ করেনি বরং খুব অযৌক্তিক, এমন কতগুলো কটু মন্তব্য করে যে ছাত্ররা হো হো করে হেসে ওঠে। দলের মধ্যে সবচে ছোটটি সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বলে এবং অন্যেরা হাসতে শুরু করে। কাজেই এটা নিশ্চয়ই কোন খারাপ শব্দ হবে।" সে স্যুয়েছেং-এর দিকে ফিরে তাকায়। "'খারাপ শব্দ' বিভাগে এটা খুঁজে দেখ।"

গলার ভেতর থেকে "হ্যাঁ" বলে স্যুয়েছেং বিনয়ের সঙ্গে চলে যায়।

"তবু তারা চীৎকার করে 'নতুন সংস্কৃতি! নতুন সংস্কৃতি!' যখন পৃথিবীর এই দশা। এটা কি যথেষ্ট খারাপ নয়?" ছাদের আড়ার দিকে তাকিয়ে সিমিং বলে চলে, "এইসব ছাত্রদের, সমাজের কোন নৈতিকতা নেই। কোন সমাধান বের করতে না পারলে চীন ধ্বংস হয়ে যাবে। তার অবস্থা কি করুণ ছিল ......

আনমনে খুব একটা গা না করে বউ জিজ্ঞেস করে "কি?"

"একটি মাতৃভক্ত কন্যা ......" তার চোখ ফিরে আসে বউয়ের ওপর, কণ্ঠে সমীহ ভাব, "বড় রাস্তায় দু'জন ভিখিরী ছিল। তাদের একজন একটি মেয়ে, আঠারো বা উনিশ বছর বয়স। আসলে এ বয়সে ভিক্ষে করা খুব খারাপ তবু সে ভিক্ষে করছে। তার সঙ্গে ছিল সত্তর বছরের এক বুড়ী, মাথার চুল সাদা এবং অন্ধ। তারা সেই কাপড়ের দোকানের ছাঁইচের নীচে ভিক্ষা করছিল এবং সবাই বলাবলি করছিল তার মাতৃভক্তি নিয়ে। বুড়ী তার দিদিমা। নিজে অভুক্ত থেকে যা কিছু মেয়েটি পেয়েছে দিদিমার হাতে তুলে দিয়েছে। তুমি কি মনে কর লোকজন এমন মাতৃভক্ত মেয়েকে ভিক্ষে দেবে?"

বুদ্ধি পরীক্ষা করার জন্য সে বউয়ের চোখের উপর নিজের চোখ রাখে।

বউ কোন জবাব দেয় না। বরং তার চোখের উপর চোখ রাখে, যেন আরো কিছু জানতে চায়।

সবশেষে সে নিজে নিজেই জবাব দেয়। "বাহ — না! আমি অনেকক্ষণ

ধরে দেখেছি এবং শুধু একজনকে একপয়সা দিতে দেখেছি। অনেকেই তাদের চারদিকে জড়ো হয়, শুধু ব্যঙ্গ করার জন্য। দু'জন ইতর লোক ছিল। একজন ধৃষ্টতা দেখিয়ে বলে: 'আফা! জিনিষের উপর ময়লা দেখে দমে যেও না। তুমি যদি দুটো সাবান কেন এবং তাকে ভালো করে মাজাঘষা কর, তাহলে খুব একটা খারাপ হবে না।' কথা বলার ভঙ্গি দেখ।"

বউ নাক দিয়ে জোরে শব্দ করে মাথা নামিয়ে ফেলে। কিছুক্ষণ পর অনেকটা আনমনেই জিজ্ঞেস করে, "তুমি কি তাকে কোন পয়সা দিয়েছো?"

"আমি? — না, দু'এক পয়সা দিতে আমার খুব লজ্জা করেছে। জান, সে সাধারণ ভিখিরিণী নয়......"

"হুম!" তাকে বলতে শেষ করতে না দিয়েই সে উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে রান্নাঘরে চলে যায়। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, খাবারের সময়ও হয়ে এসেছে।

সিমিংও উঠে দাঁড়ায় এবং উঠোনের দিকে হেঁটে যায়। বাইরে তখনো বেশ আলো। দেয়ালের কোণায় বাগুয়া (হেক্সিগ্রাম) বক্সিং চর্চা করছিল স্যুয়েছেং। এটা তার বাড়ীতে পড়াশোনা এবং একাজে সে দিনরাত্রির মাঝামাঝি একঘণ্টা সময় ব্যয় করে। প্রায় ছয়মাস ধরে বক্সিং চর্চা করছে স্যুয়েছেং। অনুমোদনের ভঙ্গীতে সিমিং ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, তারপর পেছনে হাত নিয়ে উঠোনে হাঁটতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠোনের একমাত্র চিরসবুজ গাছটি অন্ধকারে ঢেকে যায়, ছেঁড়াতুলার মত সাদা মেঘের ভেতর তারা মিটমিট করতে থাকে। রাত নেমেছে। সিমিং তার মেজাজ চেপে রাখতে পারেনা। তার ইচ্ছে হয় মহৎ কাজ করতে, খারাপ ছাত্র এবং দুষ্ট সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে। ধীরে ধীরে সে সাহসী হয়ে ওঠে, তার পদশব্দ দীর্ঘ হয় এবং জতোর শব্দ ভারী হতে হতে খাঁচার ভেতর মুরগী ও তার বাচ্চাগুলোকে জাগিয়ে দেয়। সেগুলো ভয়ে কিচমিচ করে ওঠে।

ঘরের ভেতর আলো দেখা দেয়। অর্থাৎ সন্ধ্যাকালীন খাবার তৈরী। মাঝখানে টেবিলের চারদিকে জড়ো হয় পুরো পরিবার। টেবিলের একমাথায় বাতি, আর এক মাথায় বসে সিমিং। তার গোলাকার মুখ স্যুয়েছেং-এর মত, বাড়তি একজোড়া গোঁফ আছে। সবজি স্যুপের ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে তাকে মন্দিরের বিত্ত দেবতার মত দেখা যেতে থাকে। বাম দিকে বসেছে সিমিং-এর বউ এবং যাওএর এবং ডান দিকে বসেছে স্যুয়েছেং এবং সিউএর। বাটিতে কাঠির আঘাতে বৃষ্টির মত শব্দ হচ্ছে। কেউ টু শব্দ না করলেও, তাদের খাবার টেবিল খুব জীবন্ত মনে হয়।

যাওএর তার বাটি উল্টে ফেলে। টেবিলের অর্ধেক জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে স্যুপ।

যত বড় সম্ভব ছোট চোখ মেলে সিমিং। যখন বুঝতে পারে বেচারী কেঁদে ফেলবে তখন চোখ ফিরিয়ে নেয় এবং কাঠি দিয়ে বাঁধাকপি তুলে নেয়। কিন্তু সেটা উধাও হয়ে গেছে। ডানে বামে তাকিয়ে দেখে স্যুয়েছেং সেটা হাঁ করা মুখে পুরছে। হতাশ হয়ে সিমিং কিছু হলদে পাতা তুলে নেয়।

"স্যুয়েছেং।" সে ছেলের দিকে তাকায়। "তুমি কি সেই শব্দটা পেয়েছ না পাও নি?"

"কোন শব্দ? — না, এখনো পাই নি।"

"বাহ। নিজের দিকে দেখ। ভালো ছাত্রও নয়, কোন বুদ্ধিও নেই, শুধু খেতে জান। তোমার সেই মাতৃভক্ত মেয়ের কাছ থেকে শেখা উচিত — ভিখিরী হলেও, নিজে উপোষ করে হলেও সে তার দিদিমাকে খুব সম্মান করে। তোমরা উন্নাসিক ছাত্ররা এসবের কি জান? তোমরা ঐ ইতর লোকদের মত বড় হবে

"আমি একটা ব্যাপার ভেবে দেখেছি, কিন্তু জানি না সেটা ঠিক কিনা ...... আমার মনে হয় তারা হয়ত বলেছে 'oldfool'।"

"ওটাই ঠিক। একেবারে ঠিক। ঠিক এ রকম শব্দ ছিল: 'oldfool' তার অর্থ কি? তুমিও একই দলের, তুমি নিশ্চয়ই জান।"

"জানি? — আমি নিশ্চিত জানি না।"

"ননসেন্স। আমাকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা কর না। তোমরা সব পাজী।"

"বাজ পড়লেও এমন হয় না।" হঠাৎ ফেটে পড়ে সিমিং-এর বউ। "আজ তোমার মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে কেন? এমনকি খাবার সময়ও একজনের জন্য অন্যজনকে দায়ী করছ। এই বয়সের ছেলেরা কি বোঝে?"

"কি?" সিমিং পাল্টা জবাব দিতে যাচ্ছিল এমন সময় দেখতে পায় রাগে বউয়ের গাল কাঁপছে. রং বদলে গেছে এবং চোখে ভয়ের চিহ্ন। সে জলদি গলার স্বর পাল্টে ফেলে। "আমার মেজাজ বিগড়াচ্ছে না। আমি শুধু স্যুয়েছেংকে বলছি একটু বুদ্ধি রাখার জন্য।"

"সে বুঝবে কি করে তোমার মনে কি আছে?" তাকে আগের চেয়ে আরো রাগী দেখায়। "তার বুদ্ধি থাকলে আরো আগে বাতি জ্বালিয়ে বা টর্চ নিয়ে সেই মাতৃভক্ত মেয়েকে খুঁজতে যেত। তুমি তাকে একটা সাবান কিনে দিয়েছ, আর একটা কিনে দেয়া দরকার ......"

"ননসেন্স। ঐ ইতর লোকরাই এসব বলবে।"

"আমি অত নিশ্চিত নই। তুমি যদি তাকে আর একটা সাবান কিনে দিয়ে

ভালো করে ঘষামাজা কর, তারপর পুজো কর, তাহলে গোটা পৃথিবীতে শান্তি আসবে।”

“তুমি এমন কথা বল কি করে? এটার সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে? কারণ, আমার মনে পড়েছিল তোমার কোন সাবান নেই ......”

“ঠিক আছে একটা সম্পর্ক আছে। বিশেষ করে মাতৃভক্ত মেয়ের জন্য এটা কিনেছিলে। তাই গিয়ে ভালো করে ঘষামাজা কর। আমি এটা আশা করি না। আমি চাইনা। আমি তার গৌরবের ভাগী হতে চাই না।”

“সত্যিই, তুমি এমন কথা বল কি করে?” বিড়বিড় করে সিমিং। “তোমরা মেয়েরা ......” বাগুয়া (হেক্সিগ্রাম) বক্সিং-এর পর স্যুয়েছেং-এর মুখের মত তার মুখ দিয়ে ঘাম ঝরছে, বোধহয় খাবার খুব গরম ছিল।

“আমাদের মেয়েদের কি হয়েছে? আমরা মেয়েরা তোমরা পুরুষদের চেয়ে অনেক ভালো। তোমরা পুরুষরা আঠারো উনিশ বছরের ছাত্রীদের গাল দেও, আঠারো উনিশ বছরের ভিখিরিণীদের প্রশংসা কর, তোমাদের মন এত নোংরা। সত্যিই, ঘষামাজা। — বিরক্তিকর।”

“তুমি কি শোন নি? ঐ ইতরদের একজন একথা বলেছে।”

“সিমিং!” বাইরের অন্ধকার থেকে বজ্রকণ্ঠ ভেসে আসে।

“ডাওথোং? আমি আসছি।” সিমিং জানে, এটা উচুঁ গলার জন্য বিখ্যাত হো ডাওথোং। সদ্য ছাড়া পাওয়া অপরাধীর মত আনন্দে সে পাল্টা জবাব দিয়েছে।

“স্যুয়েছেং, জলদি করে বাতি জ্বালিয়ে হো কাকাকে লাইব্রেরীতে নিয়ে যাও।”

একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে ডাওথোংকে পশ্চিমের ঘরে নিয়ে যায় স্যুয়েছেং। তাদের পেছনে পেছনে আসে বু ওয়েইইউয়ান।

“আমি দুঃখিত, আমি তোমাদের স্বাগত জানাই নি। আমাকে মাফ করে দিও।” তখনো মুখ ভর্তি ভাত নিয়ে সিমিং উঠে গিয়ে মাথা নীচু করে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে স্বাগত জানায়। “তোমরা কি আমাদের সঙ্গে চারটে ডালভাত খাবে না? ......”

“আমরা খেয়েছি।” ওয়েইইউয়ান এগিয়ে এসে তাকে স্বাগত জানায়। “নৈতিক পুনরুজ্জীবন সাহিত্য লীগের অষ্টাদশ রচনা ও কবিতা প্রতিযোগিতার কারণে আমরা এখানে ছুটে এসেছি। আগামীকাল কি সতেরো তারিখ নয়?”

“কি? আজ কি ষোল তারিখ?” অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে সিমিং।

“দেখ, তোমার কেমন ভুলো-মন?”

"তাহলে আজকেই সংবাদপত্র অফিসে আমাদের কিছু পাঠাতে হবে, যাতে কাল তারা প্রকাশ করে।"

"আমি ইতোমধ্যে শিরোনামা ঠিক করেছি। দেখ, এতে চলবে কিনা।" বলতে বলতে রুমালের ভেতর থেকে একটুকরো কাগজ বের করে সিমিং-এর হাতে তুলে দেয় ডাওথোং।

সিমিং মোমবাতির দিকে এগিয়ে যায়। কাগজের ভাঁজ খোলে তার পর এক শব্দ এক শব্দ করে পড়ে :

"'প্রেসিডেণ্টের কাছে পুরো জাতির নামে আমরা বিনয়ের সঙ্গে একটি রচনা প্রস্তাব করছি, এই ঘুণেধরা পৃথিবী ও জাতীয় চরিত্র রক্ষা করার জন্য তিনি একটি আদেশ দেবেন কনফুসীয় মতবাদ বিকাশের এবং মেনসিয়াসের মায়ের পূজো করার জন্য।' খুব ভালো। খুব ভালো। একটু লম্বা হয়ে গেল না কি?"

"তাতে কিছু হবে না।" জোরে জবাব দেয় ডাওথোং, "আমি হিসেব করে দেখেছি বিজ্ঞাপনে খুব একটা খরচ হবে না। কিন্তু কবিতার নাম কি হবে?"

"কবিতার নাম?" সিমিং-এর হঠাৎ খুব সম্মানিত মনে হয়। "আমি একটা ভেবেছি। 'মাতৃভক্ত মেয়ে' কেমন হয়? এটা সত্য ঘটনা, তার প্রশংসা করা উচিত। আজ বড় রাস্তায় . . . . . ."

"না, না, তাতে হবে না।" দ্রুত হস্তক্ষেপ করে ওয়েইইউয়ান, সিমিংকে থামানোর জন্য হাত নাড়তে থাকে। "আমিও তাকে দেখেছি। কিন্তু সে এ এলাকার নয়। আমি তার কথা বুঝি নি, সেও আমার কথা বোঝে নি। আমি জানি না সে কোন এলাকার। সবাই বলে সে মাতৃভক্ত, কিন্তু যখন তাকে জিজ্ঞেস করি কবিতা লিখতে পারে কিনা, সে মাথা নাড়ে। লিখতে পারলে, খুব ভালো হত।"

"কিন্তু যেহেতু আনুগত্য এবং মাতৃভক্তি এত গুরুত্বপূর্ণ, তাই সে কবিতা লিখতে না পারলে খুব একটা যায় আসেনা।"

"সেটা ঠিক নয়। সম্পূর্ণ উল্টো।" হাততুলে সিমিং-এর দিকে দৌড়ে যায় ওয়েইইউয়ান ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। "সে যদি কবিতা লিখতে পারত তাহলে খুব মজা হত।"

"আমরা এই শিরোনামটাই ব্যবহার করি।" সিমিং তাকে সরিয়ে দেয়। "ব্যাখ্যা দিয়ে এটাই ছাপানো হোক। প্রথমতঃ এতে তার প্রশংসা করা হবে, দ্বিতীয়তঃ সমাজের সমালোচনায় এটা ব্যবহার করা যাবে। পৃথিবীর কি হচ্ছে? আমি অনেকক্ষণ দেখেছি, কাউকে দেখি নি তাকে একটি পয়সা দিতে — লোক-

জন বড় নির্দয়! . . . . . . ”

“আহা, সিমিং!” ওয়েইইউয়ান আবার দৌড়ে আসে। “তুমি সন্ন্যাসীদের সামনে নেড়ামাথাকে গাল দিচ্ছ। আমি তাকে কিছু দেই নি কেননা তখন আমার কাছে কোন পয়সা ছিল না।”

“ওয়েইইউয়ান, এত স্পর্শকাতর হয়ো না।” সিমিং আবার তাকে পাশে সরিয়ে দেয়। “অবশ্য তুমি একটা ব্যতিক্রম। আমাকে শেষ করতে দাও। তাদের চারদিকে অনেক লোকজন ছিল, কেউ সম্মান দেখায় নি, শুধু বিদ্রূপ করেছে। আরো দু'জন ইতর ছিল, তারা আরো ধৃষ্ট। তাদের একজন বলে, 'আফা! তুমি যদি দুটো সাবান কিনে তাকে ভালো করে মাজাঘষা কর তাহলে ব্যাপারটা মন্দ হবে না। 'ভেবে দেখ . . . . . .”

“হা, হা! দুটো সাবান!” ডাওথোং হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়ে, তাদের কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। “সাবান কেন! হো, হো, হো!”

চমকে উঠে ভয় পেয়ে যায় . . . . . . “ডাওথোং! ডাওথোং! এত গোলমাল করো না!”

“ভালো মাজাঘষা! হো, হো, হো!”

“ডাওথোং।” সিমিংকে খুব কঠোর দেখায়। “আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করছি। তুমি এত গোলমাল করছ কেন, প্রায় সবার কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। আমার কথা শোন: আমরা দুটো শিরোনামই ব্যবহার করে সোজা সংবাদপত্র অফিসে পাঠিয়ে দেব, যাতে আগামীকাল অবশ্যই প্রকাশিত হয়। দুটোই নিয়ে যাবার জন্য তোমাদের কষ্ট করতে হবে।”

“ঠিক আছে, ঠিক আছে। নিশ্চয়ই।” সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয় ওয়েইইউয়ান।

“হা, হা! ভালো মাজাঘষা! হো হো!”

ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে সিমিং, “ডাওথোং”।

চীৎকারে ডাওথোং-এর হাসি বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাখ্যা লেখার পর একটি কাগজে তা নকল করে ডাওথোংকে সঙ্গে নিয়ে খবরের কাগজের অফিসের জন্য বেরিয়ে পড়ে ওযেইইউয়ান। মোমবাতির আলোয় তাদের পথ দেখিয়ে দেয় সিমিং। তার পর ভয়ে ভয়ে হলঘরের দরজায় ফিরে আসে। একটু ইতস্ততঃ করে শেষ পর্যন্ত চৌকাঠ মাড়ায়। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে তার নজরে পড়ে টেবিলের মাঝখানে সাবানের ছোট্ট, সবুজ আয়তাকার প্যাকেট, বাতির আলোয় সুন্দর নকশাওয়ালা সোনালী লেখা চকচক করছে।

টেবিলের শেষ মাথায় মেঝের ওপর খেলছে সিউএর ও যাওএর। ডান দিকে বসে অভিধানে কিছু একটা দেখছে স্যুয়েছেং। সবশেষে, বাতি থেকে দূরে

ছায়ার ভেতর উচুঁ চেয়ারের ওপর বউকে দেখতে পায় সিমিং। তার অনুভূতিহীন মুখে আনন্দ বা ক্ষোভ নেই, সে কোন কিছুর দিকেও তাকিয়ে দেখছে না।

"সত্যি, ভালো মাজাঘষা! বিরক্তিকর!"

পেছনেই সিউএর-এর অস্পষ্ট গলা শুনতে পায় সিমিং। সে ফিরে তাকায়, কিন্তু সে নড়ছে না। শুধু যাওএর তার মুখের ওপর দুটি ছোট হাত চেপে ধরে যেন কাউকে লজ্জা দিচ্ছে।

এটা তার জায়গা নয়। ফু দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে পায়চারী করার জন্য সে উঠোনে আসে। সে শান্ত হবার কথা ভুলে গেছে তাই বাচ্চাওয়ালা মুরগীটি আবার কিচমিচ করতে থাকে। এক সময় ধীরে ধীরে হেঁটে সে আরো দূরে যায়। অনেকক্ষণ পর, হলঘরের বাতি সরে যায় শোবার ঘরে। মাটিতে চাঁদের আলো মনে হচ্ছে সুতোবিহীন কাপড় এবং উজ্জ্বল মেঘের ভেতর প্রায় পূর্ণ চাঁদটাকে মনে হচ্ছে যশমপাথরের থালা।

তার খারাপ লাগে। মাতৃভক্ত মেয়ের মতই তার নিজেকে মনে হয় "সম্পূর্ণ অবহেলিত এবং একা।" সে রাতে গভীর রাত পর্যন্ত সে ঘুমোতে পারে নি।

পরদিন ভোরের মধ্যে ব্যবহারের ফলে সাবানটির মর্যাদা বেড়ে যায়। অন্যান্য দিনের চেয়ে দেরীতে উঠে সে দেখতে পায় ধোয়ামোছার ষ্টাণ্ডে কাত হয়ে তার স্ত্রী ঘাড় পরিষ্কার করছে। বড় কাকড়ার বের করা বুদ্বুদের মত তার কানের দু'-পাশে বুদ্বুদ জমা হয়েছে। রিঠার ছোট্ট সাদা বুদ্বুদ এবং এই বুদ্বুদের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। এরপর থেকে সিমিং-এর বউয়ের গা থেকে সবসময় জলপাইয়ের মত একটি অচেনা গন্ধ আসতে থাকে। প্রায় ছয়মাস অন্য কোন গন্ধ পাওয়া যায় নি। যারা পেয়েছে, তাদের কাছে এটা চন্দনকাঠের গন্ধ মনে হয়েছে।

মার্চ ২২, ১৯২৪

'জনবিদ্বেষী'

১

ওয়েই লিয়ানশু এর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের ব্যাপারটা এখন ভাবতে গেলে খুব অবাক লাগে। শেষকৃত্য দিয়ে এর শুরু এবং শেষ।

' S ' শহরে থাকার সময় প্রায়ই শুনেছি সে অদ্ভুত লোক। প্রাণীবিদ্যা পড়ার পর হাইস্কুলে ইতিহাসের মাষ্টারী নেয়। অন্যদের সঙ্গে সে কাটখোট্টা ব্যবহার করত, কিন্তু তাদের ব্যাপারে নিজেকে জড়াতেও ভালবাসত। বলত পারিবারিক ব্যবস্থা উঠে যাওয়া উচিত, কিন্তু বেতন পেয়েই টাকাটা দিদিমার কাছে পাঠিয়ে দিত। শহরে গুজবের জন্ম দেয়ার মত তার অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। এক হেমন্তে আমি ওয়েই নামের কিছু আত্মীয়ের সঙ্গে হানশিশানে থাকি। তাদের সঙ্গে তার দূর আত্মীয় সম্পর্ক ছিল। অথচ তারা তাকে খুব সামান্যই বুঝত, এমনভাবে তার দিকে তাকাত যেন সে বিদেশী। বলত : "সে আমাদের মত নয়।"

এটা খুব অদ্ভুত ব্যাপার নয়। বিশ বছর ধরে চীনে আধুনিক স্কুল থাকলেও, হানশিশানে একটা প্রাইমারী স্কুল ছিল না। পড়াশোনার জন্য একমাত্র সেই সে পাহাড়ী গ্রাম ছেড়েছিল, তাই গ্রামবাসীদের চোখে সে ছিল নিঃসন্দেহে খেয়ালী। সে প্রচুর পয়সা বানিয়েছে এই বলে তারা তাকে হিংসেও করত।

হেমন্তের শেষদিকে মহামারী আকারে গ্রামে আমাশয় দেখা দেয়। ভয়ে আমি শহরে ফিরে যাবার কথা ভাবি। শুনেছিলাম তার দিদিমারও এই অসুখ হয়েছে এবং বয়সের কারণে তার অবস্থা মারাত্মক। উপরন্তু গ্রামে একজন ডাক্তারও ছিল না। দিদিমা ছাড়া ওয়েই'র কোন আত্মীয়স্বজন ছিল না, তিনি একটি চাকরানী নিয়ে সাধারণ জীবন যাপন করতেন। ছোটবেলায় এতিম হয়ে যাওয়ায়, দিদিমাই তাঁকে বড় করেন। আগে তার জীবন ছিল কষ্টের, কিন্তু

বর্তমানে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই কাটছিল। বউ, ছেলেমেয়ে না থাকায় তার পরিবার ছিল নির্ঝঞ্ঝাট, এবং সম্ভবতঃ এই কারণেও তাকে খেয়ালী মনে করা হত।

পায়ে হাঁটা পথে শহর থেকে গ্রামের দূরত্ব ছিল ত্রিশ মাইলের বেশী, এবং নৌপথে বিশ মাইলের বেশী। তাই ওয়েইকে আনতে চারদিন লাগবে। এ ধরণের উল্টো পথের গ্রামে এমন ঘটনা খুব বড়ো সংবাদ, সকলের মুখে মুখে ফেরে। পরদিন খবর আসে বুড়ীর অবস্থা খুব খারাপ এবং খবর দেয়ার জন্য লোক গেছে। যাহোক, ভোরের আগেই সে মারা যায়, তার শেষ কথা ছিল :

"নাতি আমার, তোমাকে কেন দেখতে দিলে না?"

শেষকৃত্যের সময়ে ওয়েই-এর ফিরে আসার প্রত্যাশায় গোষ্ঠীর বয়স্করা, নিকট আত্মীয়, দিদিমার পরিবারের লোকজন এবং অন্যেরা সেই কামরায় জড়ো হয়। কফিন এবং কাপড় সবকিছু আগেই ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় এই নাতিকে সামলানো নিয়ে। সবাই আশা করেছিল সে শবানুগমনের নিয়মকানুন বদলের দাবী করবে। আলাপ আলোচনার পর তারা তার জন্য অবশ্যপালনীয় তিনটি শর্ত ঠিক করে। প্রথমতঃ তাকে শোকের পোশাক পরতে হবে, দ্বিতীয়তঃ কফিনকে প্রণাম করতে হবে, তৃতীয়তঃ বৌদ্ধ ও তাও সন্ন্যাসীদের প্রার্থনা করতে দিতে হবে। সংক্ষেপে, পুরানো রীতি অনুযায়ী সব কিছু করতে হবে।

সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে, তারা ঠিক করে ওয়েই বাড়ী পেঁৗছার সময় তারা সদলবলে উপস্থিত থাকবে, আপোষ যাতে না করতে হয় সেজন্যে আলোচনায় শক্তি জোগাতে। ঠোঁট চাটতে চাটতে গ্রামবাসীরা ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। "আধুনিক", "বিদেশী রীতিনীতির অনুসারী" হিসেবে ওয়েই সবসময় নিজেকে অযৌক্তিক প্রমাণ করেছে। ঝগড়া একটা বাঁধবেই, হয়ত মজার কিছু ঘটনাও ঘটতে পারে।

আমি শুনেছি সে বিকেলে বাড়ী ফিরে আসে। ঢোকার সময় দিদিমার চিতাকে প্রণাম করে। বুড়োরা সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোয়। তারা তাকে হলঘরে ডাকে, দীর্ঘ ভূমিকার পর মূল বিষয়ের অবতারণা করে। একবাক্যে কথা বলে তারা তাকে তর্ক করার সুযোগ দেয় নি। তাদের কথা শেষ হলে একটা গভীর নীরবতা নেমে আসে। ভয়ের সঙ্গে সব চোখ তাকিয়ে থাকে তার ঠোঁটের দিকে। কিন্তু অভিব্যক্তি না বদলে সে সোজা জবাব দেয় :

"ঠিক আছে।"

এটা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তাদের মন হাল্কা হয়ে যায়, কিন্তু হৃদয় আরো ভারী হয়ে ওঠে। কেননা উদ্বেগের জন্য ব্যাপারটা ছিল খুবই "খেয়ালী"। খবরের জন্য অপেক্ষাকারী গ্রামবাসীরা হতাশ হয়ে পড়ে। তারা বলাবলি করতে

থাকে, "অদ্ভুত ব্যাপার। সে বলেছে : 'ঠিক আছে।' চল, গিয়ে দেখি।" ওয়েই এর "ঠিক আছে" বলার অর্থ সব কিছু পুরানো রীতি অনুযায়ী হবে এবং তাতে দেখার কিছু নেই। তবু তারা দেখতে চায় এবং সন্ধ্যার পর পুরো হলঘর দুশ্চিন্তামুক্ত লোকের ভীড়ে ভরে যায়।

যারা গিয়েছে তাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। প্রথমে উপহার হিসেবে ধূপ এবং মোমবাতি পাঠিয়েছি। যখন পৌঁছি তখন সে মৃতের শরীরে কাফন পরাচ্ছে। তার গড়ন হাল্কাপাতলা, মুখটা চৌকোণা, এলোমেলো চুলের নীচে অনেকটা লুকানো কালো ভুরু এবং গোঁফ। তার কালো চোখ জ্বলজ্বল করছে। অভিজ্ঞ লোকের মত সে মৃতদেহ নড়াচড়া করে, লোকজনের চমক লেগে যায়। স্থানীয় নিয়ম অনুযায়ী একজন বিবাহিত মহিলার শেষকৃত্যে তার পরিবারের লোকজন সবকিছু ভালোভাবে হলেও খুঁত বের করবে; যাহোক সে চুপচাপ থাকে, অভিব্যক্তিহীন মুখে তাদের ইচ্ছে মেনে চলে। আমার সামনে দাঁড়ানো পাকাচুলের এক বুড়ী হিংসা ও সম্মানের সঙ্গে নিঃশ্বাস ফেলে।

লোকজন প্রণাম করে, তারপর বিলাপ করে। তাদের বিলাপের সময় মহিলারা কীর্তন গাইতে থাকে। কফিনের ভেতর মৃতদেহ রাখা হলে সবাই আবার প্রণাম করে, তারপর কফিনের ডালা না নামানো পর্যন্ত বিলাপ করে। এক-মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে আসে তারপর বিস্ময় ও অসন্তোষের গুঞ্জরণ ওঠে। আমিও হঠাৎ বুঝতে পারি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ওয়েই এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে নি। সে শুধু শোকাহতের মাদুরে বসে থাকে, তার কালো চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে।

এই বিস্ময় ও অসন্তোষের পরিবেশে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অসন্তুষ্ট শোকাহতরা চলে যেতে উদ্যত হয়, কিন্তু গভীর চিন্তায় মগ্ন ওয়েই তখনো মাদুরে বসে আছে। হঠাৎ তার চোখ দিয়ে জল পড়ে, তারপর সে নিঝুম রাতের ঊষর প্রান্তরে আহত নেকড়ের মত টানা বিলাপ শুরু করে, তার যন্ত্রণার সঙ্গে মিলে যায় ক্ষোভ এবং দুঃখ। এটা রীতির বাইরে তাই বিস্ময়ে আমরা হতবাক হয়ে যাই। একটু ইতস্তত: করার পর কেউ কেউ তাকে থামানোর চেষ্টা করে, ধীরে ধীরে লোক বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার চারদিকে একটা ভীড় জমে যায়। কিন্তু লোহার মূর্তির মত নিশ্চল সে সেখানে বসে বিলাপ করতে থাকে।

হতবুদ্ধি হয়ে লোকজন সরে পড়ে। প্রায় আধঘণ্টা বিলাপ করে ওয়েই হঠাৎ থামে। তারপর শোকাহতদের কাউকে কিছু না বলে সোজা ভেতরে চলে যায়। পরে খবর পাওয়া যায় সে দিদিমার ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

দুদিন পর, শহরে ফেরার প্রাক্কালে আমি শুনতে পাই গ্রামবাসীরা আলাপ করছে কিভাবে ওয়েই দিদিমার স্মরণে দিদিমার অধিকাংশ আসবাবপত্র পুড়ে ফেলা ও বাকীগুলো তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুশয্যায় সেবাকারী চাকরানীকে দিয়ে দেবার মনস্থ করেছে। এমনকি বাড়ীটাও অনির্দিষ্টকালের জন্য চাকরানীকে ধার দেয়া হবে। ওয়েই এর আত্মীয় স্বজন তর্ক করে গলা ফাটিয়ে ফেলে, কিন্তু তার কথার নড়চড় হয় না।

ফেরার পথে, কৌতূহল বলে আমি তার বাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার সময় সমবেদনা জানানোর জন্য ভেতরে যাই। শোকের সাদা পোশাক পরে সে আমাকে স্বাগত জানায়। ব্যবহার আগের মতই নিরুত্তাপ। ব্যাপারটা মনে গেঁথে না রাখার জন্য আমি তাকে অনুরোধ করি। কিন্তু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করার বদলে সে শুধু বলে : "তোমার উদ্বেগের জন্য ধন্যবাদ।"

২

সে বছর শীতের শুরুতে ' S ' শহরের এক বইয়ের দোকানে তৃতীয় বারের মত আমাদের দেখা হয়। আমরা পরিচিত এটা দেখাতে একে অপরকে দেখে মাথা নাড়ি। কিন্তু সে বছরের শেষদিকে চাকুরি হারানোর পর আমরা বন্ধু হয়ে যাই। তারপর বহুবার ওয়েই-এর সঙ্গে দেখা করি। প্রথমতঃ, আমার করার কিছু ছিল না, দ্বিতীয়তঃ, বলা হত রক্ষণশীল মনোভাব সত্বেও সে প্রয়োজনে হাত-পা বাধা লোকদের সান্ত্বনা দেয়। যাহোক, ভাগ্য ক্ষণস্থায়ী বলে, ফকির চিরদিন ফকির থাকে না, তাই তার স্থায়ী বন্ধু প্রায়ই ছিল না। রটনা সত্যি হয়। কেননা কার্ড দেয়াব সঙ্গে সঙ্গে সে আমার সঙ্গে দেখা করে। দুটো কামরা মিলিয়ে তার একটি বসার কামরা বানানো হয়েছে, টেবিল, চেয়ার এবং বুককেস ছাড়া আসবাবপত্র খুব বেশী নেই। "আধুনিক" হিসেবে তার মারাত্মক খ্যাতি থাকলেও তার শেলফে আধুনিক বইয়ের সংখ্যা ছিল খুবই কম। সে জানত, আমি চাকুরি হারিয়েছি ; কিন্তু সৌজন্য বিনিময়ের পর অতিথি ও স্বাগতিক উভয়ে চুপচাপ বসে থাকে, কারো কিছু বলার নেই। আমি লক্ষ্য করেছি সে খুব তাড়াতাড়ি সিগারেট শেষ করে এবং আঙ্গুলে প্রায় ছ্যাঁকা লাগার মত অবস্থা হলে মাটিতে ফেলে দেয়।

আরেকটি সিগারেট ধরাতে গিয়ে সে হঠাৎ বলে, "একটি সিগারেট নাও।"

আমি একটা নেই। এবং সিগারেট টানার ফাঁকে ফাঁকে মাষ্টারী, বই এসব

নিয়ে আলাপ করি, তবু বলার মত সামান্য বিষয়। চলে আসার কথা ভাবছি এমন সময় দরজার বাইরে চীৎকার ও পায়ের শব্দ শুনতে পাই এবং চারটি শিশু দৌড়ে ভেতরে আসে। বড়টির বয়স আট অথবা নয়, সবচে ছোটটির চার অথবা পাঁচ। তাদের হাত, মুখ, কাপড়চোপড় খুব নোংরা, দেখে আদর করতে ইচ্ছে করে না ; তবু ওয়েই-এর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পাশের কামরায় যেতে যেতে সে বলে :

"ডালিয়াং, এরলিয়াং তোমরা সবাই আস! কাল যে মাউথ-অর্গ্যান চেয়েছিলে সেটা এনেছি।"

শিশুরা তার পেছনে দৌড়ে যায় এবং একটি মাউথ-অর্গ্যান নিয়ে তৎক্ষণাৎ ফিরে আসে। কিন্তু বাইরে যাওয়া মাত্রই তারা ঝগড়া বাধিয়ে দেয় এবং একজন চীৎকার করে ওঠে।

তাদের অনুসরণ করতে করতে সে বলে, "প্রত্যেকের জন্য একটা, ঠিক এক রকমের। ঝগড়া করো না।"

জিজ্ঞেস করি, "এরা কার ছেলেমেয়ে?"

"বাড়ীওয়ালার। তাদের মা নেই, শুধু দিদিমা আছে।"

"তোমার বাড়ীওয়ালা বিপত্নীক?"

নিষ্প্রাণ হাসি হেসে সে বলে, "হ্যাঁ। তিন চার বছর আগে তার বউ মারা গেছে। সে আর দ্বিতীয় বিয়ে করে নি। না হলে, আমার মত কুমারের কাছে সে ঘর ভাড়া দিত না।"

এতদিন কেন বিয়ে করে নি এটা জিজ্ঞেস করতে আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু আমি তাকে খুব ভালোভাবে জানতাম না বলে জিজ্ঞেস করি নি।

একবার ভালোভাবে জানলে সে খুব আলাপী। তার মাথায় চমৎকার চমৎকার বুদ্ধি আছে। তার কিছু কিছু অতিথি আমাকে উত্ত্যক্ত করেছে। ফলশ্রুতিতে, বোধহয় ইয়ু ডাফু এর রোমান্টিক গল্প পড়ার কারণে তারা প্রতিনিয়ত নিজেদের বলত, "হতভাগ্য যুবক" বা "অচ্ছুৎ" এবং অলস ও রাগী কাঁকড়ার মত বড় চেয়ারে বসে সবসময় হাই তুলত, ধূমপান করত এবং ভুরু কুঁচকে থাকত।

এছাড়া ছিল বাড়ীওয়ালার ছেলেমেয়ে। নিজেদের মধ্যে সবসময় ঝগড়াঝাঁটি করত। থালাবাসন ভাঙত, কেকের জন্য হাত পাতত এবং কান ফাটানো চীৎকার করত। তবু তাদের দেখলে ওয়েই-এর নিষ্প্রাণ ভাবটা কেটে যেত। মনে হত তারা তার জীবনের সবচে মূল্যবান সম্পদ। একবার তৃতীয় শিশুটির হাম হয়েছিল। সে এত চিন্তিত হয়ে পড়ে যে তার কালো মুখ আরো কালো হয়ে যায়।

অসুখটা মারাত্মক হয় নি। তারপর ছেলেদের দিদিমা তার উদ্বেগ নিয়ে টিপ্পনী কেটেছিল।

আমার অস্থিরতা অনুমান করতে পেরে একদিন এক সুযোগে সে বলে, "শিশুরা সবসময় ভাল। তারা এত নির্দোষ ......"

আমি আনমনে জবাব দেই, "সবসময় নয়।"

"সবসময়। ছোটদের বড়দের মত দোষ নেই। বড় হয়ে যদি তারা খারাপ হয়, যেটা তুমি মনে কর, সেটা তাদের পরিবেশের প্রভাব। মূলত তারা খারাপ নয়, কিন্তু নির্দোষ ...... আমি মনে করি চীনের ভবিষ্যৎ এদের মধ্যেই নিহিত।"

"আমি একমত নই। খারাপ না হলে, বড় হয়ে তারা খারাপ হবে কি ভাবে? উদাহরণ হিসেবে একটা বীজের কথাই ভাব। যেহেতু ভেতরে পাতা, ফুল, ফলের ভ্রূণ আছে বলেই পরে সেগুলো গজায়। কারণ নিশ্চয়ই থাকতে হবে ......।" চাকরি হারাবার পর থেকে বড় আমলাদের মত যারা পদত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে, আমি বৌদ্ধ সূত্র পড়ছি। আমি বৌদ্ধ দর্শন বুঝতে না পারলেও, এলোপাতাড়ি কথা বলে যাচ্ছি।

যাহোক, ওয়েই বিরক্ত হয়। একবার আমার দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলে নি। আমি বলতে পারব না তার কিছু বলার ছিল না, না সে তর্ক করা প্রয়োজন মনে করে নি। কিন্তু তাকে আগের মত নিষ্প্রাণ দেখায়, এবং যা আগে দীর্ঘ সময় করে নি, চুপচাপ বসে এক সঙ্গে পর পর দুটি সিগারেট পান করে। তৃতীয়টার জন্য হাত বাড়াতেই আমি উঠে আসি।

আমাদের ছাড়াছাড়ি তিনমাস স্থায়ী হয়। তারপর, আংশিক ভুলে যাওয়ার কারণে এবং আংশিক ঐ "নির্দোষ" শিশুদের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কারণে সে শিশুদের সম্পর্কে আমার মন্তব্য ক্ষমা করে দেয়। অথবা আমি সে রকম ধরে নিয়েছি। ঘটনাটি ঘটে আমার ঘরে। একদিন মদ পান করার পর বিষণ্ণ নয়নে সে মাথা তুলে বলে :

"ভেবে দেখ, সত্যিই অবাক ব্যাপার। এখানে আসার পথে বাণ হাতে একটি ছোট শিশু দেখেছি। সে বাণটি আমার দিকে তাক করে চীৎকার করে, 'খতম কর!' সে ভালভাবে হাঁটতে পর্যন্ত শেখে নি ......"

"সে নিশ্চয়ই পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত।"

একথা বলা মাত্র আমি আবার তা ফিরিয়ে নিতে চাই। যাহোক, মনে হয় সে একটা পাত্তা দেয় নি, মদ পান করেই চলে। সেই সঙ্গে চলতে থাকে তীব্র ধূমপান।

বিষয় বদলানোর চেষ্টায় বলি, "আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছি, তুমি সাধারণতঃ লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করো না। আজকে হঠাৎ কি মনে করে এলে? আমি তোমাকে একবছরের বেশী জানি, তবু এই প্রথমবার তুমি এখানে।"

"আমি এইমাত্র তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম: আমার বাড়িতে আপাততঃ আমার সঙ্গে দেখা করো না। আমার ওখানে পিতা-পুত্র আছে যারা একেবারে বিরক্তিকর। ধরতে গেলে মানুষ নয়।"

"পিতা-পুত্র? তারা কে?" আমার অবাক হবার পালা।

"আমার চাচাত ভাই এবং তার ছেলে। ছেলেটি দেখতে বাবার মত।"

"আমার মনে হয় তারা শহরে এসেছে তোমাকে দেখতে এবং ভালো সময় কাটাতে।"

"না। তারা এসেছে ছেলেটিকে যাতে পোষ্য হিসেবে গ্রহণ করি সে ব্যাপারে আলাপ করতে।"

"কি? ছেলেটিকে পোষ্য হিসেবে গ্রহণ করা?" আমি বিস্ময়ে হা হয়ে যাই। "কিন্তু তুমি বিবাহিত নও।"

"তারা জানে আমি বিয়ে করব না। কিন্তু তাদের কিছু যায় আসেনা। আসলে তারা গ্রামে আমার সেই জীর্ণ বাড়ীটি ভোগ করতে চায়। তুমি জান, আমার অন্য কোন সম্পত্তি নেই; টাকা পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তা খরচ করে ফেলি। আমার শুধু ঐ বাড়ীটা আছে। জীবনে তাদের উদ্দেশ্য আপাততঃ ঐ বাড়ীতে বসবাস-কারী বুড়ী চাকরানীকে তাড়িয়ে দেয়া।"

তার মন্তব্যের এই দোষদর্শিতা আমাকে অবাক করে দেয়। যাহোক তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলি:

"আমার মনে হয় না তোমার আত্মীয় স্বজন এত খারাপ হতে পারে। তারা কিছুটা মান্ধাতা আমলের। উদাহরণ স্বরূপ, সে বছর তুমি যখন খুব কাঁদছিলে তখন তারা আগ্রহ নিয়ে এসেছিল তোমাকে বোঝাতে......"

"আমি যখন ছোট ছিলাম তখন বাবা মারা গেলে আমি খুব কেঁদেছিলাম, কেননা তারা বাড়ীটি নিয়ে যেতে এবং দলিলে আমার টিপসই নিতে চেয়েছিল। তখন তারাও আগ্রহ নিয়ে এসেছিল আমাকে বোঝাতে......" সে ওপরের দিকে তাকায়। যেন বাতাসে সেই পুরনো দিনের ছবি খুঁজছে।

"মূল ব্যাপার হচ্ছে তোমার কোন ছেলেমেয়ে নেই। তুমি বিয়ে কর না কেন?" কথা পাল্টানোর জন্য একটা পথ পেয়েছি এবং এটা অনেকদিন ধরে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছি। মনে হল সুবর্ণ সুযোগ এসে গেছে।

অবাক হয়ে সে আমার দিকে তাকায়। তারপর হাঁটুর দিকে চোখ নামিয়ে ধূমপান করতে থাকে। আমি আমার প্রশ্নের কোন জবাব পাই নি।

৩

তবু শান্তিতে তাকে এই অর্থহীন অস্তিত্ব ভোগ করতে দেয়া হয় নি। ধীরে ধীরে স্বল্প পরিচিত কাগজে তার বিরুদ্ধে বেনামী সমালোচনা প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং স্কুলে তার সম্পর্কে গুজব ছড়ানো হয়। এসব পুরনো দিনের সাধারণ গুজব নয়, উদ্দেশ্যমূলকভাবে ক্ষতিকর। আমি জানতাম এসব হচ্ছে ম্যাগাজিনে যেসব প্রবন্ধ সে লিখেছে তার ফলাফল, তাই আমি গুরুত্ব দেই নি। " S " শহরের লোকজন ভয়হীন তর্কের চেয়ে আর কোন কিছুকে এত অপছন্দ করে না, এবং যে কেউ এর দোষে দায়ী হলে গোপন আক্রমণের শিকার হবে। এটাই নিয়ম এবং ওয়েইও সেটা জানত। বসন্তে যখন শুনলাম স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে পদত্যাগ করতে বলেছে, স্বীকার করব তখন আমিও অবাক হয়ে যাই। অবশ্য, এটা শুধু আশা করেছিলাম এবং আমার বন্ধু রক্ষা পাবে মনে করাতেই অবাক হয়েছিলাম। সাধারণ অবস্থার চেয়ে " S " শহরের লোকজন নিজেদের খুব একটা হিংসুটে প্রমাণ করে নি।

সে হেমন্তে শানইয়াং-এর একটি স্কুলে যাবার ব্যাপারে আলাপ আলোচনায় আমি নিজের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তাই তার সঙ্গে দেখা করার সময় ছিল না। অবসর পেতে পেতে প্রায় তিনমাস কেটে যায়, তবু তার সঙ্গে দেখা করার কথা মনে হয় নি। একদিন বড় রাস্তা দিয়ে যাবার সময় একটি পুরনো বইয়ের দোকানের সামনে থামি। সেখানে ওয়েই-এর সংগ্রহ থেকে "সিমা ছিয়ান-এর ঐতিহাসিক রেকর্ড সম্পর্কে মন্তব্যের" প্রথমদিককার একটি সংস্করণ দেখে অবাক হয়ে যাই। সে পণ্ডিত নয় কিন্তু বই ভালোবাসে এবং জানতাম বিশেষ করে এই বইটি সে মূল্যবান মনে করত। নিশ্চয়ই কষ্টে পড়ে সে এটা বিক্রী করেছে। চাকরি হারানোর দু তিন মাস পরে সে এত গরীব হয়ে যাবে ভাবতেও অবাক লাগে। তবু টাকা হাতে এলেই সে টাকা খরচ করে এবং কখনো সঞ্চয় করে নি। আমি ঠিক করি তার সঙ্গে দেখা করব। একই রাস্তায় আমি এক বোতল মদ, দু প্যাকেট বাদাম ও দুটি ভাজা মাছের মুড়ো কিনি।

তার দরজা বন্ধ ছিল। দুবার ডাকি, কিন্তু কোন জবাব নেই। ঘুমিয়ে আছে মনে করে আমি জোরে ডাকি, সঙ্গে সঙ্গে দরজায়ও আঘাত করি।

ছেলেমেয়েদের দিদিমা, মোটা মহিলা, ছোট চোখ, উল্টো দিকের জানালা দিয়ে অধীরভাবে মাথা বের করে বলে, "সে বোধ হয় বাইরে গেছে।"

জিজ্ঞেস করি, "কোথায় গেছে?"

"কোথায়? কে জানে—কোথায় যেতে পারে? আপনি অপেক্ষা করতে পারেন, সে সহসাই ফিরে আসবে।"

ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে তার বসার ঘরে যাই। অনেক পরিবর্তন হয়েছে, শূন্যতায় নির্জন মনে হচ্ছে। সামান্য কিছু আসবাবপত্র আছে। তার লাইব্রেরীতে রয়েছে সে সব বিদেশী বই যেগুলো বিক্রী করা যায় নি। ঘরের মাঝখানে রয়েছে সেই টেবিলটি যার চারদিকে বসত সেই সব হতভাগ্য, সাহসী যুবক, অস্বীকৃত প্রতিভাশালী ব্যক্তি এবং নোংরা ও গোলমেলে ছেলেমেয়েরা। এখন সবকিছুই শান্ত মনে হচ্ছে, টেবিলের ওপর ধূলোর পাতলা আস্তর পড়েছে। বোতল এবং প্যাকেট নামিয়ে রেখে একটি চেয়ার টেনে দরজার দিকে মুখ করে টেবিলের পাশে বসে পড়ি।

সহসাই দরজা খুলে যায়। ছায়ার মত নিঃশব্দে কেউ ভেতরে প্রবেশ করে। ওয়েই। গোধূলির আলোয় হয়ত তার মুখ অন্ধকার দেখাচ্ছে, কিন্তু অভিব্যক্তি বদলে নি।

"আহ, তুমি? কতক্ষণ হল এসেছ?" মনে হল খুশী হয়েছে।

বললাম, "খুব বেশীক্ষণ হয় নি। তুমি কোথায় ছিলে?"

"তেমন কোথাও না। একটু হাঁটছিলাম।"

একটি চেয়ার টেনে নিয়ে সেও টেবিলের কাছে বসে। আমরা মদ পান করতে শুরু করি এবং তার চাকুরি হারানোর ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করি। যাহোক, প্রত্যাশিত মনে করে সে এব্যাপারে খুব একটা আলাপ করতে চায় নি। সে এধরণের বহু ঘটনা দেখেছে। মোটেও অদ্ভুত নয়, আলোচনার মত ব্যাপারও নয়। চিরাচরিতভাবেই সে খুব মদ পান করে এবং সমাজ ও ইতিহাস পাঠ নিয়ে আলোচনা করে। কোন একটা কারণে আমি শূন্য বইয়ের শেলফের দিকে তাকাই এবং "সিমা ছিয়ান-এর ঐতিহাসিক রেকর্ড সম্পর্কে মন্তব্য" মনে করে নিঃসঙ্গতা ও দুঃখ বোধ সম্পর্কে সচেতন হই।

"তোমার বসার ঘর খালি মনে হচ্ছে......। সম্প্রতি তোমার অতিথির সংখ্যা কি কমে গেছে?"

"কেউ নেই। আমার মেজাজ ভালো না থাকলে তারা মজা পায় না। মেজাজ খারাপ থাকলে লোকজন অস্বস্তি বোধ করে। যেভাবে লোকজন শীতকালে পার্কে যায় না......"

পরপর দু'চুমুক মদ পান করে সে চুপ করে থাকে। হঠাৎ চোখ তুলে জিজ্ঞেস করে, "আমার মনে হয় চাকরির ব্যাপারে তুমি সুবিধে করতে পার নি?"

যদিও জানি মদের ঘোরে সে তার মনোভাব প্রকাশ করছে, তবু তার প্রতি লোকের ব্যবহারে আমার খুব রাগ হয়। কিছু একটা বলতে যাব এমন সময় সে কান খাড়া করে, তারপর কিছু বাদাম তুলে বাইরে বেরিয়ে যায়। বাইরে ছেলে-মেয়েদের হাসি চীৎকার শুনতে পাই।

কিন্তু সে বাইরে যেতে না যেতেই ছেলেমেয়েরা শান্ত হয়। মনে হয় চলে গেছে। সে তাদের পিছু পিছু গিয়ে কিছু বলে, কিন্তু আমি কোন জবাব শুনতে পাই নি। তারপর ছায়ার মত নীরবে সে ফিরে আসে, এবং মুঠোয় ভরা বাদাম ঠোঙায় রেখে দেয়।

নীচু গলায় ব্যঙ্গ করে বলে, "আমি যা দেই তারা তাও খেতে চায় না।"

যদিও খারাপ লাগে তবু জোর করে হেসে বলি, "বুড়ো ওয়েই, তুমি নিজেকে শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছ। তোমার সহযাত্রীদের এত খারাপ ভাব কেন?"

সে অবিশ্বাসের হাসি হাসে।

"আমি এখনো শেষ করি নি। আমার মনে তুমি লোকজনকে আমার মত মনে কর, যারা সময় কাটানো বা তোমার খরচে আনন্দ করার জন্য মাঝে মাঝে এখানে আসে।"

"না, করি না। কখনো কখনো করি। বোধহয় কিছু একটা নিয়ে আলাপ করার জন্য তারা আসে।"

"তাহলে তুমি ভুল করছ। লোকজন এমন নয়। তুমি আসলে নিজেকে রেশমগুটির ভেতর গুটিয়ে ফেলছ। তোমার আর একটু হাসিখুশী হওয়া উচিত।" আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

"হয়ত বা। কিন্তু আমাকে বল, এই রেশমগুটির সুতো আসে কোত্থেকে? অবশ্য, ঐ ধরণের লোক অনেক আছে, আমার দিদিমার কথাই ধর। যদিও আমার শিরায় তার কোন রক্ত নেই, আমি তার ভাগ্য পেতে পারি। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসেনা, আমি ইতোমধ্যে নিজেকে তার ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছি ......"

আমার মনে পড়ে তার দিদিমার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে কি ঘটেছে। আমি ঠিক চোখের সামনে তা দেখতে পাচ্ছি।

খোলাখুলি বলেই ফেলি: "আমি এখনও বুঝতে পারি না তুমি এত কেঁদে-ছিলে কেন?"

"দিদিমার শেষকৃত্যে? না, তুমি বুঝবে না।" সে বাতি জ্বালায়। ধীরে

ধীরে বলে, "মনে হয় আমরা দু'জন বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম সেই কারণে। তুমি জান, এই দিদিমা আমার দাদুর দ্বিতীয় স্ত্রী। বাবার যখন তিন বছর বয়স তখন তার মা মারা যায়।" চিন্তা করতে করতে সে ধীরে ধীরে মদ পান করে এবং একটি ভাজা মাছের মুড়ো শেষ করে।

"প্রথমে এটা জানতাম না। ছোটবেলা থেকেই ধাঁধার ভেতর ছিলাম। সে সময় বাবা জীবিত ছিলেন, সংসারের অবস্থাও ভালো ছিল। নববর্ষের সময় আমরা পূর্বপুরুষদের মূর্তি ঝুলিয়ে দিতাম এবং বড় ভোগের আয়োজন করতাম। সুন্দর পোশাক পরানো সেই মূর্তিগুলো দেখা আমার জন্য একটা বিরল আনন্দের ব্যাপার ছিল। সে সময় একজন চাকরানী আমাকে একটি মূর্তির কাছে নিয়ে বলত : 'এটাই তোমার আসল দিদিমা। তাকে প্রণাম কর যাতে তিনি তোমাকে রক্ষা করতে এবং সুস্থ ও সবল হয়ে বেড়ে উঠতে আশীর্বাদ করেন।' আমি বুঝতে পারতাম না একজন থাকা সত্বেও আর একজন দিদিমা কোথেকে এল। কিন্তু 'আমার নিজের' এই দিদিমাকে আমি পছন্দ করতাম। বাড়ীর দিদিমার মত তিনি এত বুড়ী নন। যুবতী এবং সুন্দরী, সোনালী এমব্রয়ডারী করা লাল পোশাক পরণে, মাথায় মুক্তো দেয়া মুকুট, দেখতে আমার মায়ের মত। তাঁর দিকে তাকালে, মনে হত তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, এবং তাঁর ঠোঁটে একটু মৃদু হাসি দেখা দিত। আমি জানতাম তিনি আমাকে খুব পছন্দ করতেন।

"কিন্তু বাড়ীতে দিদিমাকেও আমার খুব পছন্দ হত। সারাদিন তিনি জানালার কাছে বসে ধীরে ধীরে বুননের কাঁটা চালাতেন। যত আনন্দেই আমি তাঁর সামনে হাসতাম বা খেলা করতাম অথবা ডাকতাম, কখনো তাঁকে হাসাতে পারি নি। মনে হত তিনি নিষ্প্রাণ, অন্য ছেলেমেয়েদের দিদিমার মত নয়। তবু, আমি তাঁকে পছন্দ করতাম। তারপর, বয়স বাড়া বা তিনি আমার আসল দিদিমা নয় এটা জানার কারণে আমি তাঁর প্রতি ধীরে ধীরে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ি নি। বরং প্রতিদিন যন্ত্রের মত তাঁর বুননিতে বিরক্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু তিনি বদলান নি। তিনি সেলাই করতে থাকেন, আমার দেখাশোনা করেন এবং আগের মতই আমাকে রক্ষা করেন ; কদাচিৎ হাসলেও, কখনো আমাকে গাল দেন নি। বাবার মৃত্যুর পরও একই অবস্থা চলতে থাকে। পরে আমরা প্রায় তাঁর সেলাইয়ের ওপরই বেঁচে ছিলাম। আমি স্কুলে না যাওয়া পর্যন্ত একই রকম চলতে থাকে

তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় বাতি দপ দপ করে ওঠে। বইয়ের শেলফের নীচে রাখা একটি ছোট টিন থেকে তেল ভরার জন্য সে উঠে দাঁড়ায়।

"এমাসে দুবার তেলের দাম বেড়েছে।" সলতে উসকে দিয়ে ধীরে ধীরে

বলে, "প্রতিদিন জীবন কষ্টকর হয়ে পড়ছে। স্কুলের পড়া শেষ না করা পর্যন্ত তিনি একই রকম ছিলেন এবং চাকুরি পাওয়ার পর আমাদের জীবনে নিরাপত্তা আসে। মনে হয় অসুস্থ হওয়া পর্যন্ত তিনি বদলান নি, তারপর আর চলতে পারেন নি, বিছানা নিতে হয়েছে . . . . . ."

"মনে হয় তার শেষের দিনগুলো খুব খারাপ ছিল না। তিনি অনেক দিন বেঁচেছিলেন, তাই আমার দুঃখ করার দরকার ছিল না। তাছাড়া, বিলাপ করার কি আরো লোক ছিল না? এমনকি যারা তাঁর জিনিষ লুটের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, তারাও বিলাপ করেছে অথবা দুঃখে মাথা নত করেছে।" সে হেসে ওঠে। "যাহোক, সে সময় তাঁর পুরো জীবন আমার মনে ভেসে ওঠে — এক-জনের জীবন যে নিজের জন্য নিঃসঙ্গতা সৃষ্টি করেছে এবং তার তিক্ততার স্বাদ নিয়েছে। মনে হয় তাঁর মত অনেক লোক ছিল। আমি তাদের জন্য কাঁদতে চেয়েছি ; কিন্তু বোধ হয় আমি খুব বেশী অনুভূতি প্রবণ হয়ে পড়েছিলাম . . . . . ."

"তোমার বর্তমান উপদেশ হচ্ছে আমি তার ব্যাপারে কেমন বোধ করেছি। কিন্তু সেসময় আমার ধারণা ছিল ভুল। নিজের কথা বলতে গেলে, বড় হতে হতে তার ব্যাপারে আমি নিষ্প্রাণ হয়ে গেছি . . . . . ."

সে একটু থামে। আঙ্গুলের ফাঁকে সিগারেট। মাথা নত করে চিন্তায় ডুবে যায়। বাতি দপ দপ করে ওঠে।

যেন নিজেকে বলছে, এমনভাবে সে বলে, "কেউ তোমার জন্য দুঃখ করবে না একথা জেনে বেঁচে থাকা কষ্টকর।" একটু থেমে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, "মনে হয় তুমি সাহায্য করতে পারবে না? সহসাই কিছু একটা করার ব্যবস্থা করতে হবে।"

"তোমার অন্য কোন বন্ধু নেই যাকে জিজ্ঞেস করতে পার?" অন্যকে সাহায্য করব কি, তখন নিজেকেই সাহায্য করার মত অবস্থা আমার ছিল না।

"গুটি কয়েক আছে, কিন্তু তাদের অবস্থা একই . . . . . ."

যখন উঠে আসি তখন পূর্ণিমার চাঁদ অনেক ওপরে, রাত নিঝুম।

৪

শানইয়াং-এর মাষ্টারী খুব সুখের ব্যাপার ছিল না। এক পয়সা বেতন না পেয়ে আমি দু'মাস পড়িয়েছি। তারপর সিগারেটের খরচ কমাতে হয়েছে। কিন্তু স্কুলের কর্মচারীরা, এমনকি যারা মাসে পনেরো, ষোল টাকা বেতন পায়

তারাও অল্পতেই তৃপ্ত। দারিদ্রে জর্জরিত হয়ে তারা লৌহকঠিন হয়ে গেছে। রোগা পাতলা হলেও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে, কাজের মাঝে পদস্থরা বাধা দিলে বিনয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে। এভাবেই তারা সাধারণ জীবন যাপন ও উচ্চ মানসিকতা পোষণ করছে। যে কোনভাবে এটা আমাকে ওয়েই-এর শেষ কথাগুলো মনে করিয়ে দেয়। সে তখন খুব কষ্টে আছে এবং আগের অবিশ্বাস হারিয়ে ফেলায় প্রায়ই তাকে বিব্রত দেখায়। যখন শুনেছে চলে যাচ্ছি, গভীর রাতে আমাকে বিদায় জানাতে আসে। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে তোতলাতে থাকে:

"ওখানে কি আমার জন্য কোন ব্যবস্থা হবে? এমনকি মাসিক বিশ থেকে ত্রিশ টাকার বিনিময়ে নকল করার কাজ হলেও চলবে। আমি . . . . . ."

আমি অবাক হয়ে যাই। ভাবতে পারি নি সে এত ছোট কিছু একটা ভাববে। কিভাবে জবাব দিতে হবে তাও জানি নি।

"আমি . . . . . . আমাকে আর একটু বাঁচতে হবে . . . . . ."

"সেখানে পেঁছার পর দেখব। যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেখব।"

সে সময় এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কথাগুলো প্রায়ই আমার কানে বাজত, যেন এখনো ওয়েই আমার সামনে তোতলাচ্ছে: "আমাকে আর একটু বাঁচতে হবে।" তার ব্যাপারে আমি অনেককে উৎসাহী করে তোলার চেষ্টা করি, কিন্তু কোন লাভ হয় নি। যেহেতু চাকরির সংখ্যা অল্প এবং বেকারের সংখ্যা বেশী, তাই সাহায্য করতে না পারার জন্য এসব লোক প্রায়ই ক্ষমা চাইত এবং আমিও তাকে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখতাম। টার্ম শেষ হতে হতে অবস্থা খারাপ থেকে খারাপ হয়। স্থানীয় কিছু বদমাতব্বর সম্পাদিত পত্রিকা «যুক্তি» আমাকে আক্রমণ করতে শুরু করে। স্বভাবতঃই কোন নাম উল্লেখ করা হয় নি কিন্তু সরাসরি ইঙ্গিত দেয়া হয় আমি স্কুলে গোলমাল পাকাচ্ছি। এমনকি ওয়েই সম্পর্কে আমার সুপারিশকে বলা হয় দল পাকানোর ফন্দি।

তাই আমাকে চুপ থাকতে হয়। পড়ানো ছাড়া আমি চুপচাপ ঘরে শুয়ে থাকতাম। এমনকি জানালা দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া বের হলে ভয় হত তারা বলবে আমি গোলমাল পাকাচ্ছি। স্বভাবতঃই ওয়েই-এর জন্য আমার কিছু করার ছিল না। শীতের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে।

সারাদিন বরফ পড়তে থাকে। সন্ধ্যা পর্যন্ত বরফ পড়া বন্ধ হয় নি। বাইরেটা এত নীরব যে নীরবতার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। মৃদু আলোয় চোখ মুদে আমি সেখানে চুপচাপ বসে থাকি, কল্পনা করতে থাকি তুষার কণা পড়ছে, জমে উঠছে বরফের স্তূপ। বাড়ীতে নববর্ষের সময় হয়ে এসেছে এবং সবাই খুব ব্যস্ত হবে। নিজেকে শিশুর মত মনে হয়। মনে হয় পেছনের উঠোনে একদল ছেলেমেয়ের

সঙ্গে বরফ মানুষ বানাচ্ছি। কালো কয়লা দিয়ে তৈরী বরফ মানুষের চোখ হঠাৎ ওয়েই-এর চোখ হয়ে যায়।

"আমাকে আর একটু বাঁচতে হবে।" আবার সেই একই কণ্ঠস্বর।

"কিসের জন্য?" আমি অসতর্কভাবে জিজ্ঞেস করি, সঙ্গে সঙ্গে নিজের ব্যর্থ মন্তব্যে সজাগ হয়ে ওঠি।

এই জবাব আমাকে জাগিয়ে দেয়। উঠে বসে সিগারেট ধরিয়ে জানালা খুলে দেই। দেখি ভীষণ বরফ পড়ছে। দরজায় শব্দ শুনি, একটু পরেই দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে চাকর। তার পায়ের শব্দ আমার চেনা। সে ছয় ইঞ্চির বেশী লম্বা একটি খাম আমার হাতে দেয়। ঠিকানা এলোমেলো, কিন্তু তাতে ওয়েই-এর নাম দেখতে পাই।

' S ' শহর ছেড়ে আসার পর এই প্রথম সে চিঠি লিখেছে। জবাব দিতে ব্যর্থ-তার কথা জানায় তার নীরবতায় আমি অবাক হই নি। কখনো কখনো মনে হয়েছে তার নিজের কিছু খবর আমাকে জানানো উচিত। চিঠিটি একটু অবাক ব্যাপার। খুলে ফেলি। ব্যস্ততার মধ্যে লেখা চিঠিতে বলা হয়েছে :

"......শেন ফেই,

"তোমাকে কি বলে সম্বোধন করব? তোমার পছন্দমত সম্বোধনের জন্য খালি জায়গা রেখে দিয়েছি। আমার জন্য তা একই রকম হবে।

"এ পর্যন্ত তোমার মোট তিনটি চিঠি পেয়েছি। একটি সাধারণ কারণে জবাব দেই নি : আমার টিকেট কেনার পর্যন্ত পয়সা ছিল না।

"হয়ত তুমি জানতে চাইবে আমার ভাগ্যে কি ঘটেছে। সোজা কথায় বলতে গেলে : আমি ব্যর্থ হয়েছি। ভেবেছিলাম আগে ব্যর্থ হয়েছি, তখন ভুল হয়েছিল। এখন, আমি সত্যিই ব্যর্থ। আগে কেউ একজন ছিল যে চাইত আমি আর একটু বাঁচি, আমিও তা আশা করেছিলাম, কিন্তু তা কষ্টকর মনে হয়েছে। এখন কোন দরকার নেই, তবু আমাকে বেঁচে থাকতে হবে......

"আমি কি বাঁচব?

"যে চেয়েছে আমি একটু বেশী বাঁচি সে নিজে বাঁচতে পারে নি। শত্রুর ফাঁদে আটকা পড়ে সে নিহত হয়েছে। কে তাকে হত্যা করেছে? কেউ জানে না।

"পরিবর্তন এত দ্রুত ঘটে! গত ছয় মাস আমি প্রায় ভিখিরী ছিলাম! সত্যি, আমাকে ভিখিরী বলা যেত। যাহোক, আমার উদ্দেশ্য ছিল। আদর্শের জন্য

আমি ভিক্ষা করতে, ঠাণ্ডা ও ক্ষিধের কষ্ট পেতে, নিঃসঙ্গ হতে এবং দুঃখকষ্ট ভোগ করতে রাজী ছিলাম। কিন্তু নিজেকে ধ্বংস করতে চাই নি। তাই দেখ, একজন যে চেয়েছে আমাকে বাঁচাতে, সে অখণ্ডনীয় প্রমাণিত হয়েছে। এখন আর কেউ নেই, একজনও না। একই সঙ্গে মনে হয় আমার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই, এবং আমার মতে আমার কিছু লোকেরও তা নেই। তবু আমি বেঁচে থাকার ব্যাপারে সজাগ, যারা চায় না আমি মরে যাই তাদের মুখে থুথু দেয়ার জন্য, এমন কেউ নেই যে চায় আমি সুন্দরভাবে বেঁচে থাকি, কাজেই কেউ কোন দুঃখ পাবে না। আমি এধরণের লোকদের দুঃখ দিতে চাই না। কিন্তু এখন কেউ নেই, একজনও নয়। কি মজা! চমৎকার! আগে যা অপছন্দ এবং বিরোধিতা করেছি এখন তা করছি। আগে যা বিশ্বাস এবং সমর্থন করেছি এখন তা ত্যাগ করছি। আমি সত্যিই ব্যর্থ — কিন্তু জিতে গেছি।

"তুমি কি মনে কর আমি পাগল? মনে করছ আমি বীর বা মহান পুরুষ হয়ে গেছি? না, ব্যাপারটা তা নয়। ব্যাপারটা খুব সোজা; আমি জেনারেল ডু'র পরামর্শদাতা হয়েছি, তাই মাসিক বেতন ৮০ টাকা।

"......শেন ফেই,

"তুমি আমাকে কি ভাববে? তুমিই ঠিক কর। আমার জন্য সব সমান।

"বোধহয় তোমার এখনো আমার পুরনো বসার ঘরের কথা মনে আছে, যেখানে আমাদের প্রথম ও শেষ কথা হয়েছিল। আমি এখনো এটা ব্যবহার করছি। এখন নতুন অতিথি, নতুন ঘুষ, নতুন তোষামোদী, পদোন্নতির নতুন আবদার, নতুন প্রণাম, নতুন মাজিয়াং এবং মদের খেলা, নতুন গর্ব ও বিরক্তি, নতুন অনিদ্রা এবং রক্ত বমি......

"শেষ চিঠিতে বলেছিলে তোমার মাষ্টারী ভালো চলছে না। তুমি কি পরামর্শদাতা হতে চাও? বল, তাহলে আমি তোমার জন্য ব্যবস্থা করব। আসলে, দরজার কাজ করলেও একই অবস্থা হবে। একই অতিথি, ঘুষ এবং তোষামোদী থাকবে......

"এখানে খুব বরফ পড়ছে। তোমার ওখানে কেমন? এখন মাঝরাত। কিছু রক্ত বমি হওয়ায় আমার অবস্থা শান্ত হয়েছে। মনে পড়ে হেমন্ত থেকে পর পর তিনবার তুমি আমাকে লিখেছ — বিস্ময়কর! আমি তোমাকে এই সংবাদ দিচ্ছি, আশা করি আঘাত পাবে না।

"আমি বোধহয় আর লিখব না, তুমি আমার পুরনো নিয়ম জান। তুমি যদি সহসাই আস, আমাদের আবার দেখা হতে পারে। তবু, মনে হয় আমরা ভিন্ন

পথ নিয়েছি, তুমি বরং আমাকে ভুলে যাও। আমার জন্য কাজ ঠিক করার চেষ্টা করায় তোমাকে হৃদয়ের অন্তকরণ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দয়া করে আমাকে ভুলে যাও, আমি 'ভালই' চালাচ্ছি।

ওয়েই লিয়ানশু

১৪ ডিসেম্বর।"

চিঠিটি আমাকে "আঘাত" না দিলেও, তড়িঘড়ি করে পড়ার পর, আবার সতর্কতার সঙ্গে সেটা পড়ি। আমি অস্বস্তি এবং মুক্ত বোধ করি। অন্ততঃ তার জীবন নিরাপদ, এবং তা নিয়ে আর চিন্তা করার দরকার নেই। যে কোনভাবে, আমি এখানে কিছুই করতে পারব না। আমি তাকে লেখার কথা ভাবি, কিন্তু বুঝতে পারি বলার কিছুই নেই।

আসলে, তাকে ধীরে ধীরে ভুলে যাই। আমার মনের চোখে তার চেহাবা আর হরহামেশা ভেসে ওঠে নি। যাহোক, তার চিঠি পাবার দশ দিনেরও কম সময়ে, ' S ' শহর সাপ্তাহিকী আমাকে তাদের কাগজ পাঠাতে শুরু করে। নীতি হিসেবে আমি এধরণের কাগজ পড়ি না, কিন্তু যেহেতু আমাকে পাঠানো হচ্ছে তাই কিছু কিছু বিষয়ের ওপর চোখ বুলাই। এটা আমাকে ওয়েই-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কেননা পত্রিকায় প্রায়ই তার সম্পর্কে প্রবন্ধ বা কবিতা ছাপা হত «তুষার ঝড়ের রাতে বুদ্ধিজীবী ওয়েই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ», «পরামর্শদাতা ওয়েই-এর ঘরে কবি জমায়েত», এবং আরো অনেক কিছু। একবার, তারা «গাল-গল্প»নাম দিয়ে তার এমন কিছু গল্প প্রকাশ করে যেগুলো বিদ্রূপ বলে বিবেচিত হয়েছে, কিন্তু এখন "খেয়ালী প্রতিভার কাহিনী" হয়ে গেছে। অর্থ, একমাত্র একজন অস্বাভাবিক মানুষ এ ধরণের অস্বাভাবিক কাজ করতে পারে।

যদিও এসব থেকে তার কথা মনে পড়ত, তবু তার স্মৃতি আমার কাছে ধূসর হয়ে আসে। তবু সব সময় মনে হয় আমার ওপর তার নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় হয়েছে। এতে সব সময় অকারণে আমি একটা অস্বস্তি ও অদৃশ্য চেতনা বোধ করতে থাকি। যাহোক, হেমন্তের মধ্যে কাগজ আসা বন্ধ হয়ে যায়। শানইয়াং পত্রিকা দীর্ঘ প্রবন্ধ "গুজবে সত্যের উপস্থিতি"র প্রথম কিস্তি প্রকাশ করতে শুরু করে। এতে জোর দিয়ে বলা হয় কিছু কিছু ভদ্রলোক সম্পর্কে গুজব ক্ষমতাবানের কানে পৌঁছেছে। আক্রান্তদের মধ্যে আমার নাম ছিল। তখন আমাকে খুব সর্তক হতে হয়। যাতে আমার সিগারেটের ধোঁয়া অন্যের নজরে না পড়ে সে ব্যাপারে সতর্ক হতে হয়। এই সমস্ত সতর্কতায় এত সময় কেটে যায় যে অন্য কোন ব্যাপারে নজর দিতে পারি নি, এবং স্বভাবতঃই ওয়েই-এর কথা ভাবার

অবসর ছিল না। আমি আসলে তাকে ভুলে যাই।

গরম পর্যন্ত আমি চাকরি রক্ষা করতে পারি নি। মে মাসের শেষে আমাকে শানইয়াং ছাড়তে হয়।

৫

ছয় মাসের বেশী আমি শানইয়াং, লিছেং এবং থাইগু ঘোরাঘুরি করি, কিন্তু কোন কাজ জোটাতে পারি নি। তাই ' S ' শহরে ফিরে যাওয়া ঠিক করি। বসন্তের প্রথম দিকে এক বিকেলে সেখানে পেঁৗছি। মেঘলা দিন, সবকিছু কুয়াশায় ঢাকা। পুরনো হোষ্টেলে খালি কামরা থাকায় সেখানেই থাকি। পথে ওয়েই-এর কথা ভাবতে শুরু করি। পেঁৗছার পর ঠিক করি সান্ধ্য খাবারের পর তার সঙ্গে দেখা করতে যাব। বিখ্যাত ওয়েনসী কেকের দুটো প্যাকেট নিয়ে কয়েকটি সেঁৎসেঁতে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাই। বহু ঘুমন্ত কুকুর সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে তার দরজায় পেঁৗছি। মনে হল ভেতরে উজ্জ্বল আলো। ভাবলাম, পরামর্শদাতা হওয়ায় তার ঘরে আলো বেশী এবং নিজে নিজেই হেসে ওঠি। ওপরে তাকিয়ে দেখি, দরজার ওপর একটি সাদা কাগজ লাগানো। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে মনে হয় হয়ত ছেলেমেয়েদের দিদিমা মারা গেছে ; কিন্তু সোজা ভেতরে চলে যাই।

স্বল্পালোকিত উঠোনে একটি কফিন, পাশেই ইউনিফর্ম পরা সৈন্য অথবা আর্দালী, ছেলেমেয়েদের দিদিমার সঙ্গে কথা বলছে। ছোট পোশাকের কিছু শ্রমিকও সেখানে ঘোরাফেরা করছে। আমার বুকের ভেতর দ্রুত ওঠা-নামা করতে থাকে। ঠিক সে সময়ে সে আমার দিকে তাকায়।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, "আহ, তুমি ফিরেছ? আগে এলে না কেন?"

"কে . . . . . . কে মারা গেছে?" এতক্ষণে আমি জেনে গেছি, তবু জিজ্ঞেস করি।

"পরামর্শদাতা ওয়েই গত পরশু মারা গেছেন।"

আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখি। বসার ঘরে স্বল্প আলো, বোধহয় একটি বাতি জ্বলছে, সামনের ঘরটিতে শেষকৃত্যের পরদা ঝোলানো এবং মহিলার নাতি-নাতনীরা সে ঘরের সামনে জড়ো হয়েছে।

সামনে এগিয়ে সামনের কামরার দিকে দেখিয়ে মহিলা বলে, "তার মৃতদেহ ওখানে। মিঃ ওয়েই-এর পদোন্নতির পর আমি তাঁকে সামনের কামরাটিও ভাড়া

দিয়েছিলাম, সেখানেই এখন তিনি আছেন।"

শেষকৃত্যের পর্দায় কোন কিছু লেখা ছিল না। সামনে একটি লম্বা টেবিল, তারপর একটি বর্গাকার টেবিল, ওপরে ডজন খানেক থালাবাসন ছড়ানো। ভেতরে ঢোকার সময় লম্বা সাদা গাউনের দুজন লোক হঠাৎ এসে আমার পথ রোধ করে দাঁড়ায় তাদের চোখ মরা মাছের চোখের মত, বিস্ময়ে ও অবিশ্বাসে আমার ওপর নিবদ্ধ। তড়িঘড়ি করে ওয়েই-এর সঙ্গে সম্পর্ক বর্ণনা করি এবং গৃহকর্ত্রীও এগিয়ে এসে আমার বক্তব্য সমর্থন করে। তারপর তাদের হাত ও চোখজোড়া নেমে যায় এবং মৃতের উদ্দেশে সম্মান জানানোর জন্য আমাকে ভেতরে যেতে দেয়।

সম্মান দেখানোর সময় পাশেই মেঝে থেকে একটি বিলাপ ভেসে আছে। নীচে তাকিয়ে দেখি দশ বছরের একটি শিশু, সাদা পোশাক পরণে, মাদুরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। তার চুল ছোট করে ছাঁটা, এবং তাতে কিছু শণ বাধা।

পরে জানতে পারি এই লোকদু'জনের একজন ওয়েই-এর চাচাত ভাই, তার সবচে নিকট আত্মীয়, আর একজন দূর সম্পর্কের ভাগনে। আমি ওয়েইকে দেখীর অনুমতি চাই, কিন্তু সেটা "বিনয়" বলে তারা আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে পর্দা উঠিয়ে দেয়।

এবার আমি মৃত ওয়েইকে দেখি কিন্তু অবাক ব্যাপার, গায়ে রক্তে ভেজা কোঁচকানো জামা থাকলেও এবং মুখ শুকনো দেখালেও, অভিব্যক্তি অপরিবর্তিত। বন্ধ চোখ ও মুখ নিয়ে সে এত শান্তভাবে ঘুমিয়ে আছে যে শ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে কিনা তা নাকে আঙ্গুল দিয়ে অনুভব করতে লোভ হয়।

জীবিত এবং মৃত সবকিছুই মৃতের মত নিশ্চুপ। চলে আসার সময় তার চাচাত ভাই আমাকে সম্বোধন করে বলে, বিশেষ করে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে, যখন সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, সেসময় ওয়েই-এর এই অকাল মৃত্যু শুধু তার সাধারণ পরিবারেব জন্য বিপর্যয় নয়, বন্ধুদের জন্যও দুঃখের। মনে হল ওয়েই-এর মৃত্যুর জন্য সে ক্ষমা চাইছে। গ্রামবাসীদের মধ্যে এ ধরণের বাক্‌পটুতা বিরল। যাহোক, এই বলে সে আবার নীরব হয়ে যায় এবং জীবিত ও মৃত সবকিছুই মৃতের মত নিশ্চুপ হয়ে যায়।

দুঃখবোধ নয়, নিরানন্দ মনে আমি বুড়ীর সঙ্গে আলাপ করার জন্য উঠোনে যাই। সে জানায় সহসাই শেষকৃত্য হবে। তারা কাফনের জন্য অপেক্ষা করছে এবং যখন কফিন বন্ধ করা হবে তখন কয়েকটি রাশির লোক কাছে থাকবে না। সে বকবক করেই চলে, কথা বানের মত আসতে থাকে। সে ওয়েই-এর অসুস্থতা, জীবনের কিছু ঘটনার কথা বলে, এমনকি কিছু সমালোচনাও করে।

"জানেন, কপাল ফেরার পর মিঃ ওয়েই সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে যান। তিনি সবসময় গর্বে মাথা উচুঁ করে চলতেন। তার পুরনো রীতিতে লোকজনের সঙ্গে ব্যবহার বন্ধ করে দেন। আপনি কি জানতেন তিনি বুদ্ধুর মত ব্যবহার করতেন এবং আমাকে 'ম্যাডাম' ডাকতেন। শেষে, সে মুখ টিপে হাসে, আমাকে ডাকত 'বুড়ী কুত্তী'। খুব হাস্যকর ব্যাপার। যখন লোকজন তাকে সিয়ানজ্যুশু-এর মত দুর্লভ ঔষধি পাঠাত তখন খাওয়ার বদলে তিনি সেগুলো উঠোনে ফেলে দিতেন। ঠিক এখানে এবং ডেকে বলতেন; 'বুড়ী কুত্তী, তুমি এগুলো নাও।' কপাল ফেরার পর তাঁর দর্শনপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল বহু, তাই তাঁর জন্য সামনের কামরাটা খালি করে দিয়ে পাশের একটিতে সরে যাই। সবসময় মজা করার জন্য বলেছি, কপাল ফেরার পর তিনি সম্পূর্ণ বদলে যান। এক মাস আগে আসলে এখানে সব মজা দেখতে পারতেন। প্রায় প্রতিদিন মদের আসর, গালগল্প, হাসিঠাট্টা, গান বাজনা, কবিতা লেখা এবং মাজিয়াং খেলা . . . . . .

"ছেলেমেয়েরা বাপমা'কে যা ভয় পায় তারচে বেশী তিনি ভয় পেতেন ছেলেমেয়েদের, বলতে গেলে তাদের সামনে নতমুখে চলতেন। কিন্তু সম্প্রতি সেটাও বদলে যায়, এবং খুব মজা করতে পারতেন আমার নাতি-নাতনীরা তাঁর সঙ্গে খেলতে ভালোবাসত এবং যখনই পারত তাঁর ঘরে যেত। তিনি যতসব বাস্তব চুটকি ভেবে রাখতেন। যেমন, তারা যদি তাঁকে কিছু কিনে দেয়ার কথা বলত তাহলে তিনি তাদের কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করতে বা লাফিয়ে প্রণাম করতে বাধ্য করতেন। আহ, সেটা ছিল মজার। দু'মাস আগে আমার দ্বিতীয় নাতি মিঃ ওয়েই-কে একজোড়া জুতো কিনে দিতে বলেছিল এবং তাঁকে তিনবার লাফিয়ে প্রণাম করতে হয়েছে। সে এখনো সেগুলো পড়ছে, এখনো ছিঁড়ে যায় নি।"

সাদা পোশাকের একজন বেরিয়ে এলে সে কথা বন্ধ করে দেয়। আমি ওয়েই-এর অসুস্থতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি, কিন্তু খুব সামান্যই সে বলতে পারে। সে শুধু জানে, অনেকদিন ধরেই ওয়েই-এর ওজন কমে যাচ্ছিল, তারা এনিয়ে মাথা ঘামায় নি কেননা তাঁকে সবসময় খুব উৎফুল্ল দেখাত। এক মাস আগে তারা শুনতে পায় তাঁর কাশির সঙ্গে রক্ত আসছে, কিন্তু মনে হয় তিনি ডাক্তার দেখান নি। তারপর তাঁকে বিছানায় পড়ে থাকতে হত এবং মৃত্যুর তিনদিন আগে তিনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তাঁর চাচাত ভাই সেই গ্রাম থেকে এতটা পথ আসে তাঁর টাকা পয়সা জমা আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে, কিন্তু তিনি একটি কথাও বলেন নি। তাঁর চাচাত ভাই মনে করে তিনি ভান করছেন, কিন্তু কেউ কেউ বলে যক্ষ্মায় মৃত্যুপথযাত্রীরা বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে . . . . . .।

বুড়ী হঠাৎ ফিসফিসিয়ে বলে, "কিন্তু মিঃ ওয়েই বড় অদ্ভুত লোক ছিল।

তিনি কখনো টাকা পয়সা জমান নি, সবসময় জলের মত খরচ করেছেন। তাঁর চাচাত ভাই এখনো সন্দেহ করে আমরা তাঁর কাছ থেকে কিছু হাতিয়েছি। খোদা জানে, আমরা কিছুই পাই নি। তিনি সবকিছু এলোমেলো খরচ করেছেন! আজকে কিছু কেনা, কাল সেটা বিক্রী করা অথবা ভেঙ্গে ফেলা — খোদা জানে কি ঘটেছে। তিনি যখন মারা যান তখন কিছুই ছিল না, সব খরচ হয়ে গেছে! না হলে সবকিছু আজ এত বিষণ্ন হতো না ......।

"তিনি শুধু অপচয় করেছেন, ঠিক কাজ করতে চান নি। এই বয়সে তাঁর বিয়ে করা উচিত ছিল। আমি সেটা ভেবেছিলাম এবং তাঁকে বলেছিলাম। তখন তাঁর জন্য এটা সহজ হত। ভালো পরিবার না পাওয়া গেলে তিনি কিছু রক্ষিতা রাখতে পারতেন। লোকজনের মান সম্মান ঠিক রাখা উচিত। কিন্তু যখনই তা বলতাম তিনি শুধু হাসতেন। বলতেন, 'বুড়ী কুত্তী, তুমি সবসময় লোকজনের এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাও।' দেখেন, তিনি কখনো আন্তরিক ছিলেন না, ভালো পরামর্শ শুনতেন না। আমার কথা শুনলে, পরলোকে তাঁকে একা চলতে হত না, অন্ততঃ আপনজনরা বিলাপ করত ......"

কিছু কাপড় নিয়ে একজন দোকানী আসে। মৃতের তিনজন আত্মীয় অন্তর্বাসটি তুলে পর্দার পেছনে অদৃশ্য হয়ে যায়। সহসাই পর্দা ওঠে; মৃতের দেহে নতুন অন্তর্বাসটি পরানো হয়েছে, এবং তারা তাঁর কাপড় পরাতে শুরু করেছে। তাঁকে বিশাল লাল ডোরা দেয়া সামরিক পোশাক এবং চকচকে সামরিক ব্যাজওয়ালা জামা পরাতে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। আমি জানতাম না এগুলো কোন পদমর্যাদার বা কিভাবে সে সেটা পেয়েছে। দেহটি কফিনে রাখা হয়। ওয়েই সেখানে অদ্ভুতভাবে শুয়ে আছে, পায়ের কাছে চামড়ার একজোড়া বাদামী জুতো, কোমরের কাছে কাগজের একটি তলোয়ার, এবং শুকনো ও বিবর্ণ মুখের কাছে একটি সামরিক টুপি।

তিনজন আত্মীয় কফিনের কাছে বিলাপ করে। তারপর বিলাপ থামিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে। বুড়ীর তিন নম্বর নাতির মত চুলে শণ বাধা ছেলেটি উঠে যায় — সন্দেহ নেই তাদের রাশি ভিন্ন।

গোরখোদকরা কফিনের ঢাকনা খুলতেই শেষ বারের মত ওয়েইকে দেখার জন্য আমি এগিয়ে যাই।

অদ্ভুত পোশাকে, চোখ মুখ বন্ধ করে সে নির্বিকার শুয়ে আছে। মনে হচ্ছে তার ঠোঁটে পরিহাসের হাসি, হাস্যকর মৃতদেহকে উপহাস করছে।

তারা পেরেক মারা শুরু করতেই নতুন করে বিলাপ শুরু হয়। আমি খুব বেশীক্ষণ তা সহ্য করতে পারি নি, তাই উঠোনে চলে যাই। তারপর, যেকোন-

ভাবে গেটের বা৺ ় চলে যাই। সেঁৎসেঁতে রাস্তা আলোকিত। আকাশে তাকিয়ে দেখি মেঘ সরিয়ে পূর্ণ চাঁদ উঠেছে, ছড়িয়ে দিয়েছে শীতল আলো।

যেন কোন শক্ত প্রতিবন্ধক ভাঙতে চাই এভাবে আমি হনহনিয়ে চলি, কিন্তু অসম্ভব। আমার কানে কিছু একটা বাজছে, এবং অনেক অনেক পর তা ফেটে পড়ে। একটা দীর্ঘ চীৎকার, নিঝুম রাতের ঊষর প্রান্তরে আহত নেকড়ের চীৎ-কার, যন্ত্রণার সঙ্গে ক্ষোভ এবং দুঃখ মিশ্রিত।

তারপর আমার মন হাল্কা হয়ে আসে। চাঁদের আলোয় খোরা বিছানো, সেঁৎসেঁতে রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যাই।

অক্টোবর ১৭, ১৯২৫

অতীতের জন্য অনুশোচনা

জুয়ানশেং-এর মূল হস্তাক্ষরে

আমি চাই, যদি পারি, জিজুন ও আমার নিজের খাতিরে আমার দুঃখ ও অনুশোচনা বর্ণনা করতে।

হোস্টেলের উপেক্ষিত কোনায় এই জীর্ণ কামরাটি এত নীরব এবং ফাঁকা। সময় সত্যি উড়ে যায়। জিজুনের প্রেমে পড়েছি এক বছর পেরিয়ে গেছে, তাই এই মৃত্যুর নীরবতা ও শূন্যতা থেকে মুক্তি পেয়েছি। কপাল মন্দ, ফিরে আসার পর এই কামরাটিই খালি ছিল। ভাঙা জানালা, বাইরে প্রায় বিবর্ণ লোকাস্ট গাছ ও উইস্টারিয়া লতা এবং ভেতরের চৌকোনো টেবিল আগের মতই আছে। চুনকাম খসে যাওয়া দেয়াল, কাঠের বিছানাও একই রকম আছে। জিজুনের সঙ্গে থাকতে শুরু করার আগে যে রকম ছিলাম রাতের বেলা ঠিক তেমনি বিছানায় একা শুয়ে থাকি। গত বছর এমনভাবে মুছে গেছে যেন তা কখনো আসেনি — যেন আশায় বুক বেধে জিযাও গলিতে একটি ছোট্ট ঘর বাঁধার জন্য কখনো এই জীর্ণ কামরার বাইরে যাই নি।

এটাই সব নয়। এক বছর আগে এই নীরবতা ও শূন্যতা অন্যরকম ছিল—সব সময় একটা প্রত্যাশা ছিল। জিজুনের আগমনের আশায় দীর্ঘ ও অস্থির প্রতীক্ষার সময় ইটের রাস্তায় উঁচু হিলের শব্দে চঞ্চল হয়ে উঠতাম। তারপর দেখতাম তার হাস্যময়ী মলিন গোলাকার মুখ, পাতলা, পরিষ্কার বাহু জোড়া, ডোরাকাটা সুতি ব্লাউজ এবং কালো স্কার্ট। আমি দেখবো ব'লে কখনো সে জানালার ও-ধারের প্রায় বিবর্ণ লোকাস্ট গাছ থেকে নিয়ে আসতো নতুন একটি পাতা, কখনো নিয়ে আসতো বুড়ো উইস্টারিয়া লতা থেকে ঝুলে পড়া বেগনী রঙের পুষ্পগুচ্ছ, — ঐ গাছের কাণ্ডটি লোহার তৈরী ব'লে মনে হতো।

এখন শুধু আগেকার সেই শূন্যতা ও নীরবতা। জিজুন আর আসবে না — কখনো না।

জিজুনের অনুপস্থিতিতে আমি এই জীর্ণ কামরায় কিছুই দেখি নি। হয়ত নেহাত এক ঘেয়েমি থেকে একটি বই হাতে নিয়েছি — বিজ্ঞান অথবা সাহিত্য, আমার কাছে সবই সমান। পড়ে যাচ্ছি, পড়ে যাচ্ছি। এক সময় বুঝতে পারি অনেকগুলো পাতা ওল্টানো হয়েছে কিন্তু একটা শব্দও মনে নেই। শুধু কান এত সজাগ ছিল যে মনে হত গেটের বাইরে জিজুন সহ সকলের পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। প্রায়ই মনে হত তার পায়ের শব্দ কাছে থেকে কাছে আসছে — তার পর তা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসত। একসময় মিলিয়ে যেত অন্যদের পায়ের শব্দের ভীড়ে। আমি চাকরের ছেলেকে ঘৃণা করতাম। তার জুতোর নীচে কাপড়েব শব্দ জিজুনের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। পাশের বাড়ীর মেয়েলী পুরুষটাকেও ঘৃণা করতাম। সে মুখে ক্রীম মাখত এবং প্রায়ই নতুন চামড়ার জুতো পরত। তার পায়ের শব্দ প্রায়ই জিজুনের পায়ের শব্দের মত শোনাত।

তার রিক্‌শা কি উল্টে গেছে? সে কি ট্রামের ধাক্কায় আহত হয়েছে?

মাথায় হ্যাট পরে তাকে দেখতে যাব এমন সময় মনে পড়ে তার চাচা মুখের ওপর আমাকে গালি দিয়েছে।

হঠাৎ হয়ত শুনতে পাই সে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে এবং যে সময়ে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য বাইরে যাব ততক্ষণে সে মুখেহাসি নিয়ে উইস্টারিয়া পেরিয়ে গেছে। বোধ হয় চাচার বাড়ীতে তার সঙ্গে খুব একটা খারাপ ব্যবহার করা হয়নি। আমি শান্ত হয়ে আসব, এবং এক মুহূর্ত চুপচাপ দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকার পর পরিবারের অত্যাচার, ঐতিহ্য মুছে ফেলা, নারী পুরুষের সমতা, ইবসেন, রবীন্দ্রনাথ, শেলী প্রভৃতি সম্পর্কে আমার কথার শব্দে সেই জীর্ণ কামরাটি ভরে ওঠবে...... সে মাথা নাড়বে, হাসবে, চোখে থাকবে শিশুর মত অবাক বিস্ময়। দেয়ালে টাঙানো ছিল ম্যাগাজিনের পাতা থেকে কাটা শেলীর তামার তৈরী আবক্ষমূর্তির ছবি। এটা শেলীর সবচে ভালো ছবি, কিন্তু যখনই তাকে দেখিয়েছি সে দ্রুত এক নজর দেখেছে, তারপর অস্বস্তিতে মাথা নুইয়ে ফেলেছে। এসব ব্যাপারে, জিজুন বোধ হয় নিজেকে পুরনো ধারণা থেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে পারেনি। পরে মনে হয়েছে সাগরে ডুবে যাওয়া শেলী বা ইবসেনের ছবি টাঙানোই বোধ হয় ভালো ছিল। কিন্তু কখনো তা পারি নি। এখন এ ছবিটাও উধাও হয়ে গেছে।

"আমিই আমার কর্ত্রী। আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কারো কোন অধিকার নেই।"

কিছুক্ষণ নীরব চিন্তার পর সে পরিষ্কার, দৃঢ় ও গম্ভীরভাবে এই কথাগুলো

বলে—আমরা তার এখানে বসবাসকারী চাচা ও গ্রামে বসবাসকারী বাবার সম্পর্কে আলাপ করছিলাম। তখন আমরা একে অপরকে ছয়মাস ধরে চিনি। ততদিনে আমি তাকে আমার দৃষ্টিভঙ্গি, আমার জীবনে যা ঘটেছে, আমার ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা সব বলেছি। আমি খুব সামান্যই গোপন করেছি, সে আমাকে পুরোপুরি বুঝেছে। তার এই সামান্য কটি কথা আমার হৃদয়ের গভীরে আলোড়ন তোলে এবং তার পর বহুদিন আমার কানে বাজে। হতাশাবাদীরা যেভাবে দেখেছে চীনা মহিলারা ততখানি অকর্মণ্য নয়, এবং অদূর ভবিষ্যতে তাদের পুরো মর্যাদায় দেখতে পাব—এটা জানতে পেরে এক অব্যক্ত আনন্দে আমার মন ভরে যায়।

যতবার তাকে বিদায় জানিয়েছি, ততবার কয়েক কদম পেছনে ছিলাম। বুড়োর গোঁফওয়ালা মুখ সবসময় ময়লা জানালার সঙ্গে সেঁটে থাকত, তাই নাকটাও চ্যাপ্টা হয়ে যেত। বাইরের উঠোনে পৌঁছলে দেখতাম উজ্জ্বল কাঁচের জানালার পাশে সেই ছোট্ট মানুষটার মুখ, ক্রীম মাখা। ডাইনে-বাঁয়ে না তাকিয়ে গর্বভরে হেঁটে গিয়ে জিজুন তাদের দেখত না। আমিও গর্বভরে হেঁটে ফিরে আসতাম।

"আমি আমার কর্ত্রী। আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কারো কোন অধিকার নেই।" এ ব্যাপারে সে পুরোপুরি মন ঠিক করে ফেলেছে। আমাদের দু'জনের মধ্যে সে সবচে পরিষ্কার এবং দৃঢ়। আধা কৌটা ক্রীম বা চ্যাপ্টা নাক সম্পর্কে সে কি পরোয়া করে?

এখন পরিষ্কারভাবে মনে করতে পারি না তার জন্যে আমার সত্যিকারের, আবেগময় ভালোবাসা কিভাবে প্রকাশ করেছিলাম। শুধু এখনই নয়—এটা ঘটার পর পরই আমার স্মৃতি খুব ভোঁতা হয়ে যায়। রাত্রে যখন ভাবতাম তখন যা বলেছি তার সামান্যই মনে করতে পারতাম; তার পর একত্রে থাকতে শুরু করার দু এক মাস পর এই টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলোও স্বপ্নের মত উধাও হয়ে যায়। আমার শুধু মনে পড়ে কিভাবে পনেরো দিন আগে কি বলতে হবে, কি করতে হবে, এবং প্রত্যাখ্যাত হলে মনের অবস্থা কি হবে তার মহড়া দিয়েছিলাম। কিন্তু ঠিক সময়ে তার কোন প্রয়োজন হয়নি। উত্তেজনায়, সিনেমায় যা দেখেছি অবচেতনভাবে তাই করেছি। এ কথা মনে পড়লে ভীষণ লজ্জা পায়, কিন্তু শুধু এটুকুই পরিষ্কার মনে করতে পারি। এমনকি এখন পর্যন্ত অন্ধকার ঘরে নিঃসঙ্গ একটি বাতির মত এটা আমাকে পথ দেখায়। অশ্রুসজল চোখে আমি তার হাত জড়িয়ে ধরি, তার পর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ি......।

সে সময় জিজুনের প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত আমি পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করি নি। শুধু

জানতাম, সে আমাকে গ্রহণ করেছে। মনে পড়ে প্রথমে তার মুখ মলিন তার পর ধীরে ধীরে লালচে হয়ে যায় — আগে যা কখনো দেখি নি বা পরেও না। তার শিশুর মত চোখে দেখা দেয় আশংকা মিশ্রিত দুঃখ এবং আনন্দের দুটা। বিভ্রান্তিতে সে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে চায়, যেন জানালা দিয়ে উড়ে যেতে ভালো লাগবে। তার পর বুঝতে পারি সে রাজী হয়েছে, জানিনা সে কি বলেছে বা আদৌ কিছু বলেছে কিনা।

তার অবশ্য সব কিছু মনে ছিল। আমি যা বলেছি সে একটানা বলতে পারত, যেন মুখস্থ করেছে। সে আমার প্রতিটি আচরণ পুংখানুপুংখ বর্ণনা করে, যেন চোখের সামনে ছবি দেখছি। এর মাঝে সিনেমার সেই দৃশ্যও ছিল যা ভুলে যেতে আগ্রহী ছিলাম। রাতের বেলা যখন সব নীরব, তখন আমাদের সময় হত পর্যালোচনার। আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন ও পরীক্ষা করা হোত, বলা হত সেই অনুষ্ঠানে যা যা বলা হয়েছে তা স্মরণ করার জন্য, কিন্তু প্রায়ই সে শূন্যস্থান পূরণ করত বা আমার ভুল শুধরে দিত, যেন আমি নীচু মানের ছাত্র।

ধীরে ধীরে এ সব পর্যালোচনা কমে আসে এবং দূরে চলে যায়। কিন্তু যখনই দেখেছি সে নরম চোখে টোল পড়া গালে শূন্যে তাকিয়ে আছে তখনই মনে হয়েছে সে সেই পুরনো পাঠ স্মরণ করছে। ভয় হত সে সিনেমা থেকে নকল করা আমার হাস্যকর অভিনয় দেখছে । আমি জানতাম, সে তা অবশ্যই দেখতে চাইবে, বা দেখার জন্য জেদ করবে।

কিন্তু সে এটাকে হাস্যকর মনে করেনি। যদিও আমার মনে হয়েছে হাস্যকর বা অপমানজনক, তার মোটেও তা মনে হয়নি। জানতাম, এর কারণ সে আমাকে গভীর আবেগে ভালোবাসে।

গত বছরের বসন্তের শেষ দিকটা সবচে সুখের ও ব্যস্ত সময়। আমি তখন অনেক শান্ত এবং আমার মনের একটা অংশ শরীরের মতই সক্রিয়। এটা তখনকার কথা যখন আমরা একত্রে বাইরে যেতে শুরু করি। আমরা বেশ কয়েকবার পার্কে গিয়েছি, কিন্তু প্রায়ই গিয়েছি বাড়ী খোঁজার জন্য। পথে সব সময় উন্মুখ দৃষ্টি, ব্যঙ্গাত্মক হাসি অথবা অপমানজনক চাহনির ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিলাম। মনে হত, সতর্ক না হলে কাঁপুনি ধরে যাবে। প্রতি মুহূর্তে নিজের স্বার্থে আমার সকল গর্ব এবং ঔদ্ধত্য স্মরণ করতে হত। এসব ব্যাপারে সে ছিল নির্ভীক এবং একেবারে অভেদ্য। ধীরে ধীরে এগোত, এত ধীরে যেন চোখের সামনে কেউ নেই।

বাড়ী খুঁজে পাওয়া খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন না

কোন ছুতায় আমাদের নিষেধ করা হোত। আর কিছু কিছু আমরা নিজেরাই বাদ দিয়েছি উপযুক্ত নয় বলে। প্রথম দিকে আমরা খুব খুঁৎখুঁতে ছিলাম — বিশেষভাবে খুঁৎখুঁতে নয় কেননা অধিকাংশ বাড়ীতেই আমরা বাস করতে পারতাম না। পরে, সব কিছু সহ্য করে নেয়ার কথা বলি। একটা বাড়ী পাবার আগে আমরা বিশটির বেশী বাড়ী দেখেছি — জিযাও গলির উত্তরমুখী দু কামরার ছোট্ট একটা বাড়ী। বাড়ীওয়ালা ক্ষুদে সরকারী চাকুরে, কিন্তু বুদ্ধিমান। তিনি শুধু মাঝের এবং পাশের কামরাগুলো দখলে রেখেছেন। তাঁর পরিবারে ছিল স্ত্রী, কয়েকমাসের একটি বাচ্চা এবং গ্রাম থেকে আনা একটি চাকরানী। ছেলেটি যতক্ষণ না কাঁদবে, সবকিছু বেশ শান্ত থাকবে।

সাধারণ কথা, আসবাবপত্র কিনতেই আমার জমানো টাকার অনেকটা চলে যায়, এবং জিজুনও তার সোনার আংটি ও কানের দুল বিক্রী করে দিয়েছে। আমি তাকে বাধা দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে পীড়াপীড়ি করায় আমি ব্যাপারটা নিয়ে চাপ দেই নি। আমি জানতাম, ঘরের ব্যাপারে অংশ না থাকলে সে অস্বস্তি বোধ করবে।

ইতোমধ্যে সে চাচার সঙ্গে ঝগড়া করেছে — আসলে তিনি এত রেগে গিয়েছেন যে তাঁকে ত্যাজ্য করেছেন। আমিও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি — তারা ভেবেছে আমাকে ভাল পরামর্শ দিচ্ছে, আসলে তারা আমার হয়ে ভয় পেত বা হিংসে করত। তবু, আমরা খুব শান্ত ছিলাম। অফিস থেকে বেরুনোর সময় সন্ধ্যা হয়ে এলেও এবং রিক্সাওয়ালা ধীরে ধীরে চললেও, শেষ পর্যন্ত সময় আসত যখন আমরা আবার একত্র হতাম। প্রথমে আমরা নীরবে একে অপরের দিকে তাকাতাম, তার পর গা এলিয়ে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করতাম, শেষ পর্যন্ত বিশেষ কিছু চিন্তা না করে মাথা নত করে চুপ হয়ে যেতাম। ধীরে ধীরে আমি বইয়ের মত তার শরীর, মন পড়তে শিখি। মাত্র তিন সপ্তাহে তার সম্পর্কে অনেক কিছু জানি এবং প্রথমে অজানা কিন্তু পরে উপলব্ধি করা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান সত্যিকার প্রতিবন্ধক অতিক্রম করি।

দিন যেতে যেতে জিজুন আরো জীবন্ত হয়ে ওঠে। সে ফুল পছন্দ করত না। আমি মেলায় দুটি ফুলের টব কিনেছিলাম কিন্তু চারদিন পর অযত্নে সেগুলো ঘরের কোণে শুকিয়ে যায়। সবকিছু দেখার মত সময় আমার ছিল না। সে জীবজন্তু ভালোবাসত, হয়ত সরকারী কর্মচারীর বউয়ের কাছ থেকে পেয়ে থাকবে। এবং এক মাসের কম সময়ে আমাদের পরিবারের সংখ্যা বেড়ে যায়। আমাদের চারটি মুরগীর বাচ্চা বাড়ীওয়ালীর একডজনের সঙ্গে উঠোনে জায়গা করে নেয়। কিন্তু দুই গিন্নীই সেগুলো আলাদা করতে পারত, নিজেরটা চিনে

নিতে পারত। এ ছাড়া ছিল মেলায় কেনা একটি চিত্রা কুকুর। আমার বিশ্বাস তার একটা নাম ছিল, কিন্তু জিজুন তাকে একটা নতুন নাম দেয়—আস্থুই। নামটা পছন্দ না হলেও আমিও ডাকতাম আস্থুই।

এটা সত্যি যে প্রতিনিয়ত ভালোবাসার নবায়ণ দরকার, বেড়ে ওঠা উচিত এবং সৃষ্টি করা উচিত। যখন একথা জিজুনকে বলতাম সে বুঝতে পেরে মাথা নাড়ত।

আহা, সে সন্ধ্যাগুলো কত শান্ত, মধুর ছিল।

সুখ এবং শান্তি সংহত করতে হয় যাতে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। যখন আমরা হোষ্টেলে ছিলাম তখন মাঝেমধ্যে মত পার্থক্য বা ভুলবোঝাবুঝি হত, কিন্তু জিযাও গলিতে যাওয়ার পর এই সব সামান্য মতবিরোধও উবে যায়। আমরা বাতির আলোয় একে অপরের মুখোমুখি বসে স্মৃতিচারণ করতাম, ঝগড়াঝাঁটির পর যে মিলন তার আনন্দ উপভোগ করতাম।

জিজুনের শরীরে মেদ জমে এবং তার গাল গোলাপী হয়ে ওঠে, কিন্তু দুর্ভাগ্য সে খুব ব্যস্ত ছিল। সংসারের ব্যস্ততায় তার কথা বলার সময় ছিল না, বই পড়া বা বাইরে বেরুনোর সময় ছিল আরো কম। প্রায়ই বলতাম আমাদের একটা চাকরানী পেতে হবে।

আরেকটা জিনিষ আমাকে বিব্রত করত। সন্ধ্যায় যখন ফিরে আসতাম দেখতাম সে অশান্তি লুকানোর চেষ্টা করছে। এর চেয়ে বেশী খারাপ লাগত যখন দেখতাম সে জোর করে হাসার চেষ্টা করছে। ভাগ্যভালো, আবিষ্কার করতে পারি এর কারণ ক্ষুদে কর্মচারীর বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া এবং ঝগড়ার কারণ মুরগীর বাচ্চা। কিন্তু সে আমাকে বলবেনা কেন? লোকজনের নিজের বাড়ী থাকা দরকার। এটা কোনভাবেই বাস করার জায়গা নয়।

আমার নিজেরও রুটিন ছিল। সপ্তাহের ছয়দিন আমি বাড়ী থেকে অফিস, অফিস থেকে বাড়ী আসা-যাওয়া করতাম। অফিসে টেবিলে বসে বিরামহীন সরকারী দলিল এবং চিঠিপত্র নকল করতাম। বাড়ীতে তাকে সঙ্গ দিতাম অথবা চুলো জ্বালাতে, ভাত রাঁধতে অথবা রুটি বানাতে সাহায্য করতাম। এটা ঘটে যখন আমি রান্না করতে শিখি।

তবু, হোষ্টেলের চেয়ে অনেক ভালো খেয়েছি। রান্না-বান্না জিজুনের খুব একটা রপ্ত না থাকলেও সে মনে-প্রাণে তা করার চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে তার বিরামহীন উদ্বেগ আমাকেও উদ্বিগ্ন করে তোলে এবং এভাবেই আমরা একত্রে টক মিষ্টির স্বাদ গ্রহণ করি। সে সারা দিন রান্না নিয়েএত খাটুনি করত

যে ঘামে তার ছোটচুল মাথায় লেগে যেত এবং তার হাত কর্কশ হয়ে ওঠে।

তারপর তাকে মুরগীছানা ও আসুই খাওয়াতে হত...... অন্য যে কেউ এটা করতে পারত না।

আমি তাকে বলেছি, এভাবে কাজ করে হাড়িডসার হয়ে যাওয়ার চেয়ে আমি বরং খাব না। সে টুঁশব্দ না করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, অনেকটা চিন্তিতভাবে, এবং ভালোভাবে খুব একটা বলতে পারি নি। তবু সে আগের মতই কঠোর খাটুনি খাটতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত আঘাতটি আসে ডাবল টেন্‌থ উৎসবের আগের সন্ধ্যায় আমি চুপচাপ বসে ছিলাম আর সে থালাবাসন পরিষ্কার করছিল। এমন সময় দরজায় শব্দ শুনতে পাই। দরজা খুলে দেখতে পাই অফিসের ম্যাসেঞ্জার, সে আমার হাতে একটি স্লিপ দেয়। বুঝতে পারি এটা কি। আলোয় নিয়ে দেখতে পাই সত্যিই লেখা আছে :

কমিশনারের আদেশে,
শি জুয়ানশেংকে বরখাস্ত করা হোল।

সচিবালয়।
৯ অক্টোবর।

আমরা হোষ্টেলে থাকার সময়ই এটা অনুমান করতে পেরেছিলাম। সেই মুখে ক্রীমওয়ালা ছিল কমিশনারের ছেলের জুয়াড়ী বন্ধুদের একজন। সে গুজব ছড়াতে এবং গোলমাল পাকাতে বাধ্য। আমি শুধু অবাক হয়েছি এটা আগে ঘটেনি। আসলে এটা কোন আঘাত ছিল না, কেননা ইতোমধ্যে ঠিক করে ফেলেছি কোথাও কেরানী হিসেবে কাজ করতে বা পড়াতে পারব। অথবা যদিও কষ্টকর হবে, কিছু অনুবাদের কাজ করতে পারব। আমি «স্বাধীনতার বন্ধু» পত্রিকার সম্পাদককে জানতাম এবং কয়েক মাস আগে তাঁর সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করেছিলাম। আগের মতই, আমার বুক কাঁপতে থাকে। যেটা সবচে পীড়া দেয় তাহল ভয়হীন জিজুনেব পর্যন্ত মুখ শুকিয়ে যায়। মনে হচ্ছে সে সম্প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

সে বলল : "এতে কি হয়েছে? আমরা নতুন করে শুরু করব, নয় কি? আমরা......"

সে শেষ করেনি, মনে হল গলা ধরে এসেছে। বাতিও অস্বাভাবিক মৃদু মনে

হল। মানুষ সত্যিই হাস্যকর প্রাণী, এত ক্ষুদ্র ব্যাপারে ভেঙে পড়ে। প্রথমে আমরা নীরবে একে অপরের দিকে তাকাই, তার পর কি করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা শুরু করি। শেষ পর্যন্ত ঠিক করি জমানো টাকা দিয়ে যত খানি সম্ভব হিসেব করে চলব। কাগজে কেরানীগিরি বা মাষ্টারীর জন্য বিজ্ঞাপন দেব। একই সঙ্গে আমার বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যা করে «স্বাধীনতার বন্ধু» সম্পাদকের কাছে লিখব এবং এই বিপদে আমাকে সাহায্য করার জন্য একটি অনুবাদ গ্রহণ করতে বলব।

"যেমন কথা তেমন কাজ। চল, আমরা নতুন করে শুরু করি।"

আমি সোজা টেবিলে যাই এবং তেল ও ভিনিগারের শিশি সরিয়ে রাখি। জিজুন নিয়ে আসে মৃদু বাতি। প্রথমে বিজ্ঞাপনটি লিখি, তারপর অনুবাদের জন্য কিছু বই নির্বাচিত করি। বাড়ী বদলের পর বইগুলো উল্টে দেখিনি এবং প্রতিটি বইয়ে ধূলার আস্তর পড়েছে। সবশেষ চিঠিটি লিখি।

অনেকক্ষণ চিঠির শব্দ নিয়ে ইতস্ততঃ করি এবং চিন্তা করার জন্য লেখা বন্ধ করে মৃদু আলোয় তার দিকে তাকিয়ে দেখি, তাকে আবার গভীর চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছে। আমি কখনো কল্পনা করিনি এরকম একটা ক্ষুদ্র ব্যাপার জিজুনের মত দৃঢ় ও সাহসী একজনের ভেতর এত বড় পরিবর্তন আনতে পারে। সে সম্প্রতি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে — ব্যাপারটা শুধু সে সন্ধ্যায় শুরু হয়নি। এটা আমাকে আরো দমিয়ে দেয়। হঠাৎ আমার সামনে একটা শান্তজীবন ভেসে ওঠে — চোখের সামনে ভেসে ওঠে হোষ্টেলের সেই জীর্ণ কামরার নীরবতা। ভালো করে তাকিয়ে দেখব এমন সময় নিজেকে আবার আবিষ্কার করি সেই মৃদু আলোয়।

অনেকক্ষণ পর চিঠিটি শেষ হয়। খুব দীর্ঘ চিঠি। লেখার পর এত ক্লান্ত হয়ে পড়ি যে উপলব্ধি করি সম্প্রতি আমিও দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমরা ঠিক করি পরদিন বিজ্ঞাপনটি পাঠিয়ে দেব এবং চিঠিটি ডাকে দেব। তার পর নীরবে এক সঙ্গে উঠে দাঁড়াই, যেন একে অপরের শক্তি ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কে সচেতন এবং এই নতুন যাত্রা থেকে নতুন আশার আলো দেখতে পাই।

আসলে বাইরে থেকে এই আঘাত আমাদের ভেতর নতুন শক্তি জোগায়। অফিসে আমি খাঁচার ভেতর বুনো পাখীর মত ছিলাম, বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট দানা-পানি মিলত, কিন্তু মেদ জমার জন্য যথেষ্ট নয়। সময়ে এটা পাখার ব্যবহার হারিয়ে ফেলবে যাতে কখনো খাঁচার বাইরে এলেও আর উড়তে না পারে। এখন, যে কোন মূল্যে আমি খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছি এবং অবিলম্বে নতুন-ভাবে মুক্ত আকাশে ভেসে বেড়াতে হবে, যাতে পাখা নাড়তে পারি।

অবশ্য সরাসরি একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন থেকে আমরা কোন ফলাফল আশা করতে পারি না। আবার অনুবাদও খুব সহজ কাজ নয়। কিছু পড়ার সময় মনে হয় তা বুঝতে পারছেন, কিছু অনুবাদের সময় সর্বত্র সমস্যা দেখা দেয় এবং খুব ধীরে ধীরে কাজ এগোয়। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করার কথা ঠিক করি। পনেরো দিনেরও কম সময়ে একটি প্রায় নতুন অভিধানের কিনারা আমার আঙ্গুলের ছাপে কালো হয়ে যায়, বোঝা যায় কত গুরুত্ব সহকারে আমি আমার কাজকে গ্রহণ করেছি। «স্বাধীনতার বন্ধু» সম্পাদক জানান তাঁর পত্রিকা কখনো একটি ভালো পাণ্ডুলিপি উপেক্ষা করবে না।

কপাল মন্দ, এমন কোন কামরা ছিল না যেখানে শান্তিতে বসা যায় এবং জিজুন আগের মত এত শান্ত বা সহানুভূতিশীল ছিল না। আমাদের কামরাটি থালাবাসন এবং ধোঁয়ায় এত ভর্তি ছিল যে সেখানে বসে ধীরে সুস্থে কাজ করা অসম্ভব ছিল। অবশ্য এজন্যে আমার নিজেকেই দোষ দেয়া উচিত — পড়ার ঘরের ব্যবস্থা করার ক্ষমতা নেই সেটা আমারই দোষ। তাছাড়া রয়েছে আসুই এবং মুরগীর ছানা। মুরগীর ছানাগুলো এখন মুরগী হয়েছে এবং দু পরিবারের মধ্যে আগের চেয়ে অনেক বেশী ঝগড়ার ছুতো হয়েছে।

এ ছাড়া রয়েছে প্রতিদিন খাওয়ার অন্তহীন ব্যাপার। মনে হয় জিজুনের সমস্ত প্রচেষ্টা আমাদের খাওয়ার ব্যাপারে নিবেদিত। মানুষ খাওয়ার জন্য বাঁচে, এবং বাঁচার জন্য খায়, একই সঙ্গে আসুই এবং মুরগীগুলোকেও খাওয়াতে হয়। আপাত দৃষ্টিতে মনে হত সে যা শিখেছে সব ভুলে গেছে এবং বুঝত না খাওয়ার জন্য ডেকে আমার চিন্তার স্রোতে বাধা দিচ্ছে। যদিও আমি বসেছি, মাঝে মাঝে অসন্তোষ দেখিয়েছি, কিন্তু কোন নজর দিত না এবং কোন উদ্বেগ ছাড়া খেয়ে চলত।

আমার কাজের কারণে নিয়মিত খাওয়া দাওয়া অসম্ভব এটা বুঝতে তার পাঁচ সপ্তাহ লাগে। যখন উপলব্ধি করতে পারে তখন বোধহয় বিরক্ত হয়েছিল, কিন্তু কিছুই বলেনি। তার পর আমার কাজ দ্রুত এগোতে থাকে এবং সহসাই আমি ৫0,000 শব্দ অনুবাদ করে ফেলি। আমাকে শুধু পাণ্ডুলিপি মাজাঘষা করতে হবে এবং আরো দুটি ছোট লেখার সঙ্গে «স্বাধীনতার বন্ধু» সম্পাদকের কাছে পাঠানো যায়। খাওয়ার ব্যাপারটা মাথা ব্যথা রয়ে গেছে। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কিছু যায় আসেনা, কিন্তু পরিমাণ যথেষ্ট ছিল না। এখন সারাদিন বাড়ীতে বসে মাথার কাজ করি আগের চেয়ে ক্ষিধে আরো কমে গেছে। খাসী গোস্তের সঙ্গে মিশিয়ে আসুইকে ভাত দেয়া হত বলে যথেষ্ট ভাতও থাকত না। সম্প্রতি তা'ও প্রায়ই কপালে জুটছে না। সে বলত আসুই এত শুকিয়ে গেছে যে দেখে খারাপ

লাগে এবং বাড়ীওয়ালী আমাদের ভেংচি কাটে। সে উপহাস সহ্য করতে পারত না।

তাই শুধু মুরগীগুলো আমার উচ্ছিষ্ট খেতে পেত। এটা উপলব্ধি করতে অনেক সময় লাগে। আমি খুব সচেতন ছিলাম। যাহোক, বুঝতে পারি — "এ পৃথিবীতে আমার অবস্থান" হাকসলীর ভাষায় "কুকুর এবং মুরগীর মাঝামাঝি কোথাও।"

পরে, অনেক তর্কবিতর্ক এবং পীড়াপীড়ির পর মুরগীগুলো আমাদের টেবিলে আসতে থাকে। দশদিনের বেশী আমরা ও আস্যুই তা উপভোগ করি। এগুলো খুব শুকনো ছিল, কেননা অনেকদিন ধরে প্রতিদিন সামান্য সরগম পেয়েছে। এর পর জীবন আরো শান্তিপূর্ণ হয়ে পড়ে। শুধু জিজুনকে মনে হয়ে মনমরা এবং তাদের অভাবে দুঃখিত। সে গোমড়া-মুখো হয়ে পড়ে। মানুষ কত সহজে বদলে যায়!

যাহোক, আস্যুইকেও ত্যাগ করতে হয়। কোথাও থেকে চিঠির আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম এবং কুকুরটিকে পেছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে তাকিয়ে রাখার মত খাবার জিজুনের অনেকদিন ছিল না। উপরন্তু শীত দ্রুত এগিয়ে আসছে, এবং জানতাম না উনুনের ব্যাপারে কি করতে হবে। তার ক্ষিধে অনেকদিন ধরে একটা বিরাট বোঝা, এ ব্যাপারে আমরা খুব সচেতন ছিলাম। তাই কুকুরটাকেও চলে যেতে হয়।

যদি গলায় দড়ি দিয়ে বাজারে বিক্রীর জন্য নিয়ে যেতাম তাহলে হয়ত কিছু পয়সা পাওয়া যেত। কিন্তু আমরা কেউ সেটা করতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত মাথায় কাপড় দিয়ে তাকে পশ্চিম দরজার বাইরে নিয়ে ছেড়ে দেই। যখন আমার পেছনে দৌড়ে আসে তখন ধাক্কা দিয়ে এক অগভীর গর্তে ফেলে দেই।

বাড়ী ফিরে দেখি পরিবেশ আরো শান্ত। কিন্তু জিজুনের বেদনা দেখে অবাক হয়ে যাই। তাকে কখনো এত বিষন্ন দেখিনি। এটা আস্যুইর কারণে, কিন্তু ব্যাপারটা এত গভীরভাবে নেয়ার কি আছে? আমি কুকুরটিকে গর্তে ফেলে দেয়ার কথা তাকে বলিনি।

সে রাতে তার অভিব্যক্তিতে একটা নিষ্প্রাণ ভাব ধরা পড়ে।

না বলে পারলাম না, "সত্যিই, জিজুন, তোমার আজ কি হয়েছে?"

"কি?" সে আমার দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

"তোমাকে এত দেখাচ্ছে ......"

"কিছুই না — কিছুই না"

শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারি সে আমাকে নিষ্ঠুর ভেবেছে। আসলে, আমি যখন একা ছিলাম তখন ভালই ছিলাম, যদিও পারিবারিক বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে আমার ভীষণ গর্ব ছিল। কিন্তু নতুন বাড়ীতে আসার পর পুরনো সব বন্ধুদের কাছ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। তবু, এসব থেকে ছাড়া পেতে পারলে আমার কাছে অনেক রাস্তা খোলা ছিল। এখন তার জন্যে আমাকে এসব কষ্ট করতে হচ্ছে — বিশেষ করে আস্থইকে তাড়ানোটা ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সেটা বোঝার ব্যাপারেও জিজুনকে এখন বুদ্ধু মনে হচ্ছে।

যখন সুযোগ বুঝে তাকে এটা বোঝাতে চেয়েছি তখন সে বুঝতে পারার মত মাথা নেড়েছে। কিন্তু তার পরবর্তী ব্যবহারে বোঝা যায় সে এটা গ্রহণ করেনি বা আমাকে বিশ্বাস করেনি।

ঠাণ্ডা আবহাওয়া এবং তার শীতল চাহনির ফলে বাড়ীতে থাকা দায় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কোথায় যেতে পারি? তার শীতল চাহনি এড়িয়ে রাস্তা অথবা পার্কে যেতে পারি কিন্তু বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস দেহে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত পাবলিক লাইব্রেরীতে স্বর্গের সন্ধান পাই।

বিনামূল্যে প্রবেশ করা যায় এবং পাঠকক্ষে দুটি চুলো আছে। আগুন খুব হাল্কা হলেও, উনুনের আগুন দেখেই আমার গরম লাগে। পড়ার মত কোন বই নেই, পুরনোগুলো অচল, এবং বলতে গেলে নতুন কোন বই নেই।

কিন্তু পড়ার জন্য আমি সেখানে যাই নি। সেখানে আমার মত আরো কিছু লোক ছিল, কখনো কখনো এক ডজন। প্রত্যেকের পরণেই আমার মত স্বল্প কাপড়। ঠাণ্ডা থেকে দূরে থাকার জন্য আমরা পড়ার ভান করি। এটা ভালো হয়। পথে হয়ত আপনার সঙ্গে এমন লোকের দেখা হয় যারা আপনার দিকে ঘৃণাভরে তাকায়, কিন্তু এখানে সে ধরণের কোন ঝামেলা নেই। কেননা আমার সব পরিচিতেরা অন্য উনুনের পাশে জড়ো হয়েছে বা নিজের বাড়ীর উনুনের সামনে বসে আগুন পোহাচ্ছে।

পড়ার মত বই না থাকলেও, চিন্তা করার মত নীরবতা পেয়েছিলাম। সেখানে একা বসে অতীত সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে বুঝতে পারি গত ছয় মাস ভালো-বাসা — অন্ধ ভালোবাসার — জন্য আমি জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষা করেছি। সর্বপ্রথমে আসে জীবন ধারণের কথা। ভালোবাসার আগে জীবন ধারণের ব্যবস্থা করতে হয়। যারা সংগ্রাম করে তাদের জন্য একটা পথ খোলা থাকা উচিত এবং আমি এখনো পাখা নাড়া ভুলে যাই নি, যদিও আগের চেয়ে অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছি . . . . . .।

ঘর এবং পাঠক ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসে। দেখতে পাই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে জেলে, ট্রেঞ্চে সৈনিক, গাড়ীতে সম্মানিত ব্যক্তি, টক একসচেঞ্জে দালাল, পাহাড়ী বনে বীর, মঞ্চে শিক্ষক, অন্ধকারে নিশাচর ও চোর।......জিজুন বহু দূরে। আস্নুইর ব্যাপারে রাগ করে এবং রান্নায় মজে গিয়ে সে তার সমস্ত সাহস হারিয়ে ফেলেছে। অবাক ব্যাপার হচ্ছে তাকে বিশেষভাবে শুকনো দেখাচ্ছে না......।

ঠাণ্ডা বাড়ে। উনুনের ধীরে জ্বলা শক্ত কয়লা পুড়ে গেছে, এবং বন্ধ হওয়ার সময় হয়ে এসেছে। সেই শীতল চাহনির মোকাবেলা করতে আমাকে জিযাও গলিতে ফিরে যেতে হবে। সম্প্রতি আমি কখনো কখনো উষ্ণতা অনুভব করেছি, কিন্তু সেটা আমার মেজাজ আরো বিগড়ে দেয়। মনে পড়ে এক সন্ধ্যায় যে শিশু-সুলভ চাহনি অনেকদিন দেখিনি তা হোষ্টেলের একটি ঘটনার কথা হাসি দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়ার সময় জিজুনের চোখে ভেসে ওঠে। কিন্তু তার চোখে সবসময় একটা ভীতির চাহনিও ছিল। সম্প্রতি তার চেয়ে বেশী আমি তার সঙ্গে নিষ্প্রাণ ব্যবহার করেছি, এটা তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। কখনো কখনো তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য জোর করে কথা বলেছি বা হেসেছি। কিন্তু আমার হাসি ও কথার শূন্যতা ঘৃণিত বিদ্রূপের মত যে ভাবে আমার কানে প্রতিধ্বনিত হয়েছে তা সহ্যের বাইরে।

জিজুনও হয়ত এটা অনুভব করে থাকবে, কেননা এর পর সে কাঠের মত জড়তা হারিয়ে ফেলে এবং লুকানোর শত চেষ্টাতেও মাঝে মাঝে উদ্বেগ প্রকাশ করে। সে আরো সোহাগের সঙ্গে আমার দেখাশোনা করতে থাকে।

আমি সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সাহস ছিল না। যখনই কথা বলার জন্য মন ঠিক করেছি, সেই শিশুসুলভ চাহনি আমাকে আপাততঃ হাসতে বাধ্য করেছে। কিন্তু আমার হাসি আমাকেই ব্যঙ্গ করে এবং আমার নিষ্প্রাণ ভাব কেটে যায়।

❦

তার পর সে পুরনো প্রশ্ন তুলতে ও নতুন পরীক্ষা করতে শুরু করে। তার প্রতি ভালোবাসা দেখানোর জন্য বাধ্য হয়ে আমি মেকী জবাব দেই। ভণ্ডামি আমার হৃদয়ে গাঁথা হয়ে যায়, এবং মিথ্যার চাপে দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে। আমার বিষণ্নতায় প্রায়ই অনুভব করতে থাকি সত্য বলার জন্য যথেষ্ট সাহস দরকার, যে মানুষের সাহসের অভাব এবং ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়েছে সে কখনো নতুন পথের সন্ধান পাবে না। আরো সত্য হচ্ছে, সে বেঁচে থাকতে পারেনা।

তার পর জিজুনকে বিক্ষুব্ধ দেখাতে শুরু করে। প্রথমবার ঘটে এক সকালে

খুব তীব্র শীতের সকালে, অথবা আমি তাই কল্পনা করেছিলাম। ঘৃণায় মিইয়ে গিয়ে আমি গোপনে নিজে নিজে হাসি। সে যত মতবাদ, বুদ্ধিদীপ্ত নির্ভীক কথা শিখেছে সবকিছু ফাঁকা। তবু সে সেটা জানত না। অনেক আগে সে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে এবং বুঝতে পারেনি জীবনে প্রথম কাজ হচ্ছে জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা। এবং এটা করতে হলে লোকজনকে হাতে হাত মিলিয়ে অথবা একা এগিয়ে যেতে হবে। সে শুধু জানে অন্যের আঁচল ধরে থাকতে। এতে সংগ্রামীর জন্য সংগ্রাম কষ্টকর হয় এবং উভয়ের ধ্বংস ডেকে আনবে।

বুঝতে পারি আমাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ ছাড়াছাড়ি। তাকে একটা সুস্পষ্ট ছাড়াছাড়ি করতে হবে। হঠাৎ তার মৃত্যুর কথা ভাবি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা পাই এবং নিজেকে গাল দেই। কপালভালো তখন সকাল, এবং তাকে সত্য বলার মত অনেক সময় রয়েছে। এর ওপরেই নির্ভর করছে আমাদের নতুনভাবে শুরু করা বা না করা।

আমি ইচ্ছে করে অতীতকে টেনে আনি। সাহিত্যের বিদেশী লেখক ও তাঁদের লেখা, ইবসেনের «পুতুলের সংসার» এবং «সাগর ফেরা নারী»-র কথা বলি। সাহসের জন্য নোরার প্রশংসা করি ...... আগের বছর এর সব কিছুই হোষ্টেলের সেই জীর্ণ কামরায় বলা হয়েছে, কিন্তু এখন সবকিছু ফাঁকা মনে হচ্ছে। মুখ থেকে কথা বেরিয়ে যাবার সময় নিজেকে এই সন্দেহ থেকে মুক্ত করতে পারলাম না যে আমার পেছনে এক অদৃশ্য দুরন্ত শিশু রয়েছে যে তোতাপাখীর মত আমার কথা নকল করছে।

সে শোনে, মাথা নাড়ে, তার পর চুপ করে থাকে। যা বলার ছিল তড়িঘড়ি করে শেষ করি এবং আমার কণ্ঠ শূন্যতার ভেতর হারিয়ে যায়।

আর একবার নীরবতার পর সে বলে: "হ্যাঁ, কিন্তু জুয়ানশেং, আমার মনে হয় সম্প্রতি তুমি অনেকখানি বদলে গেছ। ঠিক কিনা? আমাকে বল।"

এটা ছিল আঘাত, কিন্তু নিজেকে সামলে নেই এবং আমার মতামত ও প্রস্তাব ব্যাখ্যা করি: নতুনভাবে জীবন শুরু করা এবং একসঙ্গে ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাওয়া।

ব্যাপারটা ভালোভাবে বোঝানোর জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে বলি:

"......তাছাড়া, দ্বিধা না করে তোমার সাহসে এগিয়ে যাওয়া উচিত। তুমি আমাকে সত্য বলতে বলেছিলে। আমাদের ভণ্ডামি করা উচিত নয়। সত্যি কথা বলতে— কারণ হচ্ছে আমি তোমাকে আর ভালোবাসিনা। আসলে এতে তোমার ভাল হবে, কোন অনুশোচনা ছাড়াই তোমার পক্ষে কাজ করা সহজ হবে ......"

আমি একটা নাটক আশা করেছিলাম। কিন্তু নীরবতা নেমে আসে। মরা মানুষের মত তার চেহারা ধূসর হয়ে যায়, কিন্তু এক মুহূর্তে সেই রং এবং চোখে শিশুসুলভ চাহনি ফিরে আসে। ক্ষুধার্ত শিশু যেভাবে মা'কে খোঁজ করে সেভাবে সে চারদিকে তাকায়, কিন্তু শুধু শূন্যের দিকে। ভয়ে সে আমার চোখ এড়িয়ে যায়।

এই দৃশ্য সহ্য করা সম্ভব ছিল না। ভাগ্য ভালো, বেলা বেশী বাড়েনি। ঠাণ্ডা হাওয়ার ভেতর জলদি লাইব্রেরীতে চলে যাই।

সেখানে আমার লেখা সবগুলো ছোট প্রবন্ধসহ «স্বাধীনতার বন্ধু» পত্রিকাটি দেখতে পাই। অবাক হয়ে যাই এবং মনে হয় আমার নতুন জীবন ফিরে আসছে। মনে হয়, "আমার সামনে অনেক রাস্তা খোলা আছে। কিন্তু এভাবে চলতে পারে না।"

আমি পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে শুরু করি যাদের সঙ্গে অনেকদিন দেখা করি নি, কিন্তু একবার বা দু'বারের বেশী যাই নি। স্বভাবতঃই তাদের ঘরগুলো গরম, কিন্তু সেখানে মনে হয় হাড্ডির ভেতর ঠাণ্ডা লাগছে। সন্ধ্যায় বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা একটি ঘরের ভেতর গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকি।

একটি বরফের সুই আমার কলজে ছিদ্র করে দেয়। প্রতিনিয়ত অনুভূতিহীনতার কষ্ট পেতে থাকি। মনে হয়, "আমার সামনে অনেক রাস্তা খোলা আছে। কেমন করে পাখা নাড়তে হয় ভুলে যাই নি।" হঠাৎ তার মৃত্যুর কথা মনে হয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা পাই এবং নিজেকে গাল দেই।

লাইব্রেরীতে প্রায়ই হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত সামনে নতুন পথ দেখতে পাই। কল্পনা করি সে সাহসের সঙ্গে বাস্তবকে মোকাবেলা করেছে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে এই ঠাণ্ডা বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। চলে গেছে, আমার প্রতি কোন বিদ্বেষ না নিয়ে। তার পর মনে হয় মেঘের মত শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি, ওপরে নীল আকাশ, নীচে উঁচু পাহাড় এবং অসীম সাগর, উঁচু দালান কোঠা, যুদ্ধক্ষেত্র, মটর গাড়ী, রাস্তা, ধনী লোকের বাড়ী, কর্মব্যস্ত বাজার এবং অন্ধকার রাত ......

উপরন্তু সত্যি সত্যি মনে হয় হাত বাড়ালেই নতুন জীবন।

যাহোক, আমরা বেইজিংয়ের তীব্র শীত কাটিয়ে দেই। কিন্তু আমরা দুষ্ট ছেলের হাতে বাধা পড়া ড্রাগনমাছি, যে দড়িতে বেধে ইচ্ছে মত ঘোরাচ্ছে। জীবন্ত হলেও অসহায়, সর্বনাশটা শুধু সময়ের ব্যাপার।

জবাব পাবার আগে«স্বাধীনতার বন্ধু» সম্পাদকের কাছে তিনটি চিঠি লিখে-

ছিলাম। খামের ভেতর ছিল দুটি বইয়ের টোকেন, একটি ২০ পয়সার, অন্যটি ৩০ পয়সার। কিন্তু টাকা চেয়ে আমি নয় পয়সা ডাক খরচ দিয়েছি, এবং শুধুশুধি সারাদিন উপোস থেকেছি।

যাহোক, মনে হয় যা চেয়েছি শেষ পর্যন্ত তা পেয়েছি।

শীত গিয়ে বসন্ত আসে। বাতাসও এত হিম শীতল নয়। বাইরে ঘোরাঘুরি করে আমি আরো সময় কাটাই এবং সাধারণতঃ সন্ধ্যার আগে ঘরে ফিরি না। এক অন্ধকার সন্ধ্যায় অন্যান্য দিনের মতই অবসন্ন আমি ঘরে ফিরি। গেটের দিকে দেখে মনটা এত খারাপ হয়ে যায় যে পা থেমে আসে। শেষ পর্যন্ত কামরায় পেঁৗছি। ভেতরে অন্ধকার। বাতি জ্বালানোর জন্য ম্যাচ খুঁজতেই ঘরটাকে মনে হয় অস্বাভাবিক নীরব এবং শূন্য।

হতভম্ব হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এমন সময় জানালার ফাঁক দিয়ে সেই কর্মচারীর বউ আমাকে ডাকে।

সহজভাবে বলে : "জিজুনের বাবা আজ এসেছিলেন, তাকে নিয়ে গেছেন।"

এটা আমি আশা করি নি। আমার মনে হল মাথার পেছনে আঘাত লেগেছে এবং বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকি।

শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করি : "সে চলে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"সে — সে কি কিছু বলেছে?"

"না। শুধু বলেছে আপনি ফিরে এলে বলার জন্য যে সে চলে গেছে।"

আমি এটা বিশ্বাস করতে পারি নি, তবু কামরাটা এত অস্বাভাবিক নীরব এবং শূন্য। জিজুনের জন্য সর্বত্র তাকিয়ে দেখি, কিন্তু চোখে পড়ে পুরনো রংচটা ছড়ানো ছিটানো আসবাবপত্র, বোঝা যায় কাউকে অথবা কোন কিছু লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। মনে হল সে হয়ত চিঠি রেখে গেছে বা কিছু লেখে রেখে গেছে, কিন্তু কিছুই না। শুধু লবণ, শুকনো মরিচ, ময়দা, অর্ধেক বাঁধাকপি একসঙ্গে জড়ো করা, পাশে কিছু পয়সা। এগুলো আমাদের পার্থিব জিনিস, সতর্কতার সঙ্গে সে আমার জন্য রেখে গেছে, কোন কথা না বলে আরো কিছুদিন বেঁচে থাকার জন্য এগুলো ব্যবহারের ইঙ্গিত দিয়ে।

পরিবেশের চাপে আমি উঠোনে দৌড়ে যাই। সেখানে চারদিকে অন্ধকার। মাঝের কামরার জানালায় উজ্জ্বল আলো। সেখানে বাচ্চাটাকে হাসানোর জন্য তারা মজা করছে। আমার মন হাল্কা হয়ে আসে এবং এই নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবার জন্য পথ খুঁজতে চেষ্টা করি : উঁচু পর্বত এবং জলাভূমি, বড় রাস্তা,

উজ্জ্বল আলোর নীচে খাবার, ট্রেঞ্চ, গভীর কালো রাত, শাণিত ছুরির ঝলকানি, শব্দহীন পায়ের আওয়াজ . . . . . .

আমি হাল্কা বোধ করি, যাতায়াতের খরচের কথা ভাবি এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

চোখ বন্ধ করে শুয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি, কিন্তু মাঝরাতের আগেই তা ভেঙে যায়। অন্ধকারে হঠাৎ মনে হয় জড়ো করা মুদিখানার জিনিস দেখছি, তার পর আমার দিকে মিনতিভরা শিশুসুলভ চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকা জিজুনের পাণ্ডুর মুখ ভেসে ওঠে। যখন আমি সজাগ হয়ে ওঠি তখন ওখানে কিছুই ছিল না।

তবু আমার মন খুব ভারী মনে হয়। এভাবে তার কাছে সত্য বলার চেয়ে আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারলাম না কেন? এখন সে জানে তার জন্য রয়েছে পিতার নিষ্ঠুরতা — যে মহাজনের মত তার সন্তানসন্ততিদের প্রতি হৃদয়হীন — এবং পথচারীদের শীতল চাহনি। এ ছাড়া আছে শূন্যতা। নিষ্ঠুরতা এবং শীতল চাহনির ভেতর শূন্যতার বোঝা বহন করে দিন কাটানো কত মারাত্মক। শেষ পর্যন্ত কবরে একটা পাথরও মেলে না।

জিজুনকে আমার সত্য বলা উচিত হয়নি। যেহেতু একে অপরকে ভালোবেসেছি, তাই তার কাছে মিথ্যে বলে যাওয়া উচিত ছিল। সত্য যদি সম্পদ হয় তাহলে এটা জিজুনের কাছে শূন্যতার বোঝা হওয়া উচিত ছিল না। অবশ্য মিথ্যাও শূন্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা এত নির্মম বোঝা হত না।

ভেবেছিলাম সত্য বলে দিলে জিজুন নিঃসংকোচে সামনে এগিয়ে যাবে, ঠিক যখন একসঙ্গে থাকতে শুরু করি সেভাবে। কিন্তু আমার ভুল হয়েছে। ভালোবাসার কারণে তখন তার ভয় ছিল না।

ভণ্ডামির বোঝা বহন করার মত সাহস আমার ছিল না, তাই সত্যের বোঝা তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছি। যেহেতু সে আমাকে ভালোবেসেছে, তাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও শীতল চাহনির ভেতর তাকে এই বোঝা বহন করতে হবে।

আমি তার মৃত্যুর কথা ভেবেছি . . . . . . বুঝতে পেরেছি আমি একটা নপুংসক। সত্য হোক, ভণ্ডামি হোক, শক্তির দিকেই আমার ঝুঁকে পড়া উচিত। তবু, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আশা করেছে আমি আর একটু বাঁচতে পারব . . . . . .

আমি জিযাও গলি ছাড়তে চেয়েছিলাম, সেখানে ভীষণ শূন্যতা এবং নিঃ-

সঙ্গতা। ভেবেছিলাম একবার বেরিয়ে যেতে পারলে মনে হবে জিজুন তখনো আমার পাশে। অথবা নিদেন পক্ষে সে শহরে আছে, যে কোন সময় আসতে পারে, হোষ্টেলে থাকার সময় যেভাবে এসেছে।

যাহোক আমার চিঠিগুলোর জবাব আসে না। বন্ধুদের কাছে চাকরির দরখাস্তেরও একই অবস্থা হয়। পুরনো এক পারিবারিক পরিচিতের সঙ্গে দেখা করা দরকার ছিল। অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা করতে যাই নি। আমার চাচার পুরনো সহপাঠী, সম্মানিত বয়স্ক ডিগ্রীধারী। বেইজিং-এ অনেক বছর ধরে আছেন এবং পরিচিত লোকের সংখ্যা ব্যাপক।

দারোয়ান আমার দিকে কটাক্ষ করে — কেননা আমার কাপড় চোপড় জীর্ণ। কষ্ট করে ভেতরে ঢুকতে হয়। চাচার বন্ধুর আমাকে মনে আছে, কিন্তু আমার সঙ্গে উত্তাপহীন ব্যবহার করেন। তিনি আমাদের সম্পর্কে সব কিছুই জানতেন।

আমাকে কোথাও চাকুরির জন্য সুপারিশ করতে বলায় তিনি ভাবলেশহীন-ভাবে বললেন: "এটা পরিষ্কার তুমি এখানে থাকতে পারনা। কিন্তু কোথায় যাবে? খুব কষ্টকর ব্যাপার। বোধ হয় জান, তোমার — তোমার সেই বন্ধু, জিজুন, মারা গেছে।"

আমি বোবা হয়ে যাই।

শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলি: "আপনি কি নিশ্চিত?"

তিনি একটু কৃত্রিম হাসি হাসলেন, "নিশ্চয়ই। আমার চাকর ওয়াং শেং তার একই গ্রামের।"

"কিন্তু — সে কিভাবে মরেছে?"

"কে জানে? যে কোন ভাবে, সে মৃত।"

ভুলে গেছি কিভাবে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরেছি। জানতাম তিনি মিথ্যা বলবেন না। গত বছরের মত, জিজুন আর কখনো আমার সঙ্গে থাকবে না। যদিও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও শীতল চাহনির মধ্যে সে এই শূন্যতার বোঝা বহন করতে চেয়েছে, এটা তার জন্য ছিল খুব বেশী। নিয়তির বিধান, তাকে যে সত্য বলেছি তা জেনেই সে মারা যাবে — ভালোবাসাহীন জগতে মরণ।

এটা পরিষ্কার, আমি সেখানে থাকতে পারি না। কিন্তু কোথায় যেতে পারি?

চারদিকে একটা বিশাল শূন্যতা, মৃত্যুর নীরবতা। মনে হল, ভালোবাসাহীন মৃত্যুর শিকার প্রতিটি মানুষের চোখের সামনের অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি, তাদের সব আর্ত ও সংগ্রামের আশাহীন চীৎকার শুনতে পাচ্ছি।

নতুন, নামহীন এবং অপ্রত্যাশিত কিছু একটার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু সেই মৃত্যুর নীরবতার ভেতর দিনের পর দিন কেটে যায়।

এখন আগের চেয়ে অনেক কম বাইরে যাই। এই বিরাট শূন্যতার ভেতর শুয়ে, বসে থাকি। যাতে এই মৃত্যুর নীরবতা আমার আত্মাকে গ্রাস করতে পারে। মনে হয় এই নীরবতা সময় সময় নিজে ভীতে কাঁপে, পিছিয়ে যায়। এমন সময় নামহীন, অপ্রত্যাশিত, নতুন আশা উঁকি দেয়।

এক মেঘলা সকালে, যখন সূর্য মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না, বাতাস ক্লান্ত। ছোট্ট পায়ের ও নাক শুকার শব্দে আমার চোখ খুলে যায়। কামরায় চারদিকে তাকিয়ে কিছুই চোখে পড়ে না, কিন্তু নীচে তাকিয়ে দেখি একটি ছোট্ট প্রাণী ঘুরঘুর করছে — শুকনো, ধূলোয় ভর্তি, জীবন্তের চেয়ে বেশী মৃত ......

ভালো করে তাকাতেই দম বন্ধ হয়ে আসে। আমি লাফিয়ে উঠি।

আসুই ......! ফিরে এসেছে!

শুধু বাড়ীওয়ালা এবং চাকরানীর শীতল চাহনির কারণে জিযাও গলি ছাড়ি-নি, বরং অনেকটা আসুইএর কারণে। কিন্তু কোথায় যেতে পারি? স্বভাবতঃই বুঝতে পারি সামনে অনেক রাস্তা খোলা আছে, কখনো কখনো মনে হয়েছে তা ঠিক সামনেই প্রসারিত। যদিও জানতাম না, কি ভাবে প্রথম পা ফেলতে হবে।

অনেক ভাবনা চিন্তার পর ঠিক করি হোষ্টেলই আমার থাকার একমাত্র জায়গা। আগের মত সেই জীর্ণ কামরা, একই কাঠের বিছানা, প্রায়ই বিবর্ণ লোকাস্ট এবং উইস্টারিয়া। কিন্তু আগে যা আমাকে ভালোবাসা ও জীবন, আশা ও সুখ দিয়েছিল এখন উধাও হয়ে গেছে। শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই, সত্যের সঙ্গে যে শূন্য অস্তিত্ব বিনিময় করেছি।

আমার সামনে অনেক রাস্তা খোলা আছে। যেহেতু এখনো বেঁচে আছি তাই যে কোন একটা বেছে নিতে হবে। যদিও জানি না কিভাবে প্রথম পা ফেলতে হবে। কখনো কখনো রাস্তাকে মনে হয় একটা বিরাট, ধূসর সাপ, আমার দিকে ফণা তুলে আছে। অপেক্ষা আর অপেক্ষা করি, এগিয়ে আসা দেখি, কিন্তু সবসময় হঠাৎ অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

প্রথম বসন্তের রাতগুলো আগের মতই দীর্ঘ। অনেকক্ষণ অলসভাবে বসে থাকি এবং আজ সকালে রাস্তায় দেখা শোক মিছিল স্মরণ করি। সামনে কাগুজে মূর্তি, কাগুজে ঘোড়া, এবং পেছনে সুর করে বিলাপ। দেখতে পাই তারা কত



. . . . . . কিন্তু নীচে তাকিয়ে দেখি একটি ছোট্ট প্রাণী ঘুরঘুর করছে — শুকনো,
ধূলোয় ভর্তি, জীবন্তের চেয়ে বেশী মৃত . . . . . .

চালাক — ব্যাপারটা এত সহজ।

তার পর জিজুনের শেষকৃত্য আমার মনে ভেসে উঠে। সে একা শূন্যতার বোঝা বহন করেছে, ধূসর পথে একা এগিয়ে গেছে নিষ্ঠুরতা এবং শীতল চাহনির ভেতর নিঃশেষিত হবার জন্য।

ইচ্ছে হয় যদি সত্যি ভূত ও নরক থাকত, তাহলে, নরকের আগুন যত তীব্রই হত আমি জিজুনকে খুঁজতে যেতাম, তাকে আমার দুঃখ, বেদনার কথা বলতে, এবং ক্ষমা চাইতে। অন্যথায় নরকের বিষাক্ত আগুন আমাকে ঘিরে ধরবে, আমার দুঃখ-বেদনার অবসান ঘটাবে।

আগুনের চরকির ভেতর জিজুনকে জড়িয়ে ধরতাম, তার কাছে ক্ষমা চাইতাম অথবা তাকে সুখী করার চেষ্টা করতাম . . . . . .

যাহোক, নতুন জীবনের চেয়ে এটা শূন্য। এখন আছে প্রথম বসন্তের রাত, যা আগের মতই দীর্ঘ। যেহেতু বেঁচে আছি, তাই নতুন জীবন শুরু করতে হবে। প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে জিজুন ও আমার নিজের জন্য দুঃখ ও বেদনা বর্ণনা করা।

আমি শুধু বিলাপ করতে পারি। জিজুনের জন্য শোক গুঞ্জন মনে হয়, যেটা তাকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিচ্ছে।

আমি ভুলতে চাই। নিজের কারণে জিজুনকে যে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিয়েছি তা স্মরণ করতে চাই না।

জীবনে আমাকে নতুনভাবে শুরু করতে হবে। আহত হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে রাখতে হবে সত্য, নীরবে এগিয়ে যেতে হবে, বিস্মৃতি ও ছলনাকে সঙ্গী করে . . . . . .

অক্টোবর ২১, ১৯২৫

তালাক

"ওহ, চাচা মু! শুভ নববর্ষ, আপনার উন্নতি হোক!"

"বাসান, তুমি কেমন আছ? শুভ নববর্ষ!......"

"শুভ নববর্ষ! আইগু-ও এখানে আছে তাহলে......"

"মু দাদুর সঙ্গে দেখা হয়েছে!......"

য়ুয়াং মুসান এবং তার মেয়ে আইগু ম্যাগনোলিয়া ঘাট থেকে নৌকোয় নামতেই নৌকায় একটি গুঞ্জন ওঠে। যাত্রীদের কেউ কেউ হাত জড়ো করে প্রণাম করে এবং কেবিনের বেঞ্চে চারটি আসন খালি করে দেয়। শুভেচ্ছা জানিয়ে য়ুয়াং মুসান বসে পড়ে। নৌকোর সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখে লম্বা পাইপ। বাসানের উল্টো দিকে তার বাম পাশে বসে আইগু, পা জোড়া V এর মত আড়াআড়ি করা।

কাকড়ার খোলের মত কর্কশ মুখের একজন জিজ্ঞেস করে: "মু দাদু, শহরে যাচ্ছেন?"

"শহরে নয়।" মু দাদুকে হতাশ মনে হয়। তার কালচে লাল মুখে এত বলিরেখা যে তাকে আগের মতই দেখায়। "আমরা পাং গ্রামে যাচ্ছি।"

তাদের দিকে তাকানোর জন্য নৌকোর সবাই কথা বন্ধ করে দেয়।

সবশেষে বাসান জিজ্ঞেস করে: "আবার কি আইগু'র ব্যাপারে?"

"হ্যাঁ...... এ ব্যাপারে আমার মরণ হবে। তিন বছর ধরে চলছে। বার বার ঝগড়া করে মিটিয়ে ফেলেছি, তবু ব্যাপারটার সুরাহা হয় নি......"

"আবার কি মিঃ ওয়েই-এর বাড়ী যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। এই প্রথমবার তিনি সালিসি করছেন না, কিন্তু আমি কখনো তার শর্ত মানি নি। তাতে কিছু যায় আসে না। এখন তাদের পরিবারে নববর্ষের পুনর্মিলন হচ্ছে। এমনকি সাতনম্বর সাহেবও শহর থেকে আসবেন......"

"সাত নম্বর সাহেব?" বাসানের চোখ বড় হয়ে যায়। "তাহলে তিনিও

ফোড়ন কাটবেন? ......ভালো...... বলতে গেলে গত বছর তাদের রান্নাঘরের উনুন ভেঙে ফেলার পর থেকে মোটামুটি আমাদের প্রতিশোধ নেয়া হয়ে গেছে। তাছাড়া আইগু'র সেখানে ফিরে যাওয়ার কোন যুক্তি নেই......" সে আবার তার চোখ নামিয়ে নেয়।

"বাসান ভাই, আমি সেখানে ফিরে যেতে রাজী নই।" আইগু ক্ষোভের সঙ্গে তাকায়। "আমি এটা করছি তাদের থু থু দেওয়ার জন্য। একবার ভেবে দেখুন। ছোট হারামীটা সেই ছোট্ট বিধবাকে নিয়ে থাকছে আর ঠিক করেছে আমাকে চায় না। এটা কি এতই সহজ? বুড়ো হারামীটাও ছেলের সঙ্গে দল পাকিয়ে আমাকে তাড়াতে চায়। যেন এতই সোজা। সাত নম্বর সাহেবের ব্যাপারটা কি? যেহেতু সে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করে তাই বলে আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারবে না? সে মিঃ ওয়েই-এর মত এত গোবরমাথা হতে পারে না। সে শুধু বলে 'আলাদা হও, আলাদা হওয়াই ভালো।' আমি তাকে বলব এ ক'বছর কেমন করে কেটেছে, এবং দেখব কাকে তিনি সঠিক মনে করেন?"

বাসান বুঝতে পারে কিছু মুখ খোলে না।

নৌকোর ভেতরটা খুব নীরব। জলের ছলছলাৎ শব্দ ছাড়া কোন শব্দ নেই। পাইপটা নিয়ে তা ভর্তি করে য়ুয়াং মুসান।

তার উল্টো দিকে, বাসানের পাশেই বসা একটি মোটা লোক কোমর খুঁজে দেশলাই বার করে জ্বালায় এবং য়ুয়াং মুসানের পাইপের কাছে ধরে।

তার দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে য়ুয়াং মুসান, "ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।"

বিনয়ের সঙ্গে মোটা লোকটি বলে: "এই প্রথমবার দেখা হলেও আমি আপনার কথা অনেক আগেই শুনেছি। নদীর পাড়ের আঠারো গ্রামের কে মু চাচার কথা জানে না? আমরা বেশ কিছুদিন থেকেই জানি যুবক শি এক ছোট্ট বিধবার সঙ্গে থাকে। যখন গত বছর আপনার ছয় ছেলেকে নিয়ে তাদের রান্নাঘরের উনুন ভেঙে ফেলেছেন তখন কে বলে নি আপনারা ঠিক? .. ...সব বড় দরোজা আপনার জন্য খোলা, আপনার পক্ষে অনেক লোক আছে...... তাদের ভয় পাচ্ছেন কেন......"

সায় দিয়ে আইগু বলে: "এই চাচা সত্যিই ন্যায় অন্যায় বিচার করতে জানেন। যদিও তাকে চিনি না।"

সঙ্গে সঙ্গে মোটা লোকটি জবাব দেয়: "আমি ওয়াং ডেগুই।"

"তারা আমাকে ঠেলে দিতে পারে না। সাত নম্বর অথবা আট নম্বর সাহেব হোক পরোয়া করি না। তাদের পরিবার ধ্বংস হওয়া এবং তাদের প্রত্যেকে মারা না যাওয়া পর্যন্ত আমি গোলমাল পাকিয়ে যাব। মিঃ ওয়েই চারবার আমার

পিছু লেগেছে, নয় কি? এমনকি সালিসের টাকা দেখে বাবার মত পাল্টে গেছে।"

যুয়াং মুসান নিজে নিজে গালি দেয়।

কাকড়ামুখো জিজ্ঞেস করে, "কিন্তু মু দাদু, গত বছরের শেষে শি পরিবার কি মিঃ ওয়েইকে খাওয়া পাঠায় নি?"

ওয়াং ডেগুই বলে: "কিছু যায় আসে না। খাওয়া কি একজন মানুষকে পুরোপুরি অন্ধ করে দিতে পারে? যদি তাই হয়, তাহলে বিদেশী খাওয়া পাঠালে কি হবে? সেসব বুদ্ধিজীবীরা যারা সত্যকে জানে, সব সময় ন্যায় বিচারকে তুলে ধরবে। যদি কাউকে সবাই গাল দেয় তাহলে তারা তার পক্ষ নেবে, তাতে ফায়দা হোক বা না হোক। গত বছরের শেষে আমাদের ছোট্ট গ্রামের মিঃ রোং বেইজিং থেকে ফিরে আসেন। তিনি গ্রামবাসীদের মত নন, তিনি বড়ো পৃথিবী দেখেছেন। তিনি বলেছেন সেখানে জনৈক মাদাম গুয়াং সবচে ভালো . . . . . ."

নোঙর ফেলতে ফেলতে মাঝি চীৎকার করে, "ওয়াং ঘাট। কেউ কি নামবে এখানে?"

"আমি নামব।" মোটা লোকটি পাইপ হাতে কেবিন থেকে বেরিয়ে আসে, এবং নৌকা ভিড়তে ভিড়তে তীরে লাফিয়ে নামে।

যাত্রীদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, "মাফ করবেন।"

নতুন নীরবতায় নৌকো চলতে থাকে। শুধু জলের ছল ছলাৎ শব্দ সে নীরবতা ভেঙ্গে দেয়। আইগু'র জুতোর দিকে মুখ করে বাসান ঝিমুতে থাকে, আস্তে আস্তে তার মুখ হা হয়ে যায়। কেবিনের সামনের দুই বুড়ী ধীরে ধীরে বৌদ্ধমন্ত্র আওড়াচ্ছে, এবং মালা জপছে। আইগু'র দিকে তাকিয়ে তারা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে, ঠোঁট চাটতে চাটতে মাথা নত করে।

আইগু ছইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে, বোধ হয় ভাবছে কিভাবে সেই বুড়ো হারামীর সংসার ধ্বংস করা যায় যাতে তার এবং ছোট হারামীর কোন পথ খোলা থাকবে না। সে মিঃ ওয়েই-এর ভয়ে ভীত নয়। সে তাকে দু'বার দেখেছে, সে একটি হোঁদল, মোটাবুদ্ধি — তার নিজের গ্রামে এ ধরনের অনেক লোক আছে, শুধু গায়ের রং একটু ময়লা।

যুয়াং মুসানের পাইপের তামাক ফুরিয়ে এসেছে এবং টানের সঙ্গে তেল আসছে, তবু সে টেনেই চলে। সে জানে ওয়াং ঘাটের পরই পাং গ্রাম। এখনই গ্রামে ঢোকার মুখে 'সাহিত্যিক প্যাভিলিয়ন' চোখে পড়ছে। সে এতবার এখানে এসেছে যে মিঃ ওয়েই-এর মত এ নিয়ে কথা বলার মানে হয় না। তার মনে পড়ে কি ভাবে তার মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরেছে, তার স্বামী এবং শ্বশুর

কি ধরনের খারাপ ব্যবহার করেছে এবং সে কি ভাবে তাদের ক্ষতি করেছে। তার চোখের সামনে আবার অতীত ফিরে আসে। সাধারণতঃ যখন দুষ্টলোকদের শাস্তি দেয়ার কথা তার মনে পড়ে সে একটা ক্রূর হাসি হাসে — কিন্তু এখন নয়। সাত নম্বর সাহেবের মোটা শরীরটা চিন্তায় বাধা দিচ্ছে এবং তার মনের শান্তি কেড়ে নিচ্ছে।

নীরবে নৌকা এগিয়ে চলে। শুধু বৌদ্ধমন্ত্রের আওয়াজ বাড়তে থাকে। মনে হয় অন্য সবাই আইগু এবং তার বাবার মত চিন্তায় ডুবে আছে।

"মু চাচা, পাং গ্রাম এসে,গেছে।"

মাঝির গলায় জেগে উঠে তারা চোখের সামনে দেখতে পায় 'সাহিত্যিক প্যাভিলিয়ন'।

তীরে লাফিয়ে নামে য়ুয়াং। পেছনে পেছনে আইগু। প্যাভিলিয়ন ছাড়িয়ে তারা মিঃ ওয়েই-এর বাড়ীর দিকে এগিয়ে যায়। দক্ষিণমুখী পথে ত্রিশটি বাড়ী পেরুনোর পর মোড় নিয়ে তারা গন্তব্যে পৌঁছে যায়। দরোজায় চারটি কালো ছইওয়ালা নৌকো সার দিয়ে বাধা।

কালো-গালা লাগানো দরজা পেরুতেই তাদের কাছারীঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘর ভর্তি কামলা এবং মাঝি, দুই টেবিলে বসা। তাদের দিকে তাকাতে সাহস করেনা আইগু, কিন্তু দ্রুত একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে বুড়ো ও ছোট হারামীর কোন চিহ্ন দেখতে পায় না।

নববর্ষের মিষ্টি কেক দেয়া স্যুপ নিয়ে যখন একটি চাকর ছেলে আসে তখন আইগু জানে না কেন সে আরো অস্বস্তি এবং অস্থির বোধ করে। ভাবে, "সে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করেই বলে কি আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারে না? এসব পণ্ডিতরা যারা সত্যকে জানে সবসময় ন্যায় বিচারকে তুলে ধরবে। পনের বছর বয়সে আমার বিয়ে হওয়া থেকে শুরু করে সাত নম্বর সাহেবকে পুরো ঘটনা বলতে হবে . . . . . ."

স্যুপ শেষ হলে সে বুঝতে পারে তাদের সময় হয়েছে। সত্যি সত্যি, কিছু-ক্ষণের মধ্যে সে দেখতে পায় একজন কামলা তাকে ও বাবাকে পথ দেখিয়ে একটি বড় হলঘরের উল্টো দিকে বৈঠকখানায় নিয়ে এসেছে।

ঘরের ভেতর এত জিনিষ ঠাসাঠাসি করা যে সে সবকিছু দেখতে পায় না। বহু অতিথিও আছে, তাদের লাল ও নীল সাটিনের ছোট জ্যাকেট তার চারদিকে ঝলমল করছে। তাদের মাঝে একজনকে দেখেই সে ভাবে নিশ্চয়ই সাত নম্বর সাহেব। তাঁর মুখ, মাথা গোলাকার হলেও তিনি মিঃ ওয়েই এবং অন্যান্যদের চেয়ে অনেক বড়ো দড়। তাঁর বিরাট গোল মুখে একজোড়া ছোট

চোখ, বিড়ালের মত একজোড়া গোঁফ, মাথা ন্যাড়া এবং মুখ কর্কশ এবং তেলতেলে। এক মুহূর্তের জন্য আইগু থতমত খেয়ে যায় এবং তার পরে মনে হয় সে নিশ্চয়ই চামড়ায় শূয়রের চর্বি মেখেছে।

"এটা বাহ্যি-পথে[1] ব্যবহার করা হয়, পূর্বপুরুষরা কবর দেয়ার সময় ব্যবহার করতেন।"

সাত নম্বর সাহেবের হাতে কিছু একটা ধরা, ক্ষয়ে যাওয়া পাথরের মত। এ কথা বলতে বলতে দু'বার তিনি তা দিয়ে নাক ঘষেন। "দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্প্রতি খুঁড়ে এটা পাওয়া গেছে। তবু ভালো, হান আমলের[2] চেয়ে পুরনো হতে পারে না। দেখুন, পারদের দাগ[3] লেগে আছে . . . . . ."

অনেকগুলো মাথা 'পারদের দাগ'কে ঘিরে ধরে, অবশ্যই তাদের মধ্যে একজন মিঃ ওয়েই। বাড়ীর আরো অনেক ছেলে এদের মধ্যে আছে। আইগু তাদের লক্ষ্য করেনি কেননা সাত নম্বর সাহেবের ভয়ে তাদের চ্যাপ্টা ছার-পোকার মত দেখাচ্ছে।

তিনি এই মাত্র যা বলেছেন সে বুঝতে পারে নি ; সে এই 'পারদের দাগে' উৎসাহী নয়, তা খুঁটিয়েও দেখতে চায় না। বরং এই সুযোগে সে চারদিকে তাকায়। তার পেছনে দেয়ালের সঙ্গে দরজার খুব কাছে বুড়ো ও ছোট হারামী উভয়েই দাঁড়িয়ে আছে। সে এক নজরে দেখতে পায় ছয়মাস আগে হঠাৎ দেখা হওয়ার সময় থেকে তাদের বয়স্ক দেখাচ্ছে।

লোকজন 'পারদের দাগ' থেকে সরে যায়। 'বাহ্যি-পথের কাঁটা' নিয়ে মিঃ ওয়েই তা বাজিয়ে দেখে। তারপর য়ুয়াং মুসানের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে।

"শুধু আপনারা দু'জন এসেছেন ?"

"শুধু আমরা দু'জন।"

"আপনার ছেলেরা কেউ আসেনি কেন ?"

"তাদের সময় নেই।"

"এ ব্যাপারে না হলে নববর্ষে এসে আপনাদের কষ্ট দিতাম না . . . . . . আপ-নাকে যথেষ্ট ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। দু বছরের বেশী হয়েছে। বলি কি, শত্রুতা রাখার চেয়ে শেষ করা ভালো। স্বামীর সঙ্গে আইগু'র বনে না এবং শ্বশুর শাশুড়ীও তাকে পছন্দ করে না . . . . . . তাই আগে যে পরামর্শ দিয়েছিলাম সে অনুযায়ী তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাক। আপনাকে বোঝানোর মত যথেষ্ট ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু আপনি জানেন সাত নম্বর সাহেব ন্যায় বিচারক। তার মতও আমার মতই। যাহোক তিনি বলেছেন উভয় পক্ষ আরো কিছুটা নরম হোক। তিনি শি পরিবারকে বলেছেন আপোষের জন্য আরো দশ ডলার



তাদের মাঝে একজনকে দেখেই সে ভাবে নিশ্চয়ই সাত নম্বর সাহেব।
তাঁর মুখ, মাথা গোলাকার হলেও তিনি মিঃ 'ওয়েই এবং
অন্যান্যদের চেয়ে অনেক বড়ো দড়।

ধরে 'নব্বই ডলার' করে দিতে।"

"......"

"নব্বই ডলার! সম্রাটের কাছে গেলেও এত সুবিধেজনক শর্ত পাবেন না। কেউ না, শুধু সাত নম্বর সাহেব এমন ভালো প্রস্তাব দেবেন!"

যুয়াং মুসানের প্রতি সায় জানানোর জন্য সাত নম্বর সাহেব চোখ বড়ো করে।

"আইগু দেখতে পায় অবস্থা বেগতিক এবং অবাক হয়ে যায়, তার বাবার ভয়ে তীরের সব কটি পরিবার ভীত, তার নিজের হয়ে এখানে একটি কথাও বলেন নি। তার মনে হয়, এটা খুবই অনাহূত। যদিও সাত নম্বর সাহেবের সব কথা সে বুঝতে পারে নি তবু তাকে মনে হয় দয়ালু, সে যেমনটা ভেবেছে তত নিষ্ঠুর নয়।

সে সাহসে বলে ফেলে, "সাত নম্বর সাহেব পণ্ডিত সত্যকে জানেন। তিনি আমাদের গেঁয়ো মানুষদের মত নন। আমার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তা বলার মত কেউ ছিল না, কিন্তু এখন আমি সাত নম্বর সাহেবকে বলব। যতদিন আমার বিয়ে হয়েছে আমি ভালো স্ত্রী হতে চেয়েছি — আসা যাওয়ার সময় মাথা নুইয়েছি এবং স্ত্রীর কোন দায়িত্বে অবহেলা করি নি। কিন্তু আমার দোষ ধরে — একটা নিয়মিত গালাগালি। সে বছর বেজী বড় মোরগটা মেরে ফেলে, খাঁচা বন্ধ না করার জন্য তারা আমাকে দোষ দিল কেন? এটা সেই ক্ষেপা কুত্তা যে কুড়ো মেশানো চাল চুরি করার জন্য ঠেলা দিয়ে খাঁচার দরজা খুলেছিল। কিন্তু সেই ছোট হারামী সাদা কালো পার্থক্য করতে পারে না। সে আমার গালে চড় মারে ......"

সাত নম্বর সাহেব তার দিকে তাকায়।

"আমি জানতাম একটা কারণ আছে। সাত নম্বর সাহেব এটা লক্ষ্য করতে ভুল করবেন না। যেসব পণ্ডিত সত্যকে জানেন তাঁরা সব কিছু জানেন। সেই হারামজাদী তাকে তুক করেছে এবং আমাকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে! আমাদের সামাজিক বিয়ে হয়েছে — তিন পালা চা এবং ছয়টি উপহার[4] এবং পালকীতে চড়ে তার বাড়ী গিয়েছি। আমাকে ছুঁড়ে ফেলা কি তার জন্য এতই সহজ? ...... আমি তাদের দেখিয়ে দিতে চাই কোর্টে যেতে আমার আপত্তি নেই। জজ কোর্টে সমাধান না হলে হাইকোর্ট করব ......"

ওপরের দিকে তাকিয়ে মিঃ ওয়েই বলেন: "সাত নম্বর সাহেব এসব জানেন। আইগু, এত জেদাজেদি করলে তোমার ভালো হবে না। তোমার একটুও পরিবর্তন হয় নি। দেখ, তোমার বাবা কত বুদ্ধিমান। দুঃখ হয়, তুমি ও তোমার ভাইরা

তার মত নও। ধর তুমি হাইকোর্টে যাও, তাহলে কি তিনি সাত নম্বর সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করবেন না? তাহলে ব্যাপারটা প্রকাশ্যে হবে, কেউ রক্ষা পাবে না . . . . . . এরকম বলে . . . . . ."

"প্রয়োজন হলে জীবন দিয়ে দেব, যদি দুটো পরিবার ধ্বংসও হয়ে যায়।"

সাত নম্বর সাহেব ধীরে ধীরে বলেন : "এত বেপরোয়া হওয়ার দরকার নেই। তোমার বয়স এখনও কম। আমাদের প্রত্যেকের শান্তি বজায় রাখা উচিত। 'শান্তিতে সম্পদ আসে' নয় কি? আমি পুরো দশ ডলার বাড়িয়ে দিয়েছি, দয়ার চেয়ে অনেক বেশী। যদি তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী বলে 'যাও', তাহলে তোমাকে অবশ্যই যেতে হবে। হাইকোর্টের কথা বলো না, শাংহাই, বেইজিং অথবা বিদেশে একই অবস্থা হবে। আমাকে বিশ্বেস না করলে তাকে জিজ্ঞেস কর। সে সবে বেইজিং-এর বিদেশী স্কুল থেকে এসেছে।" বলে তিনি পরিবারের লম্বা চিবুক-ওয়ালা এক ছেলের দিকে তাকান। জিজ্ঞেস করেন : "নয় কি?"

নম্র গলায় বিনয়ের সঙ্গে জবাব দেওয়ার জন্য দ্রুত উঠে দাঁড়ায় লম্বা চিবুক-ওয়ালা "অ-ব-শ্যই।"

আইগু খুব বিচ্ছিন্ন বোধ করে। তার বাবা কথা বলতে নারাজ, ভাইরা আসার সাহস পায় নি, মিঃ ওয়েই সবসময় অন্যপক্ষে, সাত নম্বর সাহেব তাকে হতাশ করেছেন, এমনকি এই লম্বা চিবুকওয়ালা তার নরম গলা এবং চ্যাপ্টা ছারপোকার মত যা আশা করা গেছে তাই বলেছে। কিন্তু বিভ্রান্ত হয়ে সে শেষ দেখার ঠিক করে।

"সাত নম্বর সাহেব কি . . . . . ." তার চোখে বিস্ময় ও হতাশা। "হ্যাঁ . . . . . . আমি জানি, আমরা গোঁয়ারা মূর্খ। লোকজনের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা না জানার জন্য বাবা দোষী — তিনি তার পুরনো মেজাজ সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি সব ব্যাপারে বুড়ো ও জোয়ান হারামীকে সুবিধে করে দেন। যত ঝাপলা বাধুক তারা সব ব্যাপারে মাথা ঘামায়, বড়দের প্রতি ভক্তি দেখানোর জন্য। . . . . . "

"তার দিকে দেখেন, সাত নম্বর সাহেব।" তার পেছনে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট হারামী হঠাৎ বলে উঠে, "সাত নম্বর সাহেবের সামনে সে এমন ব্যবহার করার সাহস পায়। বাড়ীতে সে আমাদের কোন শান্তি দেয় নি। সে আমার বাবাকে ডাকে বুড়ো হারামী, আমাকে ডাকে ছোট হারামী অথবা বেজন্মা।"

"কোন শয়তান তোমাকে বেজন্মা ডাকে?" আইগু তাকে রেগে আক্রমণ করে, তারপর সাত নম্বর সাহেবের দিকে তাকায়, "লোকজনের সামনে আমার

আরো কিছু বলার আছে। সে সবসময় আমার সঙ্গে ইতরামি করেছে। সবসময় 'নোংরা' ও 'কুত্তী' বলে গাল দিয়েছে। সেই মাগীটার সঙ্গে ছিনালী শুরু করার পর থেকে আমার পূর্বপুরুষদের পর্যন্ত গাল দিয়েছে। সাত নম্বর সাহেব, দু'জনের মধ্যে বিচার করে দেখুন ......"

সে হঠাৎ চমকে ওঠে। কথা মুখেই আটকে যায়। হঠাৎ চোখ ঘুরিয়ে মাথা তোলেন সাত নম্বর সাহেব। সেই বিড়ালের গোঁফ ওয়ালা মুখ থেকে একটা কর্কশ, টানা চীৎকার বেরিয়ে আসে :

"এদিকে আস ......"

হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে আসা তার বুকের ভেতর ধুক ধুকানি বেড়ে যায়। মনে হয় অবস্থা উল্টে গেছে, যুদ্ধে হেরে গেছে। ভুলভাবে পা বাড়িয়ে সে পানিতে পড়ে গেছে এবং জানে সবটাই তার দোষ।

নীল গাউন এবং কালো জ্যাকেট পরা একটি লোক দ্রুত এগিয়ে আসে এবং হাতজোড়া সোজা করে লাঠির মত সাত নম্বর সাহেবের সামনে দাঁড়ায়।

ঘরের ভেতর টু শব্দটি নেই। সাত নম্বর সাহেব ঠোঁট নাড়েন, কিন্তু কেউ শুনতে পায় না তিনি কি বলছেন। শুধু তার চাকর শুনতে পায়। এই আদেশ তার মজ্জার ভেতর ঢুকে যায়, দু'বার নড়ে ওঠে, যেন ভয় পেয়েছে। জবাব দেয় :

"ঠিক আছে, স্যার।"

তারপর কয়েক পা পিছিয়ে ঘুরে চলে যায়।

আইগু জানে কিছু একটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং কল্পনাতীত ঘটতে যাচ্ছে — যেটা সে ফেরাতে অক্ষম। একমাত্র এখনই সে সাত নম্বর সাহেবের পুরো ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারে। সে আগে ভুল করেছে এবং তাড়াহুড়োয় খারাপ কাজ করেছে। সে অনুতাপ করতে থাকে এবং নিজে নিজে বলতে থাকে :

"আমি সবসময় সাত নম্বর সাহেবের রায় মেনে নিতে চেয়েছি ......"

ঘরের ভেতর টু শব্দটি নেই। তার কথা সিল্কের সুতোর মত হাল্কা মনে হলেও মিঃ ওয়েই-এর কানে বজ্রপাতের মত বাজে।

"ভালো।" তিনি মাথা নেড়ে সামনে এগিয়ে যান। "সাত নম্বর সাহেব ন্যায় বিচারক এবং আইগু সত্যি বিবেচক। সেক্ষেত্রে মুসান তোমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না, যেহেতু তোমার মেয়ে নিজেই সায় দিয়েছে। আমার বিশ্বাস, তুমি কাবিন-নামা নিয়ে এসেছ। এখন উভয় পক্ষই সেটা দেখাও ......"

আইগু দেখতে পায় তার বাবা কাঁপতে কাঁপতে কাপড়ের ভাঁজে কিছু একটা খুঁজছে। লাঠির মত চাকর ছেলেটি আবার আসে, সাত নম্বর সাহেবের হাতে

ছোট, চ্যাপ্টা, কচ্ছপের মত কালো একটা জিনিষ তুলে দেয়। আইগু ভয় পেয়ে যায় কিছু একটা মারাত্মক ঘটতে যাচ্ছে। সে একবার বাবার দিকে তাকায়, কিন্তু বাবা টেবিলের ওপর নীল কাপড়ের একটা পোটলা খুলছে, এবং রূপোলী টাকা বার করছে।

কচ্ছপের মাথা খুলে সাত নম্বর সাহেব তার হাতের তালুতে কিছু একটা ঢালেন, তারপর চ্যাপ্টা জিনিষটা লাঠির মত চাকরকে ফিরিয়ে দেন। তিনি এক আঙ্গুলে হাতের তালু ঘষেন, তারপর নাকের দু ছিদ্রের ভেতর ঢুকিয়ে দেন। তার নাক এবং ওপরের ঠোঁট হলদে হয়ে ওঠে। তারপর তিনি নাক ঘষতে থাকেন যেন হাঁচি দেবেন।

য়ুয়াং মুসান রূপোলী টাকা গুণছিল। মিঃ ওয়েই না গোনা এক সারি থেকে কিছু তুলে নেন এবং বুড়ো হারামীর হাতে তুলে দেন। তিনি লাল এবং সবুজ কাবিন-নামা বদল করে আসল মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেন।

তিনি বলেন, "এগুলো সরিয়ে রাখো। মুসান, দেখ পরিমাণ ঠিক আছে কিনা। ছেলে খেলা নয় — এই সব রূপোলী . . . . . ."

"হ্যাচ্ছো!"

যদিও আইগু জানে সাত নম্বর হাঁচি দিচ্ছেন, তবু সে তাঁর দিকে না তাকিয়ে পারে না। তাঁর মুখ হা করা এবং নাক কুঁচকে আছে। দুই আঙ্গুলে এখনো তিনি ধরে আছেন "শেষকৃত্যে পূর্বপুরুষরা ব্যবহার করতেন।" এটা দিয়ে তিনি নাক ঘষছেন।

কষ্ট করে য়ুয়াং মুসান টাকা গোণা শেষ করে এবং উভয় পক্ষই লাল এবং সবুজ কাবিন-নামা সরিয়ে রাখে। মনে হয় তারা প্রত্যেকে গুটিয়ে নিয়েছে এবং তাদের উত্তেজনা প্রশমিত। পুরো শান্তি বিরাজ করতে থাকে।

মিঃ ওয়েই বলেন: "ভালো। ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় মিটে গেছে।" তারা চলে যেতে তৈরী দেখে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। "ভালো কথা, এখন আর করার কিছুই নেই। এই ঘাপলা মেটানোর জন্য অভিনন্দন! তোমাদের কি যেতে হবে? নববর্ষের খাওয়ার জন্য থাকবে না? এটা সবসময় আসে না।"

আইগু বলে, "আমরা থাকবনা। আগামী বছর আপনার সঙ্গে মদ পান করার জন্য আসব।"

"মিঃ ওয়েই, ধন্যবাদ। আমরা এখনই মদ পান করব না। আরো কাজ আছে . . . . . ." বিনয়ের সঙ্গে পিছিয়ে আসে য়ুয়াং মুসান, বুড়ো হারামী এবং ছোট হারামী।

"কি? যাবার আগে এক ফোটাও না?" পেছনে থাকা আইগু'র দিকে তাকান মিঃ ওয়েই।

"সত্যিই না। ধন্যবাদ, মিঃ ওয়েই।"

নভেম্বর ৬, ১৯২৫

টীকা

1. প্রাচীন কালে সাধারণতঃ মৃত মানুষের মুখে, নাক, কান ও বাহ্যিপথে যসম পাথরের টুকরো দেখা হত। মনে করা হত এতে লাশ কখনো পচে যাবে না।

2. হান আমল (খৃঃপূর্ব ২০৬—খৃঃ ২২০)

3. প্রাচীন কালে কবর দেয়ার সময় মৃতদেহে পারদ লাগিয়ে দেয়া হত, যাতে পচে না যায়। কবর খুঁড়লে যসম পাথরের যে টুকরোগুলো পাওয়া যেত তাতে পারদের দাগ থাকত।

4. পুরনো চীনে অধিকাংশ এলাকায় বিয়ের অনুষ্ঠানে বরপক্ষ কনেপক্ষে চা উপহার দিত। চা গ্রহণ করা মানে কনে বিয়েতে রাজি। এখানে "তিন পালা চা এবং ছয়টি উপহার" এর অর্থ আইগু আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের উপহার গ্রহণ করেছে এবং তার বিয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়েছে।

চন্দ্রাভিযান

১

এটা সত্যি যে বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষের ইচ্ছে বুঝতে পারে। গেট নজরে আসা মাত্রই ঘোড়া গতি কমিয়ে দেয় এবং আরোহীর মত মাথা ঝুলিয়ে মুষল দিয়ে ধানভানার মত সামনে পা ফেলতে থাকে।

বড়ো বাড়ীটা সান্ধ্য কুয়াশায় আবৃত। পড়শীদের চিমণী থেকে কালো ধুঁয়া বেরুচ্ছে। সান্ধ্য কালীন খাবারের সময় এখন। ঘোড়ার খুরের শব্দে প্রহরীরা বেরিয়ে এসে অস্ত্র হাতে ফটকে সোজা দাঁড়িয়ে আছে। আবর্জনার স্তূপের পাশে ভাবলেশহীন ই[1] নামতেই তারা এগিয়ে এসে তার লাগাম ও বেত নিয়ে নেয়। চৌকাঠ পেরুনোর সময় তার নজরে পড়ে নিজের কোমরে ঝোলানো আনকোরা নতুন তীর, ব্যাগের ভেতর তিনটি কাক, একটি চড়ুই পাখী। তার কলজে ধরে আসে। সাহস করে সে এগিয়ে যায়, থলেতে তীরগুলো ঝুলতে থাকে।

ভেতরের উঠোনে পেঁৗছে সে দেখে ছাং‌এ[2] গোল জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে। সে জানে তার তীক্ষ্ণ চোখ নিশ্চয়ই কাকগুলো দেখে থাকবে, হতাশায় সে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় — কিন্তু তবু তাকে এগিয়ে যেতে হয়। স্বাগত জানানোর জন্য চাকরানীরা এগিয়ে আসে, তার ধনুক, তীর ও থলে খুলে শিকারের ব্যাগ নিয়ে নেয়। সে লক্ষ্য করে তাদের হাসি জোর করা।

হাত মুখ মুছে ভেতরের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সে ডাকে : "মাদাম . . . . . ."

গোল জানালা থেকে সূর্যাস্ত দেখছিল ছাং‌এ। সে ধীরে ধীরে ফিরে তাকায় এবং তার ডাকে সাড়া না দিয়ে উদাস দৃষ্টি হানে।

গত কিছু দিন থেকেই এ ব্যবহার সে পেয়ে আসছে, কমপক্ষে এক বছরের

ওপর। কিন্তু চিরাচরিতভাবে সে গিয়ে উল্টোদিকের পুরনো চিতাবাঘের চামড়া ঢাকা কাঠের চেয়ারে বসে। মাথা চুলকাতে চুলকাতে বিড়বিড় করতে থাকে :

"আজকেও কপাল খারাপ। কাক ছাড়া কিছুই না ......"

"বাহ!"

উইলো পাতার মত ভুরু কুঁচকে ছাংএ লাফিয়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। যেতে যেতে বিড়বিড় করতে থাকে : "আবার কাকের ঝোলওয়ালা ন্যুডলস! আবার কাকের ঝোলওয়ালা ন্যুডলস! জানতে ইচ্ছে হয় আর কারা বছরের পর বছর কাকের ঝোলওয়ালা ন্যুডলস খায়? কপাল মন্দ তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল এবং সারা বছর কাকের ঝোলওয়ালা ন্যুডলস খেতে হচ্ছে।"

"মাদাম!" পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ই তাকে অনুসরণ করে। নরম সুরে বলতে থাকে, "আজকে অবস্থা এত খারাপ নয়। একটা চড়ুইও মেরেছি, তোমার জন্য রান্না করা যাবে ...... ন্যুসিন।" সে চাকরানীকে ডাকে : "তোমার বেগম-সাহেবাকে দেখানোর জন্য ঐ চড়ুইটা নিয়ে আস।"

থলে রান্নাঘরে নেয়া হয়েছে। কিন্তু চড়ুইটা আনবার জন্য ন্যুসিন দৌড়ে যায় এবং দু হাতে তা ছাংএ-র সামনে মেলে ধরে।

"এটা!" বিরক্তি সহকারে তা স্পর্শ করার জন্য সে ধীরে হাত বাড়ায়। রেগে বলে : "বিরক্তিকর। তুমি এটাকে গুঁড়ো করে ফেলেছ। মাংস কোথায়?"

অস্বস্তিতে ই স্বীকার করে, "আমি জানি আমার ধনুক খুব শক্তিশালী, তীরের মাথাটাও খুব বড়।"

"ছোট তীর ব্যবহার করতে পার না?"

"আমার নেই। যখন বড় বরাহ এবং পাইথন শিকার করি ......"

"এটা কি বড় বরাহ না পাইথন?" ন্যুসিন-এর দিকে ফিরে সে আদেশ দেয়, "এটাকে স্যুপের জন্য ব্যবহার কর!" তার পর নিজের কামরায় ফিরে যায়।

একা খেই হারিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ই রান্নাঘরে লাকড়ী পোড়ানোর শব্দ শুনতে থাকে। তার মনে পড়ে দূরে ছোট পাহাড়ের মত বরাহ দলের কথা। তখন না মেরে রেখে দিলে ছয় মাস চলত এবং প্রতিদিনের খাওয়ার চিন্তা থাকত না। এবং সেই বিরাট পাইথন! এটা দিয়ে কি স্যুপ তৈরী হতে পারে!

বাতি জ্বালে ন্যুই। উল্টো দিকের দেয়ালে মৃদু আলোয় চকচক করছে লাল তীর ও ধনুক, কালো তীর ও ধনুক, ক্রস ধনুক তলোয়ার এবং ভোজালি। একবার দেখে ই মাথা নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সন্ধ্যাকালীন খাবার এনে ন্যুসিন তার মাঝখানে টেবিলের ওপর সাজায়, বাম দিকে পাঁচটি বড় বাটি ন্যুডলস, ডান

দিকে দু বাটি ন্যুডলস ও একটি স্যুপ, মাঝখানে এক বড় বাটি কাকের ঝোল।

খাওয়ার সময় ই স্বীকার করে এটা মজাদার খাবার নয়। চুরি করে ছাং‌এ-র দিকে তাকায়। কাকের ঝোলের দিকে খুব একটা না তাকিয়ে সে স্যুপের ভেতর ন্যুডলস মিশিয়েছে, এবং বাটি প্রায় অর্ধেক শেষ করেছে। তার কাছে মনে হয় ছাং‌এ-র মুখ শুকনো এবং বিমর্ষ — যেন অসুখে পড়েছে।

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে একটু খোশমেজাজে পানি পান করে কোন কথা না বলে ছাং‌এ বিছানার ধারে বসে। ই তার পাশেই কাঠের চেয়ারে বসে, লোম ঝরে যাওয়া চিতাবাঘের চামড়ায় হাত বুলাতে থাকে।

মন পাওয়ার ভঙ্গীতে বলে : "আহ, বিয়ের আগে পশ্চিম পাহাড়ে এই চিতা বাঘটা মেরেছিলাম। বড় সুন্দরী ছিল — একতাল সোনার মত।"

তার মনে পড়ে অতীতের কথা। তারা ভালুকের থাবা, উটের কুঁজ ছাড়া কিছু খেত না, অন্যান্য অংশ চাকরানী এবং প্রহরীদের দিয়ে দেয়া হত। শিকার শেষে তারা খেত বন্য বরাহ, খরগোশ এবং রঙ্গীন পাখী। সে এত ভালো তীরন্দাজ ছিল যে, যেমন খুশী তেমন তীর ছুঁড়তে পারত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে : "আসলে আমি খুব ভালো তীরন্দাজ। সে জন্যে পুরো এলাকা খালি হয়ে গেছে। কে জানত, কাক ছাড়া আর কিছু থাকবে না?"

ছাং‌এ মৃদু হাসে।

"আজকে অন্যদিনের চেয়ে কপাল ভালো ছিল।"ই খোশ মেজাজে বলছে। "অন্ততঃ একটা চড়ুই মারতে পেরেছি। এজন্যে বাড়তি ত্রিশ লি পথ যেতে হয়েছে।"

"তুমি কি আর একটু দূরে যেতে পার না?"

"হ্যাঁ। সেটাই করতে চাই। কাল ভোরে উঠব। তুমি আগে উঠলে, আমাকে ডাকবে। আরো পঞ্চাশ লি পথ গিয়ে দেখতে চাই হরিণ অথবা খরগোশ পাওয়া যায় কিনা। . . . . . . ব্যাপারটা খুব সহজ হবে না। মনে পড়ে সেই বিরাট বরাহ এবং পাইথনটা শিকারের কথা? তোমার মায়ের বাড়ীর সামনে দিয়ে কালো ভালুক আসা যাওয়া করত এবং তিনি আমাকে কয়েকবার বলেছেন সেটাকে মারার জন্য . . . . . ."

"সত্যি?" মনে হয় ব্যাপারটা ছাং‌এ-র মনে নেই।

"কে ভাবতে পেরেছিল এগুলো এভাবে উধাও হয়ে যাবে? ভেবে দেখছ, আমি জানিনা কিভাবে সামলাব। আমি ঠিক আছি। শুধু সেই সন্ন্যাসীর দেয়া সালসা খেতে হবে এবং আমি উড়ে স্বর্গে যেতে পারি। কিন্তু প্রথমে তোমার

কথা ভাবতে হবে...... সেজন্যেই কাল আর একটু দূরে যাব ঠিক করেছি

"হুম" ছাং‌এ পানি শেষ করে। ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ে এবং চোখ বন্ধ করে। মৃদু আলোর বাতি শেষবারের মত দপ দপ করতে থাকে। তার পাউডার অনেকখানি মুছে গেছে, চোখের নীচে কালো রেখা, এবং একটি ভুরু আরেকটির চেয়ে বেশী কালো, তবু মুখ আগুনের মতই লাল, যদিও সে হাসছে না তবু তার গালে টোল দেখা যাচ্ছে।

"আহ, না, না। এ ধরণের একজন মহিলাকে আমি শুধু ন্যুডলস এবং কাকের ঝোল খাওয়াই কি করে!"

লজ্জায় ই'র কান পর্যন্ত লাল হয়ে যায়।

২

রাত কাটে, নতুন ভোর আসে।

হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ই চোখ মেলে। পশ্চিম দেয়ালে সূর্যের আলো দেখে বুঝতে পারে খুব একটা সকাল নয়। সে গভীর ঘুমে অচেতন ছাং‌এ-র দিকে তাকায়। কোন শব্দ না করে গায়ে কাপড় চড়িয়ে চিতাবাঘের চামড়া দেয়া চেয়ার থেকে নামে এবং পা টিপে টিপে হলঘরে যায়। মুখ ধুতে ধুতে ন্যু-গেংকে বলে ঘোড়ার জিন পরানোর জন্য ওয়াং শেংকে আদেশ দিতে।

এত কাজ থাকে যে সে অনেক আগেই নাস্তার পাট চুকিয়ে দিয়েছে। ন্যাই তার থলেতে পাঁচটি কেক, পাঁচটি পেঁয়াজ পাতা এবং এক প্যাকেট মরিচের গুঁড়ো দিয়ে তার তীর ধনুকসহ কোমরের সঙ্গে শক্ত করে বেধে দেয়। সে শক্ত করে বেল্ট বাধে এবং ধীরে ধীরে হলঘরের বাইরে যায় এবং ন্যুগেংকে বলে :

"শিকারের জন্য আজ দূরে যাবার আশা রাখি। ফিরতে ফিরতে হয়ত একটু দেরী হবে। গিন্নী যখন নাস্তা সারবে এবং ভালো মেজাজে থাকবে তখন আমার হয়ে ক্ষমা চাইবে এবং সান্ধ্য খাবারের সময় আমার জন্য অপেক্ষা করতে বলবে। আমি ক্ষমা চেয়েছি — ভুলে যেয়ো না।"

সে হনহনিয়ে বেরিয়ে যায়, জিন পরায় এবং দু পাশে দাঁড়ানো প্রহরীদের ছাড়িয়ে যায়। সহসা গ্রামের বাইরে আসে। সামনেই সরগমের মাঠ, যেটা সে প্রতিদিন পার হয়। এটা সে উপেক্ষা করে, কেননা অনেক আগেই জেনেছে এখানে কিছু নেই। দুবার চাবুকের বাড়ি মেরে সে সামনে এগোয়, একটানা

ষাট লি পথ অতিক্রম করে। সামনেই গভীর বন। ঘোড়া হাফিয়ে ওঠায় এবং মুখে ফেনা বেরিয়ে যাওয়ায় গতি কমিয়ে আনে। আরো দশ লি পরে তারা বনের ভেতর ঢোকে। কিন্তু মৌমাছি, প্রজাপতি, পিপীলিকা, ফড়িং ছাড়া ই কিছুই দেখতে পায় না — কোন পশু-পাখীর চিহ্ন নেই। এই পতিত অরণ্যের প্রথম দৃশ্যে মনে হয়েছিল কিছু শেয়াল অথবা খরগোশ মারা যাবে, কিন্তু এখন সে বুঝতে পারে এটা দিবাস্বপ্ন। এগিয়ে গিয়ে সামনেই সবুজ সরগমের ক্ষেত দেখতে পায়। দূরে দু' একটি মাটির ঘর। বাতাসে একটা মিষ্টি গন্ধ, সূর্যের আলো কড়কড়ে, কাক-চড়ুই শব্দ শোনা যায় না।

মনের ভাব হাল্কা করার জন্য সে বলে : "বিরক্তিকর।"

আরো কয়েক কদম এগিয়ে যাওয়ার পর তার মন আনন্দে নেচে ওঠে। দূরে মাটির কুড়েঘরের সামনের উঠোনে সত্যি সত্যি একটি পেঁচা। এমনভাবে ঘুরছে দেখে মনে হয় বড় পায়রা। সে ধনুক নিয়ে তীর আটকায়, এবং জোরে টেনে ছেড়ে দেয়। উল্কার মত ছুড়ে যায় তার তীর।

ইতস্ততঃ না করে, কেননা কখনো তার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়নি, সে তীরের পেছনে ছুটে যায়। কিন্তু কাছে যেতেই এক বুড়ী এগিয়ে আসে ঘোড়ার দিকে। সে তীর লাগা বড় পায়রাটা তুলে চীৎকার করছে :

"তুমি কে ? কেন তুমি আমার সবচে ভালো কালো মুরগীটি মেরেছ ? তোমার কি আর কিছু করার নেই ? . . . . . ."

ই'র দম বন্ধ হয়ে আসে। সে দম ফেলে।

"কি ? মুরগী ?" সে ভয়ে ভয়ে জবাব দেয়, "আমি ভেবেছিলাম কাঠপায়রা।"

"তুমি কি কানা ? তোমার বয়স নিশ্চয়ই চল্লিশের ওপর।"

"হ্যাঁ। গত বছর পঁয়তাল্লিশ হয়েছে।"

"লোকে বলে, বোকা বুড়োর মত বোকা হয় না। ভেবে দেখ, মুরগীকে কাঠপায়রা বলে ভুল করে। তুমি কে ?"

"আমি ই।" বলার সময় সে দেখতে পায় তার তীর মুরগীটার কলজে ছিদ্র করে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলেছে। তাই ঘোড়া থেকে নামার সময় নাম বলতে বলতে তার কণ্ঠ ভারী হয়ে আসে।

"ই ? . . . . . . তার কথা কখনো শুনিনি।" বুড়ী তার মুখের দিকে তাকায়।

"অনেকে আমার নাম জানে। রাজা ইয়াও-এর সুদিনে আমি বন্য বরাহ এবং সাপ শিকার করতাম . . . . . ."

"তুমি একটা মিথ্যুক। এগুলো প্রভু ফেং মেং[3] এবং অন্যেরা শিকার করেছে। হয়ত তুমি সাহায্য করেছিলে। কিন্তু এটা নিজে করার গর্ব কর কি করে ? লজ্জা।"

"কেন? ফেং মেং গত কয়েক বছর ধরে প্রায় আমাকে দেখতে আসে। আমরা কখনো একসঙ্গে কাজ করি নি। এতে তার কোন অংশ ছিল না।"

"মিথ্যুক! সবাই সে কথা বলে। আমি মাসে চার পাঁচ বার একথা শুনি।"

"ঠিক আছে। এখন ফয়সালা করা যাক। এই মুরগীর কি হবে?"

"তোমাকে পূরণ করতে হবে। এটা সবচে সেরা ছিল, প্রতিদিন একটি করে ডিম দিত। বিনিময়ে আমাকে তোমার একজোড়া নিড়ানি এবং তিনটি টাকু দিতে হবে।"

"আমার দিকে তাকান — আমি চাষীও নই, জোলাও নই। আমি নিড়ানি অথবা টাকু কোথায় পাব? আমার কাছে টাকা পয়সাও নেই, শুধু পাঁচটি কেক আছে — কিন্তু সেগুলো ময়দার তৈরী। আমি আপনার মুরগীর বিনিময়ে এগুলোসহ, পাঁচটি পেঁয়াজ এবং এক প্যাকেট মরিচের গুঁড়ো দেব। কি বলেন? ......"

এক হাতে ব্যাগ থেকে কেকগুলো নিয়ে সে আর এক হাতে মুরগীটি তোলে।

বুড়ী ময়দার তৈরী কেকের ব্যাপারে খুব বিরক্ত নয়, কিন্তু সে পনেরোটি দাবী করতে থাকে। কিছুক্ষণ দরাদরির পর তারা দশটিতে রাজী হয় এবং ই প্রতিজ্ঞা করে সর্বশেষ পরদিন দুপুরের মধ্যে বাকী পাঁচটি এনে দেবে। জামিন হিসেবে রেখে যায় তার তীর। তার পর মনের শান্তিতে মুরগীটি থলেতে পুরে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়। ক্ষুধায় কাতর হলেও সে খুশী। এক বছরের বেশী হয়েছে শেষ বার মুরগীর স্যুপের স্বাদ নিয়েছে।

বন পেরোতে পেরোতে বিকেল হয়ে যায়। বাড়ীতে পৌঁছার অস্থিরতায় সে জোরে চাবুক চালাতে থাকে। তার ঘোড়াও ক্লান্ত এবং সন্ধ্যার আগে তারা পরিচিত সরগম মাঠে পৌঁছুতে পারে না। একটু দূরে একটি ছায়া তার নজরে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাতাস ভেদ করে তার দিকে ছুটে আসে একটি তীর।

ক্লান্ত ঘোড়ার রাশ না টেনে ই ধনুকে তীর বাগিয়ে ছুড়ে দেয়। ঝিং! দুটি তীরের মুখোমুখি সংঘর্ষে স্ফুলিঙ্গ উঠে এবং উল্টে মাটিতে পড়ার আগে দুটি তীরের লেজ উল্টো V এর মত হয়ে যায়। প্রথম দুটি মিলতে না মিলতেই দুজনেই আরো দুটি তীর ছুড়ে দেয়, আবার মাঝ-আকাশে সংঘর্ষ হয়। ই'র সরবরাহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা নয়বার এ রকম করে, এখন সে উল্টো দিকে দেখতে পায় ফেং মেংকে তার গলার দিকে আনন্দে তীর তাক করছে।

ই ভাবে, "ভালো, ভালো, ভেবেছিলাম সে সাগরতীরে মাছ ধরছে, কিন্তু এখন দেখি এ ধরণের নোংরামির জন্য ওৎ পেতে আছে। এখন বুঝছি বুড়ী কেন ওভাবে কথা বলেছে ......"

চোখের পলকে তার শত্রুর ধনুক পূর্ণিমার চাঁদের মত গোল হয়ে যায় এবং বাতাসের ভেতর দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে তীরটি ই'র গলার দিকে এগিয়ে আসে। বোধ হয় লক্ষ্য ঠিক ছিল না, কেননা এটা ঠিক তার মুখে আঘাত করে। কেঁপে উঠে সে অসাড় হয়ে যায়, তার পর মাটিতে পড়ে যায়। তার ঘোড়াটি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে।

ই'কে মৃত মনে করে ফেং মেং পা টিপে টিপে এগিয়ে আসে। বিজয়ের আনন্দে হাসতে হাসতে সে মৃতের মুখের দিকে তাকায়।

সে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ই চোখ মেলে এবং উঠে বসে।

"আমাকে একশো বার মোকাবেলা করেও তুমি কিছু শেখো নি।" তীর ছুড়ে সে হেসে ওঠে। "তুমি আমার তীর খেয়ে ফেলার কৌশল কি জান না? খুব খারাপ। এসব ফন্দিতে কোন লাভ হবে না। তুমি গুরুর কাছ থেকে শেখা বিদ্যা দিয়ে গুরুকে মারতে পারবে না। তোমাকে নিজের একটা কিছু বের করতে হবে।"

বিজয়ী বিড়বিড় করে: "আমি মাছের তেলে মাছ ভাজতে চেয়েছিলাম

প্রাণ খুলে হাসতে হাসতে ই উঠে দাঁড়ায়। "তুমি সবসময় কোন না কোন প্রবাদ বলছ। হয়ত এসব দিয়ে বুড়ীকে মুগ্ধ করতে পারবে, কিন্তু আমাকে না। আমি সবসময় শিকার করেছি, তোমার মত ডাকাতি করিনি ......"

ব্যাগের ভেতর মুরগীটার ক্ষতি হয়নি দেখে সে ঘোড়ায় চড়ে চলে যায়।

"নিকুচি করি ......" সে একটা গাল শুনতে পায়।

"সে এত নীচে নেমেছে ভাবতে গেলে ...... তার মত একজন যুবক এবং সে গাল দেয়া শুরু করেছে। সেই বুড়ী বিশ্বাস করেছে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।" যেতে যেতে ই দুঃখে মাথা নাড়তে থাকে।

৩

সরগমের মাঠ পেরোনোর আগেই রাত নামে। নীল আকাশে তারার মেলা। পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যাতারা খুব বেশী জ্বল জ্বল করছে। মাঠের মাঝখানে আল দিয়ে ঘোড়াটি এগিয়ে চলেছে, এত ক্লান্ত যে গতি আগের চেয়ে অনেক মন্থর। ভাগ্য ভালো, দিগন্তে রূপালী আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে চাঁদ।

"বিরক্তিকর!" ই যার পেট এতক্ষণ মোচড়াচ্ছিল, ধৈর্য হারিয়ে ফেলে।

"বেঁচে থাকার জন্য যত কষ্ট করি, সময় নষ্ট করে তত বাজে ঘটনা ঘটে।" সে ঘোড়ার ওপর চাবুক চালায়, কিন্তু এটা একটু নড়ে চড়ে আগের মতই ধীরে ধীরে চলতে থাকে।

সে ভাবে : "এত দেরী হয়েছে, ছাংএ নিশ্চয়ই রেগে যাবে। তার মেজাজ চড়ে যেতে পারে। কপাল ভালো, তাকে খুশী করার জন্য এই ছোট্ট মুরগীটি আছে। তাকে বলব : 'গিন্নী দু'শ লি পথ আসা যাওয়া করে তোমার জন্য এটা পেয়েছি।' না এতে হবে না, খুব বাড়িয়ে বলা হচ্ছে।"

সামনেই আলো দেখে সে খুশী হয় এবং চিন্তা দূর করে দেয়। কোন চাবুক ছাড়াই ঘোড়াটি স্বচ্ছন্দে চলতে থাকে। বরফের মত সাদা গোল চাঁদের আলো তার পথে আলো ছড়িয়ে দিয়েছে এবং গালে লাগছে ঠাণ্ডা বাতাসের পরশ — বড় শিকার থেকে বাড়ী ফেরার চেয়ে এটা ভালো।

আবর্জনার স্তূপের পাশে ঘোড়াটি নিজে নিজে থেমে যায়। এক নজরে ই বুঝতে পারে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। পুরো বাড়ীতে একটা বিশৃংখলা। তার সঙ্গে দেখা করার জন্য যাও ফু একা এসেছে।

সে জানতে চায়, "কি হয়েছে? ওয়াং শেং কোথায়?"

"সে বেগমসাহেবাকে খুঁজতে ইয়াও পরিবারে গিয়েছে।"

"কি? তোমাদের বেগমসাহেবা ইয়াও পরিবারে গিয়েছেন?" নামতে নামতে ই'ও খুব অবাক হয়ে যায়।

"জ্বি।" যাও জিন এবং চাবুক নিয়ে নেয়।

তার পর ঘোড়া থেকে নেমে চৌকাঠ পেরোয় ই। এক মুহূর্ত ভেবে সে জিজ্ঞেস করার জন্য ফিরে তাকায়, "তুমি কি ঠিক জান অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে সে কোন রেস্তোরায় যায় নি?"

"না হুজুর। আমি সবগুলো রেস্তোরায় খুঁজেছি। তিনি নেই।"

চিন্তায় তার মাথা নুইয়ে আসে, ই বাড়ীতে ঢোকে। হলঘরের সামনে তিন চাকরানী ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিস্ময়ে সে চীৎকার করে :

"কি? তোমরা সবাই এখানে? তোমাদের বেগমসাহেবা কখনো একলা ইয়াও পরিবারে যায় না।"

তারা নীরবে তার দিকে তাকায়। তার পর তার ধনুক, তূণীর, এবং ছোট্ট মুরগীওয়ালা থলেটি নেয়। এক মুহূর্ত ভয় পেয়ে যায় ই। যদি রাগে ছাংএ আত্মহত্যা করে থাকে? সে যাও ফু'র জন্য ন্যুগেংকে পাঠায় এবং পেছনে পুকুর ও গাছে খোঁজ করতে বলে। একবার কামরায় এসে বুঝতে পারে অনুমান ভুল। সারা ঘর এলোমেলো, আলমারী খোলা এবং বিছানার পেছনে এক নজর দেখে

বোঝা যায় অলংকারের বাক্সটি উধাও। তার মনে হয় ঠাণ্ডা পানিতে ভিজে গেছে। তার কাছে সোনা রূপার কোন দাম নেই, কিন্তু সন্ন্যাসীর দেয়া সালসা সেই বাক্সে ছিল।

ঘরের ভেতর দুবার ঘুরবার পর সে দরজায় ওয়াং শেংকে দেখতে পায়।

"হুজুর, আমাদের বেগমসাহেবা ইয়াও পরিবারে নেই। তাঁরা আজকে পাশা খেলছেন না।"

ই তার দিকে তাকিয়ে কিছুই বলে না। ওয়াং শেং চলে যায়।

ঢুকতে ঢুকতে যাও ফু জিজ্ঞেস করে : "হুজুর, কি আমাকে ডেকেছিলেন?"

ই মাথা নেড়ে তাকে চলে যেতে ইশারা করে।

সে ঘরের ভেতর ঘুরতেই থাকে, ঘুরতেই থাকে, তার পর হলঘরে যায় এবং বসে পড়ে। মাথা তুলে উল্টো দিকের দেয়ালে দেখতে পায় সিন্দূর রংয়ের তীর-ধনুক, কালো তীর-ধনুক, ক্রসধনুক, তলোয়ার এবং ভোজালি। কিছুক্ষণ চিন্তার পর, সেখানে কাঠের মত দাঁড়িয়ে থাকা চাকরানীদের জিজ্ঞেস করে :

"তোমাদের বেগমসাহেবা কখন উধাও হয়েছেন?"

ন্যুই বলে : "যখন বাতি নিয়ে আসি তখন তিনি এখানে ছিলেন না। কিন্তু কেউ তাঁকে বাইরে যেতে দেখেনি।"

"তোমরা কি তাঁকে ঐ বাক্সে ঔষধটা নিতে দেখেছ?"

"না, হুজুর। কিন্তু আজ বিকেলে তিনি কিছু পানি চেয়েছিলেন।"

আতংকে ই উঠে দাঁড়ায়। সন্দেহ হয় এই পৃথিবীতে সে একা।

জিজ্ঞেস করে : "তোমরা কি কোন কিছু স্বর্গের দিকে উড়ে যেতে দেখেছ?"

"ওহ!" ন্যুসিন চিন্তায় পড়ে যায়। "বাতি জ্বালিয়ে বাইরে এসে, এই পথে একটি কালো ছায়া উড়ে যেতে দেখেছি। স্বপ্নেও ভাবিনি তিনি আমাদের বেগমসাহেবা......" তার মুখ শুকিয়ে যায়।

"নিশ্চয়ই তাই ঘটেছে।" হাঁটু চাপড়ে ই লাফিয়ে উঠে। বেরিয়ে যেতে যেতে ফিরে ন্যুসিনকে জিজ্ঞেস করে : "ছায়াটি কোন দিকে গেছে?"

ন্যুসিন এক আঙ্গুলে দেখায়। কিন্তু সে দিকে শুধু দেখতে পায় গোল বরফের মত সাদা চাঁদ আকাশে ঝুলে আছে। এতে আবছা ইমারত আর গাছও দেখা যায়। যখন ছোট ছিল, দিদিমা চাঁদের সৌন্দর্যের কথা বলেছিলেন, আবছা আবছা সে বর্ণনার কথা মনে আছে। চাঁদটিকে নীলকান্ত মণির সাগরে ভাসতে দেখতে দেখতে তার হাত পা ভারী হয়ে আসে।

প্রতিহিংসা তাকে পেয়ে বসে। এবং এই প্রতিহিংসায় খুন করার ইচ্ছা বোধ করে। চোখ পাকিয়ে সে চাকরানীদের উদ্দেশে চীৎকার করে :

"আমার ধনুক নিয়ে আয়! যেটা দিয়ে আমি সূর্যকে বধ করেছিলাম। এবং তিনটি তীর।"

ন্যুই এবং ন্যুগেং অতিকায় ধনুকটি হলঘরের মাঝখানে নিয়ে ধুলা ঝাড়তে থাকে। তিনটি তীরসহ সেটা তারা তার হাতে তুলে দেয়।

এক হাতে ধনুক ধরে অন্য হাতে সে তিনটি তীর আটকায়। চাঁদের দিকে তাক করে ধনুকটি পুরোপুরি টানে। সেখানে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থেকে তার চোখ দিয়ে আগুনের ফুলকি বেরোতে থাকে, বাতাসে চুল দাড়ি এমনভাবে উড়তে থাকে যেন আগুনের কালো শিখা। এক মুহূর্তের জন্য তাকে মনে হয় সেই বীর, যে অনেক অনেক আগে সূর্যকে বধ করেছিল।

হঠাৎ, একটা, শুধু একটা হুইসিল শোনা যায়। তিনটি তীর একটার পর একটা এগিয়ে যায়, এত দ্রুত যে চোখে দেখা বা কানে শোনা অসম্ভব। একই জায়গায় এগুলো চাঁদকে আঘাত করা উচিত ছিল, কেননা এক চুলও ফাঁক না রেখে ওগুলো এগিয়ে যায়। কিন্তু নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে পথ সামান্য পাল্টে দেয়, যাতে তিনটি তীর তিন জায়গায় তিনটি ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে।

চাকরানীরা চেঁচিয়ে ওঠে। তারা চাঁদটিকে কাঁপতে দেখে এবং ভাবে নিশ্চয়ই পড়ে যাবে — কিন্তু তবু সেটা সেখানে শান্তভাবে ঝুলে থাকে, যেন একটুও আঁচড় লাগে নি এভাবে শান্ত, আরো উজ্জ্বল আলো ছড়াতে থাকে।

আকাশকে গাল দেয়ার জন্য ই মাথা পেছনে ছুড়ে দেয়। সে দেখে এবং অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু চাঁদটি কোন নজর দেয় না। সে তিন পা এগিয়ে যায়, চাঁদটিও তিন পা পিছিয়ে যায়। সে তিন পা পিছিয়ে আসে, চাঁদটিও তিন পা এগিয়ে আসে।

তারা নীরবে একে অপরের দিকে তাকায়।

অনুভূতিহীন ই ধনুকটি হলঘরের দরজার সঙ্গে হেলান দিয়ে রাখে। ভেতরে যায়। চাকরানীরা পিছু পিছু যায়।

সে বসে পড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "তোমাদের বেগমসাহেবা এখনথেকে নিজেকে নিয়ে চিরদিন সুখে থাকবেন। কেমন করে সে আমাকে রেখে ওখানে একলা উড়ে গেল ? সে কি আমাকে খুব বুড়ো ঠাউরেছে ? কিন্তু মাত্র গত মাসে বলেছে : তুমি বুড়ো নও। নিজেকে বুড়ো ভাবা মানসিক দুর্বলতার লক্ষণ......"

ন্যুই বলে : "তা হতে পারে না। হুজুর, লোকজন এখনো আপনাকে যোদ্ধা ভাবে।"

"কখনো কখনো আপনাকে শিল্পী মনে হয়।" ফোড়ন কাটে ন্যুসিন।

"ননসেন্স! আসল কথা হচ্ছে, কাকের ঝোলওয়ালা ঐ ন্যুডলগুলো খাওয়ার অযোগ্য। খেতে না পারার জন্য তাকে দোষ দিতে পারি না......"

"ঐ চিতাবাঘের চামড়াটার একটা কোনা ছিঁড়ে গেছে। দেয়ালের দিকে মুখ করা একটি পা কেটে নেব সারাইয়ের জন্য। তাতে ভাল দেখাবে।" ন্যুসিন ভেতরে যায়।

"একটু অপেক্ষা কর।" বলে ই চিন্তা করে। "এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আমি ক্ষুধার্ত। জলদি মরিচের গুঁড়ো দিয়ে মুরগীর তরকারী এবং পাঁচ ক্যাটি কেক বানিয়ে দাও। তার পর শুতে যেতে পারি। আগামী কাল সেই সন্ন্যাসীকে আবার সালসার কথা বলব, যাতে তাকে অনুসরণ করতে পারি। ন্যুগেং, ওয়াং শেংকে বল আমার ঘোড়াকে চার পাত্র মটরশুঁটি দিতে।"

ডিসেম্বর, ১৯২৬

টীকা

1. চীনা রূপকথার বিখ্যাত তীরন্দাজ ই বা হৌ ই।

2. চীনা পৌরাণিক কাহিনীর দেবী। ই'র স্ত্রী হিসেবে বিবেচিত। অমরত্বের সালসা পান করে সে চাঁদে উড়ে যায় সেখানে দেবী হওয়ার জন্য।

3. ফেং মেং ছিলো ই'র শিষ্য এবং আর একজন ভাল তীরন্দাজ। তরুণ লেখক গাও ছাং-হোংকে ব্যঙ্গ করে বলা। কারণ সে লুস্যুন-এর শিষ্য ছিল। পরে প্রবন্ধ লিখে লুস্যুনকে আক্রমণ করে। তাই ইর বিরুদ্ধে ফেং মেং-এর তীর লুস্যুন-এর বিরুদ্ধে গাওএর আক্রমণের সঙ্গে তুলনীয়।

তলোয়ার

।।১।।

সেই জিয়ানছি মায়ের পাশে শুতে না শুতেই পাতিলের কাঠের ঢাকনা কাটার জন্য ইঁদুরগুলো বেরিয়ে আসে। শব্দে তার মাথা ধরে যায়। প্রথমে তার শব্দে কাজ হত, কিন্তু এখন ইঁদুরগুলো তাকে উপেক্ষা করে যেমন খুশী তেমন চিবিয়ে যাচ্ছে। মা জেগে যাবে এই ভয়ে সে এগুলোকে তাড়ানোর জন্য উচ্চ শব্দ করার সাহস পায় না। সারাদিনের পরিশ্রমে মা এত ক্লান্ত যে বালিশে মাথা রাখতে না রাখতেই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

অনেকক্ষণ পর নীরবতা নেমে আসে। সে ঝিমুচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ ঝুপ করে শব্দ হওয়ায় আচমকা তার তন্দ্রা কেটে যায়। সে মাটির পাত্রের সঙ্গে থাবার খর খর শব্দ শুনতে পায়।

"ভালো! আশা করি ডুবে মরবে!" সে আনন্দে ভাবতে থাকে এবং চুপচাপ উঠে বসে।

বিছানা থেকে নেমে, চাঁদের আলোয় সে দরজার দিকে যায়। পেছনে লাকড়ির জন্য হাত বাড়ায়, এবং একটি পাইনের লাকড়ি নিয়ে আগুন ধরিয়ে কলসীর ওপর আলো ফেলে। সত্যি, একটা বড় ইঁদুর পড়েছে ভেতরে। বেরিয়ে আসার মত জল খুব কম। শুধু ভেতরে সাঁতার কাটছে আর কলসীর গায়ে আঁচড় কাটছে।

ছেলেটি উল্লসিত হয়ে উঠে, "খুব মজা হয়েছে!" এটা সেই ইঁদুরগুলোর একটা যা প্রতিরাতে আসবাবপত্র কেটে তাকে ঘুমুতে দেয় নি। মজার দৃশ্য দেখার জন্য ছেলেটি দেয়ালের ছিদ্রে বাতিটি গেঁথে রাখে। তবু ইঁদুরটির বীজের মত চোখ দেখে তার ঘেন্না ধরে। সে একটি কাঠি নিয়ে এটাকে পানির নীচে ঠেলে দেয়। কিছুক্ষণ পর সে লাঠিটি সরিয়ে নেয় এবং ইঁদুরটি ওপরে উঠে সাঁতরাতে

থাকে এবং কলসীর গায়ে আঁচড় কাটতে থাকে, কিন্তু আগের চেয়ে কম শক্তিতে। এটার চোখজোড়া পানির নীচে — শুধু চোখে পড়ে ছোট্ট সরু নাকের লাল অগ্রভাগ, বেপরোয়া শ্বাস নিচ্ছে।

গত কিছুদিন ধরে লাল-নাক ওয়ালা লোকজনের ব্যাপারে সে বিরূপ। তবু এখন এই ছোট্ট লাল-নাক ওয়ালা প্রাণীটিকে তার কাছে করুণ মনে হয়। সে লাঠি দিয়ে ইঁদুরটির পেটে খোঁচা মারে। ইঁদুরটি সেটা ধরে ফেলে, তারপর একটু দম নিয়ে লাঠি বেয়ে উঠতে শুরু করে। কিন্তু এর গোটা শরীরের দৃশ্য — কালো পশম, ফোলা পেট, কৃমির মত লেজ — দেখে তার এত ঘেন্না লাগে যে লাঠি ঝাড়া দেয়। ইঁদুরটি ঝুপ করে পানির ভেতর পড়ে যায়। তারপর ডুবিয়ে দেয়ার জন্য সে কয়েকবার এটার মাথায় আঘাত করে।

এখন পাইনের লাকড়িটি ছয়বার বদলেছে। ক্লান্ত ইঁদুরটি ডুবে ডুবে কলসীর মাঝখানে ভাসছে, কখনো কখনো কিনারায় আসার চেষ্টা করছে। ছেলেটির আবার করুণা হয়। সে লাঠিটি ভেঙে দু'টুকরো করে ফেলে, তারপর কষ্ট করে ইঁদুরটিকে আটকে মেঝেতে ফেলে। প্রথমে এটা নড়ে নি, তারপর একটু দম নেয়, অনেকক্ষণ পর পা নড়ে এবং এটা উল্টে যায়, যেন চলে যায়। এতে মেই জিয়ানছি একটা ধাক্কা খায়। সঙ্গে সঙ্গে সে পা তুলে জোরে আঘাত করে। একটা ছোট্ট চীৎকার শুনতে পায়। নীচে তাকিয়ে দেখে, ইঁদুরটির নাকে-মুখে রক্ত — বোধ হয় মরে গেছে।

তার আবার খারাপ লাগে, এত খারাপ যেন অপরাধ করেছে। সে সেখানে উপুড় হয়ে বসে, দৃষ্টি ইঁদুরটির দিকে নিবদ্ধ, আর ওঠার শক্তি নেই।

এর মাঝে তার মায়ের ঘুম ভেঙেছে। বিছানা থেকে তিনি জিজ্ঞেস করেন : "বাবা, কি করছ?"

"একটা ইঁদুর ......" সে দ্রুত উঠে দাঁড়ায় এবং সংক্ষেপে জবাব দেয়ার জন্য ফিরে তাকায়।

"আমি জানি ইঁদুর। তুমি কি করছ? মারছ অথবা বাঁচিয়ে রাখছ?"

সে জবাব দেয় না। আলোও নিভে গেছে। সে সেখানে অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, চাঁদের মৃদু আলোর সঙ্গে চোখ মানিয়ে নিতে থাকে।

তার মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "মাঝরাতের পর তোমার বয়স ষোল হবে, কিন্তু এখনও ছেলে মানুষ আছ। তুমি কখনো বদলাবে না। মনে হচ্ছে তোমার বাবার প্রতিশোধ নেয়ার কেউ থাকবে না।"

মনে হচ্ছে ধূসর আলোয় বসে থাকা মায়ের মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপছে। তার নীচু কণ্ঠস্বরের অসীম দুঃখে তারও কাঁপুনি ধরে যায়। পর মুহূর্তে তার

শিরা উপশিরা দিয়ে গরম রক্ত বইতে শুরু করে।

"বাবার প্রতিশোধ? তাঁর কি প্রতিশোধ দরকার আছে?" অবাক বিস্ময়ে সে এগিয়ে যায়।

"প্রয়োজন আছে। সে দায়িত্ব তোমার। অনেকদিন তোমাকে বলতে চেয়েছি, কিন্তু ছোট ছিলে বলে কিছুই বলি নি। এখন তুমি আর ছেলে মানুষ নও, যদিও সেরকম ব্যবহার কর। আমি জানি না কি করতে হবে। তোমার মত একজন ছেলে মানুষ কি বড়ো মানুষের কাজ করতে পারে?"

"আমি পারি। মা, আমাকে বল। আমি বদলে দিতে যাচ্ছি......"

"নিশ্চয়ই, আমি তোমাকে বলতে পারি। এবং তোমাকে বদলে দিতে হবে।...... ঠিক আছে, এখানে আস।"

সে এগিয়ে যায়। তার মা বিছানায় উঠে বসে আচ্ছা চাঁদের আলোয় তার চোখ জ্বলজ্বল করছে।

মা গম্ভীরভাবে বলতে থাকে, "শোন, তলোয়ার নির্মাতা হিসেবে তোমার বাবার খুব খ্যাতি ছিল, এ তল্লাটে সবচে সেরা। যাতে উপোস করতে না হয় সেজন্যে তাঁর যন্ত্রপাতি বিক্রী করে দিয়েছি, তাই তোমার দেখার মত কিছু নেই। কিন্তু সারা পৃথিবীতে তিনি ছিলেন সেরা তলোয়ার নির্মাতা। বিশ বছর আগে, রাজার রক্ষিতা এক টুকরো লোহার জন্ম দেয়। তারা বলে একটি লোহার থামকে জড়িয়ে ধরার পর সে এটা গর্ভ ধারণ করেছে। এটা ছিল স্বচ্ছ, খাঁটি লোহা। এটা অমূল্য সম্পদ বুঝতে পেরে, রাজত্ব রক্ষা, শত্রুদের খতম করা এবং নিজের আত্মরক্ষার জন্য রাজা এটা দিয়ে একটা তলোয়ার বানানোর সিদ্ধান্ত নেন। কপাল খারাপ, তোমার বাবাকে এ কাজের জন্য বাছাই করা হয় এবং দু'হাতে তিনি লোহাটি বাড়ীতে নিয়ে আসেন। তিন বছর দিন রাত এটা পুড়িয়ে, পিটিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি দুটো তলোয়ার তৈরী করেন।

"শেষ পর্যন্ত যখন হাপর খুললেন তখন সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে উঠে যায়, মাটি কেঁপে ওঠে। সাদা ধোঁয়া ওপরে সাদা মেঘ বনে যায়, ধীরে তা রক্ত বর্ণ হয়ে ওঠে এবং সবকিছুর ওপর পীচ ফুলের রঙ ছিটিয়ে দিতে থাকে। কালো হাপরের ভেতর পড়ে থাকে দুটো লাল-গরম তলোয়ার। তোমার বাবা কূপের পরিষ্কার পানি ছিটাতে শুরু করলে তলোয়ার থেকে ছ্যাৎ ছ্যাৎ শব্দ উঠতে থাকে এবং ধীরে ধীরে নীল বর্ণ হয়ে যায়। সাতদিন, সাত রাত পর তলোয়ার দুটি উধাও হয়ে যায়। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় তখনো হাপরে পড়ে আছে, পরিষ্কার নীল এবং বরফের মত স্বচ্ছ।

"তোমার বাবার চোখে খুশীর ছটা ফুটে ওঠে। তলোয়ার দুটি তুলে তিনি

সেগুলো টোকা মেরে দেখেন, আদর করেন। তারপর তাঁর কপালে এবং মুখের কোনায় দুঃখের রেখা দেখা দেয়। তিনি দুটি কাস্কেটে তলোয়ার দুটি রাখেন।

"তিনি চুপে চুপে আমাকে বলেন, 'গত কয়েকদিনের আলামত দেখে তুমি বুঝতে পারছ সবাই জানে তলোয়ার তৈরী হয়ে গেছে। একটা রাজাকে দেয়ার জন্য কাল আমাকে অবশ্যই যেতে হবে। কিন্তু যেদিন এটা দেব, সেদিনই হবে আমার জীবনের শেষ দিন! ভয় হয়, আমাদের আর কখনো দেখা হবে না।'

"ভয় পেয়ে এবং তাঁর কথার মর্ম বুঝতে না পেরে কি জবাব দিতে হবে বুঝতে পারি নি। শুধু বলতে পারি : 'কিন্তু আপনি এত সুন্দর কাজ করেছেন।'

" 'আহ, তুমি বুঝতে পারছ না। রাজা সন্দেহপ্রবণ এবং নিষ্ঠুর। এখন আমি দুটো তলোয়ার তৈরী করেছি যা আগে কখনো দেখা যায় নি তাই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী-রা যাতে তাঁর বিরোধিতা অথবা তাঁকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে দিয়ে তলোয়ার বানাতে না পারে সেজন্যে তিনি আমাকে খুন করতে বাধ্য।'

"আমি চোখের জল ফেলি।

"তিনি বললেন : 'কেঁদো না। কোন পথ নেই। চোখের জল ভাগ্য বদলে দিতে পারে না। গত কিছু দিন ধরেই আমি এজন্যে তৈরী হয়েছি।' আমার হাঁটুর ওপর একটা কাস্কেট রাখতে রাখতে মনে হল তাঁর চোখে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তিনি আমাকে বলেন, 'এটা পুরুষ তলোয়ার। এটা রাখ। কাল রাজার কাছে নারী তলোয়ারটা নিয়ে যাব। ফিরে না আসলে বুঝবে আমি মৃত। চার পাঁচ মাসের মধ্যে কি তোমার বাচ্চা হবে না? দুঃখ করো না, আমাদের সন্তানকে ভালোভাবে লালন পালন করবে। যখন সে বড় হবে, তাকে এই তলোয়ার দিয়ে বলবে প্রতিশোধের জন্য রাজার মাথা কেটে ফেলতে।"

ছেলেটি জানতে চায়, "বাবা কি সেদিন ফিরেছিলেন?"

মা শান্তভাবে জবাব দেয় : "না। আমি সর্বত্র খোঁজ করেছি, কিন্তু তাঁর কোন খবব নেই। তারপর একজন আমাকে বলে তোমার বাবাই প্রথম নিজের তৈরী তলোয়ারকে নিজের রক্তে রাঙিয়েছেন। তাঁর ভূত রাজ প্রাসাদে আস্তনা গাড়বে এই ভয়ে তারা তাঁর শরীরকে সামনের দরজায় পুঁতে রাখে, আর মাথা পুঁতে রাখে পেছনের পার্কে।"

মেই জিয়ানছি'র মনে হয় তার শরীরে আগুন ধরেছে এবং মাথার প্রতিটি চুল দিয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বেরুচ্ছে। আঙ্গুলের গাঁট না ফোটা পর্যন্ত অন্ধকারে সে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে।

তার মা উঠে দাঁড়ায়, বিছানার মাথা থেকে একটি তক্তা সরায়। তারপর বাতি জ্বালিয়ে দরজার পেছন থেকে নিড়ানি বের করে ছেলেকে আদেশ করে :

"খোঁড়!"

ছেলেটির বুক ধুক ধুক করলেও, সে ধীরে ধীরে খোঁড়ে, কোপের পর কোপ। সে পাঁচ ফুটের বেশী হলদে মাটি খোঁড়ে, তারপর পচা কাঠের দেখা পাওয়া যায়।

"দেখ! খুব সাবধানে!" মা চীৎকার করে ওঠে।

গর্তের পাশে শুয়ে পড়ে হাত বাড়িয়ে সে পচা কাঠের সন্ধান পায়। তারপর তার আঙ্গুলে বরফের মত ঠাণ্ডা কিছু একটা লাগে। স্বচ্ছ, খাঁটি তলোয়ার। সে হাতলটা ধরে বাইরে নিয়ে আসে।

জানালার বাইরে চাঁদ-তারা এবং ঘরের ভেতর-বাতি হঠাৎ ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলে। পৃথিবী ভরে যায় ইস্পাত, নীল আলোতে। এবং এই ইস্পাত আলোতে মনে হয় তলোয়ারটি গলে চোখের আড়াল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভালো করে তাকিয়ে বালকটি দেখে তিনফুটের লম্বা একটা কিছু — কিন্তু খুব বেশী ধারালো নয় — আসলে পেঁয়াজ পাতার মত গোলাকার।

মা বলেন : "এখন থেকে তোমাকে আর নরম হলে চলবে না। বাবার প্রতি-শোধ নেয়ার জন্য এই তলোয়ার নাও।"

"আমি ইতোমধ্যে মন নরম করা বন্ধ করে দিয়েছি। এ তলোয়ার দিয়ে আমি তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণ করব।"

"আমিও তাই আশা করি। একটি নীল কোট পর এবং তলোয়ারটি পেছনে বাঁধ। এক রঙ হলে কেউ দেখবে না। আমার কাছে কোট আছে।" তার মা আঙ্গুল দিয়ে বিছানার পেছনে এক জীর্ণ বাক্স দেখায়। "তুমি কালকেই বেরিয়ে পড়বে, আমার জন্য চিন্তা করবে না।"

মেই জিয়ানছি নতুন কোটটা পরার চেষ্টা করে, তার গায়ে ঠিক ঠিক লেগে গেছে। সে এটা দিয়ে তলোয়ারটা জড়িয়ে বালিশের কাছে রাখে, তারপর চুপচাপ শুয়ে পড়ে। তার বিশ্বাস, সে মন নরম করা বন্ধ করে দিয়েছে। মনে কিছু নেই এমন চিন্তা করার কথা সে ঠিক করে, তার পর ঘুমিয়ে পড়বে, নিয়মমত পরদিন ভোরে উঠে প্রাণঘাতী শত্রুর খোঁজে দৃঢ়তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়বে।

কিন্তু সে ঘুমোতে পারে না। এপাশ ওপাশ করে, সবসময় উঠে বসার জন্য ব্যস্ত। সে মায়েব দীর্ঘ, নরম এবং হতাশ শ্বাস শুনতে পায়। যখন মোরগের প্রথম ডাক শুনতে পায় বুঝতে পারে ভোর হয়েছে, এখন তার বয়স ষোল।

।।২।।

মেই জিয়ানছি, তার চোখ ফোলা, একবারও পেছনে না তাকিয়ে বাড়ী থেকে বেরোয়। নীল কোট এবং পেছনে বাঁধা তলোয়ার নিয়ে সে দ্রুত শহরের দিকে এগোয়। তখনো পূর্ব দিকে কোন আলো নেই। তখনো প্রতিটি পাতায় রাতের শিশির লেগে আছে। বনের শেষ সীমায় পৌঁছতে পৌঁছতে শিশিরকণাগুলো ঝলমলিয়ে ওঠে, এবং ভোরের স্পর্শ অনুভূত হয়। বহু দূরে তার নজরে পড়ে শহরের দেয়ালের ধূসর সীমা রেখা।

তরকারীওয়ালাদের সঙ্গে মিশে সে শহরে প্রবেশ করে। রাস্তা ঘাটে ইতোমধ্যে গোলমাল ও হৈচৈ বেধে গেছে। লোকজন অলসভাবে দলে দলে দাঁড়িয়ে আছে। যখন তখন মেয়েরা দরজা দিয়ে উঁকি মারছে। ঘুমের ফলে তাদের অনেকের চোখের পাতা ফোলা, চুল অবিন্যস্ত এবং মুখ ফ্যাকাশে কেননা পাউডার মাখার সময় পায় নি।

মেই জিয়ানছি বুঝতে পারে একটা বিরাট কিছু ঘটতে যাচ্ছে, এইসব লোকজন অধীরভাবে ও ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করছে।

সে এগোতেই একটি ছেলে পাশ কাটিয়ে যায়। পিঠের তলোয়ারের সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লেগে গিয়েছিল। সে ভয়ে ঘেমে ওঠে। প্রাসাদ থেকে অল্পদূরে উত্তরে মোড় নিয়ে দেখতে পায় একদল লোক রাস্তার দিকে তাদের মাথা বাড়িয়ে আছে। সে লোকজনের ভীড়ে নারী ও ছেলে মেয়েদের চীৎকার শুনতে পায়। তার অদৃশ্য তলোয়ার তাদের আহত করবে ভয়ে সে সামনে এগোনোর সাহস পায় না। কিন্তু নতুন আসা লোকজন তাকে সামনে ঠেলে দেয়। তাকে তাদের পথ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়, শেষ পর্যন্ত সে শুধু সামনে তাদের পিঠ ও বাড়ানো গলা দেখতে পায়।

হঠাৎ সামনের লোকজন একের পর এক হাঁটু গেড়ে বসে। দূরে নজরে পড়ে দু'জন ঘোড়সওয়ার পাশাপাশি এগিয়ে আসছে। তাদের পেছনে রয়েছে লাঠি, বর্শা, তলোয়ার, ধনুক, পতাকাবাহী যোদ্ধা। তারা হলদে ধোঁয়া উড়িয়ে আসছে। তার পেছনে, একটি চার ঘোড়ার টমটম। তাতে রয়েছে বাদ্যযন্ত্রী। তারা ঢোল করতাল এবং অদ্ভুত যন্ত্র বাজাচ্ছে। এর পেছনে রয়েছে আরো কিছু শকট। সেগুলোয় রয়েছে উজ্জ্বল পোশাক পরা রাজসভাসদ, বুড়ো অথবা বেঁটে মোটা লোক, ঘামে তাদের মুখ চকচক করছে। তাদের অনুসরণ করছে বল্লম, তলো-য়ার ও ত্রিশূলওয়ালা অশ্বারোহী সৈন্য। তারপর নতজানু লোকজন উপুড় হয়

এবং মেই জিয়ানছি দেখতে পায় হলদে চাঁদোয়া দেয়া একটা বিরাট গাড়ী এগিয়ে আসছে। মাঝখানে বসে আছে উজ্জ্বল পোশাক পরা একটি মোটা লোক। মুখে ধূসর গোঁফ এবং মাথাটা ছোট। তার সঙ্গে রয়েছে ছেলেটির পিঠে বাঁধা তলোয়ারের মত একটি তলোয়ার।

মেই জিয়ানছি'র হঠাৎ কাঁপুনি ধরে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সে প্রচণ্ড গরম অনুভব করে। পিঠের তলোয়ারের হাতল ধরে সে নতজানু লোকজনের মাথার ফাঁক দিয়ে সামনে এগোয়।

কিন্তু পাঁচ ছয় কদমের বেশী এগোয় নি এমন সময় সে কারো সঙ্গে হোঁচট খায় এবং শীর্ণ মুখওয়ালা এক যুবকের ওপর গিয়ে পড়ে। তার তলোয়ারের মাথা কোন ক্ষতি করেছে কিনা এটা দেখার জন্য যেই সে ভয়ে ভয়ে ওঠার চেষ্টা করে তখন পাঁজরে দুটি প্রচণ্ড ঘুষি খায়। প্রতিবাদ না করে সে রাস্তার দিকে তাকায়। কিন্তু হলদে চাঁদোয়া দেয়া গাড়ী পার হয়ে গেছে। এমনকি পেছনের অশ্বারোহী চাকর বাকররাও বেশ দূরে চলে গিয়েছে।

রাস্তার দু'পাশের সবাই আবার উঠে দাঁড়ায়। শীর্ণ মুখওয়ালা যুবকটি মেই জিয়ানছি'র কলার চেপে ধরেছে এবং তাকে যেতে দেবে না। সৌরজাল নষ্ট করার জন্য তাকে দায়ী করে এবং আদেশ করে আশি বছর বয়সের আগে মারা গেলে তাকে নিজের জীবন দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ভবঘুরেরা একনজর দেখার জন্য ভীড় করে, কিন্তু কিছুই বলে না। শীর্ণ মুখওয়ালা যুবকের পক্ষ নেয়া লোকজন কিছু ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করে। এই বিদ্রূপে মেই জিয়ানছি হাসতেও পারে না, মেজাজও গরম করতে পারে না। তাদের মত বিরক্ত হলেও, তাদের কাছ থেকে ছাড়া পায় না। এক হাঁড়ি জোয়ার রান্নায় যতক্ষণ লাগে ব্যাপারটা ততক্ষণ ধরে চলে। সে অধৈর্য হয়ে জ্বলে ওঠে। তবু পথচারীরা যেতে চায় না, লোভীর মত তাকিয়ে থাকে।

তার পর ভীড় ঠেলে একজন কালো লোক এগিয়ে আসে, লোহার রঙের মত পাতলা, চোখ, দাড়ি কালো। কোন কথা না বলে, সে মেই জিয়ানছি'র দিকে নিষ্প্রাণ হাসি হাসে, তারপর তার হাত দিয়ে শীর্ণ মুখওয়ালা যুবকের চোয়াল চেপে ধরে তার চোখের দিকে তাকায়। এক মুহূর্ত যুবকটি তাকায়, তারপর ছেলেটি কলার ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। কালো লোকটিও চলে যায় এবং হতাশ দর্শকরা সরে পড়ে। কেউ কেউ এগিয়ে এসে মেই জিয়ানছি'কে তার বয়স ও ঠিকানা জিজ্ঞেস করে এবং জানতে চায় বাড়ীতে বোন আছে কিনা। কিন্তু সে তাদের উপেক্ষা করে।

সে দক্ষিণে হেঁটে যায়। বুঝতে পারে এই ব্যস্ত শহরে দুর্ঘটনায় কাউকে

আহত করা সম্ভব। বাবার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তার বরং রাজার প্রত্যাবর্তনের জন্য দক্ষিণ দরোজার বাইরে অপেক্ষা করা ভালো। সেই উন্মুক্ত জনশূন্য স্থানটি তার উদ্দেশ্যের জন্য সবচে ভালো। ইতোমধ্যে লোকজন পাহাড়ে রাজার ভ্রমণ সম্পর্কে আলোচনা করতে শুরু করেছে। কি লোকলস্কর! কি দাপট! রাজাকে দেখতে পাওয়া কত সম্মানজনক! তারা এত নত হয়েছে যে গোটা জাতির জন্য উদাহরণ হওয়া উচিত! তারা মৌমাছির মত গুন গুন করছে। দক্ষিণ দরোজার কাছে এটা শান্ত হয়ে আসে।

শহর ত্যাগ করার পর দুটি সেদ্ধ রুটি খাওয়ার জন্য সে একটা বড়ো তুঁত গাছের নীচে বসে। খেতে খেতে মার কথা ভাবতে গিয়ে তার গলায় আটকে যায়, তার পর সেটা কেটে যায়। চারদিকের সবকিছু ধীরে ধীরে নীরব হয়ে আসে, শেষ পর্যন্ত সে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস পরিষ্কার শুনতে পায়।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে সে অস্থির হয়ে উঠে। চোখ কচলে সামনে তাকায়, কিন্তু রাজার কোন চিহ্ন নেই। যেসব গ্রামবাসীরা তরকারী বেচার জন্য শহরে গিয়েছিল একের পর এক খালি ঝুড়ি কাঁধে বাড়ী ফিরছে।

সবকিছু শেষ হওয়ার পর সেই কালো লোকটা শহর থেকে বেরিয়ে আসে।

"মেই জিয়ানছি, পালাও! রাজা তোমার পেছনে লেগেছে।" তার গলা পেঁচার চীৎকারের মত মনে হয়।

মেই জিয়ানছি'র পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। স্তব্ধ হয়ে কালো লোকটিকে অনুসরণ করতে থাকে, দৌড়াচ্ছে যেন পাখা গজিয়েছে। সবশেষে, দম ফেলার অবসরে সে বুঝতে পারে তারা বনের কিনারায় পেঁৗছেছে। অনেক পেছনে উদীয়মান চাঁদের রূপালী আলো, কিন্তু সামনে শুধু দেখতে পায় কালো লোকটির চোখ আলেয়ার মত জ্বলছে।

অবাক বিস্ময়ে ছেলেটি জিজ্ঞেস করে: "আপনি আমাকে চিনলেন কি করে? ......"

"আমি সবসময় তোমাকে চিনি।" লোকটি হেসে ওঠে। "আমি জানি. বাবার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তোমার পিঠে পুরুষ তলোয়ারটি রয়েছে। এবং আমি জানি তুমি ব্যর্থ হবে। শুধু তাই নয়, আজকে একজন তোমার বিরুদ্ধে বলে দিয়েছে। তোমার শত্রু পূর্ব দরজা দিয়ে রাজপ্রাসাদে ঢুকে তোমার গ্রেফতারের আদেশ জারী করেছে।"

মেই জিয়ানছি হতাশ হতে শুরু করে।

বিড়বিড়িয়ে বলে, "অবাক হওয়ার কিছু নেই, মা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়েছেন।"

"কিন্তু তিনি শুধু অর্ধেক জানেন। তিনি জানেন না যে আমি তোমার হয়ে

প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছি।"

"আপনি? ন্যায়ের প্রতীক, আপনি কি আমার হয়ে প্রতিশোধ নিতে রাজী?"

"আহ, ঐ উপাধি দিয়ে আমাকে অপমান করো না।"

"তাহলে, বিধবা এবং এতিমদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে?"

সে ধমকে উঠে, "এসব নোংরা শব্দ ব্যবহার করো না। ন্যায় বিচার, সহানুভূতি যা একসময় ভালো শব্দ ছিল, এখন নিষ্ঠুর, সুদখোরের পুঁজি। আমার হৃদয়ে এগুলোর জন্য কোন স্থান নেই। আমি শুধু তোমার হয়ে প্রতিশোধ নিতে চাই।"

"ভালো। কিন্তু কি ভাবে করবেন?"

"আমি তোমার কাছ থেকে দুটো জিনিষ চাই।" মনে হয় তার কণ্ঠ জ্বলন্ত চোখের নীচ থেকে আসছে। "কোন দুটো জিনিষ? প্রথমে তোমার তলোয়ার, তারপর তোমার মাথা।"

মেই জিয়ানছি'র কাছে প্রস্তাবটা বড় অদ্ভুত মনে হয়। ইতস্ততঃ করলেও, সে ভয় পায় না। এক মুহূর্তের জন্য সে বোবা হয়ে যায়।

অন্ধকারে সেই অশান্ত কণ্ঠ ভেসে আসে, "জীবন ও সম্পদ নিয়ে তোমাকে বোকা বানাতে চাই এটা ভয় করো না। সবটা তোমার ওপর নির্ভর করে। যদি বিশ্বাস কর তাহলে আমি এগোব, না করলে না।"

"কিন্তু আপনি কেন আমার হয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইছেন? আপনি কি আমার বাবাকে জানতেন?"

"প্রথম থেকেই তাকে জানতাম, যেভাবে সবসময় তোমাকে জেনেছি। কিন্তু সেটাই কারণ নয়। বুদ্ধিমান ছেলে, তুমি বুঝবে না, প্রতিশোধ গ্রহণে আমি কত ওস্তাদ। যা তোমার সেটা আমার, যা তাঁর ব্যাপার, সেটা আমারও ব্যাপার। আমি অন্যদের এবং নিজের কাছ থেকে হৃদয়ে এত আঘাত পেয়েছি যে এখন নিজেকে ঘৃণা করি।"

অন্ধকারের সেই কণ্ঠ থেমে যায়। মেই জিয়ানছি হাত দিয়ে পিঠ থেকে নীল তলোয়ার বের করে এবং একই সঙ্গে তার ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দেয়। পায়ের কাছে সবুজ শেওলার ওপর তার মাথা পড়তে পড়তে সে কালো লোকটিকে তরবারি এগিয়ে দেয়।

"আহা।" লোকটি এক হাতে তলোয়ারটি নেয় এবং অন্য হাতে চুল ধরে মেই জিয়ানছি'র মাথাটি তোলে। সে উষ্ণ ও মৃত ঠোঁটে দুবার চুমু খায় এবং তারপর নিষ্প্রাণ, অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

তার হাসি ছড়িয়ে পড়ে বনের ভেতর। তৎক্ষণাৎ, বনের গভীরে আলেয়ার

আলোর মত জ্বলজ্বলে চোখ চোখে পড়ে, যেটা পর মুহূর্তে এত কাছে এসে পড়ে যে নেকড়ের নিশ্বাস পর্যন্ত শোনা যায়। এক কামড়ে মেই জিয়ানছি'র নীল কোটটি টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তারপর তার গোটা শরীর এবং তৎক্ষণাৎ তার রক্ত চেটে খেয়ে ফেলে। একমাত্র হাড় চিবুনোর শব্দ আসে।

সবচে সামনের বড়ো নেকড়েটা কালো মানুষটির দিকেও ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু নীল তলোয়ারের এক ঘায়ে এর খণ্ডিত মাথা পড়ে যায় তার পায়ের কাছে সবুজ শেওলার ওপর। অন্য নেকড়েগুলো এক কামড়ে এর চামড়া তুলে ফেলে, তার শরীর সাবাড় করে এবং তৎক্ষণাৎ রক্ত চেটে খেয়ে ফেলে। একমাত্র হাড় চিবুনোর শব্দ আসে।

মেই জিয়ানছি'র মাথা জড়ানোর জন্য কালো লোকটি মাটি থেকে নীল কোটটি তুলে নেয়। পিঠে মাথা ও তলোয়ার বেঁধে নিয়ে অন্ধকারের ভেতর রাজধানীর দিকে এগিয়ে চলে।

নেকড়েগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, জিহ্বা দিয়ে লালা পড়তে থাকে এবং হাঁপাতে থাকে। সে চলে যাবার সময় তারা লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

সে অন্ধকারে রাজধানীর দিকে এগিয়ে চলে। কর্কশ কণ্ঠে গান গাইতে থাকে :

গান গাও, গান গাও,
যে ভালো বেসেছে তলোয়ার
মৃত্যুকে জেনেছে পুরস্কার।
যারা একা যায় তারা অসংখ্য
যারা তলোয়ার ভালোবাসে,
তাবা আর একা নয়।
দুশমনের বদলে দুশমন,
হা! মাথার বদলে মাথা।
দুজন মানুষ নিজের হাতে মৃত।

।।৩।।

পাহাড়ে গিয়ে রাজা খুব একটা শান্তি পান নি। রাস্তায় লুকিয়ে থাকা আততায়ীর সংবাদ তাঁকে আরো হতাশ করে দেয়। সে রাতে তাঁর মেজাজ ছিল খুব খারাপ। তিনি অভিযোগ করেন এমনকি নয় নম্বর রক্ষিতার চুলও গতদিনের মত এত কালো ছিল না। কপাল ভালো, সে রাজার হাঁটুতে বসে সত্তর বার চেষ্টা

করে তাঁর কপালের বলি রেখা মুছে দেয়।

কিন্তু পরদিন দুপুরে ঘুম থেকে ওঠার পর রাজার মেজাজ আবার চড়ে যায়। দুপুরের খাওয়া শেষ হতে হতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

হাই তুলে চেঁচিয়ে ওঠেন, "আমি বিরক্ত।"

রানী থেকে শুরু করে দরবারের ভাঁড় পর্যন্ত ভয়ে চুপসে যায়। রাজা অনেক দিন থেকেই বুড়ো মন্ত্রীদের উপদেশ এবং বামুন লোকদের হাসি ঠাট্টায় ক্লান্ত। সম্প্রতি দড়ির ওপর হাঁটা, ভোজবাজি, ডিগবাজী, তলোয়ার গিলে ফেলা, অগ্নি বমি করা, লাঠিতে ওঠার খেলাও তাঁর কাছে নীরস মনে হচ্ছে। এখন তাঁর রাগে ফেটে পড়ার উপক্রম, এত রাগ যে সামান্যতম অজুহাতে তলোয়ার বের করে মানুষ খুন করে ফেলবেন ।

দু'জন খোজা প্রাসাদের বাইরে লুকোচুরি খেলে ফিরে আসছিল। তারা দেখেছে রাজদরবারে অন্ধকার নেমে এসেছে, বুঝতে পেরেছে মারাত্মক বিপদ ঘনিয়ে আসছে। একজন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আরেকজন, সাহসে বুক বেঁধে আস্তে আস্তে রাজার সামনে গিয়ে নতজানু হয়ে ঘোষণা করে :

"দাস এই কথা জানাতে চায়, সে এইমাত্র এমন এক চমৎকার লোকের দেখা পেয়েছে যে মহামান্য রাজাকে আনন্দ দিতে পারবে।"

"কি ?" রাজা কথা বেশী বলেন না।

"সে একজন রোগা পাতলা কালো লোক, দেখতে ভিখিরীর মত। তার পরণে নীল পোশাক, পিঠে নীল, গোলাকার পুঁটলি এবং অদ্ভুত ছন্দহীন গান গায়। প্রশ্ন করলে, বলে, সে এমন অদ্ভুত খেলা দেখাতে পারে যা কেউ কখনো দেখে নি, পৃথিবীতে অদ্ভুত এবং সম্পূর্ণ নতুন। এ দৃশ্য দেখলে সব ঝামেলা চুকে যাবে এবং পৃথিবীতে শান্তি আসবে। কিন্তু দেখাতে বলায় সে দেখায় নি। সে বলে এজন্যে প্রয়োজন সোনালী ড্রাগন এবং সোনালী কড়াই ......"

"সোনালী ড্রাগন ? সে'ত আমি। সোনালী কড়াই ? আমার একটা আছে।"

"অনুগত দাস তাই ভেবেছে ......"

"তাকে ভেতরে নিয়ে আস।"

রাজার কণ্ঠ মিলিয়ে যাবার আগেই চারজন রক্ষী খোজার সঙ্গে দৌড়ে যায়। রানী থেকে শুরু করে রাজদরবারের ভাঁড় পর্যন্ত সবাই খুশী হয়ে ওঠে, আশা এই যাদুকর ঝামেলা মিটিয়ে দেবে এবং পৃথিবীতে শান্তি আনবে। খেলা না জমলেও, রোগা পাতলা, কালো, ভিখিরীর মত দেখতে লোকটি রাজ-রোষ সহ্য করতে পারবে। সে আসা পর্যন্ত তারা টিকতে পারলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

তাদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি। ছয়জন লোক সোনালী সিংহাস-

নের দিকে হনহনিয়ে এগিয়ে আসে। সামনে খোজা, পেছনে চারজন রক্ষী এবং মাঝখানে একটি কালো লোক। কাছে এলে তারা তাকিয়ে তার নীল কোট, কালো দাড়ি, ভুরু এবং চুল দেখতে পায়। সে এত শুকনো যে চোয়ালের হাড় বেরিয়ে আছে এবং চোখ গর্তের ভেতর। প্রণাম করার জন্য সে যখন নত-জানু হয় তারা তার পিঠের ওপর দেখতে পায় নীল কাপড়ে জড়ানো, গভীর লাল নকশাওয়ালা একটি ছোট গোল পুঁটলি।

"ঠিক আছে।" অধৈর্য হয়ে রাজা চেঁচিয়ে ওঠেন। লোকটির সাধারণ বেশভূষা তার কৌশলের জন্য ভালো হয় নি।

"প্রজার নাম ইয়ান-শি-আও-যে, জন্ম ওয়েনওয়েন গ্রামে। আমার কোন পেশা ছিল না। যখন বড় হই, তখন এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি আমাকে একটি বালকের মাথা নিয়ে যাদু দেখানো শেখান। তবে আমি এটা একা করতে পারি না। এটা হতে হবে সোনালী ড্রাগনের উপস্থিতিতে, আরো প্রয়োজন পরিষ্কার পানি ওয়ালা সোনালী কড়াই, কয়লা দিয়ে সেদ্ধ করা। যখন ছেলেটির মাথা রাখা হবে এবং পানি ফুটতে থাকবে তখন মাথাটি উঠবে, নামবে এবং সব ধরণের নাচ দেখাবে। অদ্ভুত কণ্ঠে গান গাইবে এবং হাসবে। যে কেউ এর গান শুনবে বা নাচতে দেখবে, সে ঝামেলা মেটানোর পথ পাবে। যখন সবাই দেখবে, সারা পৃথিবীতে শান্তি আসবে।

রাজা জোরে আদেশ দেন, "ঠিক আছে, দেখাও।"

তাদের খুব বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি। রাজদরবারের বাইরে একটি ষাঁড় সেদ্ধ করার মত বড় সোনালী কড়াই বসানো হয়। পরিষ্কার জলে ভর্তি, নীচে কয়লার আগুন। কালো লোকটি দাঁড়ায় এক পাশে। কয়লা লাল হলে সে পোটলা নামিয়ে খোলে। তারপর দু'হাতে তুলে ধরে সুন্দর ভুরু, বড় চোখ, সাদা দাঁত এবং লাল ঠোঁট ওয়ালা একটি বালকের মাথা। এর মুখে হাসি। এলো-মেলো চুল দেখতে অস্পষ্ট নীল ধোঁয়ার মত। পুরো জমায়েতকে ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য কালো লোকটি মাথাটি উঁচু করে ধরে। সে এটা কড়াইর ওপর ধরে, বিড়-বিড়িয়ে অস্পষ্ট কিছু একটা আওড়ায়, শেষ পর্যন্ত ঝুপ করে তা পানিতে ফেলে দেয়। প্রায় পাঁচ ফুট পর্যন্ত ফেনা ওঠে। তার পর সবকিছু শান্ত হয়ে যায়।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছুই ঘটে না। রাজা ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন, রানী, রক্ষিতা, মন্ত্রী এবং খোজারা ভয় পেতে থাকে এবং কুঁজো বামুন ব্যঙ্গ করতে থাকে। এই ব্যঙ্গে রাজার মনে হয় তিনি বোকা বনেছেন। তিনি রক্ষীদের আদেশ দেন, এই হাবা যে তার রাজাকে প্রতারণা করার সাহস পেয়েছে তাকে কড়াইতে ফেলে সেদ্ধ করে মারতে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনি শুনতে পান পানি ফুটছে। গনগনে আগুনের আভা কালো লোকটির মুখে ছড়িয়ে পড়েছে, গলিত লাল লোহার মত দেখাচ্ছে। রাজা চারদিকে তাকিয়ে দেখেন। কালো লোকটি দু'হাত আকাশের দিকে তুলে শূন্যে তাকিয়ে আছে, নাচছে, কর্কশ কণ্ঠে গান গাইছে:

ভালোবাসার গান গাও,
আহা ভালোবাসা! আহা রক্ত! কে এমন নয়?
মানুষ অন্ধকারে লুকোয়,
রাজা জোরে হাসে,
দশহাজার মাথা মরে গিয়ে নত হয়েছে।
আমি শুধু একটি মাথা ব্যবহার করি,
একজনের মাথার জন্যই রক্ত ঝরুক!
রক্ত — বয়ে থাক!
গান গাও, গাও গান!

তার গানের সঙ্গে সঙ্গে কড়াই'র পানি কোনাকার পর্বতের মত উপরে উঠতে থাকে, উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ফুটতে থাকে। মাথাটি পানির সঙ্গে উপরে উঠতে, নীচে নামতে থাকে, ঘুরতে ঘুরতে ডিগবাজী খেতে থাকে। তারা শুধু এর মুখে সুখের হাসি দেখতে পায়। তারপর স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটার জন্য হঠাৎ এসব বন্ধ করে। ঘুরতে থাকে, আগ পিছু করতে থাকে এমনভাবে চারদিকে পানি ছিটাতে থাকে যে রাজদরবারে গরম পানির ফোটা পড়তে থাকে। বামুন-দের একজন চীৎকার করে নাক ঘষতে থাকে। ছ্যাকা খেয়ে সে ব্যথায় চীৎকার চেপে রাখতে পারে না।

কালো লোকটি গান বন্ধ করে দেয়। মাথাটি পানির মাঝখানে নিশ্চল, মুখমণ্ডল গম্ভীর। কয়েক সেকেণ্ড পর এটা আবার ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে, নামতে থাকে। এটা ওপরে নীচে সাঁতার কাটতে শুরু করে, খুব দ্রুত নয়, কিন্তু অসীম প্রশান্তিতে। উপর নীচ করে তিনবার কড়াইতে পাক খায়। তারপর চোখ মেলে, উজ্জ্বল কালো মণি বের করে গেয়ে উঠে:

রাজার শাসন ছড়িয়ে পড়ে দূর দূরান্তে
জয় করেন চারদিকের শত্রু।
পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে,
কিন্তু তাঁর ক্ষমতা নয়,
তাই আমি এখানে এসেছি উজ্জ্বল আলোয়।
চকচকে তলোয়ার — আমাকে ভুলো না,

রাজদর্শন, কিন্তু কপাল খারাপ।
গান গাও, গাও গান, রাজদর্শন।
ফিরে আস, যেখানে উজ্জ্বল নীল আলো।

মাথাটি হঠাৎ পানির ওপরে থেমে যায়। কয়েকবার ডিগবাজি খাওয়ার পর আবার ওঠা-নামা করতে থাকে, ডাইনে-বাঁয়ে মোহন দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে আর একবার গেয়ে উঠে :

হে, হো, যে ভালোবাসা আমরা জানি।
আমি কাটি একটি মাথা, একটি মাথা হে হো।
একটি মাথা ব্যবহার করি, বেশী নয়,
যে মাথা সে ব্যবহার করে তা অনেক ......।

গানের শেষ কলিতে মাথাটি আবার ডুবে যায়, যেহেতু আর উঠে নি তাই গান অস্পষ্ট হয়ে যায়। গান অস্পষ্ট হয়ে এলে ভাঁটার মত ফুটন্ত জল ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে, শেষ পর্যন্ত কড়াই'র কিনারার নীচে নেমে যায়। দূর থেকে আর কিছু দেখা যায় না।

"ঠিক আছে?" অপেক্ষা করতে করতে রাজা অধৈর্য হয়ে পড়েন।

"মাননীয় রাজা!" লোকটি এক হাঁটু গেঁড়ে বসে। "এটা কড়াই'র তলায় সবচে বিস্ময়কর মিলনের নাচ নাচছে। কাছে না এলে আপনি দেখতে পাবেন না। আমি এটাকে ওপরে আনতে পারি না, কেননা এই মিলনের নাচ কড়াই'র তলায় নাচতে হয়।"

রাজা উঠে সিঁড়ি বেয়ে কড়াই'র কাছে যান। তাপ উপেক্ষা করে দেখার জন্য মাথা ঝুঁকিয়ে দেন। আয়নার মত পরিষ্কার পানি। নিশ্চল মাথাটি সেখান থেকে রাজার দিকে তাকায়। যখন রাজার দৃষ্টি এর ওপর পড়ে তখন একটা মিষ্টি হাসি দেয়। হাসি দেখে রাজার মনে হয় তাদের আগে দেখা হয়েছে। এটা কে হতে পারে? যখন তিনি ভাবছেন, কালো লোকটি পিঠ থেকে নীল তলোয়ারটি এনে বিদ্যুতের মত রাজার ঘাড়ের ওপর চালিয়ে দেয়। ঝুপ করে কড়াইয়ের ভেতর পড়ে যায় রাজার মাথা।

যখন শত্রুরা মিলিত হয়, একনজরে একে অপরকে চিনতে পারে, বিশেষ করে খুব কাছাকাছি হলে। ঠিক যে মুহূর্তে রাজার মাথা পানি স্পর্শ করে, তখন মেই ছিয়ানছি'র মাথা এগিয়ে এসে তাঁর কান কামড়ে দেয়। দুটি মাথা মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হলে কড়াই'র জল টগবগ করে ফুটতে থাকে। প্রায় বিশ বার প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর রাজা পাঁচ জায়গায় এবং মেই জিয়ানছি সাত জায়গায় আহত হয়। দুষ্ট রাজা তার শত্রুর পেছনে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে, আর এক অসতর্ক

মুহূর্তে মেই জিয়ানছি'র ঘাড়ের পেছনে ধরে ফেলে তাই সে আর ঘুরতে পারে না। রেশমী পোকা যেভাবে তুঁতগাছের পাতা চিবিয়ে ধরে রাজা সেভাবে তার দাঁত বসিয়ে দেয়। কড়াই'র বাইরে ছেলেটির আর্ত চীৎকার শোনা যায়।

রানী থেকে শুরু করে ভাঁড় পর্যন্ত সবাই যারা ভয়ে জমে গিয়েছিল — এই চীৎকারে তাদের দেহে প্রাণ ফিরে আসে। তাদের মনে হয় সূর্য অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে। ভয়ে কাঁপতে থাকলেও তারা গোপন আনন্দ অনুভব করে। চোখ বড় করে অপেক্ষা করতে থাকে।

অবাক হয়ে গেলেও, কালো লোকটির চেহারা বদলায় নি। অনায়াসে সে অদৃশ্য তলোয়ার নিয়ে শুকনো ডালের মত হাত তোলে। সামনে ঝুঁকে পড়ে যেন কড়াইতে কিছু দেখছে। হঠাৎ তার হাত বেঁকে যায়, নীল তলোয়ারটি এক ঘায়ে তার মাথা কড়াইতে ফেলে দেয়। বরফের মত সাদা ফেনা চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

তার মাথা পানিতে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে রাজার মাথাকে আক্রমণ করে এবং রাজার নাক কামড়ে ধরে, প্রায় তুলে নেয়ার মত অবস্থা। ব্যথায় রাজা চীৎকার করে ওঠেন। ছাড়া পাবার জন্য মেই জিয়ানছি এই সুযোগ গ্রহণ করে এবং তার চোয়াল টেনে ধরে। তারা সর্বশক্তি দিয়ে উল্টো দিকে টানতে থাকে, তাই রাজা তার মুখ বন্ধ করে রাখতে পারে না। তারপর, ক্ষুধার্ত মুরগী যেভাবে ধানের উপর লাফিয়ে পড়ে সেভাবে তারা রাজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, যে পর্যন্ত রাজার চেহারা চেনার অযোগ্য হয়ে না যায়। প্রথমে রাজা কড়াইতে প্রাণপণ চেষ্টা করে, তারপর পড়ে থেকে কোঁকাতে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত দম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চুপ হয়ে পড়ে।

কালো লোকটি এবং মেই জিয়ানছি কামড়ানো বন্ধ করে দেয়। তাদের শত্রু ভান করছে কি না এটা দেখার জন্য তারা একবার কড়াইয়ের চারদিকে পাক খায়। রাজা মরেছে আশ্বস্ত হয়ে তারা চোখাচোখি করে এবং হাসে। তারপর আকাশের দিকে মুখ করে চোখ বন্ধ করে তারা জলের তলায় ডুবে যায়।

।৪।।

ধোঁয়া সরে যায়, আগুন নিভে যায়। জলের ওপর আর কোন আলোড়ন নেই। অসীম নীরবতা ছোট বড় সকলের হুঁশ ফিরিয়ে আনে। কেউ হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে, তৎক্ষণাৎ ভয়ে অন্য সবাই চেঁচিয়ে ওঠে। কেউ একজন

সোনালী কড়াইয়ের দিকে এগোয়, অন্যেরাও তার পিছু পিছু যায়। যারা পেছনে জড়ো হয়েছে তারা শুধু সামনের লোকজনের ঘাড়ের ফাঁক দিয়ে দেখতে পায়।

আগুনের তাপ তখনো তাদের গালে লাগছে। আয়নার মত স্বচ্ছ পানি এখন তেলচেলে, তাতে সকলের ছায়া পড়েছে : রানী, রক্ষিতা, প্রহরী, পুরনো মন্ত্রী, বামুন, খোজা . . . . . .

"হা, ঈশ্বর! আমাদের রাজার মাথা এখনো ওখানে। কি ভয়ঙ্কর।" ছয় নম্বর রক্ষিতা হঠাৎ ফুঁপিয়ে ওঠে।

রানী থেকে শুরু করে ভাঁড় পর্যন্ত সবাই আতংকগ্রস্ত। তারা ভয়ে ছুটোছুটি করতে থাকে, বৃত্তাকারে দৌড়াতে থাকে। জ্ঞানী বুড়ো উপদেষ্টা একা সামনে এগিয়ে যান এবং কড়াই'র গায়ে হাত রাখেন। তিনি ভয়ে পিছিয়ে আসেন, আঙ্গুল সরিয়ে নেন এবং দুটো আঙ্গুল মুখের কাছে এনে ফুঁ দিতে থাকেন।

শেষ পর্যন্ত হুঁশ ফিরে এলে তারা কেমন করে রাজার মাথা তুলতে হবে তা নিয়ে পরামর্শ করার জন্য রাজ প্রাসাদের সামনে জড়ো হয়। তিন পাত্র জোয়ার রান্না করতে যে সময় লাগে ততক্ষণ পরামর্শ করে। শেষ সিদ্ধান্ত ছিল : বড় রান্নাঘর থেকে তারের চালুনী সংগ্রহ করা এবং রাজকীয় মাথা তোলার জন্য গার্ডদের আদেশ দেয়া।

সহসাই সরঞ্জাম তৈরী হয়ে যায় : তারের চালুনী, ছাঁকনী, সোনালী থালা এবং বুরুশ। সবকিছু রাখা হয় কড়াই'র পাশে। রক্ষীরা হাতা গুটায়। কেউ চালুনী হাতে, কেউ ছাঁকনী হাতে বিনয়ের সঙ্গে দেহাবশেষ তোলার কাজে হাত দেয়। চালুনী একটা আরেকটার সঙ্গে ধাক্কা খায়, কড়াই'র কিনারায় ধাক্কা খায় এবং জল ছিটিকে পড়ে। কিছুক্ষণ পর একজন প্রহরী গম্ভীর মুখে দু'হাতে সতর্কতার সঙ্গে তার চালুনী তোলে। পাত্র থেকে মুক্তোর বিন্দুর মত ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে, তার মধ্যে বরফের মত সাদা একটা খুলি। সবাই যখন বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠে, সে খুলিটি রাখে একটি সোনালী থালার ওপর।

"হায়! আমাদের রাজা!" রানী, রক্ষিতা, মন্ত্রী এবং এমনকি খোজারা পর্যন্ত ফুঁপিয়ে ওঠে। তারা সহসাই থেমে যায় যখন আরেকজন প্রহরী প্রথমটার মত আরেকটি খুলি তোলে।

তারা অশ্রুসজল চোখে ঘর্মাক্ত প্রহরীদের উদ্ধার কাজ দেখতে থাকে। তারপর এক গুচ্ছ সাদা ও কালো চুল, কয়েক চামচ ছোট চুল, নিঃসন্দেহে সাদা ও কালো গোঁফ, উদ্ধার করে। তারপর আরেকটি খুলি। তারপর তিনটি চুলের কাঁটা।

কড়াইতে স্বচ্ছ স্যুপ ছাড়া যখন আর কিছুই নেই তখন তারা থামে এবং তিন সোনালী থালায় জিনিষগুলো ভাগ করে : একটিতে খুলি, একটিতে চুল,

একটিতে চুলের কাঁটা।

"মাননীয় রাজার একটি মাত্র মাথা ছিল। কোনটা তাঁর?" নয় নম্বর রক্ষিতা পাগলের মত জানতে চায়।

হতাশ হয়ে মন্ত্রীরা একে অপরের দিকে তাকায়। "তাইতো . . . . . ."

নতজানু এক বামুন বলে : "চামড়া এবং মাংস সেদ্ধ না হয়ে গেলে কোনটা কার বলা সহজ হত।"

তারা বাধ্য হয়ে খুলিগুলো পরীক্ষা করতে থাকে, কিন্তু আকার ও রঙ প্রায় একই রকম। কোনটি ছেলের তারা তাও চিনতে পারে না। রানী বলেন যুবরাজ থাকা কালীন পড়ে যাওয়ায় রাজার মাথার ডানদিকে একটা কাটা দাগ ছিল, সে দাগ হয়ত এখনো খুলিতে আছে। সত্যি সত্যি, এক বামুন এক খুলিতে এরকম একটি দাগ আবিষ্কার করে এবং সবাই খুশী হয়ে ওঠে। এসময় আরেকটি বামুন আর একটি ঈষৎ হলদে খুলিতে এরকম একটি দাগ আবিষ্কার করে।

"আমি জানি।" খুশীতে বলে তিন নম্বর রক্ষিতা। "আমাদের রাজার নাক ছিল খুব উঁচু।"

খোজারা নাক পরীক্ষা করতে লেগে যায়। সত্যি সত্যি, একটা একটু উঁচু, কিন্তু তাদের মতে পার্থক্য করার তেমন কিছু নেই, কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই বিশেষ খুলিটির ডান দিকে কোন কাটা দাগ ছিল না।

মন্ত্রীরা খোজাদের বলে, "তাছাড়া, রাজার মাথার পেছনের দিকটা কি এত ফোলা ছিল?"

"আমরা কখনো মাননীয় রাজার মাথার পেছনে নজর দেই নি . . . . . ."

রানী এবং রক্ষিতারা তাদের স্মৃতি হাতড়াতে থাকে। কেউ কেউ বলে এটা ছিল ফোলা, কেউ বলে সমান। যে খোজা রাজার চুল আঁচড়িয়েছে তাকে জিজ্ঞেস করলে সে কোন জবাব দেয় না।

সে সন্ধ্যায় রাজার মাথা বাছাই করার জন্য যুবরাজ ও মন্ত্রীদের সভা বসে, কিন্তু দিনের চেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায় না। বাস্তবে, চুল দাড়িও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সাদা নিঃসন্দেহে রাজার, কিন্তু যেহেতু তা ধূসর বর্ণের, তাই কালো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়াও খুব কঠিন। মাঝরাত্রি পর্যন্ত আলোচনার পর তারা কয়েকটি বাদামী দাড়ি সরিয়েছে এমন সময় নয় নম্বর রক্ষিতা প্রতিবাদ করে। সে নিশ্চিত রাজার গোঁফে বাদামী রং দেখেছে, সেক্ষেত্রে তারা কি করে নিশ্চিত হতে পারে একটিও লাল চুল নেই? তাদের সবগুলো একত্র করে ব্যাপারটা অমীমাংসিত রেখে দিতে হয়।

ভোর পর্যন্ত তারা কোন সমাধানে পৌঁছুতে পারে না। হাই তুলতে তুলতে

আলোচনা চালায়। মোরগ যখন দ্বিতীয় বার ডাকে তখন তারা একটি সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছে: কবর দেয়ার জন্য রাজার শরীরের পাশে তিনটি মাথাই সোনালী কফিনের ভেতর রাখা হবে।

এক সপ্তাহ পরে শেষ কৃত্য হয়। পুরো শহর উত্তেজিত হয়ে পড়ে। রাজধানী এবং দূর দূরান্ত থেকে লোক আসে রাজকীয় শেষ কৃত্যে। ভোর হতে না হতেই পথঘাট ভরে যায় নারী পুরুষে। এদের মাঝখানে ভোগের সামগ্রীর টেবিলের চ্যাপ্টা হয়ে যাবার ফলা। দুপুরের একটু আগে অশ্বারোহীরা আসে রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য। তার পরে আসে পতাকা, লাঠি, বর্শা, ধনুক, এর মিছিল, পেছনে পেছনে চারগাড়ী বাদ্যযন্ত্রী। তারপর অসমান মাটিতে ওঠা নামা করতে করতে এগিয়ে আসে হলদে চাঁদোয়া দেয়া গাড়ী। সোনালী কফিন-এর, যার ভেতর রয়েছে তিনটি মাথা ও একটি দেহ, শবযান তৈরী করা সহজ ছিল।

লোকজন নতজানু হয়, ভোগের সামগ্রীর টেবিল চোখে পড়ে। রাজার সঙ্গে দুটি দুষ্ট আত্মা ভোগ গ্রহণ করছে এই কথা ভেবে কোন কোন অনুগত প্রজা রাগে গর গর করতে থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের কিছুই করার নেই।

এর পেছনে আসে রানী ও রক্ষিতাদের বাহন। লোকজন তাদের দিকে তাকায়, তারাও লোকজনের দিকে তাকায়, কিন্তু বিলাপ বন্ধ করে না। তারপর আসে মন্ত্রী, খোজা এবং বামুনরা, তাদের মুখেও বিষাদের ছায়া। কেউ তাদের দিকে সামান্য নজরও দেয় না, এবং তাদের মিছিলে কোন শৃংখলা নেই।

অক্টোবর, ১৯২৬



পেন্সিল অংকন : থাও ইউয়ানছিং

阿Q正傳

巴人

第六章　從中興到末路

在未莊再看見阿Q出現的時候，是剛過了這年的中秋。人們都驚異，說是阿Q回來了，于是又回上去想道，他先前那里去了呢？阿Q以前幾回的上城，大抵早就興高采烈的對人說，但這一次卻並不，所以也沒有一個人留心到。他或者也曾告訴過管土穀祠的老頭子，然而未莊老例，只有趙太爺錢太爺和秀才大爺上城纔算一件事。假洋鬼子尚且不足數，何況是阿Q。因此老頭子也就不替他宣傳，而未莊的社會上也就無從知道了。

但阿Q這回的回來，卻與先前大不同，確乎很值得驚異。天色將黑，他睡眼朦朧的在酒店門前出現了，他走近櫃台，從腰間伸出手來，滿把是銀的和銅的，在櫃上一扔，說，"現錢！打酒

«আ' কিউ'র সত্য ঘটনা»-র পাণ্ডুলিপি

লুস্যুনের

নির্বাচিত গল্পসংকলন

বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়

দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৯

অনুবাদ : মাহফুজ উল্লাহ

প্রকাশনে : বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়

মুদ্রণে : বিদেশী ভাষা মুদ্রণালয়

পরিবেশনায় : চীনা প্রকাশন কেন্দ্র (গুওজি শুডিয়ান)

সচীপত্র

«হে যুদ্ধ স্বাগত» গল্প সংকলনের ভূমিকা

যৌবনে আমারও অনেক স্বপ্ন ছিল। যার অনেককিছু এখন মনে নেই, কিন্তু তা নিয়ে কোন দুঃখবোধ নেই। অতীতের স্মৃতিচারণায় আনন্দ আছে, কিন্তু কখনো কখনো নিজেকে বড় একা মনে হয়। ফেলে আসা নিঃসঙ্গ দিনগুলোকে আঁকড়ে ধরার কোন মানে হয় না। কিন্তু অসুবিধে হচ্ছে আমি পুরোপুরি ভুলে যেতে পারি না। আমার স্মৃতি থেকে যা মুছে ফেলতে পারিনি, তা থেকেই এ গল্পগুলোর জন্ম।

চার বছরেরও বেশী সময় প্রায় প্রতিদিন আমি বন্ধকী কারবারের দোকান ও ঔষধের দোকানে যেতাম। মনে করতে পারি না তখন বয়স কত ছিল। কিন্তু ঔষধের দোকানের কাউণ্টারের উচ্চতা ছিল আমার সমান এবং বন্ধকী কারবারের দোকানের কাউণ্টারের উচ্চতা ছিল আমার দ্বিগুণ। দ্বিগুণ উচ্চতার সেই কাউণ্টারে কাপড় ও গহনা দিয়ে আমি তাদের ঘৃণা-মেশানো টাকা নিতাম এবং সমান উচ্চতার কাউণ্টারে গিয়ে দীর্ঘ অসুস্থ বাবার জন্য ঔষধ কিনতাম। বাড়ীতে ফেরার পর নিজেকে ব্যস্ত রাখার মত অনেক কিছু ছিল। যে ডাক্তার বাবাকে দেখতেন তিনি ছিলেন বহু পরিচিত। তিনি অস্বাভাবিক ঔষধ ব্যবহার করতেন। শীতকালে ঘৃতকুমারীর শেকড়, তিন বছর ধরে শিশির ভেজা আখ, দম্পতি ঝিঁঝিঁ পোকা এবং বীজ পাকা আর্ডিসিয়া . . . . . . যেগুলো সংগ্রহ করা ছিল কষ্টসাধ্য। কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত বাবার শরীর দিন দিন খারাপ হতে থাকে।

আমি বিশ্বাস করি যারা বিত্ত থেকে দারিদ্রে নেমে আসে, তারা বুঝতে পারবে সংসার কি ? আমি N -এ K স্কুলে[1] যেতে চেয়েছিলাম, সম্ভবতঃ পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য। যাতায়াতের জন্য আট টাকা জোগাড় করা এবং যা খুশী করতে দেয়া ছাড়া মায়ের কিছুই করণীয় ছিলনা। মা যে কেঁদেছেন সেটা স্বাভাবিক। কেননা সে সময় চিরায়ত সাহিত্য পড়া এবং রাজকীয় পরীক্ষা দেয়াই

ছিল উত্তম ব্যবস্থা। যে কেউ 'বিদেশী বিষয়' পড়েছে, সবাই তাকে নিষ্কর্মা হিসেবে খাটো করে দেখেছে, — যে হতাশায় বাধ্য হয়ে বিদেশী শয়তানদের কাছে আত্মা বিক্রী করেছে। আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ির দুঃখও মায়ের ছিল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আমি N -এ গিয়ে K স্কুলে ভর্তি হই। সেখানেই প্রথমবারের মত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অংক, ভূগোল, ইতিহাস, ছবি আঁকা এবং শারীরিক শিক্ষার মত বিষয়গুলোর নাম শুনি। শরীরতত্ত্ব সম্পর্কে সেখানে কোন কোর্স ছিলনা। কিন্তু সেখানেই «মানবদেহ সম্পর্কে নতুন পাঠ» এবং«রসায়ন ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে রচনা»র কাঠের সংস্করণ আমরা দেখতে পাই। আমার চেনা ডাক্তারের কথা'ও ব্যবস্থাপত্র মনে করে এবং এখন যা জানি তার সঙ্গে তা মিলিয়ে আমি বুঝতে পারি এরা হয়ত বোকা নয়ত হাতুড়ে ডাক্তার। এদের হাতে নিগৃহীত পঙ্গু ও পরিবারগুলোর জন্য আমি সমবেদনা বোধ করতে থাকি। অনূদিত ইতিহাস থেকে আমি জানতে পারি পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের ফলে ব্যাপকভাবে জাপানে সংস্কার শুরু হয়েছে।

এই তুচ্ছ জ্ঞানই আমাকে জাপানের একটি প্রাদেশিক মেডিকেল কলেজে নিয়ে যায়। আমি স্বপ্ন দেখতাম চীনে ফিরে এসে বাবার মত ভুল চিকিৎসার শিকার রোগীদের সারিয়ে তুলব। যুদ্ধ বাঁধলে সেনাবাহিনীর ডাক্তার হিসেবে কাজ করব এবং একই সময়ে সংস্কারে দেশবাসীর বিশ্বাস জাগিয়ে তুলব।

জানি না মাইক্রোবায়োলজি পড়ানোর জন্য আজ কি ধরণের আধুনিক ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তখন জীবাণু দেখানোর জন্য লণ্ঠন স্লাইড ব্যবহার করা হোত এবং তাড়াতাড়ি বক্তৃতা শেষ হলে সময় কাটানোর জন্য শিক্ষক প্রাকৃতিক দৃশ্য বা খবরের স্লাইড ব্যবহার করতেন। তখন জাপান-রাশিয়া যুদ্ধ চলছে। কাজেই যুদ্ধের প্রচুর ছবি ছিল এবং অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে বক্তৃতা কক্ষে আমাকেও হাততালি ও আনন্দে যোগ দিতে হত। দীর্ঘদিন কোন দেশ-বাসীকে আমি দেখি নি। কিন্তু একদিন একটি ছবিতে বেশকিছু চীনা দেখি, যাদের একজন বন্দী এবং তার পাশে বেশকিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে। তারা শক্তসমর্থ মানুষ কিন্তু উদাস। ধারাবর্ণনা অনুযায়ী বন্দী লোকটি রাশিয়ার গুপ্তচর, অন্যদের প্রতি হুঁশিয়ারি হিসেবে জাপানী সৈন্যরা যার মাথা কেটে ফেলবে। সেখানে সমবেত চীনারা এই মজা দেখতে এসেছে।

পড়া শেষ না করেই আমি টোকিও'র উদ্দেশে যাত্রা করি। কেননা এ ছবি দেখার পর মনে হয় চিকিৎসা বিজ্ঞান আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। একটি দুর্বল এবং অনুন্নত দেশের লোক যত শক্তসমর্থই হোক না কেন, উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে অথবা এ ধরণের ব্যর্থ পরীক্ষার সাক্ষী হতে পারে। এদের কতজন

অসুস্থতায় মারা যায় তাতে কিছু যায় আসে না। সেজন্যে সবচে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন। সেই থেকে উপলব্ধি করি এ ব্যাপারে সাহিত্যই হচ্ছে সবচে উত্তমপন্থা এবং আমি একটি সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেই। বহু চীনা ছাত্র টোকিওতে আইন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান. পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন এমনকি পুলিশীকাজ ও প্রকৌশলবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছিল কিন্তু শিল্প-সাহিত্য কারো বিষয় ছিল না। যাহোক, এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও কিছু সমমনার সঙ্গে আমার দেখা হয়। প্রয়োজনীয় কয়েকজনের সঙ্গে আমরা মিলিত হই। আলোচনার পর ঠিক হয় আমাদের প্রথম কাজ পত্রিকা প্রকাশ করা, যার নাম থেকে বোঝা যায় এটা নতুন জন্ম। তখন প্রাচীনপন্থী ছিলাম বলে এর নাম দেই «নতুন জীবন»।

প্রকাশনার সময় ঘনিয়ে আসতেই আমাদের কিছু লেখক পিছিয়ে পড়ে এবং তার পর তহবিল প্রত্যাহার করা হয়। শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে কপর্দকহীন তিনজন। অশুভ সময়ে আমরা পত্রিকার কাজ শুরু করেছি বলে ব্যর্থতার সময় কারো কাছে অভিযোগ করতে পারি নি। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা তিনজন আলাদা হয়ে পড়ি এবং রঙীন ভবিষ্যতের কল্পনা শেষ হয়ে যায়। এ ভাবেই «নতুন জীবনের» অপমৃত্যু ঘটে।

সে সময়ে আমি আসলে কিছুই বুঝতাম না। শুধু পরবর্তী পর্যায়ে এর অসাড়তা উপলব্ধি করতে পারি। পরে বুঝতে পারি কারো আকাংক্ষাকে যদি সমর্থন করা হয় তাহ'লে তা তাকে অনুপ্রাণিত করে, কিন্তু ঐ আকাংক্ষার বিরোধিতা করা হ'লে তা তাকে প্রতিরোধী ক'রে তোলে। কিন্তু সবচে বড় ব্যর্থতা হচ্ছে তার সোচ্চার কণ্ঠ যদি সমর্থন বা বাধা না পায়। এ হচ্ছে বিশাল মরুভূমিতে অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকা। তাই আমি নিঃসঙ্গ বোধ করতে শুরু করি।

এবং এই ক্রমবর্ধমান নিঃসঙ্গতা আমার হৃদয়কে বিষাক্ত সাপের মত জড়িয়ে ধরে।

বিশাল দুঃখবোধ সত্ত্বেও আমার কোন ক্ষোভ ছিলনা। কেননা এই অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারি আমি সে ধরণের বীর পুরুষ নই যার আহ্বানে লক্ষ জনতা সমবেত হয়।

কিন্তু এই যন্ত্রণাদায়ক নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে ওঠা দরকার ছিল। তাই আমার অনুভূতি ভোঁতা করে দেয়ার জন্য একই সঙ্গে অতীতের দিকে তাকিয়ে এবং বর্তমানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমি বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করি। পরবর্তীতে আরো বিশাল নিঃসঙ্গতা ও দুঃখবোধ আমাকে পেয়ে বসে। তা আমি স্মরণ করতে চাইনা। আশা করি আমার সঙ্গেই এর পরিসমাপ্তি ঘটবে। তবু আমার অনুভূতিকে

ভোঁতা করে দেয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি—আমি যৌবনের উৎসাহ উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলি।

কথিত আছে S —হোষ্টেলের তিন কামরার একটিতে এক মহিলা থাকতেন। তিনি উঠোনের লোকাস্ট গাছে গলায় দড়ি দিয়েছিলেন। গাছটি এত বড় হয়েছিল যে ডাল ছোঁয়া যেতনা, কিন্তু কামরাগুলো ছিল জনশূন্য। পুরনো লিপি নকল করার জন্য আমি কয়েকবছর সেখানে থাকি। আমার অতিথির সংখ্যা ছিল নগণ্য। সে সব লিপিতে কোন রাজনৈতিক প্রশ্ন বা সমস্যা ছিল না। আমার একমাত্র আশা ছিল এধরণের শান্তিপূর্ণ জীবন কাটানোর। গরমের রাতে মশা বেড়ে গেলে আমি লোকাস্ট গাছের নীচে গিয়ে বসতাম। পাখা নাড়তে নাড়তে পাতার ফাঁক দিয়ে আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম আর বরফের মত ঠাণ্ডা শুয়া পোকা এসে পড়তে আমার ঘাড়ে।

মাঝে মাঝে কথা বলার জন্য আসত আমার একমাত্র অতিথি ও পুরনো বন্ধু জিন সিনই ভাঙ্গা টেবিলের ওপর ব্যাগ রেখে সে তার লম্বা গাউন খুলত। তার পর আমার মুখোমুখি বসত। এমনভাব দেখাত যে কুকুরের তাড়া খেয়ে তখনো তার বুক ধুক ধুক করছে।

আমি যেসব লিপি নকল করেছি তা দেখে একরাতে সে জানতে চায়, "এসব লিপি নকল করে কি লাভ?"

"কোন লাভ নেই।"

"তাহলে নকল করছ কেন?"

"বিশেষ কোন কারণ নেই।"

"আমি ভাবছি তুমি হয়ত কিছু লিখবে ......"

আমি বুঝতে পারলাম তারা«নতুন যৌবন»[2] পত্রিকা সম্পাদনা করছে। কিন্তু এ পর্যন্ত পক্ষে বা বিপক্ষে কোন প্রতিক্রিয়া না থাকায় নিঃসঙ্গ বোধ করছে। আমি বললাম :

"জানালাবিহীন একটি লোহার বাড়ীর কথা চিন্তা কর যা ধ্বংস করা যায় না। এর ভেতরে বহু লোক গভীর ঘুমে অচেতন যারা সহসা দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে। কিন্তু তুমি জান, যেহেতু তারা ঘুমের মধ্যে মারা যাবে তাই মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করবে না। তুমি যদি এখন হাল্কা ঘুমের কয়েকজনকে জাগানোর জন্য চীৎকার কর এবং অন্যান্য হতভাগ্যদের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে দাও, তাহলে কি তুমি তাদের উপকার করছ?"

"যদি কয়েকজন জেগে ওঠে, তাহলে তুমি বলতে পার না যে লোহার বাড়ী

ভেঙ্গে ফেলার কোন আশা নেই।"

সত্যি বলতে কি, আপন বিশ্বাস সত্ত্বেও আমি আশা ছাড়িনি কেননা ভবিষ্যতের মধ্যেই আশা নিহিত। তার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়ার জন্য নিজে কোন প্রমাণ হাজির করতে পারিনি। তাই লিখতে রাজী হই এবং আমার প্রথম গল্প «এক পাগলের ডায়েরী»। সেই থেকে আমি লেখা বন্ধ করতে পারিনি। এবং এই সংখ্যা একডজন না হওয়া পর্যন্ত বন্ধুদের অনুরোধে সময় সময় কোন না কোন গল্প লিখেছি।

আমার কথা বলতে গেলে, নিজেকে প্রকাশ করার জন্য আমি আর কোন বিশেষ প্রেরণা অনুভব করিনা, সম্ভবতঃ অতীতের নিঃসঙ্গতার বেদনা পুরোপুরি ভুলতে পারিনি বলে। নিঃসঙ্গতার বিরুদ্ধে যারা লড়ছে তারা যাতে সাহস না হারায় সে জন্যে মাঝে মাঝে চীৎকার করে সাহস জোগাই। আমার সে চীৎকার সাহসের না বেদনার, বিরক্তিকর না হাস্যকর তাতে পরোয়া করি না। যেহেতু এটা যুদ্ধের আহ্বান, তাই আমাকে সেনাপতির আদেশ মানতেই হবে। এজন্যে আমি মাঝে মাঝে কটাক্ষ করি। যেভাবে আমি «ঔষধ» গল্পে পুত্রের কবরে পরিচয়হীন পুষ্পমাল্য এনেছি বা «আগামী কাল» গল্পে বলিনি যে চার নম্বর শানের স্ত্রীর ছোট্ট ছেলে সম্পর্কে কোন স্বপ্ন ছিল না। কেননা তখন আমাদের নেতারা ছিলেন হতাশাবাদ বিরোধী। এবং যে যুবকরা সুখস্বপ্ন দেখছে তাদের নিঃসঙ্গতার বেদনা দিয়ে ভরিয়ে দিতে চাইনি কেননা যৌবনে আমিও সুখস্বপ্ন দেখেছি।

তাই এটা পরিষ্কার যে আমার গল্পগুলো শিল্পকর্ম নয়। এগুলো এখনো গল্প হিসেবে পরিচিত এবং একটি বইয়ে সংকলিত হচ্ছে বলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। যদিও এই সৌভাগ্যে আমি অস্বস্তি বোধ করি, তথাপি এইজন্যে ভালো লাগে যে নিদেনপক্ষে মানব সংসারে তার পাঠক রয়েছে।

যেহেতু উল্লিখিত কারণে আমার এই ছোট গল্পগুলো একটি সংকলনে পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে, তাই আমি নাম দিয়েছি«হে যুদ্ধ স্বাগত»।

ডিসেম্বর ৩, ১৯২২, বেইজিং

টীকা

1. নানজিং-এ জিয়াংনান নৌ একাডেমী।
2. «নতুন যৌবন» , সে সময়ের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে সবচে প্রভাবশালী পত্রিকা।

এক পাগলের ডায়েরী

তারা দুই ভাই হাইস্কুলে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তাদের নাম এখানে বলার দরকার নেই। বহু বছরের ব্যবধানে আমাদের যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যায়। কিছু-দিন আগে জানতে পারি তাদের একজন গুরুতর অসুস্থ। পুরনো বাড়ী যাবার পথে যাত্রাবিরতি করে তাদের দেখতে যাই। একজনের সঙ্গেই শুধু আমার দেখা হয়। সে জানায় তার ছোট ভাই পঙ্গু।

সে বলে: "এতখানি পথ কষ্ট করে আমাদের দেখতে এসেছ বলে খুশী হয়েছি, আমার ভাই কয়েকদিন আগে সেরে উঠেছে এবং সরকারী কর্মোপলক্ষে অন্যত্র চলে গিয়েছে।" তার পর হাসতে হাসতে তার ভাইয়ের দুটি ডায়েরী বের করে সে বলে এগুলো থেকে তার অসুস্থতা বুঝতে পারবে। পুরনো বন্ধুকে এগুলো দেখালে কোন ক্ষতি নেই। আমি ডায়েরীগুলো নিয়ে আসি এবং ভালো করে পড়ে দেখি। দেখতে পাই সে একধরনের মানসিক উৎপীড়নে ভুগেছে। লেখাগুলো বিভ্রান্তিকর এবং অসঙ্গতিপূর্ণ এবং সে বহু আজগুবী মন্তব্য করেছে। উপরন্তু তারিখ লেখার কথা ভুলে গেছে। একমাত্র কালির ভিন্নতা এবং লেখার পার্থক্য থেকে বোঝা যায় এগুলো একই তারিখের লেখা নয়। কিছু অংশ মোটেই বিচ্ছিন্ন নয় এবং চিকিৎসা গবেষণার জন্য আমি কিছু অংশ নকল করেছি। আমি ডায়েরীর কোন অযৌক্তিকতা পরিবর্তন করি নি। শুধু নাম বদলেছি। অবশ্য এরা সবাই এ সংসারে গুরুত্বহীন অপরিচিত গেঁয়ো লোক। সুস্থ হয়ে ওঠার পর লেখক নিজেই ডায়েরীর শিরোনাম ঠিক করেছেন, তাই আমি বদলাই নি।

১

আজ রাতে চাঁদের আলোয় বান ডেকেছে। ত্রিশ বছরেব বেশী তা দেখি নি। আজ রাতে এ জ্যোৎস্না দেখে মন ভরে গেছে। মনে হচ্ছে গত ত্রিশ বছর ধরে অন্ধকারে ছিলাম। এখন আমাকে খুব সতর্ক হতে হবে। না হলে যাও বাড়ীর কুকুরটি আমার দিকে দু'বার তাকাবে কেন?

আমার ভয়ের কারণ আছে।

২

আজ রাতে কোন চাঁদ নেই। জানি এটা অমঙ্গলের প্রতীক। আজ সকালে যখন সাবধানে বাইরে গেছি তখন যাও সাহেব এমন অদ্ভুতভাবে তাকালেন যেন তিনি আমার ভয়ে ভীত, যেন আমাকে খুন করতে চান। ধরা পড়ার ভয়ে সেখানে আরো সাত আট জন আমার সম্পর্কে ফিসফিসিয়ে আলাপ করছিল। যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তারা সবাই ঐ ধরণের। তাদের মধ্যে সবচে হিংস্র ব্যক্তি আমাকে দেখে ভেংচি কেটেছে। তাদের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে বুঝতে পেরে ভয়ে আমার আপাদমস্তক কাঁপতে থাকে।

যাহোক, আমি নির্ভয়ে চলতে থাকি। সামনে একদল ছেলেমেয়েও আমাকে নিয়ে আলাপ করছিল। তাদের চোখের দৃষ্টি ঠিক মিঃ যাও-এর মত এবং মুখমণ্ডলও বিমর্ষ। বুঝতে পারিনা কেন তারা এ ধরনের ব্যবহার করছে। "বল, কি হয়েছে!" চীৎকার না করে পারলাম না। কিন্তু তারা পালিয়ে যায়।

বুঝতে পারি না আমার সঙ্গে মিঃ যাও বা রাস্তার লোকজনের কিসের শত্রুতা। শুধু মনে পড়ে বিশ বছর আগে মিঃ গু জিউ-র পুরনো ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করেছি এবং তাই নিয়ে মিঃ গু অসন্তুষ্ট ছিলেন। মিঃ যাও তাঁকে জানেন না, কিন্তু হয়ত শুনে থাকবেন। তাই প্রতিশোধ নেয়ার জন্য রাস্তার লোকজনের সঙ্গে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। কিন্তু বাচ্চাদের ব্যাপারটা কি? সে সময় তাদের জন্ম হয়নি। আজ তারা এমন অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকাবে কেন? যেন আমাকে ভয় পায়, যেন আমাকে খুন করতে চায়। এই বিভ্রান্তি ও বিপর্যয় আমাকে সত্যিই ভয় পাইয়ে দেয়।

আমি জানি। তারা নিশ্চয়ই তাদের বাপ মায়ের কাছ থেকে এ সব শিখে থাকবে।

৩

রাতে ঘুমোতে পারি না। কোন কিছু বুঝতে হলে ভালোভাবে ভেবে দেখা দরকার।

ম্যাজিস্ট্রেট যাদের শূলে চড়িয়েছে, বদমাতব্বররা যাদের চড় মেরেছে, দারোগা-পুলিশ যাদের বউ কেড়েছে, পাওনাদাররা যাদের বাপ-মা'কে গলায় দড়ি দিতে বাধ্য করেছে তাদেরকে আর কখনো কালকের মত এত ভীত ও মারমুখী দেখায় নি।

সবচে অস্বাভাবিক ব্যাপার হচ্ছে রাস্তার সেই মেয়েলোকটি। ছেলের পাছায় চড় মেরে সে বলেছে : "ছোট্ট শয়তান। আমার ইচ্ছে করে তোর শরীর থেকে মাংস কামড়ে খেতে!" তবু সারাক্ষণ সে আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমি বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম ; তারপর সেই হোঁদল, দাঁতাল লোকগুলো উপহাস করতে থাকে। বুড়ো ছেন এগিয়ে এসে আমাকে বাড়ীতে নিয়ে আসে।

সে আমাকে বাড়ী নিয়ে এসেছে। বাড়ীতে জ্ঞাতি গোষ্ঠীর এমন ভাব যে আমাকে চেনে না। অন্যদের মত তাদের চোখেও একই দৃষ্টি। যখন পড়ার ঘরে যাই এমনভাবে দরজা বন্ধ করেছে যেন হাঁস মুরগী খোঁয়াড়ে পুরছে। এ ঘটনা আমাকে আরো বিভ্রান্ত করে দেয়।

কয়েকদিন আগে 'নেকড়ের বাচ্চা' গ্রাম থেকে আমাদের এক ভাড়াটে শস্যহানির খবর জানাতে এসেছিল। বড়দা'কে জানায় তাদের গ্রামে এক দুষ্ট লোককে পিটিয়ে মারা হয়েছে। তারপর একদল লোক সাহস বাড়ানোর জন্য তার কলজে তেলে ভেজে খেয়েছে। বাধা দিতেই বড়দা' এবং ভাড়াটে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকায়। শুধু আজকেই বুঝতে পেরেছি বাইরের লোকদের মত তাদের চোখেও একই দৃষ্টি ছিল।

শুধু এ কথা ভাবলেই ভয়ে মাথা থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত কাঁপতে থাকে।

তারা মানুষ খেকো, তাই আমাকেও খেয়ে ফেলতে পারে।

বুঝতে পারি সেই মহিলার "মাংস কামড়ে খাওয়া" সেই হোঁদল, দাঁতাল লোকদের অট্টহাসি এবং ভাড়াটের গল্প সবই গোপনসংকেত। বুঝতে পারি তাদের কথা বিষাক্ত, হাসি ছুরির মত। তাদের দাঁত সাদা ও ঝকঝকে, তারা সবাই মানুষ খেকো।

যদিও আমি লোকটা মন্দ নই, আমার মনে হয় যে থেকে আমি মিঃ গু-র ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি সেই থেকে ব্যাপারটা শত্রুতায় দাঁড়িয়েছে। তাদের এমনসব গোপন কথা আছে যা আমি অনুমান করতে পারি না। একবার

রেগে গেলে তারা যে কাউকে মন্দ লোক বলে গাল দেবে। আমার মনে পড়ে যখন বড়দা' আমাকে রচনা লিখতে শিখিয়েছেন তখন কার কথা. যত ভাল লোক হোক না কেন আমি উল্টো যুক্তি দিলে তিনি সায় দিতেন। মন্দ লোকদের ক্ষমা করলে বলতেন, "খুব ভাল হয়েছে, এতে মৌলিকত্ব আছে।" তাদের গোপন চিন্তা অনুমান করব কেমন করে — বিশেষ করে যখন তারা মানুষ খেতে রাজী?

কোন কিছু বুঝতে হলে ভালোভাবে ভেবে দেখা দরকার। মনে পড়ে অতীতে মানুষ প্রায়ই মানুষের মাংস খেত, কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাছে অস্পষ্ট। ব্যাপারটা খুঁজে দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার ইতিহাসের কোন দিনপঞ্জী নেই এবং পাতায় পাতায় লেখা আছে "সততা ও নৈতিকতা।" ঘুমোতে পারি না বলে আমি ইচ্ছে করে মাঝরাত অবধি পড়াশোনা করি। যতক্ষণ না দৃষ্টি গুলিয়ে যায় এবং পুরো বইতে ভেসে ওঠে দুটি শব্দ "মানুষ খাও।"

বইয়ে লেখা সমস্ত শব্দ, আমাদের ভাড়াটের সকল কথা হেঁয়ালি হাসি হেসে আমার দিকে অবাকভাবে তাকিয়ে থাকে।

আমিও একজন মানুষ এবং তারা আমাকে খেতে চায়।

8

সকালে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলাম। বুড়ো ছেন খাওয়া দিয়ে যায়: এক বাটি তরকারী, এক বাটি সেদ্ধ মাছ। মাছটির চোখ শক্ত এবং বিবর্ণ, মুখটা মানুষ-খেকো মানুষদের মত হা করা। কয়েক লোকমার পর আর বুঝতে পারি নি তা মাছ না মানুষের মাংস। তাই সবকিছু বমি করে দেই।

আমি বললাম: "বুড়ো ছেন, দাদাকে গিয়ে বল আমার দম আটকে আসছে, তাই বাগানে একটু বেড়াতে চাই।" বুড়ো কিছু না বলে চুপচাপ চলে যায়। একটু পরে ফিরে এসে গেট খুলে দেয়।

আমি নড়ি নি। কিন্তু দেখতে চেয়েছি তারা কেমন ব্যবহার করে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল তারা যেতে দেবে না। সত্যিই তাই। ধীরে ধীরে দাদা এলেন একজন বয়স্ক লোককে সঙ্গে করে। তাঁর চোখে খুনীর দৃষ্টি। দেখে ফেলব ভয়ে তিনি মাথা নুইয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে চুরি করে আমাকে দেখতে থাকেন।

দাদা বললেন: "তোমাকে আজ খুব ভালো দেখাচ্ছে।"

আমি জবাব দিলাম: "হ্যাঁ।"

তিনি বললেন: "তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য আজ মিঃ হো'কে এনেছি।"

আমি বললাম : "ঠিক আছে।" আসলে আমি ভালোভাবেই জানতাম এই বুড়ো ছদ্মবেশী কসাই। সে নাড়ী দেখার ভান করেছে আমার শরীরে মাংসের পরিমাণ জানার জন্যে ; এতে সে আমার মাংসের ভাগ পাবে। তবু আমি ভয় পাই নি। যদিও আমি মানুষ খেকো নই, আমার সাহস তাদের চেয়ে বেশী। সে কি করে দেখার জন্য আমি হাতজোড়া বাড়িয়ে দিলাম। বুড়ো বসল, চোখ বন্ধ করল, কিছুক্ষণ আবোলতাবোল বকল, কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তার পর উল্টানো চোখ মেলে বলল : "কল্পনার জগতে ভেসে বেড়াবে না। কয়েক-দিন চুপচাপ বিশ্রাম নাও, তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

কল্পনার জগতে ভেসে বেড়াবে না। চুপচাপ কয়েকদিন বিশ্রাম নাও। যেহেতু আমি মোটাতাজা হয়েছি, তাই তারা বেশী খেতে পাবে। কিন্তু তাতে আমার কি লাভ? অথবা সবকিছু 'ঠিক' হয়ে যাবে কি ভাবে? এসব লোকজন মানুষের মাংস খেতে চায়, আবার মনের ভাব লুকিয়ে রাখতে চায়। জলদি কাজ করারও সাহস নেই। এসব দেখে শুনে আমার হাসতে হাসতে মরে যাবার দশা। আমার এমন মজা লেগেছে আমি হাসিতে ফেটে পড়ি। আমি জানতাম এ হাসিতে সাহস এবং সততা আছে। আমার সাহস ও সততায় দাদা ও বুড়ো দুজনের মুখ শুকিয়ে যায়।

কিন্তু যেহেতু আমি সাহসী, তাই তারা আমাকে খেতে আরো বেশী আগ্রহী, আমার কিছু সাহসে ভাগ বসানোর জন্য। বুড়ো গেটের বাইরে চলে যায়। কিন্তু বেশী দূর যাবার আগে দাদাকে চুপিচুপি বলে : "এখনই খেয়ে ফেলতে হবে।" দাদাও সায় জানান। সুতরাং তুমিও এর সঙ্গে জড়িত! বেদনাদায়ক হলেও এই বিস্ময়কর আবিষ্কার আমার প্রত্যাশার বাইরে নয় ; আমাকে খেয়ে ফেলার দোসর আমার দাদা!

আমার দাদা মানুষ খেকো!

আমি মানুষ খেকো'র ছোট ভাই!

অন্যরা আমাকে খেয়ে ফেলবে, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আমি মানুষ খেকো'র ছোট ভাই।

৫

গত কয়েকদিন ধরে আবার ভাবছি : যদি সেই বুড়ো ছদ্মবেশী কসাই না হয়ে সত্যি ডাক্তার হয় ; তাহলেও সে মানুষ খেকো হবে। তার পূর্বসূরী লি

শিয়েন[1] -এর লেখা ভেষজবিদ্যা বইতে পরিষ্কার লেখা আছে সেদ্ধ করে মানুষের মাংস খাওয়া যায় ; তাই সে কি বলতে পারে সে মানুষ খায়না ?

দাদাকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। আমাকে পড়ানোর সময় তিনি নিজ মুখে বলেছেন : "খাওয়ার জন্য লোকজন সন্তান বিনিময় করে।"[2] একবার এক মন্দ লোক সম্পর্কে বলার সময় তিনি বলেছেন তাকে শুধু খুন করাই উচিত নয়, তার "মাংস খেয়ে ফেলা এবং চামড়ার ওপর ঘুমানো উচিত।" আমার তখনো বয়স কম এবং কিছুক্ষণ বুক কাঁপতে থাকে। সেদিন 'নেকড়ের বাচ্চা' গ্রামের ভাড়াটে একজনের কলজে খেয়ে ফেলার যে গল্প বলেছে তাতে তিনি মোটেও অবাক হননি, বরং সায় দিয়েছেন। তিনি আগের মতই নিষ্ঠুর। যেহেতু "সন্তান বিনিময়" সম্ভব তাই যে কোন কিছু বিনিময় করা যায়, যে কোন লোককে খাওয়া যায়। অতীতে শুধু তাঁর ব্যাখ্যা শুনেছি, তাতে কান দেইনি। এখন বুঝতে পারি যখন তিনি এসব বলতেন তখন তাঁর ঠোঁটের কোণে শুধু মানুষের চর্বিই লেগে থাকতনা, তাঁর সমস্ত হৃদয় তৈরী হয়ে থাকত মানুষ খাওয়ার জন্য।

৬

গভীর অন্ধকার। জানিনা এখন দিন না রাত। যাও বাড়ীর কুকুরটি আবার ডাকছে।

সিংহের হিংস্রতা, খরগোশের ভীরুতা, শেয়ালের ধূর্ততা . . . . . .

৭

আমি তাদের ব্যাপারটা জানি। তারা সোজাসুজি কাউকে খুন করতে চায় না, পরিণতির ভয়ে সাহসও করেনা। অপরদিকে আমাকে আত্মহননে বাধ্য করতে তারা দল পাকিয়েছে এবং সর্বত্র জাল ফেলেছে। কয়েকদিন আগে রাস্তায় লোকজনের ব্যবহার এবং গত কয়েকদিনে দাদার মনোভাব থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাদের সবচে বেশী পছন্দ হচ্ছে একজন লোক তার বেল্ট খুলে কড়িকাঠের সঙ্গে গলায় দড়ি দেবে। তাহলেই তারা খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত না হয়ে মনের ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে। স্বভাবতঃই তারা এতে

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। অপরদিকে ভয়ে বা চিন্তায় কেউ শুকিয়ে মরলেও তাদের আপত্তি নেই।

তারা শুধু মরা মাংস খায়! হিংস্র প্রাণী হায়েনার কথা, যা সবসময় মরা মাংস খায়, কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ে। এমনকি বড় হাড্ডিও এটা চিবিয়ে গিলে ফেলে ; শুধু এই ভাবনাই আমাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট। "হায়েনার" সঙ্গে নেকড়ের সম্পর্ক আছে এবং নেকড়ে কুকুর-প্রজাতির। আরেকদিন যাও বাড়ীর কুকুর আমার দিকে কয়েকবার তাকিয়েছে ; নিঃসন্দেহে এটাও ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে তাদের দোসর হয়েছে। বুড়োর চোখ ছিল নীচের দিকে, কিন্তু তা আমাকে প্রতারণা করেনি।

সবচে শোচনীয় অবস্থা দাদার। তিনিও মানুষ। তিনি কেন ভয় পান না? আমাকে খেয়ে ফেলার জন্য কেন তিনি অন্যের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছেন? একবার অভ্যাস হয়ে গেলে তিনি আর অপরাধের কথা ভাবেন না? অথবা মন্দ কাজ করার জন্য তিনি কি তাঁর হৃদয়কে নিষ্ঠুর বানিয়ে ফেলেছেন?

মানুষ খেকোদের অভিশাপ দেয়ার সময় দাদাকে দিয়েই শুরু করব। মানুষ খেকোদের বিরত করার সময়ও তাঁকে দিয়েই শুরু করব।

৮

আসলে অনেক আগেই এ সব যুক্তি তাদের মেনে নেয়া উচিত ছিল ......

হঠাৎ কেউ এল। তার বয়স মাত্র বিশ। আমি তার চেহারা ভালোভাবে দেখিনি। তার মুখে ছিল হাসি, কিন্তু যখন সে আমাকে স্বাগত জানায় তখন তা সত্যি মনে হয়নি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, "মানুষ খাওয়া কি ঠিক?" হাসতে হাসতে সে জবাব দিল : "দুর্ভিক্ষ না থাকলে কেউ মানুষ খায় কি করে?"

তখনি বুঝতে পারি সে তাদের একজন। তবু সাহস সঞ্চয় করে আবার প্রশ্ন করি :

"এটা কি ঠিক?"

"তুমি এসব জিজ্ঞেস করছ কেন? তুমি সত্যিই ...... ঠাট্টা করতে ভালবাস ...... আজ খুব চমৎকার দিন।"

আজ খুব চমৎকার দিন, চাঁদ খুব উজ্জ্বল। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে চাই : "এটা কি ঠিক?"

তাকে উত্তেজিত মনে হল এবং সে বিড়বিড়িয়ে বলল, "না ......"

"না? তাহলে তারা এখনো তা করছে কেন?"

"তুমি কিসের কথা বলছ?"

"আমি কিসের কথা বলছি? এখন তারা 'নেকড়ের বাচ্চা' গ্রামে মানুষ খাচ্ছে এবং দেখ গোটা বইতে তা নতুন লাল কালিতে লেখা আছে।"

তার মুখের ভাব বদলে বিবর্ণ হয়ে যায়। আমার দিকে তাকিয়ে বলে: "এটা হতে পারে। সবসময়ই এরকম ছিল ......"

"সবসময় এরকম ছিল বলেই কি এটা ঠিক?"

• "তোমার সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলতে চাইনা। তোমার এসব নিয়ে কথা বলা উচিত নয়। যে কেউ এসব নিয়ে কথা বলে সে ভুল করছে।"

লাফিয়ে উঠে চোখ বড় করে তাকাই। কিন্তু লোকটি হাওয়া হয়ে গেছে। ঘামে আমার গা ভিজে গেছে। সে দাদার চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু সেও এর সঙ্গে জড়িত। নিশ্চয়ই বাবা-মা তাকে এসব শিখিয়েছে। এবং আমার ভয় হয় সে তার ছেলেকেও শিখিয়েছে, তাই ছেলেমেয়েরাও এমন মারমুখী হয়ে আমার দিকে তাকায়।

৯

মানুষ খেতে চাওয়া, একই সঙ্গে নিজেরাও খাবার হয়ে খাবার ভয়। তাই তারা একে অপরের দিকে গভীর সন্দেহের চোখে তাকায় ......

জীবন কত আরামদায়ক হত যদি তারা এই মোহ থেকে মুক্তি পেয়ে কাজে যেতে পারত, হাঁটতে পারত এবং আয়েসে খেতে ও ঘুমোতে পারত। তাদের সামনে এই একটি পথই খোলা। তবু এই পথে যেতে একে অপরকে বাধা দিয়ে পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, ভাই, বন্ধু, ছাত্র-শিক্ষক, জাত শত্রু এবং এমনকি অচেনা ব্যক্তি সবাই এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে।

১০

আজ খুব ভোরে দাদার খুঁজে গিয়েছিলাম। তিনি হলঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছিলেন। তাঁর পিছু পিছু গিয়ে দরজা ও তাঁর মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়াই। তার পর অসীম বিনয়ের সঙ্গে বলি:

"দাদা, তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।"

দ্রুত আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন: "কি?"

"খুব সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু বলতে আমার কষ্ট হয়।দাদা, সম্ভবতঃ শুরুতে সব আদিম মানুষই অল্পসল্প মানুষের মাংস খেত। পরে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাওয়ায় তাদের কেউ কেউ এটা বন্ধ করে। এবং যেহেতু তারা ভালো হবার চেষ্টা করে তাই তারা সত্যিকারের মানুষে বদলে যায়। কিন্তু কেউ কেউ এখনো সরীসৃপের মতো খাচ্ছে। কেউ কেউ বদলে মাছ, পাখী, বানর এবং শেষ পর্যন্ত মানুষ হয়েছে। কেউ কেউ ভালো হবার চেষ্টা করে নি এবং এখনো সরীসৃপ রয়ে গেছে। যারা মানুষ খেকো তারা যখন অন্যদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে তখন তাদের লজ্জা পাওয়া উচিত। বানরের সামনে সরীসৃপের যে লজ্জা তারচে বেশী লজ্জিত হওয়া উচিত।

"অতীতে জিয়ে এবং যৌ-এর খাবার হিসেবে নিজের ছেলেকে সেদ্ধ করে-ছিল ই ইয়া।[3] কিন্তু বাস্তবে পান গু-র হাতে স্বর্গ-মর্ত্য সৃষ্টির সময় থেকে মানুষ একে অপরকে খাচ্ছে—ই ইয়ার ছেলের সময় থেকে স্যু সীলিনের[4] সময় পর্যন্ত, স্যু সীলিনের সময় থেকে 'নেকড়ের বাচ্চা' গ্রামে ধরা পড়া লোকটির সময় পর্যন্ত। গত বছর তারা শহরে এক আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে এবং এক যক্ষারোগী তার রক্তে রুটি ভিজিয়ে তা চুষেছে।

"তারা আমাকে খেতে চায়। অবশ্যি আপনি একা এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারবেন না। কিন্তু আপনি তাদের দলে যোগ দিচ্ছেন কেন? মানুষ খেকো হিসেবে তারা যা খুশী করতে পারে। আমাকে খেলে, তারা আপনাকেও খেতে পারে, একই দলের লোকজন একে অপরকে খেতে পারে। কিন্তু আপনি যদি এখনই পথ বদলান, তাহলে সবাই শান্তি পাবে। যদিও এটা অনাদিকাল ধরে চলে আসছে তবু ভালো হবার জন্য আজকে আমরা বিশেষ উদ্যোগ নিতে পারি এবং বলতে পারি এটা আর ঘটবে না। দাদা, আমার বিশ্বাস আপনি এটা বলতে পারেন। আরেকদিন যখন ভাড়াটে ভাড়া কমাতে চেয়েছে, আপনি বলেছেন তা সম্ভব নয়।"

প্রথমে তিনি অবিশ্বাসের হাসি হেসেছেন, তারপর তাঁর চোখে খুনীর দৃষ্টি এসেছে এবং যখন তাদের গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছি তাঁর মুখ শুকিয়ে গেছে। গেটের বাইরে থেকে মিঃ যাও, তার কুকুর সহ একদল লোক উঁকি মারছে। সবার মুখ দেখতে পাচ্ছি না, মনে হচ্ছে মুখোশ আঁটা। তাদেরকে ফ্যাকাশে ও প্রাণহীন দেখাচ্ছে, তাদের হাসি লুকানো। আমি জানি তারা একদ-লের, সবাই মানুষ খেকো। কিন্তু এও জানি তাদের সবাই একই চিন্তা করে না।

তাদের কেউ কেউ মনে করে যেহেতু এটা চলে এসেছে তাই মানুষ খাওয়া উচিত। কেউ কেউ জানে মানুষ খাওয়া উচিত নয়, তবু তারা খেতে চায়। তারা ভয় পায় লোকজন তাদের গোপন কথা জেনে ফেলবে। তাই আমার কথা শুনতে পেয়ে তারা রেগেছে কিন্তু অবিশ্বাসী, মুচকি হাসি হেসেছে।

হঠাৎ দাদাকে ক্ষিপ্ত মনে হয় এবং তিনি চীৎকার করে উঠেন:

"তোমরা সব ভাগো এখান থেকে। পাগলের দিকে তাকিয়ে থাকার কি দরকার?"

তখন তাদের শয়তানী বুঝতে পারি। তারা কখনো তাদের মত বদলাবে না, সব পরিকল্পনা ঠিক হয়ে আছে। তারা আমাকে পাগল ঠাউরেছে। ভবিষ্যতে যখন আমাকে খেয়ে ফেলবে, কোন ঝামেলা হবে না। বরং লোকজন তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। আমাদের ভাড়াটে তাদের গ্রামে দুষ্ট লোককে খেয়ে ফেলার যে কথা বলেছে তা একই কায়দার। এটা তাদের পুরনো চাল।

বুড়ো ছেন তড়িঘড়ি দৌড়ে আসে। কিন্তু আমার মুখ বন্ধ করতে পারেনি, কেননা আমাকে লোকজনের উদ্দেশে বলতে হয়েছে:

"তোমরা বদলে যাও। হৃদয় মন নিয়ে বদলে যাও। তোমাদের জানা উচিত ভবিষ্যতে এ পৃথিবীতে মানুষ খেকোদের জায়গা হবে না।

না বদলালে তোমরা নিজেরা একে অপরকে খেয়ে ফেলবে। যদিও বহু জন্ম নিচ্ছে, তারা সত্যিকারের মানুষ-এর হাতে শেষ হয়ে যাবে, যেভাবে শিকারীর হাতে নেকড়ে শেষ হয়। ঠিক সরীসৃপের মত।"

বুড়ো ছেন সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে। দাদা চলে গেছেন। বুড়ো ছেন আমাকে কামরায় ফিরে যেতে বলেছে। কামরায় গভীর অন্ধকার। মাথার উপর কড়িকাঠ দুলছে। কিছুক্ষণ নড়ে আয়তনে বড়ো হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে আমার উপর বোঝা হয়ে চেপে বসেছে।

এত ভারী যে নড়তে পারছি না। তার অর্থ আমার মরে যাওয়া উচিত। আমি জানি এ ওজন মেকী, তাই কষ্ট করে আমাকে বেরুতে হয়। ঘামে গা ভিজে যায়। কিন্তু আমাকে বলতে হয়:

"এখনই তোমাদের হৃদয়ের অন্তকরণ থেকে বদলে যাওয়া উচিত, তোমাদের জানা উচিত ভবিষ্যতে এ পৃথিবীতে মানুষ খেকোদের জায়গা হবে না . . . . . ."

১১

সূর্যের কোন আলো নেই। দরজা খোলে না। প্রতিদিন দুবার আহার।

আমি খাবার কাঠি হাতে নেই। তারপর দাদার কথা মনে পড়ে। এখন জানি কিভাবে ছোট বোনের মৃত্যু হয়েছে। দাদাই এজন্যে দায়ী। সে সময় বোনের বয়স ছিল পাঁচ বছর। এখনো মনে পড়ে তার চেহারার কমনীয়তা। মা শুধু কাঁদতেন। তিনি মা'কে কাঁদতে বারণ করেন, সম্ভবতঃ বোনকে খেয়ে ফেলেছেন বলে। তাই মায়ের কান্না তাকে লজ্জা দিত। তার যদি কোন লজ্জা থাকত . . . . . .

দাদা আমার বোনকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু জানি না মা তা বুঝতে পেরেছেন কিনা।

আমার মনে হয় মা নিশ্চয়ই তা জানেন। কিন্তু কান্নার সময় তিনি কিছুই বলেন নি, সম্ভবতঃ তিনিও তা ঠিক মনে করেছেন। আমার মনে পড়ে চার-পাঁচ বৎসর বয়সের কথা। ঘরের দাওয়ায় বসে দাদা বলেছিলেন কারো বাবা মা'র অসুখ হলে নিজেকে সুসন্তান প্রমাণ করার জন্য তার উচিত নিজের শরীরের মাংস কেটে তা তাঁদের জন্য সেদ্ধ করে দেয়া। মা একথার প্রতিবাদ করেন নি। একটুকরো খাওয়া গেলে পুরোটাই খাওয়া যায়। এবং শোকের কথা মনে হলেই আমার হৃদয় থেকে রক্ত ঝরতে থাকে — সেটাই সবচে অবাক ব্যাপার।

১২

আমি আর এসব ভাবতে পারি না।

শুধু এটুকু বুঝতে পেরেছি যে গত কয়েকবছর ধরে আমি এমন জায়গায় বাস করছি যেখানে চার হাজার বছর ধরে তারা মানুষের মাংস খাচ্ছে। বোনের মৃত্যুর সময় দাদা সবেমাত্র বাড়ির দায়িত্ব নিয়েছেন। সম্ভবতঃ তিনি তার মাংস আমাদের ভাতে-তরকারিতে মিশিয়ে অজান্তে তা খেতে বাধ্য করেছেন।

হয়ত আমি অজান্তে বোনের কয়েক টুকরো মাংস খেয়েছি—এবার আমার পালা . . . . . .

আমার মত একজন মানুষ, যার ইতিহাসের চার হাজার বছর ধরে মানুষ খাওয়া চলছে, প্রথমে কিছু না জেনেও এখন কিভাবে সত্যিকারের মানুষদের মোকাবেলা করব ?

১৩

সম্ভবতঃ এখনো অনেক শিশু আছে যারা মানুষ খায় নি।
শিশুকে বাঁচাও......

এপ্রিল, ১৯১৮

টীকা

1. লি শিযেন, বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী (১৫১৮—১৫৯৩), বা মেটেরিযা মেডিকার লেখক।

2. এটা পুরনো চিরায়ত রচনা "জুও যুয়ান" থেকে উদ্ধৃতি।

3. পুরনো রেকর্ড অনুযায়ী ই ইয়া নিজের ছেলেকে সেদ্ধ করে ছি বংশের নবাব হুয়ানকে উপহার দিয়েছিল, তাঁর শাসনামলের সময় খৃঃ পূর্ব ৬৮৫ থেকে ৬৪৩। জিয়ে এবং যৌ ছিলেন আরো আগের অত্যাচারী শাসক। পাগল এখানে একটি ভুল করেছে।

4. স্যু সীলিন ছিলেন ছিং রাজবংশের (১৬৪৪—১৯১১) শেষ দিককার বিপ্লবী। ১৯০৭ সালে আনহুই প্রদেশের একজন সরকারী কর্মচারীকে হত্যার কারণে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং তাঁর হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ সেদ্ধ করে খেযে ফেলে।

খোং ইজি

লুযেনের শুঁড়ীখানাগুলো চীনের অন্যান্য এলাকার মত নয়। এসব শুঁড়ীখানায় রাস্তার মুখোমুখি সমকোণী কাউণ্টার আছে যেখানে মদ গরম করার গরম পানি থাকে। দুপুরে বা সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফেরার সময় লোকজন একবাটি মদ কেনে। বিশ বছর আগে এর দাম ছিল চার পয়সা আর এখন দশপয়সা। কাউণ্টারের পাশে দাঁড়িয়ে গরম মদ পান করে তারা অবসাদ দূর করে। মদের সঙ্গে খাবার জন্য আর এক পয়সায় এক প্লেট নোনা বাঁশের অংকুর বা মৌরী-মসলা দেয়া মটরশুঁটি কেনা যায়। আর বারো পয়সা হলে পাওয়া যায় এক প্লেট মাংস। কিন্তু এই খদ্দেরদের প্রায় সবাই ছোটজাতের, মাত্র গুটি কয়েকের সাধ্য আছে তা কেনার। শুধু লম্বা গাউনওয়ালা লোকজন পাশের কামরায় ঢুকে মদ ও খাবার অর্ডার দিয়ে মনের আনন্দে তা পান করে।

বারো বছর বয়সে শহরের প্রবেশ পথে 'শুভ শুঁড়ীখানায়' আমি বেয়ারা হিসেবে কাজ শুরু করি। শুঁড়ীখানার মালিকের মতে লম্বা গাউনওয়ালা খদ্দেরদের সামনে আমাকে বোকা দেখায়। তাই আমাকে বাইরের কামরায় কাজ দেয়া হয়। ছোটজাতের খদ্দেররা সহজে খুশী হলেও, তাদের মধ্যে কয়েকজন গোলমেলে লোকও ছিল। মদ ঢালার সময় তারা নিজের চোখে তা দেখতে চাইত, দেখতে চাইত পাত্রের তলায় কোন পানি আছে কিনা অথবা গরম পানিতে তা ঠিকমত ডোবানো হচ্ছে কিনা। এত কড়াকড়ির মধ্যে মদে পানি মেশানো খুব কষ্টকর। তাই কয়েকদিন পর মালিক ঠিক করলেন আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। ভাগ্যভালো, একজন প্রভাবশালী লোক আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তাই তিনি আমাকে বরখাস্ত করতে পারেন নি। আমাকে মদ গরম করার এক ঘেঁয়ে কাজ দেয়া হয়।

সেই থেকে কাজ নিয়ে আমি সারাদিন কাউণ্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকি।

কাজে তৃপ্তি থাকলেও মনে হয়েছে এক ঘেঁয়ে ও ফালতু। মালিকের চেহারা ছিল মারমুখী আর খদ্দেররা ছিল খিটখিটে, তাই মজা করার উপায় ছিল না। শুধু খোং ইজি এলে একটু হাসতে পারতাম। একারণেই তাকে আমার এখনো মনে আছে।

লম্বা গাউনওয়ালা খদ্দেরদের মধ্যে একমাত্র খোং দাঁড়িয়ে মদ পান করত। বিশাল বপুর এই মানুষটি ছিল অদ্ভুতভাবে ফ্যাকাসে। মুখের বলিরেখায় প্রায়ই দেখা যেত ক্ষতচিহ্ন। তার ছিল লম্বা, আগোছালো কাঁচা-পাকা দাড়ি। লম্বা গাউন পরলেও সেটা ছিল জীর্ণ ও নোংরা। দেখে মনে হত দশ বছরের বেশী ধোয়াই বা রিফু করা হয় নি। তার কথায় এত পুরনো শব্দ থাকত যে অর্ধেক কথাই বোঝা যেত না। তার ডাকনাম ছিল খোং। তাই তাকে নাম দেয়া হয়েছিল খোং ইজি — বাচ্চাদের দ্রুতপঠনের প্রথম তিন অক্ষর। যখনই সে দোকানে আসত সবাই তার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসত। কেউ হয়ত বলে উঠত :

"খোং ইজি, তোমার চেহারায় আরো কিছু নতুন দাগ দেখা যাচ্ছে।"

এসব কথায় কান না দিয়ে খোং কাউণ্টারে এসে দু' বাটি গরম মদ ও মৌরী-মসলা দেয়া এক প্লেট মটরশুঁটির অর্ডার দিত। এজন্যে সে নয় পয়সা দিত। অমনি কেউ ইচ্ছা করে জোরে বলে উঠত :

"তুমি আবার চুরি করেছ!" বিস্ফারিত চোখে সে জিজ্ঞেস করত, "মিছেমিছি একজনের বদনাম করছ কেন?"

"হুঁ, বদনাম। গতপরশু আমি নিজের চোখে দেখেছি হো বাড়ী থেকে বই চুরির অপরাধে তোমাকে মেরে ঝুলিয়ে রেখেছে।"

খোং-এর মুখ লাল হয়ে যেত। প্রতিবাদ জানানোর সময় তার কপালের শিরা ফুলে উঠত, "বই নেয়া চুরি হতে পারে না...... বই বুদ্ধিজীবীর ব্যাপার, তাকে চুরি বলা যায় না।" তার পরেই আসত বিখ্যাত গ্রন্থের উদ্ধৃতি "দারিদ্রেও ভদ্রলোক চরিত্র নষ্ট করে না" এবং এক বোঝা দুর্বোধ্য শব্দ। শুঁড়ী-খানার সবাই হো হো করে হেসে উঠতেই পরিবেশ হাল্কা হয়ে যেত।

লোকমুখে শুনেছি খোং ইজি চিরায়ত বিষয় পড়েছে কিন্তু কখনো সরকারী পরীক্ষা পাস করেনি। জীবনধারণের কোন উপায় না থাকায় গরীব হতে হতে সে ভিখিরী হয়ে গেছে। ভাগ্যভালো, তার হাতের লেখা ছিল সুন্দর এবং জীবনধারণের জন্য নকল করার অনেক কাজ সে পেতে পারত। তার দোষও ছিল : সে মদ পছন্দ করত আর আলসে ছিল। তাই কয়েকদিন পর বই, খাতা, কালি-কলম, তুলি নিয়ে সে উধাও হয়ে যেত। কয়েকবার এমন ঘটার পর কেউ আর তাকে নকল করার কাজ দিত না। তার পর মাঝেমধ্যে হাত-সাফাই করা

ছাড়া তার উপায় ছিল না। আমাদের শুঁড়ীখানায় তার ব্যবহার ছিল দেখার মত। পয়সা দিতে সে কখনো কসুর করে নি। মাঝে মাঝে পয়সা না থাকলে দেনাদার-দের সঙ্গে তার নাম বোর্ডে উঠত। কিন্তু এক মাসের মধ্যেই সে পাওনা শোধ করে দিত এবং বোর্ড থেকে তার নাম মুছে যেত।

আধাবাটি মদ পান করার পর খোং তার মেজাজে ফিরে আসত। কিন্তু তখনই হয়ত কেউ বলে উঠত:

"খোং ইজি, তুমি কি সত্যি সত্যি পড়তে জানো?"

খোং এমনভাবে তাকাত যেন এ ধরণের প্রশ্ন অবান্তর। তারা আবার জিজ্ঞেস করত: "কিন্তু এটা কেমন করে হয় যে তুমি সবচে ছোট পরীক্ষা পর্যন্ত পাস করে নি?"

এতে খোংকে অসুখী এবং অশান্ত দেখায়। তার মুখ শুকিয়ে যেত, ঠোঁট নড়তে থাকত। কিন্তু সে শুধু সেই দুর্বোধ্য কথাগুলো বলত। আর সবাই হো হো করে হেসে উঠত। আনন্দময় হয়ে উঠত শুঁড়ীখানার পরিবেশ।

এসব সময়ে মালিকের গাল না খেয়ে আমি হাসিতে যোগ দিতে পারতাম। মাঝে মাঝে তিনিও খোংকে এমন প্রশ্ন করতেন যে তাতে হাসি পেত। তাদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই জেনে খোং বাচ্চাদের সঙ্গে গল্প করত। একবার সে আমাকে জিজ্ঞেস করে:

"তুমি কি কখনো স্কুলে গিয়েছ?"

সায় দিতেই সে বলে, "ঠিক আছে, তা হলে তোমাকে পরীক্ষা করব। মৌরী মশলা দেয়া মটরশুঁটি বাক্যের মধ্যে মৌরী লিখবে কি ভাবে?"

আমি ভাবলাম, "ভিক্ষুকের কাছে পরীক্ষা দেব না!" তাই মুখ ফিরিয়ে তাকে উপেক্ষা করি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে বায়না ধরে:

"তুমি এটা লিখতে পারনা? আমি তোমাকে শেখাব। মনে রাখবে! তোমাকে এসব মনে রাখতে হবে। কেননা পরে যখন নিজের দোকান হবে, তোমাকে হিসেব রাখতে হবে।"

আমার মনে হল নিজের দোকান হতে এখনো অনেক দেরী। তাছাড়া মালিক কখনো মৌরীমসলা দেয়া মটরশুঁটির হিসেব খাতায় লেখেন না। মজা ও বিরক্তি নিয়ে আমি উদাসভাবে জবাব দিলাম, "তোমার মাষ্টারী কে চায়? এটা কি হুই-সিয়াং এর হুই নয়?"

খোং খুব মজা পায় এবং কাউণ্টারে হাতের নখ দিয়ে আঘাত করতে থাকে। মাথা নাড়তে নাড়তে সে বলে, "ঠিক, ঠিক। তুমি কি জান চার রকমভাবে 'হুই' লেখা যায়?"

আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। ভুরু কুঁচকে আমি কেটে পড়ি। কাউণ্টারের ওপর অক্ষরগুলো লেখার জন্য খোং ইজি মদের মধ্যে নখ ডুবিয়েছে। কিন্তু আমার নজর নেই দেখে সে হতাশ হয়ে পড়ে।

কখনো কখনো আশেপাশের ছেলে মেয়েরা হাসির শব্দে মজায় যোগ দিতে আসত এবং খোং ইজিকে ঘিরে ধরত। খোং তাদের প্রত্যেককে একটি করে মৌরী মসলা দেয়া মটরশুঁটি দিত। মটরশুঁটি খাবার পরও ছেলেমেয়েরা ঘিরে থাকত — তাদের নজর থাকত প্লেটের দিকে। তাড়াতাড়ি সে হাত দিয়ে প্লেট ঢেকে উপুড় হয়ে বলত, "খুব বেশী নেই। আমি খুব একটা খাই নি।" তারপর মাথা সোজা করে মটরশুঁটির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলত, "না, না, খুব বেশী নেই।" তারপর হাসতে হাসতে ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করত।

খোং ইজি সঙ্গী হিসেবে খুব মজার ছিল, কিন্তু তাকে ছাড়াও আমাদের সময় ভালোই কাটত।

হেমন্ত উৎসবের কয়েকদিন আগে, একদিন শুঁড়ীখানার মালিক তার হিসেব পরীক্ষা করছিলেন। দেয়াল থেকে বোর্ড নামিয়ে তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, "অনেক দিন খোং ইজি'র দেখা নেই। তার কাছে এখনো উনিশ পয়সা পাওনা আছে।" তখনই বুঝতে পারলাম কতদিন তাকে দেখিনি।

খদ্দেরদের একজন বলে উঠল, "সে কেমন করে আসবে? গতবারের পিটু-নীতে তার পা ভেঙে গেছে।"

"আহা।"

"সে আবার চুরি করতে গিয়েছিল। এবার বোকামি করেছে প্রাদেশিক বুদ্ধিজীবী মিঃ ডিং-এর বাড়ীতে চুরি করতে গিয়ে। যেন যে কেউ সেটা করতে পারে।"

"তারপর কি হয়েছে?"

"কি আর হবে? প্রথমে তাকে স্বীকারোক্তি লিখতে হয়েছে, তারপরে পিটুনী। পিটুনী প্রায় সারারাত ধরে চলে, পা ভেঙে যাওয়া পর্যন্ত।"

"তার পর?"

"তার পা জোড়া ভেঙে গেছে।"

"কিন্তু তার পর কি হয়েছে?"

"তার পর? . . . . . . কে জানে? সে হয়ত মরে গিয়ে থাকবে।" মালিক আর কিছু জানতে চায় নি, হিসেব মেলাতে থাকে।

হেমন্ত উৎসবের পর, শীত আসতে শুরু করলে বাতাসও দিন দিন ঠাণ্ডা

হতে থাকে। সারাদিন চুলার কাছে বসে থাকলেও আমাকে প্যাডেড কোট পরতে হয়। একদিন দুপুরে দোকান প্রায় খালি। চোখ বন্ধ করে বসে আছি এমন সময় শুনতে পেলাম :

"একবাটি মদ গরম কর।"

গলার স্বর নীচু, কিন্তু পরিচিত। কিন্তু মাথা তুলতেই কেউ নজরে পড়লো না। আমি দাঁড়িয়ে দরজার দিকে তাকালাম। দেখতে পেলাম দরজার দিকে মুখ করে কাউণ্টারের নীচে বসে আছে খোং ইজি। তার চোখ জোড়া বসে গেছে, মুখ শুকনো, খুব বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে। তার গায়ে টুটা ফাটা একটি জ্যাকেট। গলার সঙ্গে ঝোলানো একটি মাদুরের ওপর সে পা আড়াআড়ি করে বসে আছে। আমাকে দেখতে পেয়ে সে আবার বলল :

"এক বাটি মদ গরম কর।"

এ সময়ে কাউণ্টারের ওপর দিয়ে মাথা বাড়িয়ে মালিক বললেন, "খোং ইজি নাকি? তোমার কাছে এখনো উনিশ পয়সা পাওনা আছে।"

একটু অস্থির হয়ে খোং ইজি জবাব দিল, "সেটা আগামীবার মিটিয়ে দেব। এবার নগদ পয়সা দিচ্ছি। মদ ভালো হওয়া চাই।"

মালিক মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করে,

"খোং ইজি, তুমি আবার চুরি করতে গিয়েছিলে?" কিন্তু প্রতিবাদ না করে সে শুধু বলে :

"ঠাট্টা কর না।"

"ঠাট্টা? চুরি না করলে তারা তোমার পা ভেঙেছে কেন?"

নীচু গলায় খোং বলল, "পড়ে গিয়ে, পড়ে গিয়ে আমার পা ভেঙেছে।" ব্যাপারটা শেষ করার জন্য তার চোখে আকুল মিনতি। কিন্তু ততক্ষণে বেশ কয়েকজন জড়ো হয়েছে এবং তারা হাসতে শুরু করেছে। আমি মদ গরম করে তা নিয়ে চৌকাঠের ওপর রাখলাম। টুটাফাটা কোটের পকেট থেকে চার পয়সা বের করে সে আমার হাতে দিল। দেখতে পেলাম তার হাত জোড়া কাদামাখা। সে নিশ্চয়ই হামাগুড়ি দিয়ে এখানে এসেছে। তারপর মদ শেষ করে লোকজনের হাসাহাসি ও চুটকির মধ্যে সে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। খোং এর দেখা নেই। বছরের শেষে বোর্ড নামিয়ে মালিক বললেন, "খোং ইজি'র কাছে এখনো উনিশ পয়সা পাওনা আছে।" পরের বছর ড্রাগন নৌকা উৎসবের সময়ও তিনি একই কথা বললেন। কিন্তু হেমন্ত উৎসবের সময় আর কিছু বললেন না। আরেকটি নববর্ষ এলো কিন্তু তাকে আর দেখা গেল না।

সেই থেকে আমি আর তাকে দেখি নি।
হয়ত সে সত্যি সত্যি মরে গিয়ে থাকবে।

মার্চ, ১৯১৯

ঔষধ

১

হেমন্তের কাকভোর। চাঁদ ডুবে গেছে কিন্তু সূর্য ওঠে নি। বিশাল আকাশ নীল চাদরের মত বিছানো। নিশাচর ছাড়া আর কেউ জেগে নেই। বুড়ো শুয়ান হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে। খশ্ করে ম্যাচ জ্বালিয়ে হারিকেন ধরায়। চা-দোকানের দু'কামরার ওপর এক ভুতুড়ে আলো নেমে আসে।

বউ জানতে চায়, "ছোট শুয়ানের বাপ, তুমি কি এখন যাচ্ছ?" ভেতরের ছোট্ট কামরা থেকে কাশির শব্দ আসছে।

"হুঁ"

কাপড় পরতে পরতে বুড়ো শুয়ান জবাব দেয়। তারপর হাত বাড়িয়ে বলে "ওটা দাও।"

কিছুক্ষণ বালিশের নীচে হাতড়ে বউ টাকার পোটলা তার হাতে তুলে দেয়। বুড়ো শুয়ান ভয়ে ভয়ে সেটা পকেটে ঢোকায়, দুবার পকেট চাপড়ে দেখে। তারপর কাগুজে লণ্ঠন জ্বালিয়ে ভেতরের কামরায় ঢোকে। প্রথমে মৃদু কাশির শব্দ আসে, তারপর আরো জোরে। সব কিছু থেমে গেলে, বুড়ো আস্তে আস্তে বলে, "বা'জান ...... উঠিস না। ...... তোর মা দোকান দেখাশোনা করবে।"

জবাব না পেয়ে বুড়োর মনে হল ছেলে গভীর ঘুমে অচেতন। সে রাস্তায় নেমে আসে। অন্ধকারে ধূসর রাস্তা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। লণ্ঠনের আলো পায়ের সঙ্গে সঙ্গে দুলছে। এখানে সেখানে কুকুর চোখে পড়ে। কিন্তু একটাও ঘেউ ঘেউ করছে না। ঘরের চেয়ে বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। তবু বুড়ো শুয়ানের সাহস বেড়ে যায়, যেন হঠাৎ তার বয়স কমে গেছে, যাদুর জীবনী-শক্তি পেয়ে

গেছে। সে পা চালিয়ে দেয়। রাস্তা পরিষ্কার হতে হতে আকাশও পরিষ্কার হয়ে আসে।

বুড়ো শুয়ান একমনে হেঁটে চলেছে। সামনে পথের শেষ দেখতে পেয়ে হঠাৎ তার সম্বিৎ ফিরে আসে। কয়েক পা পিছিয়ে এক দোকানের কার্নিসের নীচে সে বন্ধ দরোজার সামনে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণের মধ্যে ঠাণ্ডায় তার কাঁপুনি ধরে যায়।

"আহা, বুড়ো।"

"বেশ সতেজ মনে হয় . . . . . .।"

বুড়ো শুয়ান আবার সজাগ হয়। চোখ খুলতেই দেখতে পায় কয়েকজন লোক যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। তাদের একজন আবার তার দিকে ফিরেও তাকায়। সে তাকে পরিষ্কার দেখতে না পেলেও মনে হল খাওয়া দেখে অভুক্ত মানুষের যা হয়, তার চোখ সেরকম জ্বল জ্বল করছে। বুড়ো শুয়ান তাকিয়ে দেখে লণ্ঠন নিভে গেছে। পকেট চাপড়ে দেখে — না, পোটলাটা আছে। তারপর আশে পাশে তাকাতেই তার অদ্ভুত সব লোক নজরে পড়ে। ভূতের মত দু'জন, তিনজন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ভালো করে তাকাতেই, তাদের আর অদ্ভুত মনে হয় না।

সে দেখতে পায় জনা কয়েক সৈন্য ঘোরাঘুরি করছে। দূর থেকে তাদের ইউনিফর্মের বড়ো সাদা চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যায়, কাছে আসতে লাল বর্ডারও চোখে পড়ে। পরমুহূর্তে ধুপধাপ শব্দে একদল লোক পার হয়ে গেল। তারপর একটু আগে যে ছোট্ট দলটি এসেছিল তারা জড়ো হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ঠিক পথের শেষ প্রান্তের আগে হঠাৎ থেমে গিয়ে তারা অর্ধ বৃত্তাকারে আবার জড়ো হয়।

বুড়ো শুয়ান সেদিকে তাকিয়ে দেখে। কিন্তু শুধু লোকজনের পেছন দিকটা দেখতে পায়। অদৃশ্য হাতে গলা ধরে ঝোলানো হাঁসের মত তাদের দেখা যাচ্ছে। এক মুহূর্ত সব চুপচাপ, তারপর একটি শব্দ শোনা গেল। দর্শকদের মধ্য হৈচৈ পড়ে যায়। তারা সবাইকে পেছনে ঠেলতে শুরু করে। ধাক্কায় বুড়ো শুয়ানের প্রায় পড়ে যাবার দশা হয়।

পুরো শরীর কালো কাপড়ে ঢাকা একজন এসে বুড়ো শুয়ানকে বলে, "তোমার টাকা আমাকে দাও, আমি তোমাকে জিনিষ দেব।" তার চোখ জোড়া চাকুর মত। ভয়ে বুড়ো শুয়ান চুপসে যায়। সে তার লম্বা একটি হাত বাড়িয়ে দেয় বুড়োর দিকে। আর এক হাতে ধরা আছে একটি সেদ্ধ রুটি, যা থেকে ফোটায় ফোটায় ঝরছে লাল তরল পদার্থ।

টাকার জন্য বুড়ো শুয়ান জলদি হাতড়াতে থাকে। কাঁপতে কাঁপতে সে প্রায় দিয়েই দিচ্ছিল, কিন্তু ভয়ে অন্য বস্তুটি নিতে সাহস হলো না। অস্থির হয়ে লোকটি চীৎকার করে উঠে, "তোমার কিসের ভয়? কেন নিচ্ছ না?" বুড়োর তখনো থতমত অবস্থা। কালো কাপড়ে ঢাকা লোকটি রুটি জড়ানোর জন্য লণ্ঠন নিয়ে কাগজের ঢাকনাটি ছিঁড়ে ফেলে। জড়ানো রুটি সে বুড়োর হাতে সঁপে দেয় এবং শয়তানী চোখে তাকিয়ে রুপোলী জিনিষগুলো নিয়ে নেয়। "বুড়ো হদ্দ ......" বিড়বিড় করতে করতে সে ফিরে চলে।

"এসব কার অসুখের জন্য?" বুড়ো শুয়ানের মনে হল কেউ জিজ্ঞেস করছে,' কিন্তু সে কোন জবাব দিল না। তার পুরো মনোযোগ পোটলার দিকে। এমন সাবধানে সে সেটা বহন করছে যেন তা কোন পুরনো বাড়ীর একমাত্র বংশধর। এখন আর কোনকিছু এত দামী নয়। সে তার বাড়ীতে নতুন জীবন আনবে, সুখের সন্ধান পাবে। সূর্য উঠেছে। যে রাস্তা সোজা বাড়ীর দিকে গেছে তা এখন আলোকিত। পথের শেষে পুরনো ফলকে বিবর্ণ সোনালী রংয়ে লেখা জ্বলছে: "পুরনো প্যাভিলিয়ন।"

২

বুড়ো শুয়ান বাড়ীতে পৌছে দেখে দোকান পরিষ্কার করা হয়েছে। চায়ের টেবিলগুলো ঝকঝক করছে, কিন্তু কোন খদ্দের তখনো আসে নি। শুধু তার ছেলে দেয়ালের কাছে বসে খাচ্ছে। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। জ্যাকেট শিরদাঁড়ার উপর ঝুলে আছে, V-এর মত কাঁধের হাড়গুলো চোখে পড়ে। ছেলে-কে দেখেই আবার বুড়োর কপাল কুঁচকে যায়। রান্না ঘর থেকে তার বৌ দৌড়ে আসে। তার চোখে আশার আলো, ঠোঁট জোড়া কাঁপছে:

"পেয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

তারা দু'জনেই রান্নাঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ যুক্তি করে। তার পর তার স্ত্রী বাইরে থেকে একটি শুকনো পদ্মপাতা এনে টেবিলের উপর বিছিয়ে দেয়। বুড়ো শুয়ান লণ্ঠনের কাগজে জড়ানো লাল রংয়ের রুটিটি খুলে পদ্মপাতার ওপর রাখে। ছোট শুয়ানের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তার মা জলদি বলে উঠে:

"বা'জান, বসে থাক। এখানে আসবি না।"

চুলোর জ্বাল ঠিক করতে করতে বুড়ো শুয়ান সবুজ পোটলা এবং লণ্ঠনের

সাদা-লাল কাগজ চুলোর ভেতর দিয়ে দেয়। আগুনের লাল-কালো শিখা উঠে আসে। একটা অদ্ভুত গন্ধে ভরে যায় সমস্ত দোকান।

"বেশ ভাল গন্ধ মনে হচ্ছে! কি খাচ্ছ তোমরা?" কুঁজো এসেছে। সে তাদের একজন যারা পুরো সময়টা চা দোকানে কাটায়। সকালে সবার আগে আসে এবং সন্ধ্যায় সবার পরে যায়। হোঁচট খেতে খেতে রাস্তার মুখোমুখি কোণার এক টেবিলে গিয়ে সে বসে। কিন্তু কেউ তার প্রশ্নের জবাব দেয় না।

"চালের খিচুড়ি?"

• তবু কোন জবাব নেই। তার জন্যে চা বানাতে বুড়ো দৌড়ে আসে।

"বা'জান, এদিকে আয়।" তার মা তাকে ডেকে ভেতরের ঘরে নিয়ে যায়। ঘরের মাঝে একটি টুল দিয়ে ছেলেকে সেখানে বসায়। তারপর প্লেটে করে কালো একটি কিছু নিয়ে এসে সোহাগ করে বলে :

"খেয়ে ফেল ...... তা'হলে ভালো হয়ে যাবি।"

কালো জিনিষটি হাত দিয়ে ধরে ছোট শুয়ান সে দিকে তাকায়। তার ভেতরে একটা অদ্ভুত ভাব খেলা করতে থাকে। যেন সে নিজের জীবন হাতে ধরে আছে। তারপর সাবধানে সে সেটা খুলে ফেলে। কালো আবরণের নীচ থেকে সাদা ধোঁয়া বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ে। পড়ে থাকে দু টুকরো সেদ্ধ রুটি। খাওয়া হয়ে গেলে গন্ধ চলে যায়, পড়ে থাকে খালি থালা। তার দু পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার বাবা মা। তাদের চোখ কিছু একটা দেখছে। যেন ছেলের শরীরে কিছু একটা দিয়ে অন্য কিছু বের করে আনতে চায়। তার ছোট্ট বুক দ্রুত উঠা নামা করতে থাকে। বুকের ওপর হাত চেপে সে আবার কাশতে থাকে।

মা বলে, "ঘুমা, তা'হলে ভালো হয়ে যাবি।"

ভালো ছেলের মত ছোট শুয়ান কাশতে কাশতে ঘুমিয়ে পড়ে। তার দম ফেলা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত মা অপেক্ষা করে। তার পর শততালি দেয়া কাঁথা দিয়ে ঢেকে দেয় তার শরীর।

৩

দোকানে লোকজন গিজগিজ করছে। বুড়ো শুয়ান ব্যস্ত। বড়ো তামার কেটলীতে করে সে খদ্দেরদের জন্য চা বানিয়ে চলেছে। তার চোখের নীচে কালো রেখা।

সাদা দাড়িওয়ালা একজন জিজ্ঞেস করে, "বুড়ো শুয়ান, তোমার কি শরীর

ভালো নেই? কি হয়েছে তোমার?"

"কিছু না।"

"কিছু না? ...... তোমার হাসি দেখে মনে হচ্ছে......" বুড়ো নিজেকে শুধরে নেয়।

কুঁজো বলে, "ওটা বুড়ো শুয়ানের ব্যস্ততা। যদি তার ছেলে......" কথা শেষ করবার আগেই দোকানে ঢুকল ভারী চোয়ালের এক লোক। তার কাঁধের উপর ঝুলছে বোতাম খোলা খয়েরী রংয়ের শার্ট, এলোমেলোভাবে ফিতে দিয়ে কোমরে বাঁধা। দোকানে ঢুকতে না ঢুকতেই সে বুড়ো শুয়ানের দিকে হাঁক' মারে:

"সে কি সেটা খেয়েছে? কিছুটা ভাল হয়েছে? বুড়ো, তোমার কপাল ভালো। কি কপাল! যদি তাড়াতাড়ি না জানতাম......"

এক হাতে কেটলী ধরে, আর এক হাত ভক্তির সঙ্গে সোজা ঝুলিয়ে রেখে হাসিমুখে বুড়ো শুয়ান সব শোনে। আসলে উপস্থিত সবাই মনোযোগের সঙ্গে শুনছিল। বুড়ী, তার চোখের নীচেও কালো রেখা, চা-পাতা ও জলপাই দেয়া বাটি নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে। বুড়ো শুয়ান নতুন মানুষটির জন্য তাতে ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়।

বড়ো চোয়ালের মানুষটি বলে, "এটা একেবারে ধন্বন্তরী! অন্য জিনিষের মত নয়। একবার ভেবে দেখো, গরম গরম কেনা, গরম গরম খাওয়া।"

বুড়ী গদ গদ হয়ে বলে: "খাং চাচার সাহায্য না পেলে আমরা এটা জোগাড় করতে পারতাম না।"

"ধন্বন্তরী! গরম গরম খেয়েছে। মানুষের রক্তে ভেজা এরকম রুটি যে কোন যক্ষারোগ সারিয়ে তুলতে পারে।"

'যক্ষারোগ' কথাটি শুনে বুড়ীকে একটু বিচলিত ও ফ্যাকাশে মনে হয়। তবু জোর করে হেসে সে এক ছুতায় ভেতরে চলে গেল। এদিকে খয়েরী পোশাক পরা লোকটি অসভ্যের মত চীৎকার করে চলেছে যতক্ষণ না ছেলেটি ভেতরের কামরায় জেগে উঠে আবার কাশতে শুরু করে।

"তোমার ছোট্ট শুয়ানের কপাল ভালো। তার অসুখ পুরো সেরে যাবে। বুড়ো শুয়ানের হাসিতে অবাক হবার কিছুই নেই।" কথা বলার সময় সাদা দাড়িওয়ালা খয়েরী জামার কাছে এগিয়ে আসে। গলার স্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করে:

"খাং চাচা আমি শুনেছি আজকে যাকে বলি দেয়া হয়েছে সে সিয়া পরিবারের। সে কে? কেন তার বলি হয়েছে?"

"কে? বিধবা সিয়ার ছেলে, নিশ্চয়ই! একটা রাসকেল।"

তাদের শোনার ভঙ্গী দেখে মিঃ খাং-এর সাহস আরো বেড়ে যায়। তার চোয়াল কেঁপে ওঠে এবং যত জোরে সম্ভব সে তত গলা চড়িয়ে দেয়।

"বদমাশটা বাঁচতে চায় নি। এবার আমি কিছুই করি নি। এমনকি তার কাপড়গুলো পর্যন্ত জেলার নিয়ে গেছে। আমাদের বুড়ো শুয়ানের কপাল খুব ভালো এবং তারপরে কপাল ভালো তিন নম্বর চাচা সিয়ার। পুরস্কারের পঁচিশ টেল রুপা পুরোটাই সে মেরে দিয়েছে, এক পয়সাও খরচ করতে হয় নি।"

বুক চেপে ধরে কাশতে কাশতে ছোট শুয়ান ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। রান্নাঘরে গিয়ে সে একবাটি ঠাণ্ডা ভাত নিল। তারপর গরমপানি মিশিয়ে সেখানে বসে খেতে শুরু করে। মা ঝুঁকে পড়ে সোহাগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে :

"বা'জান, তোর কি ভাল লাগছে? ভুখ কি লেগেই আছে?"

"মহা ধন্বন্তরী।" খাং ছেলেটির দিকে তাকায়। তারপর মুখ ঘুরায় লোকজনদের কিছু বলার জন্য, "তিন নম্বর চাচা সত্যিই স্মার্ট। সে খবর না দিলে তার পরিবারের ফাঁসি এবং সম্পত্তি ক্রোক হয়ে যেত। কিন্তু তার বদলে? রুপা! সেই বদমাশটা সত্যিই একটা রাসকেল! সে জেলারকেও বিদ্রোহের সুড়সুড়ি দেয়।"

পেছনের সারিতে বসা বিশ বছরের বেশী একজন ক্ষেপে ওঠে, "না! এমন কথা বলবেন না।"

"তুমি জান, রক্ত-চক্ষু তাকে বাজিয়ে দেখতে যায়, কিন্তু সে তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়। সে বলে, আমরা সবাই মহান ছিং সাম্রাজ্যের মালিক। একবার ভাব : এটা কি বুদ্ধিমানের কথা? রক্ত-চক্ষু জানত বাড়ীতে তার বুড়ী মা আছে, কিন্তু ভাবতে পারে নি সে এত গরীব। সে তার কাছ থেকে কিছুই আদায় করতে পারে নি। সে ভীষণভাবে ক্ষেপে গেলো। তারপর সেই বুদ্ধু সাপের লেজ দিয়ে কান চুলকাতে চেয়েছে এবং সে তাকে দুটি চড় মেরেছে।"

দেয়ালের কোনা থেকে কুঁজো খুশীতে বলে ওঠে, "রক্ত-চক্ষু ভালো মুষ্টিযোদ্ধা। ঐ চড়গুলোতে নিশ্চয়ই চোট লেগেছে।"

"পাজিটার মারের ভয় ছিল না। সে এমনকি তার দুঃখের কথাও বলেছে।"

সাদা দাড়িওয়ালা বলে, "এমন মন্দ লোককে মারলে তাতে দুঃখের কিছু নেই।"

খাং ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকায়। তারপর ঘৃণা ভরে বলে, "তুমি ভুল বুঝেছ। যেভাবে সে বলেছে, সে লাল-চক্ষুর জন্য দুঃখিত।"

তার শ্রোতাদের চোখ চকচক করে ওঠে। কিন্তু কেউ কিছু বলে না। ছোট শুয়ানের ভাত খাওয়া শেষ। তার গা দিয়ে দরদর করে ঘাম পড়ছে, মাথা দিয়ে ভাপ বেরুচ্ছে।

যেন হঠাৎ আলো দেখতে পেয়েছে এমনভাবে সাদা দাড়ি বলে ওঠে, "লাল-চক্ষুর জন্য খারাপ লাগে — পাগল! সে একটা আস্ত পাগল।"

বিশ বছরের যুবকটিও বলে ওঠে, "সে নিশ্চয়ই পাগল।"

খদ্দেরদের মধ্যে আবার প্রাণ ফিরে আসে। কথাবার্তা শুরু হয়। হৈচৈ-এর ভেতর ছেলেটি আবার বেদম কাশতে থাকে। খাং উঠে গিয়ে তার পিঠ চাপড়ে বলে :

"মহা ধন্বন্তরী। ছোট শুয়ান, এভাবে কাশবে না। মহা ধন্বন্তরী।"

মাথা নেড়ে কুঁজো বলে, "পাগল।"

৪

শহরের পশ্চিম ফটকের বাইরে দেয়াল ঘেষে যে জমিটুকু আছে তা একসময় খাস জমি ছিল। পথচারীরা শর্ট-কাট হিসেবে কোণাকুণি যে আঁকাবাঁকা পথ বানিয়েছে তা'ই এখন সীমানা। পথের বাম পাশে ফাঁসির আসামী বা জেলে অবহেলায় মারা যাওয়া বন্দীদের কবরস্থান। ডান পাশে ফকিরদের কবরস্থান। পথের দু'পাশে কবরের মাটির ঢিবিগুলো দেখে মনে হয় কোন বড়লোকের জন্মদিনের সাজানো রুটি।

সে বছর ছিং মিং উৎসবের সময়টা ছিল অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। শস্যকণার মত উইলো গাছে ছোট নতুন কুড়ি এসেছে। ভোরের আলো ফুটবার পরেই ডানে একটি নতুন কবরের পাশে চার থালা খাবার ও এক বাটি ভাত নিয়ে আসে বুড়ো শুয়ানের বউ। তারপর সেখানে বিলাপ করতে থাকে। কাগুজে টাকা পোড়ানোর পর সে সেখানে চুপচাপ বসে থাকে, যেন কারো জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু জানে না কার জন্য। বাতাসে তার ছোট্ট চুল উড়ছে। গতবারের চেয়ে চুল এবার আরো সাদা হয়েছে।

আর এক মহিলা এল। পাকা চুল, টুটা-ফাটা কাপড় পরণে। পুরনো, গোলাকার ঝুড়িতে ঝোলানো কাগুজে টাকা নিয়ে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। মাটিতে বসে বুড়ো শুয়ানের বউ তাকে দেখছে দেখতে পেয়ে তার ফ্যাকাশে মুখ লজ্জায় ঢেকে গেল। তবু সে সাহস করে বাম দিকের একটি কবরে গিয়ে মাটিতে ঝুড়ি রাখল।

সে কবরটি ছোট্ট শুয়ানের কবরের ঠিক উল্টো দিকে। মাঝখানে শুধু পথের ফারাক। সে মহিলাও চার থালা খাবার ও এক বাটি ভাত বিছিয়ে এবং কাগুজে

একজন। সে বসে বসে প্রেসক্রিপশন লিখছে।

কাগজের এক কোনায় লেখা দেখিয়ে সে শানের বউকে বলে: "প্রথমটি হচ্ছে শিশুরক্ষা বড়ি। এক মাত্র জিয়া বাড়ীর দোকানেই এগুলো কিনতে পাবে।"

কাগজটি হাতে নিয়ে চার নম্বর শানের বউ ভাবতে ভাবতে হাঁটতে থাকে। হতে পারে সে সাদাসিধে মহিলা। কিন্তু সে জানে হো ডাক্তারের বাড়ী, দোকান এবং তার বাড়ীর অবস্থান ত্রিভুজের মতো। তাই বাড়ী যাবার আগে ওষুধ কেনাই ভালো। সে তাড়াতাড়ি দোকানে যায়। ধীরে ধীরে প্রেসক্রিপশন পড়তে পড়তে দোকানদারও তার লম্বা নখ দেখায়, তারপর কাগজে মুড়ে দেয় ঔষধ। বাওএর-কে কোলে নিয়ে শানের বউ অপেক্ষা করতে থাকে। হঠাৎ ছোট্ট হাত তুলে বাওএর তার চুল ঠিক করে। সে আগে কখনো এটা করে নি। তার মা ভয়ে চুপসে যায়।

সূর্য বেশ উপরে উঠেছে। ছেলেকে কোলে নিয়ে এবং ঔষধ হাতে নিয়ে সে যত হাঁটছে ততই তার বোঝা ভারী মনে হচ্ছে। ছেলেও নড়াচড়া করছে। তাতে পথ মনে হচ্ছে আরো লম্বা। খানিক জিরিয়ে নেবার জন্য রাস্তার পাশে এক বড় বাড়ীর দুয়ারে তাকে বসতে হয়। গায়ের জামা কাপড় ঘামে লেপটে গেছে। মনে হয় বাওএর গভীর ঘুমে অচেতন। আবার উঠে দাঁড়াতেই ছেলেকে তার কাছে খুব ভারী মনে হয়। পাশ থেকে একজন বলে উঠে:

"চার নম্বর শানের বউ, তাকে আমার কাছে দাও।" মনে হল নীল-চামড়া আ উ'র গলা।

সে তাকিয়ে দেখে আ উ। ঘুম জড়ানো চোখে সে তাকে অনুসরণ করে চলেছে।

নিজেকে উদ্ধারের জন্য সে অলৌকিক কিছু ভাবলেও আ উ'কে আশা করে নি। আ উ'র ব্যবহারে একটা নাগর নাগর ভাব ছিল। সে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। অবশেষে কয়েকবার আপত্তি করে সে রাজী হয়ে যায়। বাওএরকে নেয়ার জন্য তার স্তন ও ছেলের মাঝখান দিয়ে হাত বাড়িয়ে চাপ দিতেই সে তার স্তনে একটা উষ্ণতা অনুভব করে। লজ্জায় তার কান পর্যন্ত লাল হয়ে যায়।

হাত দুয়েকের ব্যবধানে তারা হাঁটতে থাকে। আ উ অনেক কথাই বলে, যার অনেকগুলো চার নম্বর শানের বউ জবাব দেয় না। বেশী দূর না যেতেই সে ছেলেকে তার কাছে ফিরিয়ে দেয়। বলে আজ এ সময়ে এক বন্ধুর সঙ্গে খাওয়ার জন্য গতকাল তার কথা হয়েছে। শানের বউ বাওএরকে ফিরিয়ে নেয়। ভাগ্য ভালো, পথ খুব একটা বাকী ছিল না। সে দেখতে পায় পথের পাশে নয় নম্বর খালা ওয়াং বসে আছে। খালা জিজ্ঞেস করে:

"চার নম্বর শানের বউ, ছেলে কেমন আছে? ...... তুমি কি ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলে?"

"আমরা ডাক্তার দেখিয়েছি ...... খালা, তোমার ত বয়স হয়েছে এবং তুমি অনেক দেখেছ। খালা, তুমি কি তাকে একবার দেখবে এবং বলবে কি হয়েছে ......?"

"হ্যাঁ।"

"ভালো ......?"

"হ্যাঁ ......।"

বাওএরকে দেখার পর খালা ওয়াং দুবার সায় দিলেন দুবার মাথা নাড়লেন।

বাওএর ঔষধ খেতে খেতে দুপুর গড়িয়ে গেছে। চার নম্বর শানের বউ ভালো করে তাকিয়ে দেখে। ছেলেকে একটু সুস্থ মনে হয়। বিকেলে হঠাৎ চোখ মেলে সে ডাকে "মা"। তারপর আবার চোখ বন্ধ করে ফেলে। মনে হয় ঘুমুচ্ছে। ঘণ্টা খানেক ঘুমোয় নি। তার নাক ও কপাল ঘামতে থাকে। মা হাত দিয়ে দেখতেই তা আঠার মত হাতে লেগে যায়। ভয়ে সে বুকে হাত দিয়ে দেখে। তারপর ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

একটু পরেই তার দম চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। ফোঁপানো বাদ দিয়ে সে বিলাপ করতে থাকে। সহসাই লোকজন জড়ো হয়। ঘরের ভেতর আসে নয় নম্বর খালা ওয়াং, নীল-চামড়া আ উ। বাইরে জড়ো হয় শুভ শুঁড়ীখানার মালিকের মতো ভূস্বামী, লাল-নাক ওয়ালা গোং। নয় নম্বর খালা ওয়াং ফতোয়া দেয়, এক মালা কাগুজে টাকা পোড়াতে হবে। তারপর জামিন হিসেবে দুটি চৌকি ও পাঁচখানা কাপড় নিয়ে সে শানের বউয়ের জন্য দু টাকা ধার করে, যারা সাহায্য করছে তাদের খাওয়ার আয়োজন করতে।

প্রথম ঝামেলা কফিন তৈরী নিয়ে। তখনো শানের বউয়ের কাছে সোনার প্রলেপ দেয়া একটি রুপোর চুলের কাঁটা ও একজোড়া রুপোর কানের দুল আছে। সে সেগুলো শুভ শুঁড়ীখানার মালিকের হাতে তুলে দেয়। তার জন্যে জামিন হয়ে অর্ধেক নগদে এবং অর্ধেক বাকীতে একটা কফিন কেনার জন্য। নীল-চামড়া আ উ সাহায্যের হাত বাড়ায়, কিন্তু নয় নম্বর খালা ওয়াং তাতে কান দেয় না। তাকে শুধু পরদিন কফিন বহনের কাজ দেয়া হয়। "বুড়ী হারামজাদী" গাল দিয়ে সে সেখানে দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়াতে থাকে। মালিক চলে যায়। সন্ধ্যায় ফিরে এসে জানায় বিশেষভাবে কফিন তৈরী করতে হবে বলে তা কাল সকালের আগে তৈরী হবে না।

মালিক ফিরে আসতে আসতে সাহায্যকারীরা তাদের খাওয়া শেষ করেছে।

লুযেন পুরনো ঢংয়ের বলে তাবা রাত্রি এক প্রহর হবার আগেই ঘুমোতে বাড়ী চলে গিয়েছে। শুধু শুভ শুঁড়ীখানায় বসে মদ টানছে আ উ আর হেঁড়ে গলায় গান গাইছে বুড়ো গোং।

বিছানার পাশে বসে কাঁদছে চার নম্বর শানের বউ। বিছানায় শুয়ে আছে বাওএর, মাটিতে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে তাঁতযন্ত্র। অনেকক্ষণ কেঁদে কেটে চোখের জল শুকিয়ে গেলে সে চোখ মেলে চারিদিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে। সব কিছু অসম্ভব। তার মনে হয় "এটা একটা স্বপ্ন। শুধুই স্বপ্ন। কাল সকালে জেগে উঠলে দেখব বাওএর আমাকে জড়িয়ে শুয়ে আছে। তার পর সে জেগে উঠে ডাকবে 'মা'। বাঘের বাচ্চার মত লাফিয়ে নীচে নামবে খেলার জন্য।"

অনেকক্ষণ আগে বুড়ো গোং গান বন্ধ করেছে। শুভ শুঁড়ীখানার বাতিও নিভে গেছে। শানের বউ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যা ঘটে গেছে তা তার বিশ্বাস হচ্ছে না। মোরগ ডাকছে। পূর্বের আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকছে দিনের আলো।

ধীরে ধীরে ভোরের রূপোলী আলো তামাটে হয়ে আসে। সূর্যের আলো এখন ঘরের চালের ওপর। চার নম্বর শানের বউ ঠায় বসে আছে। দরজায় টোকা পড়তেই সে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। পিঠে বোঝা নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে অচেনা এক লোক। তার পেছনেই নয় নম্বর খালা ওয়াং।

ওহ। তা হলে সে কফিন নিয়ে এসেছে।

সে দিন বিকেল পর্যন্ত কফিন বন্ধ করা যায় নি। কারণ শানের বউ কাঁদতে কাঁদতে এক একবার গিয়ে ছেলের মুখ দেখে আর কফিন বন্ধ করার কথা উঠলেই বারণ করে। ভাগ্যভালো, নয় নম্বর খালা ওয়াং অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে পড়ে। রেগে গিয়ে খালা তাকে টেনে সরিয়ে নেয়। তারপর তারা তাড়াতাড়ি কফিন বন্ধ করে দেয়।

বাওএর-এর জন্য যা কিছু সম্ভব, চার নম্বর শানের বউ সব করেছে। কোন কিছু বাদ রাখে নি। আগের দিন সে একমালা কাগুজে টাকা পুড়িয়েছে। আজ সকালে পুড়িয়েছে 'মহা করুণা মন্ত্রের' ৪৯টি মন্ত্র। কফিনে দেয়ার আগে সবচে নতুন কাপড় পরিয়েছে। বালিশের কাছে রেখে দিয়েছে তার প্রিয় খেলনাগুলো—ছোট্ট মাটির পুতুল, দুটো কাঠের বাটি, দুটো শিশি। নয় নম্বর খালা ওয়াং বার বার আঙ্গুলে গুণলেও, কোন কিছু বাদ পড়েছে বের করতে পারেন নি।

নীল-চামড়া আ উ সারাদিনে একবারও দেখা দেয় নি। তাই কফিন বহন ও কবর খোঁড়ার জন্য মাথাপিছু ২১০ পয়সার বিনিময়ে শুভ শুঁড়ীখানার মালিক

দু'জন লোক ভাড়া করে। খালা ওয়াং খাওয়া তৈরিতে সাহায্য করে। যারা আঙ্গুল নেড়েছে বা মুখ খুলেছে সবাই দাওয়াত পায়। সূর্য ডোবার সময় হলে মেহ-মানরাও বাড়ী ফেরার কথা বলে। এবং সবাই বাড়ী চলে যায়।

প্রথম দিকে চার নম্বর শানের বউয়ের মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। একটু জিরানোর পর সেটা কেটে যায়। তখনি তার কাছে সবকিছু অবাক লাগে। তার জীবনে যা কখনো ঘটে নি, যা কখনো ঘটবে বলে সে ভাবে নি, তা'ই ঘটে গেছে। যতই ভাবছে, ততই তার অবাক হবার পালা। আরেকটা জিনিষ তার কাছে খুব অবাক লাগছে—হঠাৎ একটা বিশাল নীরবতা নেমে এসেছে পুরো ঘরের ভেতর।

উঠে বাতি জ্বালাতেই ঘরটাকে আরো নীরব মনে হয় তার কাছে। হাতড়ে গিয়ে সে দরজা বন্ধ করে, ফিরে এসে বিছানায় বসে। মেঝের উপর পড়ে আছে তাঁতটি। সে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকার ক্ষমতা তার নেই। ঘরটা শুধু নীরব নয়, হঠাৎ বড়ো হয়ে গেছে, জিনিষপত্র কমে গেছে। এই বড়ো ঘর তাকে ঘিরে আছে। বিশাল শূন্য-তায় তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

সে জানে তার বাওএর সত্যিই মরে গেছে। ঘরকে সহ্য করতে না পেরে সে ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। তারপর কাঁদতে থাকে ও ভাবতে থাকে। মনে পড়ে তাঁত বোনার সময় কেমন করে বাওএর তার পাশে বসে থাকত, মৌরী-মশলা দেয়া মটরশুঁটি খেত। ছোট্ট কালো চোখ দিয়ে সে গভীরভাবে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকত। হঠাৎ বলে উঠত, "মা! বাবা হুন ডুন[3] বিক্রী করতেন। বড় হয়ে হুন ডুন বিক্রী করে আমি অনেক টাকা পাব। সবটাকাই তোমাকে দিয়ে দেব।"

এসময় প্রতি ইঞ্চি সূতো তার কাছে দামী এবং জীবন্ত মনে হোত। কিন্তু এখন? শানের বউ কখনো বর্তমান নিয়ে ভাবে নি—কেননা সে সাদাসিধে মহিলা। কি সমাধানের কথাই বা সে ভাববে? সে শুধু জানে এই ঘর খুব বড়ো, খুব ফাঁকা এবং নীরবতায় ভরা।

চার নম্বর শানের বউ সাদাসিধে মহিলা হলেও সে জানে মৃতের দেহে আর প্রাণ আসবে না। ছেলে বাওএরকে সে আর কখনো দেখবে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলে: "বাওএর তুমি নিশ্চয়ই এখানে আছ। আমাকে স্বপ্নে দেখা দাও।" তারপর সে চোখ বন্ধ করে তখনই স্বপ্নে বাওএরকে দেখার আশায়। বিশাল নীরব-তা, শূন্যতা ও বিশালত্বের মধ্যে সে নিজের নিশ্বাস শুনতে পায়।

অবশেষে চার নম্বর শানের বউ ঝিমুতে থাকে। পুরো ঘরটা নিশ্চুপ। লাল

নাকওয়ালা গোং-এর লোকগীতি অনেক আগে বন্ধ হয়ে গেছে। শুভ শুঁড়ীখানা থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে আসার সময় সে হেঁড়ে গলায় গাইছে :

"তোমার জন্য দয়া হয়
আমার প্রেমিকা
তুমি বড় একেলা ......"

নীল-চামড়া আ উ বুড়ো গোং-এর ঘাড়ে হাত রাখে। তারপর দুই মাতাল হাসতে হাসতে চলে যায়।

শানের বউ ঘুমিয়ে আছে। বুড়ো গোং এবং অন্যেরা চলে গেছে। শুভ শুঁড়ী-খানার দরোজা বন্ধ। সমস্ত লুযেন শহরে এক গভীর নীরবতা। ভোরের আশায় নীরব রাত এগিয়ে চলেছে। এবং অন্ধকারে লুকানো কিছু কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।

জুন, ১৯২০

টীকা

1. ছোট্ট রৌপ্যমুদ্রা ছিল ছিং রাজবংশের সম্রাট স্যুযান থোং (১৯১০)-এর শাসনামলে চালু মুদ্রা। তৎকালীন দশ রৌপ্যমুদ্রা বর্তমান এক ইউয়ানের সমান। তাম্রমুদ্রা ছিং রাজবংশের সম্রাট গুয়াং স্যুর (১৯০০) শাসনামলে চালু মুদ্রা। তৎকালীন একশো তাম্রমুদ্রা বর্তমান এক ইউয়ানের সমান।

2. পুরনো চীনারা বিশ্বাস করত পাঁচটি উপাদান আছে: আগুন, কাঠ, মাটি, ধাতু এবং পানি। আগুন ধাতুকে জয় করতে পারে। ঐতিহ্যবাহী চীনা ডাক্তাররা মনে করতেন হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, প্লীহা ও মুত্রগন্থি এই পাঁচ উপাদানের অনুরূপ। এখানে হো ডাক্তার বলছেন হৃদরোগের জন্য ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

3. হুন ডুন এক ধরণের চীনা খাবার। ভেতরে মাংস ও সব্জি থাকে। স্যুপে ভিজিয়ে খেতে হয়।

একটি ছোট্ট ঘটনা

গ্রাম থেকে রাজধানীতে এসেছি ছয় বছর। এর মাঝে তথাকথিত রাষ্ট্রীয় ব্যাপার-স্যাপার অনেক দেখেছি, শুনেছি। কিন্তু কোন কিছুই আমার মনে গভীর দাগ কাটে নি। আমার ওপর এর প্রভাবের কথা বলতে গেলে এসব ঘটনায় আমার মেজাজ আরো বিগড়ে গেছে। এবং সত্যি বলতে কি মানুষের প্রতি ঘৃণাও বেড়েছে।

এর মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমার মেজাজ ঠাণ্ডা করে দেয়। আজ পর্যন্ত আমি তা ভুলতে পারি না।

ঘটনাটি ঘটেছে ১৯১৭ সালের শীতকালে। জীবন ধারণের জন্য কনকনে উত্তুরে বাতাসের মধ্যে আমাকে ভোরে উঠে বাইরে বেরুতে হোত। কদাচিৎ রাস্তায় দু' একজন চোখে পড়ত। 'S' গেটে যাবার রিকশা পাওয়া ছিল এক কষ্টকর ব্যাপার।

যেদিনের ঘটনা সেদিন বাতাস একটু পড়ে গিয়েছিল। সমস্ত ধূলো উড়ে গিয়ে রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। রিকশাওয়ালাও পা চালিয়ে দিয়েছে। 'S' গেটের কাছাকাছি আসতেই রাস্তা পেরুতে গিয়ে একজন আমাদের রিকশার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নীচে পড়ে গেল।

পথচারী একজন মহিলা। চুলে কিছু কিছু পাক ধরেছে। পরণে টুটাফাটা কাপড়। কোন ইশারা না দিয়েই সে রিকশার সামনে এসে পড়ে। রিকশাওয়ালা পথ করে দিলেও তার বোতাম খোলা ছেঁড়া জ্যাকেট হাওয়ায় রিকশার শ্যাফটে আটকে যায়। ভাগ্যভালো, রিকশাওয়ালা তাড়াতাড়ি রিকশা সরিয়ে নেয়। না হলে সে বেকায়দায় পড়ে গিয়ে আরো মারাত্মক আঘাত পেত।

মহিলা মাটিতে পড়ে আছে। রিকশাওয়ালা থেমে গেছে। আমি ভাবি নি সে আঘাত পেয়েছে। এবং এ ঘটনার কোন সাক্ষীও ছিল না। রিকশাওয়ালার

গায়েপড়া ভাব আমার কাছে ভাল লাগলো না। মনে হল সে বিপদে পড়বে এবং আমার দেরী হয়ে যাবে।

আমি বললাম : "ঠিক আছে, চল।"

সে কান দিল না। বোধ হয় শুনে নি। সে রিকশা রেখে ধীরে ধীরে মহিলাকে উঠতে সাহায্য করে। এক হাতে তাকে ধরে জিজ্ঞেস করে :

"চোট লেগেছে?"

"হ্যাঁ।"

আমি দেখেছি কত ধীরে সে পড়েছে। তাই নিশ্চিত ছিলাম চোট লাগে নি। এই ভান করা বিরক্তিকর। রিকশাওয়ালা নিজের বিপদ ডেকে এনেছে। তাকে নিজের ঝামেলা নিজে সারতে হবে।

মহিলা চোট লাগার কথা বলতেই রিকশাওয়ালা আর একমিনিটও ইতস্তত: করে নি। তার হাত ধরে তাকে সামনে নিয়ে যায়। আমার অবাক হবার পালা। সামনে তাকিয়ে দেখি পুলিশ ফাঁড়ি। তীব্র বাতাসের জন্য বাইরে কেউ ছিল না। তাই রিকশাওয়ালা সেই বুড়ী মহিলাকে গেটের দিকে নিয়ে যায়।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে পেয়ে বসে। মনে হল সে মুহূর্তে তার ধূলোমাখা, অপসৃত শরীর লম্বা হয়ে গেছে। যত সে হাঁটছে, ততই তাকে মরীচিকার মত মনে হচ্ছে। বাধ্য হয়ে আমাকে ভালো করে তাকাতে হল। সে সময়ে আমার মনে হল পশমের তৈরী গাউনের নীচে আমার যে স্বত্বা তাকে সে গ্রাস করবে।

পুলিশ না আসা পর্যন্ত সেখানে বসে থাকতে থাকতে মনে হল আমার জীবনীশক্তি ফুরিয়ে গেছে, মন উধাও হয়ে গেছে। তারপর আমি রিকশা থেকে নেমে পড়ি।

পুলিশ আমার কাছে এসে বলে, "আরেকটি রিকশা দেখুন। সে আর আপনাকে টানতে পারবে না।"

কিছু না ভেবেই, পকেট থেকে বেশ কিছু পয়সা বের করে পুলিশের হাতে দিয়ে বলি, "তাকে এগুলো দেবেন।"

বাতাস পুরো পড়ে গেছে। কিন্তু রাস্তা তখনো নীরব। ভাবতে ভাবতে আমি হাঁটছি, কিন্তু নিজের কথা ভাবতেই আমার খুব ভয় হচ্ছে। যা ঘটেছে তা বাদ দিয়ে, বেশী পয়সা দিয়ে আমি কি বোঝাতে চেয়েছি? এটা কি পুরস্কার? রিকশাওয়ালাকে বিচার করার আমি কে? আমি কোন জবাব খুঁজে পেলাম না।

এখন পর্যন্ত এ ঘটনা আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রায়ই আমার কষ্ট হয় এবং এটা আমাকে নিজের সম্পর্কে ভাবিয়ে তোলে।

ছোটবেলায় পড়া চিরায়ত সাহিত্যের মত সে সময়ের সামরিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী আমি সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। তবু এই ঘটনা বার বার আমার মনে ফিরে আসে। বাস্তবের চেয়েও অনেক জীবন্ত। আমাকে লজ্জা দেয়, শোধরানোর প্রেরণা দেয় এবং নতুন শক্তি ও সাহস জোগায়।

জুলাই, ১৯২০

টাকা জ্বালিয়ে বিলাপ করছে দেখতে পেয়ে বুড়ো শুয়ানের বউ ভাবল : "সে কবরে নিশ্চয়ই তার ছেলে আছে।" বুড়ো মহিলা উদ্দেশ্যহীনভাবে কয়েক পা এগিয়ে চারিদিকে এলোমেলো তাকাল। তারপর হঠাৎ টলতে টলতে পিছিয়ে আসতে লাগল, যেন মাথা ঘুরছে।

বেদনায় সে ভারাক্রান্ত মনে করে বুড়ো শুয়ানের বউ পথ পেরিয়ে তার কাছে গিয়ে নীরবে বলে, "দুঃখ করো না, চল বাড়ী যাই।"

সে সায় দিল। কিন্তু তখনো একদিকে তাকিয়ে আছে। বিড় বিড়িয়ে বলে : "দেখ। ওটা কি?"

বুড়ো শুয়ানের বউ দেখতে পায় সামনের কবরে তখনো ঘাস গজায় নি। ময়লা মাটি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু একটু ভালো করে তাকাতেই তার অবাক হবার পালা। দেখতে পায় মাটির ঢিবির ওপর সাদা-লাল ফুলের তোড়া।

তাদের দু'জনেরই চোখের নজর কম। তবু তারা সাদা-লাল ফুল স্পষ্ট দেখতে পায়। খুব বেশী নয়, কিন্তু গোল করে সাজানো, খুব তাজা নয় কিন্তু সুন্দর। ছোট্ট শুয়ানের মা তাকিয়ে নিজের ছেলের কবর দেখতে পায়। প্রায় অন্যসবগুলোর মত তার ছেলের কবরেও গুটি কয়েক শুকনো ফুল। হঠাৎ তার মনে হল সবকিছুই অর্থহীন এবং ফুলের তোড়া সম্পর্কে তার উৎসাহ দমে যায়।

ইতোমধ্যে আরো খুঁটিয়ে দেখার জন্য বুড়ী কবরের কাছে গেছে। সে নিজে নিজে বলতে থাকে, "এগুলোর কোন শেকড় নেই। এগুলো এখানে জন্মাতে পারে না। কে এসেছিল? ছেলেমেয়েরা এখানে খেলতে আসে না, আত্মীয়-স্বজনরাও কখনো আসে না। ব্যাপারটা কি হতে পারে?" তার কাছে ব্যাপারটা ধাঁধার মত মনে হয়। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে এবং সে বিলাপ করতে থাকে :

"বা'জান, সবাই তোর প্রতি জুলুম করেছে। তুই তা ভুলতে পারিস নি। সে দুঃখ জানানোর জন্যই কি তুই আজ এই কেরামতি দেখিয়েছিস?"

সে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। কিন্তু দেখতে পায় শূন্য ডালে বসে আছে শুধু একটি কাক। সে বলতে থাকে : "আমি জানি। তারা তোকে খুন করেছে। কিন্তু বিচারের দিন মালিক তার বিচার করবেন। বা'জান, শান্তিতে ঘুমা ...... তুই যদি সত্যিই এখানে আমার কথা শুনে থাকিস, তা হলে ঐ কাকটি তোর কবরের উপর দিয়ে উড়ে যাক।"

বাতাস পড়ে গেছে অনেকক্ষণ। তামার তারের মত শুকনো ঘাসগুলো শক্ত ও খাড়া হয়ে আছে। একটি ক্ষীণ, ভীরু শব্দ বাতাসে ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে

যায়। চারিদিকে মৃত্যুর নীরবতা। তারা শুকনো ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি তাদের কাকটির দিকে। গাছের ডালে কাকটি লোহার মত চুপচাপ বসে আছে।

সময় কেটে যায়। ছেলে-বুড়ো সহ অনেকে আসে কবর জেয়ারতে।

বুড়ো শুয়ানের বউ-এর মনে হয় তার বুক থেকে একটি ভারী বোঝা নেমে গেছে। চলে যাবার জন্য সে বুড়ীকে বলে :

"চল যাই।"

বুড়ী দীর্ঘ শ্বাস ফেলে। তারপর উদাসভাবে তুলে নেয় খাবার ও ভাত। এক মুহূর্ত ইতস্তত: করে সে ধীরে ধীরে চলতে থাকে। তখনো সে বিড় বিড় করছে :

"এর মানে কি?"

তারা ত্রিশ কদমও যায় নি। পেছনে শুনতে পায় কাকের ডাক। থতমত খেয়ে পেছনে তাকায়। দেখতে পায় পাখা মেলে কাকটি তীরের মত, দূর দিগন্তের দিকে উড়ে যাচ্ছে।

এপ্রিল, ১৯১৯

আগামী কাল

"টু শব্দটি নেই — ছেলেটার কি হয়েছে?"

বলতে বলতে পাশের বাড়ীর দিকে মাথা ঝাঁকায় লাল নাকওয়ালা বুড়ো গোং। তার হাতে এক বাটি হলদে মদ। নীল-চামড়া আ উ নিজের বাটি রেখে বুড়ো গোং-এর পিঠে জোরে গুঁতো মারে।

সে গর্জন করে উঠে, "বাহ ...... আবার ন্যাকামি শুরু হয়েছে।"

উল্টো পথে চলে লুযেন এখনো পুরনো ঢংয়ের শহর। রাত্রি এক প্রহর হবার আগেই লোকজন দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ে। মাঝরাত পর্যন্ত জেগে থাকে দু'টি বাড়ীর লোকজন। "শুভ শুঁড়িখানা" যেখানে কিছু পেটুক ঘুর ঘুর করে এবং পাশের বাড়ী যেখানে চার নম্বর শানের বউ থাকে। দু'বছর আগে বিধবা হবার পর থেকে এই মহিলার তেমন কিছু নেই। আছে পেট চালানোর মত একটা তাঁত এবং তিন বছরের ছেলে। এজন্যেই সে রাত করে ঘুমোয়।

গত ক'দিন ধরে তাঁতের কোন শব্দ নেই। মাঝরাত অবধি দুটো বাড়ীর লোকজন জেগে থাকে বলে বুড়ো গোং এবং অন্যেরা বুঝতে পারে চার নম্বর শানের বউয়ের বাড়ী থেকে কোন শব্দ আসছে কি না।

গুঁতো খেয়েও বুড়ো গোংকে স্বাভাবিক মনে হয়। মদে বড় করে চুমুক দিয়ে সে বাঁশীতে লোকসুর বাজাতে শুরু করে।

চোখের মণি বাওএরকে কোলে নিয়ে বিছানার ধারে বসে আছে চার নম্বর শানের বউ। মেঝেতে পড়ে আছে তাঁত। টিমটিমে বাতির আলো পড়েছে বাওএর-এর মুখে। জ্বরাক্রান্ত মুখ বিবর্ণ। শানের বউ ভাবতে থাকে: "আমি মন্দিরে পূজো দিয়েছি। ভগবানের কাছে কসম খেয়েছি, সে মহা ধন্বন্তরী খেয়েছে। তবু ভালো না হলে কি করব? তাকে হো সিয়াওসিয়ান ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু রাতেই বাওএর-এর অবস্থা খারাপ হয়। কাল ভোরে সূর্য

উঠলে হয়ত তার জ্বর ছেড়ে যাবে, সে দম ফেলতে পারবে। অনেক বালাই'ই এমন।"

চার নম্বর শানের বউ সাদাসিধে মহিলা। সে জানে না 'কিন্তু' শব্দ কত ভয়ংকর। এ শব্দের জন্যেই বহু খারাপ ভালো হয় এবং বহু ভালো খারাপ হয়ে যায়। গরমের রাত ছোট। বুড়ো গোং এবং অন্যেরা গান বন্ধ করতে না করতেই পূবের আকাশ ফর্সা হয়ে ওঠে। জানালার ফাঁক দিয়ে ভেতরে আসে ভোরের আলো।

ভোরের আশায় বসে থাকা অন্যদের মত শানের বউয়ের কাছে সহজ ব্যাপার নয়। সময় যেন কাটতেই চায়না : বাওএর একবার দম ফেলে তার মনে হয় এক বছর কেটে গেল। কিন্তু অবশেষে চারদিকে ফর্সা হয়ে এসেছে। দিনের আলো গ্রাস করে বাতির আলো। দম ফেলার চেষ্টা করতেই বাওএর-এর নাক কেঁপে ওঠে।

চার নম্বর শানের বউ কান্না চেপে ধরে। সে জানে এটা অমঙ্গলের চিহ্ন। ভাবতে থাকে কি করবে? একমাত্র আশা তাকে হো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া। সাদাসিধে হলেও, তার নিজের মনোবল আছে। উঠে দাঁড়িয়ে আলমারীর কাছে গিয়ে সে পুরো টাকা বের করে—সর্বসাকুল্যে ১৩ রৌপ্যমুদ্রা ও ১৮০ তাম্রমুদ্রা।[1] টাকা পকেটে রেখে দরজা বন্ধ করে সে যত জলদি সম্ভব বাওএরকে নিয়ে যায় হো ডাক্তারের বাড়ী।

সকাল সকাল হলেও চার রোগী তখনই অপেক্ষা করছে। চল্লিশ পয়সা দিয়ে সে নাম লেখায়। পাঁচ নম্বরে বাওএর-এর পালা। ছেলের নাড়ী দেখার জন্য হো ডাক্তার হাত বাড়িয়ে দেয়। তার নখগুলো চার ইঞ্চি লম্বা। শানের বউ ভাবতে থাকে, "আমার বাওএর-এর কপালজোর, বেঁচে যাবে।" কিন্তু তার দুশ্চিন্তা আগের মতই। ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞেস না করে পারে না :

"ডাক্তার, আমার বাওএর-এর কি হয়েছে?"

"হজমের নালী বন্ধ হয়ে গেছে।"

"খুব কি কঠিন রোগ? সে কি......?"

"এই দুই প্রেসক্রিপশন্ দিয়ে শুরু কর।"

"সে দম ফেলতে পারে না, তার নাক কাঁপছে।"

"আগুন ধাতুকে বশ মানায়......"[2]

কথা শেষ না করেই হো ডাক্তার চোখ বন্ধ করেন; চার নম্বর শানের বউয়েরও আর কিছু বলতে ইচ্ছে হয় না। ডাক্তারের উল্টো দিকে বসে আছে ত্রিশ বছরের

চায়ের কাপে ঝড়

নদীর কিনারায় সূর্যের উজ্জ্বল হলদে আভা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে। রিঠা গাছের রৌদ্রদগ্ধ পাতাগুলো দম ফেলার সুযোগ পায়। গাছের নীচে চিতা মশার দল ভন ভন করছে। নদীর ধারে কৃষকদের রান্নাঘরের চিমনির ধোঁয়া মিলিয়ে যাচ্ছে। মহিলা ও শিশুরা দরোজার বাইরে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে এবং ছোট টেবিল, চৌকি বের করেছে। বোঝা যায় এখন সান্ধ্য খাবারের সময়।

বুড়ো ও পুরুষরা বসেছে চৌকির ওপর। গল্প করতে করতে তারা বাতাস করছে চেটাল পাতার পাখা দিয়ে। বাচ্চারা ঘোরাঘুরি করছে অথবা রিঠা গাছের নীচে এক্কাদোক্কা খেলছে। মহিলারা টেবিলের ওপর গরম কালো শুকনো সব্‌জি ও হলদে ভাত সাজিয়ে দিয়েছে। নদীতে প্রমোদতরীতে ছিল কয়েকজন পণ্ডিত। এ সব দেখে শুনে তাদের ভাব উথলে ওঠে। তারা চীৎকার করে উঠে: "আহা, কোন ঝামেলা নেই! এটাই গ্রামীণ জীবনের শান্তি।"

পণ্ডিতরা একটু বাড়িয়েই বলেছিল। তারা শুনতে পায়নি বুড়ী জিউজিন[1] কি বলছে। রাগে গরগর করতে করতে বুড়ী ছেঁড়া চেটাল পাখা দিয়ে চৌকির পায়ায় আঘাত করে বলে:

"আমি ৭৯ বছর বেঁচেছি। যথেষ্ট। বসে বসে সবকিছু গোল্লায় যাওয়া দেখতে চাইনা — তার'চে মরণ ভালো। খাওয়ার সময় হয়েছে, তবু তারা ভাজা মটর-শুঁটি খাচ্ছে, বাড়ীঘর সব খেয়ে ফেলবে!"

বুড়ীর প্রপৌত্রী লিউজিন মটরশুঁটি হাতে তার দিকেই দৌড়ে আসছিল। কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখেই আবার নদীর কিনারায় দৌড়ে গিয়ে রিঠা গাছের পেছনে লুকোয়। তারপর ছোট্ট মাথার বেণীজোড়া দুলিয়ে চীৎকার করে: "আহ, বুড়ীর মরণ নাই!"

বুড়ী জিউজিনের অনেক বয়স হলেও, সে কানে খাটো নয়। বুড়ী শুনতে

পায়নি মেয়েটি কি বলেছে। সে নিজের মনেই বিড়বিড়িয়ে বলতে থাকে: "গেছে দিন ভালো দিন।"

এ গ্রামে একটা অসাধারণ নিয়ম চালু আছে। ছেলে-মেয়ের জন্ম হলে মায়েরা ওজন করে ওজন দিয়ে নাম রাখে। ৫০ তম জন্মদিন পালন করার পর থেকে বুড়ী জিউজিন খুঁত ধরতে শুরু করেছে। সবসময় বলবে তার যৌবনে গরমের দিনে এত গরম ছিল না, মটরশুঁটিগুলো এত শক্ত ছিল না। সংক্ষেপে বলা যায়, এই কলিকালে কিছু একটা দারুণ গোলমাল লেগেছে। না হলে, লিউজিনের ওজন কেন তার প্রপিতামহের চেয়ে তিন জিন এবং বাবার চেয়ে এক জিন কম হবে? এ প্রমাণ উল্টানো যাবে না। তাই সে জোর দিয়ে বার বার বলে: "গেছে দিন ভালো দিন।"

তার পৌত্র-বধু ছিজিন সবে টেবিলে ভাতের ঝুড়ি নিয়ে এসেছে। টেবিলের ওপর তা ঢাকতে ঢাকতে সে রাগে বলতে থাকে: "তুমি আবার এসেছ? লিউ-জিনের জন্মের সময় তার ওজন হয়েছিল সাড়ে ছয় জিন, নয়কি? তোমার বাড়ীতে দাড়ি-পাল্লার পাথরের ওজন বেশী, আঠারো লিয়াং-এ এক জিন। ষোল লিয়াং-এ এক জিনের পাথর হলে লিউজিনের ওজন সাত জিনের বেশী হোত। আমার মনে হয় না দাদা এবং বাবার ওজন সত্যি নয় জিন বা আট জিন হয়েছিল। সম্ভবতঃ সে আমলে এক জিন ছিল চৌদ্দ লিয়াং......"

"গেছে দিন ভালো দিন।"

ছিজিনের বউ জবাব দেবার আগেই গলির মাথায় স্বামীকে দেখতে পায়। রাগ গিয়ে পরে স্বামীর ওপর: "ঢিলা কোথাকার, এত দেরী হল কেন? সারা দিন কোথায় ছিলে? খাওয়া নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকি তাতে তোমার কিছু যায় আসে না।"

গ্রামে থাকলেও ছিজিন সবসময় নিজের ভালো করতে চেয়েছে। দাদার আমল থেকে তিনপুরুষে তার পরিবারের কেউ নিড়ানি ধরেনি। বাপের মতই সে নৌকো চালায়। সকালে লুযেন থেকে শহরে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে আসে। তাই সে দিন দুনিয়ার খবর ভালোই জানে। যেমন, বাজ-দেবতা কোথায় কেন্নো আত্মাকে মেরেছে, কোথায় কুমারী মাতা দৈত্য প্রসব করেছে। এ নিয়ে গাঁয়ে নাম থাকলেও, তার পরিবার গাঁয়ের নিয়ম কানুন মেনে চলে এবং গরমে সান্ধ্য-ভোজের জন্য বাতি জ্বালায় না। তাই দেরী করে ফিরলে তাকে গাল শুনতে হবে।

ছিজিনের এক হাতে ফুটকি দেয়া বাঁশের লগি। ছয়ফুটের চেয়ে লম্বা। লগির মাথায় হাতির দাঁতের ও দস্তার কাজ করা। মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে হেঁটে

গিয়ে সে একটি চৌকির ওপর বসে। সুযোগ বুঝে লিউজিন বেরিয়ে এসে তার পাশে বসে পড়ে। সে কথা বলতে থাকে, কিন্তু জবাব পায় না।

বুড়ী জিউজিন বিড়বিড় করতে থাকে : "গেছে দিন ভালো দিন।"

ছিজিন ধীরে মাথা তুলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে : "সম্রাট আবার সিংহাসনে বসেছেন।"

ছিজিনের বউ হঠাৎ বোবা বনে যায়। তার পর বুঝতে পেরে আনন্দে চীৎকার করে ওঠে : "ভালো কথা! সম্রাট আবার ক্ষমা ঘোষণা করবেন, নয় কি?"

ছিজিন আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে : "আমার কোন বেণী নেই।"

"সম্রাট কি বেণী রাখতে চান?"

"হ্যাঁ।"

ছিজিনের বউ বিচলিত হয়ে পড়ে। সে জানতে চায়, "তুমি কেমন করে জান?"

"শুভ-শুঁড়ীখানায় সবাই তাই বলে।"

ছিজিনের বউ বুঝে নেয় অবস্থা বেগতিক। শুভ-শুঁড়ীখানাই সব খবরের আড্ডা। ঘৃণা এবং ক্ষোভের সঙ্গে সে স্বামীর নেড়া মাথার দিকে তাকায়। তার পর হাল ছেড়ে দিয়ে থালায় ভাত ভর্তি করে তার সামনে শব্দ করে রাখে, "তাড়াতাড়ি খাও। কাঁদলে তোমার বেণী গজাবে না।"

সূর্যের শেষ আলোটুকু মিলিয়ে গেছে। কালো জল ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। নদীর পাড়ে হাঁড়ি-পাতিলের টুংটাং শব্দ শোনা যাচ্ছে, সেখানে লোক-জনের পিঠে ঘাম বেরিয়ে গেছে। ছিজিনের বউ তিন বাটি ভাত শেষ করেছে এমন সময় কিছু একটা দেখতে পেয়ে তার হৃৎকম্প বেড়ে যায়। রিঠা গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সাঁকোর ওপর মিঃ যাও-এর ছোটখাটো মোটা শরীর দেখা যাচ্ছে। তার পরণে নীল রংয়ের সুতী গাউন।

মিঃ যাও পাশের গ্রামের সমৃদ্ধ শুঁড়ীখানার মালিক। আশেপাশের দশ মাইলের মধ্যে তিনিই একমাত্র নামকরা ব্যক্তি এবং একটু লেখাপড়া জানেন। এই লেখা-পড়া তাঁর বিগত যুগের এক ধরনের মেজাজের কারণ হয়েছে। তাঁর কাছে জিন শেংথান[2] এর টীকা লেখা "তিন রাজ্যের কাহিনী"-এর বারো খণ্ড বই আছে। এগুলো তিনি অক্ষর ধরে ধরে বার বার পড়েন। তিনি পঞ্চ ব্যাঘ্র সেনাপতি-দের[3] নাম জানেন এবং হুয়াং যোং হানশেং হিসেবে এবং মা ছাও মেংছি হিসেবে পরিচিত একথাও বলতে পারেন। বিপ্লবের পর তাও ধর্মযাজকদের মত তিনি চুলের বেণীকে মাথার ওপর কুণ্ডলী পাকিয়েছেন এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন

যাও ইয়ুন বেঁচে থাকলে সাম্রাজ্যের এই দশা হতো না।

ছিজিনের বউয়ের চোখের নজর ভালো। তাই সে দেখতে পায় আজকে মিঃ যাও তাও ধর্মযাজকদের মত চুল বাঁধেন নি। তাঁর মাথার সামনের দিকটা নেড়া এবং বেণী দুলছে। সে বুঝতে পারে সম্রাট সিংহাসনে বসেছেন, বেণী জরুরী হয়ে পড়েছে এবং ছিজিনের মহাবিপদ। বিনাকারণে মিঃ যাও তাঁর লম্বা গাউন পরেন নি — গত তিন বছরে তিনি এটা মাত্র দুবার পরেছেন। একবার যখন তাঁর শত্রু বসন্তের দাগওয়ালা আহ্ সি রোগে পড়েছে, আর একবার যখন তাঁর শুঁড়ীখানা গুড়িয়ে দেয়া মিঃ লু মারা গেছে। আজকে তৃতীয় বারের মত পরেছেন। নিশ্চয়ই তাঁর জন্য আনন্দের এবং শত্রুদের জন্য ক্ষতিকর কিছু একটা ঘটেছে।

ছিজিনের বউয়ের মনে পড়ে দু বছর আগে মাতাল হয়ে তার স্বামী মিঃ যাওকে "হারামজাদা" বলে গাল দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারে তার স্বামীর মহাবিপদ এবং তার বুক কাঁপতে থাকে।

মিঃ যাও পাশ কাটানোর সময় লোকজন উঠে দাঁড়ায় এবং ভাতের বাটির দিকে কাঠি-তাক করে বলে : "আসুন, খেতে বসুন মিঃ যাও।"

মিঃ যাও মাথা নেড়ে সবাইকে বলেন : "আপনারা খান।" তিনি সোজা চলে যান ছিজিনের টেবিলে। তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য সবাই উঠে দাঁড়ায়। মুচকি হেসে মিঃ যাও বলেন : "খেতে থাকো।" টেবিলের ওপর খাওয়ার দিকেও তিনি একবার চোখ বুলিয়ে নেন।

"শুকনো সবজিগুলোর বেশ সুবাস — খবর শুনেছ?" ছিজিনের বউয়ের উল্টো দিকে ছিজিনের পেছনে মিঃ যাও দাঁড়িয়ে ছিলেন।

ছিজিন বলে : "সম্রাট সিংহাসনে বসেছেন।"

মিঃ যাও-র অভিব্যক্তি দেখে ছিজিনেব বউ জোর করে হাসে। সে জিজ্ঞেস করে : "সম্রাট সিংহাসনে বসেছেন। কখন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করবেন?"

"সাধারণ ক্ষমা? — ঠিক সময়েই সাধাবণ ক্ষমা ঘোষিত হবে।" মিঃ যাও-এর গলা কঠোর হয়ে আসে। "ছিজিনের বেণীর কি হবে? সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। তুমি জান লম্বাচুলের[4] আমলের কথা : চুল রাখ মাথা যাবে, মাথা রাখ চুল যাবে

ছিজিন এবং তার বউ কখনো লেখাপড়া করেনি, তাই তারা এসবের কিছু জানে না। তাদের মনে হয় যেহেতু মিঃ যাও বলেছেন, তাই ব্যাপারটা গুরুতর, উল্টানো যাবে না। তাদের মনে হল যেন তাদের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। তাদের কান ঝিঁ ঝিঁ করতে থাকে। তারা আর একটি কথাও বলতে পারে না।

বুড়ী জিউজিন সুযোগ বুঝে মিঃ যাও-এর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেয় : "গেছে দিন ভালো দিন। আজকাল বিদ্রোহীরা লোকজনের বেণী এমনভাবে কেটে দেয় যে তাদের বৌদ্ধ বা তাও কোনটাই দেখায় না। বিদ্রোহীরা কি আগে এমন ছিল ? আমি ৭৯ বছর বেঁচেছি, যথেষ্ট। আগে বিদ্রোহীরা পায়ের গোড়া পর্যন্ত ঝোলানো লাল সাটিনে মাথা ঢেকে রাখত। রাজপুত্রের হলদে সাটিন ঝুলে থাকত ......হলদে সাটিন, লাল সাটিন, হলদে সাটিন ...... ৭৯ বছরে অনেক দেখেছি।"

দাঁড়িয়ে উঠে ছিজিনের বউ বিড় বিড় করতে থাকে : "কি করব ? ছেলে বুড়ো মিলিয়ে আমাদের পরিবার এত বড়, সবাই তার ওপর নির্ভর করে ......"

মিঃ যাও-এর জবাব : "তোমাদের কিছুই করার নেই। বেণী না রাখার শাস্তি বইয়ে পরিষ্কার লেখা আছে। পরিবার বড় বা ছোট তাতে কিছু যায় আসেনা।"

বইয়ে লেখা আছে শুনে ছিজিনের বউ সব আশা ছেড়ে দেয়। উদ্বেগে সে হঠাৎ ছিজিনকে ঘৃণা করতে থাকে। তার নাকের সামনে কাঠি বাড়িয়ে চীৎকার করে : "সে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মেরেছে। আমি কি করব ? বিদ্রোহের সময় আমি বলেছি, নৌকো নিয়ে যেও না, শহরে যেও না। কিন্তু সে যাবে। সে শহরে গিয়েছে, তারা তার বেণী কেটে দিয়েছে। তার চকচকে কালো বেণী ছিল, এখন তাকে বৌদ্ধ বা তাও-এর মত দেখায় না। সে নিজের কবর নিজে তৈরী করেছে, এখন তাকে শুতে হবে। আমাদের এসবে ঠেলে দেয়ায় তার কি অধিকার আছে ?"

মিঃ যাও আসার পর গ্রামবাসীরা তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে ছিজিনের টেবিলের চারদিকে জড়ো হয়। ছিজিন জানে লোকের সামনে বউয়ের গাল খাওয়া মানী লোকের জন্য বেখাপ্পা দেখায়। তাই মাথা তুলে সে ধীরে ধীরে বলে : "আজ তুমি অনেক বলেছ, কিন্তু সেই সময়ে ......"

"খাঁচার বন্দী পাখী! ......"

সেখানে যারা এসেছে তাদের মধ্যে বিধবা বাই'র মনটা সবচে নরম। স্বামীর মৃত্যুর পর জন্ম হওয়া দু বছরের সন্তানকে নিয়ে ছিজিনের বউয়ের পাশে দাঁড়িয়ে সে মজা দেখছিল। বুঝতে পারে ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে। তাই শান্ত করার জন্য বলে :

"ছিজিনের বউ, কিছু মনে করো না। মানুষ ত আর দেবতা নয়, ভবিষ্যতের কথা বলবে কেমন করে ? ছিজিনের বউ কি আগে বলে নি বেণী না থাকলে লজ্জার কিছু নেই ? তা ছাড়া সরকারী বড়ো কর্তা এখনও কোন আদেশ দেয়নি

তার কথা শেষ করার আগেই ছিজিনের বউয়ের কান লাল হয়ে ওঠে এবং সে তার কাঠি বিধবার নাকের ডগায় তুলে ধরে। প্রতিবাদ করে ওঠে : "না, কখনো না। এটা কি বলার ব্যাপার, বাই'র বউ? আমি এখনো মানুষ — এমন একটা হাস্যকর কথা কি করে বলতে পারি? সে ঘটনার পর আমি পুরো তিন দিন কেঁদেছি, সবাই দেখেছে। এমনকি সেই শিশু লিউজিন পর্যন্ত ......" লিউজিন সবে এক বাটি ভাত শেষ করেছে। আর এক বাটির জন্য বাটি বাড়িয়ে দিয়েছে। ছিজিনের বউয়ের মেজাজ ছিল সপ্তমে। হাতের কাঠি দিয়ে বেণীজোড়ার মাঝখানে মেয়ের মাথায় আঘাত করে : "চুপ কর! ছোট্ট হারামজাদী!"

লিউজিনের হাত থেকে মাটিতে পড়ে বাটি ফেটে যায়। ইটের সঙ্গে লেগে বাটিটি টুকরো হয়ে যায়। ছিজিন লাফিয়ে বাটিটি তুলে নেয় এবং ভাঙা জোড়া দিতে দিতে তাকিয়ে দেখে। "যত্তোসব!" বলেই সে লিউজিনকে এমন জোরে চড় মারে যে বেচারী পড়ে যায়। সে সেখানে পড়ে কাঁদতে থাকে। বুড়ী জিউজিন তাকে তুলে সঙ্গে করে নিয়ে যায় এবং বিড়বিড়াতে থাকে : "গেছে দিন ভালো দিন।"

এবার বাই'র বিধবা বউয়ের রাগ করার পালা। সে চীৎকার করে ওঠে : "বাচ্চাকে মারধোর, ছিজিনের বউ!"

মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে সবকিছু দেখছিলেন মিঃ যাও। "সরকারী বড়ো কর্তা এখনো কোন আদেশ দেয়নি" — বিধবা বাই'র এ কথা শুনে তিনি ক্ষেপে যান। ঠিক টেবিলের কাছে এসে বলতে থাকেন : "বাচ্চাকে মারধোর করলে কি আসে যায়? রাজকীয় বাহিনী যে কোন সময় এখানে এসে পড়বে। তুমি জান, তিন রাজ্যের যাং ফেই-এর বংশধর জেনারেল যাং সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা। তার বারো হাত লম্বা বল্লম আছে এবং দশ হাজার লোককে ঠেকাতে পারে। কেউ তার সামনে দাঁড়াতে পারে না।" তার পর দু হাত উপরে তুলে, যেন বিরাট বল্লম ধরে আছেন, তিনি বিধবা বাই'র দিকে এগিয়ে যান : "তুমি কি তার সঙ্গে পাল্লা দিতে চাও?"

ছেলে কোলে বিধবা বাই রাগে কাঁপতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ চোখের সামনে ঘর্মাক্ত, চোখরাঙানো মিঃ যাওকে দেখে তার ভয় ধরে যায়। যা বলার তা শেষ না করেই সে পালিয়ে যায়। মিঃ যাও-ও চলে যান। লোকজন গায়ে পড়ে কথা বলার জন্য বিধবা বাই'কে দায়ী করতে থাকে। যারা বেণী কেটেছে এবং আবার গজাতে শুরু করেছে তাদের কয়েকজন ভয়ে ভীড়ের মাঝে লুকিয়ে যায় যেন মিঃ যাও দেখে না ফেলেন। মিঃ যাও ভালো করে না তাকিয়ে ভীড় ঠেলে এগিয়ে যান। হঠাৎ তিনি রিঠা গাছের পেছনে ঘুরে দাঁড়ান। "মনে কর তোমরা

তার সমানে সমান।" বলেই সাঁকোর ওপর দিয়ে চলে যান।

গ্রামবাসীরা সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। গোটা ব্যাপারটা ভাবতে থাকে। বুঝতে পারে, তারা সত্যিই যাং ফেই-এর সমান নয়; ছিজিনের বাঁচা-মরা সমান। যেহেতু ছিজিন রাজকীয় আইন ভেঙ্গেছে তাই তাদের মনে হয় সেই লম্বা পাইপ টেনে খবরটা বলার সময় তার এমন বাবুগিরি দেখানো উচিত হয় নি। এখন সে মুশকিলে পড়েছে, এতে তারা একটু খুশীই হয়। তারা ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চায়, কিন্তু জানে না কি বলতে হবে। তাদের আশেপাশে মশা ভন ভন করছে, তার পর আবার রিঠা গাছের নীচে গিয়ে জড়ো হচ্ছে। গ্রামবাসীরা ফিরে যায়, দরজা বন্ধ করে এবং ঘুমিয়ে পড়ে। বিড় বিড় করতে করতে ছিজিনের বউ থালাবাসন টেবিল চেয়ার গুছিয়ে ভেতরে যায়, দরজা বন্ধ করে ঘুমানোর জন্য।

ছিজিন ভাঙ্গা বাটি হাতে ভেতরে যায়, এবং দরোজায় বসে ধূমপান করতে থাকে। কিন্তু উদ্বেগে পাইপের কথা পর্যন্ত ভুলে যায়। ধীরে ধীরে তার লগির মাথায় দস্তার তৈরী পাত্রের আলো নিভে যায়। মনে হয় ব্যাপারটা খুব মারাত্মক পর্যায়ে পেঁৗছেছে, তাই সামলানোর বা কিছু একটা করার কথা ভাবে। কিন্তু তার চিন্তা শুধু ঘুরপাক খাচ্ছে, সে আগামাথা কিছুই ভেবে পায় না। "বেণী, আহা বেণী? বারো হাতি বল্লম। 'গেছে দিন ভালো দিন'। সম্রাট সিংহাসনে বসেছেন। সারানোর জন্য ভাঙ্গা বাটিটি শহরে নিয়ে যেতে হবে। কে তার সমান? এটা বইয়ে লেখা আছে। যত্তোসব!......"

পরদিন ভোরে আগের মতোই নৌকো নিয়ে শহরে যায় ছিজিন। সন্ধ্যায় চার হাতি বাঁশের লগি এবং বাটি নিয়ে সে লুযেন ফিরে আসে। সান্ধ্য ভোজের সময় বুড়ী জিউজিনকে বলে, বাটিটি শহর থেকে সারিয়ে এসেছে। এমনভাবে ফেটেছে যে ষোল জায়গায় তামা দিয়ে ঝালাই করতে হয়। প্রতিটি ঝালাইয়ে তিন পয়সা — সব মিলিয়ে আটচল্লিশ পয়সা।

রেগে গিয়ে বুড়ী বলে: "গেছে দিন ভালো দিন। অনেক বেঁচেছি। একবার ঝালাইয়ে তিন পয়সা। এই ঝালাই আগের মত নয়। আগের দিনে...... আহ...... ৭৯ বছর বেঁচেছি......"

আগের মতই ছিজিন প্রতিদিন শহরে গেলেও, তার বাড়ীতে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করতে থাকে। অধিকাংশ গ্রামবাসী তাকে এড়িয়ে চলে, আগের মত শহরের খবর জিজ্ঞেস করতে আসে না। ছিজিনের বউয়ের মেজাজ সব সময় খারাপ, তাই মাঝে মাঝে সে স্বামীকে ডাকে: "খাঁচার বন্দী পাখী"।

প্রায় দিন পনেরো পরে, একদিন শহর থেকে ফিরে ছিজিন দেখতে পায় বউ খোশ মেজাজে আছে। সে জিজ্ঞেস করে : "শহরে কি কিছু শুনলে?"

"না, কিছু না।"

"সম্রাট কি সিংহাসনে বসেছেন?"

"তারা বলেনি।"

"শুভ শুঁড়ীখানায় কি কেউ কিছু বলেনি?"

"না, কিছু না।"

"আমার মনে হয় না সম্রাট সিংহাসনে বসবেন। আজকে মিঃ যাও-এর শুঁড়ি-খানা পার হওয়ার সময় দেখেছি তিনি বসে বসে বই পড়ছেন। তাঁর বেণী মাথার উপর পাকানো। পরণেও লম্বা গাউন নেই।"

"......"

"তুমি কি মনে কর তিনি সিংহাসনে বসবেন না?"

"সম্ভবতঃ না।"

এখন আবার বউ এবং গ্রামবাসীরা প্রত্যেকে ছিজিনকে সমীহ করে, তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। গরমের দিনে তার পরিবারের লোকজন খাওয়ার জন্য উঠোনে বসে, পথচারীরা তাদের দেখে হাসে, সালাম করে। কয়েকদিন আগে বুড়ী জিউজিন তার ৮০তম জন্মদিন পালন করেছে। সে আগের মতই সুস্থ, সবল এবং খুঁত ধরে বেড়ায়। লিউজিনের বেণীজোড়া আরো মোটা হয়েছে। তারা তার পা বাঁধতে শুরু করলেও, সে মা'কে টুকটাক সাহায্য করে। ষোল জায়গায় ঝালাই করা ভাতের বাটি নিয়ে উঠোনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়।

অক্টোবর, ১৯২০

টীকা

1. জিন হচ্ছে চীনের ওজনের একটি পরিমাপ। এক জিন প্রায় আধা সেরের সমান। তখনকার ১৬ লিয়াং সমান ছিল এক জিন (বর্তমানে ১০ লিয়াং সমান ১জিন)।

৯কে চীনা ভাষায় জিউ বলা হয়। চীনের অংকসংখ্যা যথাক্রমে — ই (এক), এর (দুই), সান (তিন), সি (চার), উ (পাঁচ), লিউ (ছয়), ছি (সাত), বা (আট), জিউ (নয়) এবং শি (দশ)।

2. জিন শেংথান (১৬০৯—১৬৬১) ছিলেন চীনের সাহিত্যের টীকাকার।

3 "তিন রাজ্যের" সময় স্থ রাজত্বে (২২১—২৬৩) পাঁচজন বিখ্যাত সেনাপতি: গুয়ান ইয়ু, ঝাং ফেই, ঝাও ইয়ুন, হুয়াং ঝোং এবং মা ছাও।

4. কৃষক অভ্যুত্থানের (১৮৫১—১৮৬৪) থাইপিং বাহিনী। ছিং রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পর চীনারা কপালের ওপরের চুল কেটে ফেলতে এবং বেণী বাঁধতে বাধ্য হয়। যেহেতু থাইপিংরা তাদের চুল রেখেছিল, তাই তাদের বলা হত "লম্বা চুলো"।

পুরনো বাড়ী

বিশ বছরের আগে যে বাড়ী ছেড়েছি, সে বাড়ীতে ফেরার জন্য তিক্ত শীতের মধ্যে সাতশো মাইলের বেশী পথ পেরিয়ে এসেছি।

তখন শীতের শেষ। পুরনো বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই দিনটা ঘোলাটে হয়ে আসে। বজরার ভেতরে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করে। বাঁশের ছইয়ের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে দূরে এবং কাছে হলদে আকাশের নীচে ছড়ানো ছিটানো জীবনের স্পন্দনহীন কয়েকটি জনশূন্য গ্রাম। মনটা বিষন্ন হয়ে ওঠে।

গত বিশ বছর ধরে যে বাড়ী আমার স্বপ্নের ভেতর এটা নিশ্চয়ই সেই পুরনো বাড়ী নয় ?

যে পুরনো বাড়ী আমি মনে রেখেছি সেটা কোনমতেই এ রকম নয়। আমার পুরনো বাড়ী অনেক ভালো ছিল। কিন্তু এর মোহ বা সৌন্দর্য বলতে হলে, কোন পরিষ্কার ধারণাই আমার নেই, নেই বর্ণনা করার ভাষা। এখন মনে হয় এর সবকিছুই তাতে ছিল। আমি যুক্তি খাড়া করি : বাড়ী সবসময় এরকম ছিল, উন্নতি না হলেও, যতখানি খারাপ ভেবেছি তত নয়। শুধু আমার মন বদলেছে, কেননা কোন মোহ ছাড়াই এবার গ্রামে ফিরছি।

এবার ফিরে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য বিদায় নেওয়া। বহু বছর ধরে আমাদের গুষ্টি যে পুরনো বাড়ীতে বাস করেছে তা ইতোমধ্যে আরেক পরিবারের কাছে বিক্রী হয়ে গেছে। বছর না ঘুরতেই তা আবার হাত বদল হবে। নববর্ষের আগেই বহু চেনা পুরনো বাড়ীকে চিরদিনের জন্য বিদায় জানাতে যেতে হচ্ছে। পুরনো শহর থেকে বহু দূরে কর্মস্থলে নিয়ে আসতে হবে আমার পরিবারকে।

পরদিন ভোরে আমি বাড়ীর দরোজায় পেঁাছি। বাড়ীর ছাঁদে হাওয়ায় কাঁপছে কিছু বিবর্ণ ঘাস। এ বাড়ীর হাতবদল হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। সম্ভবতঃ আমাদের গুষ্টির অনেকেই অন্যত্র সরে গেছে। তাই একটা অস্বাভাবিক নীরবতা।

বাড়ীতে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই স্বাগত জানানোর জন্য দরজায় বেরিয়ে আসেন মা। তাঁর পেছনে ছুটতে ছুটতে আসে আমার আট বছরের ভাইপো — হোংএর।

মা খুশী হলেও, এক ধরণের দুঃখ বোধ ঢাকার চেষ্টা করছেন। আপাততঃ মালপত্র সরানো বন্ধ করে তিনি আমাকে বসে বিশ্রাম নিতে এবং চা খেতে বলেন। হোংএর আমাকে আগে কখনো দেখে নি। দূরে দাঁড়িয়ে সে আমাকে দেখতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত সরে যাওয়া নিয়ে কথা বলতেই হয়। আমি বললাম, অন্যত্র বাড়ী ভাড়া নেয়া হয়েছে, কিছু আসবাবপত্রও কিনেছি। আরো কিছু জিনিষ কেনার জন্য বাড়ীর সমস্ত আসবাবপত্র বিক্রী করতে হবে। মা সায় দিয়ে বললেন, বাঁধাছাঁদার কাজ প্রায় শেষ। সেসব আসবাবপত্র সহজে সরানো যাবে না, তার অর্ধেক বিক্রী হয়ে গেছে। শুধু খদ্দেরদের কাছ থেকে টাকা পাওয়া মুশকিল।

মা বললেন, "তুমি দু একদিন বিশ্রাম নাও। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা কর। তারপর আমরা যেতে পারব।"

"ঠিক আছে।"

"ইয়ুনথু-এর কথা মনে আছে? যতবার সে আসে, তোমার কথা জিজ্ঞেস করে এবং তোমাকে আবার দেখতে চায়। আমি তাকে তোমার বাড়ী ফেরার তারিখ বলেছি। সে হয়ত যে কোন সময় এসে পড়বে।"

এ সময়ে আমার মনের ভেতর একটা অদ্ভুত ছবি ভেসে ওঠে। নীল আকাশে সোনালী চাঁদ ঝুলে আছে। নীচে বালুকাবেলায় যতদূর চোখ যায় শুধু সবুজ তরমুজ গাছের সারি। এর মাঝে গলায় রূপোলী চেনওয়ালা এগারো কি বারো বছরের একটি ছেলে নিড়ানি হাতে সর্বশক্তি দিয়ে একটি খট্টাশকে আঘাত করছে। আর সেটা আঘাত এড়িয়ে তার পায়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সেই বালক ইয়ুনথু। তার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা তখন তার বয়স দশের সামান্য ওপরে। সে ত্রিশ বছর আগের কথা। বাবা তখনো জীবিত। পরিবারের অবস্থাও সচ্ছল এবং আমি সত্যি বখাটে ছেলে। সে বছর পূর্বপুরুষদের জন্য ভোগের আয়োজন করা আমাদের পরিবারের পালা। ত্রিশ বছরে একবার আসে বলেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। পয়লা মাসে পূর্বপুরুষদের মূর্তির উদ্দেশ্যে ভোগ দেয়া হয়। ভোগের পাত্র খুব সুন্দর বলে এবং পূজারীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় চুরির ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয়। আমাদের পরিবারের শুধু একজন খণ্ড-কালীন কামলা ছিল। (আমাদের জেলায় মজুরদের আমরা তিনভাগে ভাগ করি: যারা এক পরিবারের জন্য সারা বছর কাজ করে তারা সাল-মজুর, যাদের শুধু একদি-

নের জন্য ভাড়া করা হয় তারা দিন-মজুর, এবং যারা নিজেদের জমি চাষ করে এবং নববর্ষ, উৎসব অথবা খাজনা আদায়ের সময় কোন পরিবারে কাজ করে তারা খণ্ড-কালীন) অনেক কাজ করতে হবে বলে, সে বাবাকে জানায় ভোগের পাত্রের উপর নজর রাখার জন্য ছেলে ইয়ুনথুকে নিয়ে আসবে।

বাবা রাজী হলে আমার খুব খুশী লাগে। আমি বহুদিন ইয়ুনথু-এর কথা শুনেছি এবং জানতাম সে আমারই প্রায় সমবয়সী। তার জন্ম বাড়তি মাসে[1]। ভাগ্য-গণনার সময় দেখা যায় পাঁচটি উপাদানের মধ্যে তার ভাগ্যে মাটি নেই। তাই তার বাবা তার নাম রেখেছেন ইয়ুনথু (বাড়তি মাটি)। সে ফাঁদ বানিয়ে ছোট্ট পাখী ধরতে পারে।

আমি প্রতিদিন নববর্ষের আশায় থাকি। নববর্ষেই ইয়ুনথু আসবে। অবশেষে বছরের শেষে একদিন মা বললেন ইয়ুনথু এসেছে। তাকে দেখার জন্য আমি ছুটে যাই। সে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছে। তার গোলগাল লাল মুখ, মাথায় টুপি এবং গলায় উজ্জ্বল রূপোলী চেন। বোঝা যায় তার বাবা ভালো বাসায় অন্ধ। ছেলে মরে যাবে ভয়ে দেব-দেবীর কাছে কসম খেয়ে গলায় রূপোলী কবচ দিয়েছে। সে খুব লাজুক। কিন্তু একমাত্র আমাকেই ভয় পেত না। কেউ না থাকলে সে আমার সঙ্গে কথা বলত। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমরা ভালো বন্ধু হয়ে যাই।

জানি না তখন কি নিয়ে আলাপ করতাম। কিন্তু মনে পড়ে ইয়ুনথু-এর মনোবল ছিল উচুঁ। শহরে আসা অবধি সে নতুন অনেক কিছু দেখেছে।

পরদিনই আমি তাকে পাখী ধরে দিতে বলি। তার জবাব :

"হবে না। শুধু বরফ পড়লে হবে। বরফের পর আমি মাটিতে একটু জায়গা পরিষ্কার করে নেই। তারপর ছোট্ট একটা লাঠি দিয়ে বিরাট একটা ঝুড়ি খাড়া করে দেই। নীচে ছড়ানো থাকে কিছু ধান। পাখীরা ধান খেতে এলে, লাঠির সঙ্গে বাঁধা দড়ি ধরে টান দিলেই, ঝুড়ির ভেতর আটকা পড়ে। কত রকমের পাখী : বুনো রঙীন পাখী, বড়ো পাখী, কবুতর, নীলপাখী . . . . . ."

সেই থেকে আমি বরফের আশায় থাকি।

ইয়ুনথু আরেকদিন বলে : "এখন খুব ঠাণ্ডা। গরমের সময় আমাদের ওখানে তোমাকে আসতে হবে। দিনের বেলা বালুকাবেলায় আমরা ঝিনুক কুড়োতে যাব। কত রঙ বেরঙের ঝিনুক, লাল, সবুজ, পাজি, এবং 'বুদ্ধের হাত'। সন্ধ্যায় যখন বাবার সঙ্গে তরমুজ দেখতে যাই তখন তুমিও যাবে।"

"সে কি চোর ধরার জন্যে?"

"না। যদি তৃষ্ণায় পথচারীরা একটি তরমুজ তুলে নেয়, আমাদের লোকজন

সেটাকে চুরি মনে করে না। আমাদের দেখতে হয় খটাশ, সজারু আছে কিনা। চাঁদনী রাতে যখন তরমুজ খেতে শুরু করে তখন শব্দ পাওয়া যায়। তখনই তুমি নিড়ানি হাতে চুপি চুপি সেখানে যাবে ......"

তখন খটাশ সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিলনা — এখনও তা পরিষ্কার নয় — বুঝতে পারি এটা ছোট্ট কুকুরের মত, ভয়ংকর কিছু একটা।

"ওগুলো কি মানুষকে কামড়ায় না?"

"তোমার হাতে নিড়ানি আছে। তুমি যাবে, দেখতে পেলে আঘাত করবে। 'এটা খুব ধূর্ত প্রাণী। তোমার দিকে ছুটে এসে পায়ের ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যাবে। এর লোম তেলের মত পিছলা।"

আমি কখনো জানতাম না এসব অদ্ভুত জিনিষ আছে। বালুকাবেলায় রঙধনুর বিভিন্ন রংয়ের ঝিনুক আছে, তরমুজের বিপদ আছে। শুধু জানতাম ওগুলো মুদী দোকানে বিক্রি হয়।

"আমাদের বালুকাবেলায় জোয়ারের সময় প্রচুর উচ্ছিরিংগা মাছ আসে, ব্যাঙের মত দু পাওয়ালা ......"

ইয়ুনথু-এর মন ছিল ঐসব অদ্ভুত জিনিষের বাসা, আমার পুরনো বন্ধুদের হিসেবের বাইরে। তারা এসবের কিছুই জানত না। ইয়ুনথু সাগর তীরে বাস করত। তারা আমার মতই দেয়ালের বাইরে শুধু আকাশ দেখতে পেত।

দুঃখজনকভাবে, নববর্ষের একমাস পরে ইয়ুনথুকে বাড়ী চলে যেতে হয়। আমি কান্নায় ভেঙে পড়ি, সে রান্নাঘরে লুকোয়। না যাবার জন্য কাঁদতে থাকে। সবশেষে তার বাবা তাকে নিয়ে যায়। পরে তার বাবার হাতে সে আমার জন্য উপহার হিসেবে এক প্যাকেট ঝিনুক ও কিছু সুন্দর পালক পাঠায়। আমিও দু একবার উপহার পাঠিয়েছি। কিন্তু আর কখনো আমাদের দেখা হয় নি।

মায়ের মুখে তার কথা শুনতেই, ছেলেবেলার কথা আমার মনে বিজলীর মত চমকে উঠে। মনের পর্দায় ভেসে ওঠে পুরনো সুন্দর বাড়ী। আমি বললাম :

"খুব ভালো! সে — সে কেমন আছে?"

মা বললেন, "সে? .... সেও ভালো নেই।" তারপর দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললেন, "ঐ লোকগুলো আবার আসছে। তারা আমাদের আসবাবপত্র কিনতে চায়। আসলে তারা দু একটা হাতাতে চায়। আমাকে গিয়ে তাদের উপর নজর রাখতে হবে।"

মা উঠে চলে গেলেন। বাইরে কয়েকজন মহিলার গলা শোনা যাচ্ছে। হোংএরকে কাছে ডেকে আমি কথা শুরু করে দেই। সে লিখতে পারে কিনা। এখান থেকে চলে গেলে খুশী হবে কিনা।

"আমরা কি রেলে চড়ে যাব?"

"হ্যাঁ।"

"নৌকো?"

"প্রথমে আমরা নৌকোয় যাব।"

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কর্কশ গলা ভেসে আসে, "ওহ! এই রকম! লম্বা গোঁফ-ওয়ালা!"

থতমত খেয়ে তাকিয়ে দেখি পঞ্চাশ বছরের এক মহিলা। চোখ ও গালের মাঝখানের হাড় উঁচু, ঠোঁটজোড়া পাতলা। নিতম্বের উপর হাত রেখে, স্কার্ট নয়, প্যাণ্ট পরা পা জোড়া ফাঁক করে জ্যামিতি বাক্সের কম্পাসের মত সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বোকা বনে যাই।

"তুমি আমাকে চেন? তোমাকে আমি কোলে রেখেছি।"

আমার আরো বোকা বনে যাবার দশা।

ভাগ্য ভালো, ঠিক তখনই মা এসে বললেন:

"সে অনেক দিন বাইরে, তাই ভুলে যাবার জন্য তাকে মাফ করে দাও।" তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "তোমার মনে রাখা উচিত, ইনি রাস্তার উল্টো পাশের মিসেস ইয়াং ...... তাঁর বিন্‌কার্ড-এর দোকান আছে।"

তখনই আমার মনে পড়ে। আমি যখন ছোট্ট ছিলাম তখন মিসেস ইয়াং নামে একজন রাস্তার উল্টো পাশের বিন্‌কার্ড-এর দোকানে সারাদিন বসে থাকতো। লোকজন তার নাম দিয়েছিল "বিন্‌কার্ড সুন্দরী"। সে মুখে পাউডার মাখত। এখনকার মত তার চোয়ালের হাড় এত উঁচু, বা ঠোঁট জোড়া পাতলা ছিল না। তাছাড়া, সে সারাদিন বসে থাকত, তাই কখনো কম্পাসের সঙ্গে মিল খুঁজে পাই নি। তখন লোকজন বলত, তার কারণেই বিন্‌কার্ড দোকানে বেচাকেনা বেশ ভালো হত। বোধ হয় বয়সের কারণে, আমার উপর তার কোন ছাপ পড়ে নি। তাই পরে তাকে পুরোপুরি ভুলে গেছি। যাহোক, কম্পাস আমার দিকে বিরক্তি ও ঘৃণার সঙ্গে তাকায় যেভাবে নেপোলিয়নের নাম না শোনা ফরাসী বা ওয়াশিংটনের নাম না শোনা মার্কিনীর দিকে কেউ তাকাবে। বিদ্রূপের হাসি হেসে সে বলে:

"তুমি ভুলে গেছ? স্বাভাবিক, আমি তোমার হিসেবের বাইরে ......"

দাঁড়িয়ে গিয়ে, ঘাবড়ে গিয়ে জবাব দিলাম:

"না, না, অবশ্যই নয় ...... আমি ......"

"তাহলে আমার কথা শোন, মাষ্টার স্যুন। তোমার টাকা পয়সা হয়েছে। তাছাড়া ওগুলো খুব ভারী, তাই ঐ পুরনো আসবাবপত্র তোমার আর দরকার

নেই। তারচে' বরং আমি নিয়ে যাই। আমাদের মত গরীব লোকদেরই ওসব প্রয়োজন।"

"আমার টাকা পয়সা হয় নি.। ...... আমাকে ওগুলো বিক্রী করতে হবে যাতে আরো কিছু ......"

"আহ, রাখ ওসব কথা। তুমি এখন সরকারী কর্মচারী, আর বলছ তোমার টাকাপয়সা নেই। তোমার তিনজন রক্ষিতা আছে। যখনই বাইরে যাও আটজন বেহারা তোমার পালকী বহন করে। তবু তুমি বলবে তুমি ধনী নও? হা। আমার কাছে কিছুই লুকোতে পারবে না।"

কিছু বলার নেই মনে করে আমি চুপ করে থাকি।

"মুখ খোল। লোকের যত টাকা হয় তত তারা কঞ্জুস হয়, যত কঞ্জুস হয় তত টাকা পায় ......" বলেই কম্পাস রাগে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে। চলে যেতে যেতে সে মায়ের একজোড়া হাতমোজা তুলে কোমরে গুঁজে।

এরপর আশেপাশের বহু আত্মীয়স্বজন দেখা করতে আসে। তাদের সঙ্গে দেখা করার ফাঁকে ফাঁকে আমি কিছু বাঁধাছাঁদার কাজ করি। তাতে তিন চার-দিন চলে যায়।

এক শীতের বিকেলে দুপুরের খাওয়ার পর বসে চা খাচ্ছি। শুনতে পেলাম কে যেন আসছে। দেখার জন্য মাথা ঘুরে তাকাই। প্রথম দেখাতেই মন বিগড়ে যায়। আমি দ্রুত উঠে গিয়ে তাকে স্বাগতি জানাই।

এই নতুন লোক ইয়ুনথু। প্রথম দেখাতেই চিনতে পারলেও, এই ইয়ুনথু সেই ইয়ুনথু নয়। তার শরীর দ্বিগুণ হয়েছে। একসময়ের গোলগাল লাল মুখ হলদে হয়ে গেছে, গভীর ভাঁজ পড়েছে। চোখজোড়া তার বাবার মত হয়ে গেছে, ফোলা ও লাল। সেই সব কৃষকদের মত, যারা সারাদিন সাগর তীরে সাগরের হাওয়ায় কাজ করে। তার মাথায় একটা জীর্ণ টুপি এবং গায়ে একটা পাতলা প্যাডেড জ্যাকেট। ফলে সে ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে। তার হাতে একটা কাগজের ঠোঙা ও লম্বা পাইপ। তার হাত জোড়া আর আগের মত লাল নয়, পাইন গাছের ছালের মত পুরু ও খসখসে।

খুশীতে কি বলতে হবে বুঝতে পারি নি। শুধু বলতে পারলাম :

"ওহ। ইয়ুনথু, তুমি? ......"

এরপর কত কথা বলতে চেয়েছি, সবকিছু মালার মত বেরিয়ে আসতে চেয়েছে: বড়ো পাখী, উচ্ছিরিংগা মাছ, ঝিনুক, খাটাশ ...... কিন্তু কথা আটকে গেছে, ভাবনা আর কথা হয়ে বেরুচ্ছে না।

সে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে আনন্দ ও বেদনার অভিব্যক্তি। তার ঠোঁট কাঁপছে,

কিন্তু একটি কথাও সে বলল না। তারপর বিনয়ের সঙ্গে পরিষ্কারভাবে বলল :

"হুজুর! ......"

আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠে। আমাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠেছে। তবু আমি কিছু বলতে পারলাম না।

মাথা ফিরিয়ে সে বলল :

"শুইশেং, হুজুরকে সালাম কর।" তারপর সে পেছনে লুকানো একটি ছেলেকে সামনে নিয়ে আসে। ঠিক বিশ বছর আগের ইয়ুনথু। একটু ফ্যাকাশে, একটু পাতলা, এবং গলায় রূপোর চেন নেই। সে বলল, "এটা আমার পাঁচ নম্বর। সে লোকজনের সঙ্গে মেলে না, তাই একটু লাজুক ও ভিন্ন প্রকৃতির।"

বোধ হয় আমাদের গলা শুনতে পেয়ে মা নেমে এলেন হোংএরকে সঙ্গে করে।

ইয়ুনথু বলল, "বেগম সাহেবা, আপনার চিঠি পেয়েছি কয়েকদিন আগে। হুজুর ফিরে আসছেন জেনে কত খুশী হয়েছি ......"

মা মজা করে বললেন, "এত ভদ্রতা কিসের? আগে তোমরা খেলার সাথী ছিলে না? তুমি বরং আগের মত তাকে দাদা ডাক।"

"ওহ, আপনি সত্যিই ...... সেটা খুব খারাপ ব্যাপার হবে। তখন ছোট ছিলাম বলে বুঝতে পারি নি।" বলতে বলতে সালাম করার জন্য শুইশেংকে সামনে ঠেলে দেয় ......। কিন্তু লাজুক ছেলে বাপের পেছনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

মা জিজ্ঞেস করলেন : "সে শুইশেং? তোমার পাঁচ নম্বর? আমরা সবাই অচেনা। এজন্যে তাকে দোষ দিতে পার না। হোংএর বরং তাকে খেলতে নিয়ে যাক।"

এই কথা শুনেই শুইশেং-এর কাছে গেল হোংএর। সেও সহজেই বেরিয়ে গেল তার সঙ্গে। মা ইয়ুনথুকে বসতে বললেই সে কাঁচু-মাচু হয়ে বসল। তারপর লম্বা পাইপ টেবিলের সঙ্গে ঠেস দিয়ে কাগজের ঠোঙাটি বাড়িয়ে দিল :

"শীতকালে আনার মত তেমন কিছু নেই। কিন্তু এই মটরশুঁটিগুলো আমরা নিজেরাই শুকিয়েছি, হুজুর যদি দয়া করেন।"

দিনকাল কেমন যাচ্ছে জিজ্ঞেস করতে সে শুধু মাথা নাড়ল।

"দিনকাল খারাপ যাচ্ছে। এমনকি আমার ছয় নম্বরটা পর্যন্ত কাজ করতে পারে, তবু ভালো করে খাওয়া জোটে না ...... কোন নিরাপত্তা নেই, সব ধরণের লোক পয়সা চায়, কোন নিয়মকানুন নেই ...... ফসলও ভাল হয় না। জিনিষ ফলিয়ে বাজারে নিয়ে গেলে খাজনা দিয়ে টাকা চলে যায়। আর

বিক্রী না করলে জিনিষ নষ্ট হয়ে যায়......"

সে মাথা নেড়েই চলেছে। সারা মুখে ভাঁজ পড়ে গেলেও, একটিও নড়ছে না। যেন সে পাথরের মূর্তি। তার খুব গোস্বা, কিন্তু বোঝাতে পারছে না। কিছুক্ষণ পর পাইপ তুলে নিয়ে সে নীরবে পাইপ টানতে থাকে।

তার সঙ্গে কথা বলে মা বুঝতে পারলেন, বাড়ীতে তার অনেক কাজ, তাই পরদিন চলে যেতে হবে। তার দুপুরের খাওয়া হয় নি বলে মা বললেন রান্না ঘরে গিয়ে নিজেই কিছু ভাত ভেজে নিতে।

সে বাইরে যেতেই তার কষ্ট নিয়ে আমি ও মা দু'জনেই মাথা নাড়লাম : বহু ছেলেমেয়ে, দুর্ভিক্ষ, খাজনা, সৈন্য, দুর্বৃত্ত, বদ মাতবর, আমলা সবাই তাকে মমির মত শুকিয়ে ফেলেছে। মা বললেন, যা আমরা নেব না তা তাকে দেয়া উচিত, সে খুশীমত বেছে নেবে।

সেই বিকেলে সে কিছু কিছু জিনিষ বেছে নেয় : দুটো লম্বা টেবিল, চারটি চেয়ার, একটা ধূপদানি, মোমবাতি এবং একটি দাঁড়িপাল্লা। সে চুলার ছাইগুলোও চেয়ে নিল। (আমাদের অঞ্চলে আমরা খড় দিয়ে রান্না করি। খড়ের ছাই বালু মাটিতে সার হিসেবে কাজ করে) বলল আমরা চলে যাবার পর সে এগুলো নৌকা দিয়ে নিয়ে যাবে।

সে রাতে আমরা আবার আলাপ করি। তবে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। পরদিন সকালে সে শুইশেংকে নিয়ে চলে যায়।

আরো নয় দিন পর আমাদের যাবার সময় হয়। সকালে ইয়ুনথু আসে। শুইশেং তার সঙ্গে আসে নি — সে শুধু পাঁচ বছরের একটি মেয়েকে নিয়ে এসেছে নৌকা দেখার জন্য। সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে কেটে যায় ; আমাদের কথা বলার কোন সময় ছিল না। লোকজনও এসেছে বেশ কিছু, কেউ বিদায় জানাতে, কেউ জিনিষপত্র নিতে, কেউ দুটোই করতে। নৌকায় চড়তে চড়তে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়। তার মধ্যে সে বাড়ীর জীর্ণ, পুরনো, ছোট, বড়, হালকা, পাতলা সব জিনিষ সাফ হয়ে যায়।

সন্ধ্যায় যখন যাত্রা শুরু করি তখন নদীর উভয় তীরের সবুজ পাহাড় কালো হয়ে এসেছে, নৌকার পেছনে হারিয়ে যাচ্ছে।

হোংএর এবং আমি জানালা দিয়ে বাইরে অস্পষ্ট দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে :

"চাচা, আমরা কখন ফিরে যাব?"

"ফিরে যাব? তুমি কি বেরুনোর আগেই ফিরে যাবার কথা বলতে চাও?"

উদ্বেগে কালো চোখ জোড়া বড় করে সে তাকায় : "কিন্তু শুইশেং যে আমাকে

তার বাড়ীতে দাওয়াত দিয়েছে......"

মা এবং আমার দু'জনেরই খারাপ লাগে। আবার ইয়ুনথু-এর কথা ওঠে। মা বললেন, বাঁধাছাঁদা শুরু হবার পর থেকে বিনকার্ড দোকানের মিসেস ইয়াং প্রতিদিন আসতো। পরশু সে ছাইয়ের স্তূপ থেকে একডজন থালা-বাসন বের করে। তার যুক্তি ছিল, ইয়ুনথু ওগুলো সেখানে লুকিয়েছে, যাতে যখন ছাই নিতে আসবে তখন ওগুলো নিয়ে যেতে পারে। এই খুঁজে পাওয়ার পর মিসেস ইয়াং নিজে নিজে খুব খুশী হয়ে ওঠে এবং 'কুত্তার-লোভ' নিয়ে চলে যায়। (আমাদের এলাকার লোকজন 'কুত্তার-লোভ' রাখে। এটা এক ধরণের কাঠের খাঁচা যার ভেতর খাবার থাকে। হাঁস মুরগী গলা বাড়িয়ে তা খেতে পারে, কিন্তু কুকুর শুধু তাকিয়ে থাকতে পারে।) তার ঐ পা নিয়ে তিনি কত জোরে দৌড়াতে পারেন তা এক দেখার বিষয় ছিল।

ধীরে ধীরে আমার পুরনো বাড়ী পেছনে চলে যাচ্ছে। পাহাড়-নদী দূরে হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার কোন অনুশোচনা নেই। আমি বুঝতে পারি আমার চারদিকে গড়ে উঠেছিল বাধার দেয়াল, যা সঙ্গীদের কাছ থেকে আমাকে আলাদা করেছে। এ অবস্থা আমাকে পুরোপুরি মনমরা করে দেয়। আগে তরমুজের খেতে গলায় রুপোর চেনওয়ালা সেই ছোট্ট নায়কের উপস্থিতি ছিল দিনের মত উজ্জ্বল। এখন তা হঠাৎ হারিয়ে গেছে, আমার মনোবেদনা বেড়েছে।

মা এবং হোংএর ঘুমিয়ে পড়ে।

আমি শুয়ে থাকি। শুনতে পাই নৌকোর নীচে জলের কল ধ্বনি। বুঝতে পারি আমি নিজের পথে এগিয়ে চলেছি। আমার মনে হল : ইয়ুনথু এবং আমার মধ্যে বাধার প্রাচীর গড়ে উঠলেও, শিশুদের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। হোংএর এইমাত্র শুইশেং-এর কথা ভাবছিল। আমার বিশ্বাস, তারা আমাদের মত হবে না, নিজেদের মধ্যে বাধার দেয়াল গড়ে উঠতে দেবে না। কিন্তু আমার তাদের পছন্দ হবে না, কেননা তারা সগোত্রীয় হতে চায়, পেতে চায় আমার মত বাঁধা ধরা জীবন। বোকা বনা পর্যন্ত ইয়ুনথু-এর মত কষ্ট করতে চায় না, বা অন্যদের মত তুচ্ছ প্রমোদেও গা ভাসিয়ে দিতে চায় না। তাদের নতুন জীবন প্রয়োজন, যে জীবন আমরা ভোগ করি নি।

এই আশার আলোয় আমার হঠাৎ ভয় ধরে যায়। ইয়ুনথু যখন ধূপদানি এবং মোমবাতির কথা বলেছে তখন গোপনে আমার খুব হাসি পায়। সে এখনো মূর্তি পূজো করে এবং মন থেকে তা মুছে ফেলতে পারে না। যে আশার কথা বলেছি, তা আমার তৈরী মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। একমাত্র পার্থক্য, সে যা চায় তা হাতের কাছাকাছি, আর আমি যা চাই তা সহজে পাবার নয়।

তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সবুজ বালুকাবেলা, উপরে গভীর নীলাকাশে গোলাকার সোনালী চাঁদ। আমার মনে হল : আশা আছে কি নেই বলা যায় না। এটা পৃথিবীর ওপরে পথগুলির মত। আসলে পথ দিয়ে পৃথিবীর শুরু হয় নি। কিন্তু অনেক লোক যখন একই পথ দিয়ে যায়, তখন পথ তৈরী হয়ে যায়।

জানুয়ারী, ১৯২১

টীকা

1. চীনের প্রতিটি চান্দ্রবৎসরে ৩৬০ দিন রয়েছে। প্রত্যেক মাসে ২৯ বা ৩০ দিন, কখনো ৩১ দিন হবে না। তাই কয়েক বছর পর পর এয়োদশ মাস হিসেব করতে হয়। এই বাড়তি মাস অন্যান্য মাসগুলোর মধ্যে বিন্যস্ত।

আ' কিউ'র সত্য ঘটনা

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

গত কয়েক বছর ধরেই আ' কিউ'র সত্য ঘটনা লেখার কথা ভাবছি। কিন্তু লিখতে চাওয়ার সময় ভয়ও ছিল। এতেই বোঝা যায় আমি তাদের একজন নই যারা লিখে গৌরব অর্জন করে। কেননা অমর লোকের কীর্তি রচনার জন্য সবসময়ই অমর লেখক প্রয়োজন। উত্তর কালে লেখা মানুষটিকে পরিচিত করে এবং মানুষটি লেখাকে পরিচিত করে। — শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার বোঝা যায় না কে কাকে পরিচিত করছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেকটা শয়তানের প্রভাবে, আমি 'আ' কিউ'র সত্য ঘটনা লেখার প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

কিন্তু কলম হাতে নিতে না নিতেই এই অমর কীর্তির চেয়েও বড় কীর্তি সম্পর্কে লেখার মারাত্মক প্রতিকূলতা সম্পর্কে আমি সচেতন হই। প্রথম সমস্যা, কি নাম দেব? কনফুসিয়াস বলেছেন, "নাম ঠিক না হলে, কথা সত্য মনে হবে না।" এবং এই স্বতঃসিদ্ধ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে। বহু ধরণের জীবনী আছে: সরকারী জীবনী, আত্মজীবনী, অননুমোদিত জীবনী, উপকথা, সম্পূরক জীবনী, পারিবারিক ইতিহাস, নকশা...... কিন্তু দুর্ভাগ্যএর একটাও আমার উদ্দেশ্যের সঙ্গে খাপ খায় নি। "সরকারী আত্মজীবনী"? নির্ভরযোগ্য ইতিহাসে বহু বিখ্যাত লোকের ক্ষেত্রেই তা অন্তর্ভুক্ত হবে না। "আত্মজীবনী"? কিন্তু আমি নিশ্চয়ই আ' কিউ নই। এটাকে "অননুমোদিত জীবনী" বললে তার "অনুমোদিত জীবনী" কোথায়? "উপকথার" ব্যবহার অসম্ভব, কেননা আ' কিউ উপকথার নায়ক নয়। "সম্পূরক জীবনী"? কিন্তু কোন প্রেসিডেণ্ট কখনো

জাতীয় ঐতিহাসিক ইনস্টিটিউটকে আ' কিউ'র "নমুনা জীবনী" লেখার নির্দেশ দেন নি। এটা সত্য যে নির্ভরযোগ্য ইংরেজ ইতিহাসে কোন "জুয়াড়ীর জীবনী" নেই, কিন্তু বিখ্যাত লেখক কোনান ডয়েল লিখেছেন «রডনী ষ্টোন»। বিখ্যাত লেখকের জন্য তা অনুমোদনযোগ্য হলেও আমার মত লেখকের জন্য নয়। তারপর আসে "পারিবারিক ইতিহাসের" কথা, কিন্তু আমি জানি না আমি এবং আ' কিউ একই পরিবারের কিনা এবং তার ছেলেমেয়ে অথবা নাতি-নাতিনী কখনো আমাকে এই দায়িত্ব দেয় নি। যদি "নকশা" ব্যবহার করি তাহলে হয়ত এই বলে আপত্তি উঠবে যে আ' কিউ'র কোন "পূর্ণ বিবরণ" নেই। সংক্ষেপে, এটা সত্যি একটা "জীবন", কিন্তু যেহেতু ছোট লোকদের ভাষা ব্যবহার করে আমি লিখি তাই ভারী নাম দেয়ার মত সাহস আমার নেই। তাই ঔপন্যাসিকদের জমা অর্থপঞ্জী থেকে, যারা তিন ধর্ম এবং নয় স্কুলের[1] মধ্যে বিবেচ্য নয়, "অবান্তর কথকতা অনেক হয়েছে, সত্য ঘটনায় ফিরে যাওয়া যাক।" শেষ দুটো শব্দ শিরোনাম হিসেবে গ্রহণ করব। এতে যদি পুরনো দিনের «হস্তাক্ষরের সত্য ঘটনার»[2] কথা মনে পড়ে তাহলে করার কিছু নেই।

দ্বিতীয় অসুবিধা হলো, এই ধরণের জীবনী অনেকটা এভাবে শুরু হওয়া উচিত: "অমুক, যার আর এক নাম অমুক, অমুক এলাকার অধিবাসী ছিল।" কিন্তু আমি সত্যি জানি না আ' কিউ'র পারিবারিক নাম কি? এক সময় মনে হয়েছে তার নাম যাও, কিন্তু পরদিনই এব্যাপারে আবার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। মিঃ যাও -এর ছেলে কাউন্টি পরীক্ষা পাশ করার পর এটা দেখা দেয়, ঢোল বাজিয়ে তার সাফল্যের কথা গ্রামে ঘোষণা করা হয়। সবেমাত্র দু'বাটি হলদে মদ পান করে আ' কিউ এই বলে লাফাতে থাকে যে এটা তারও গৌরব, কেননা সে ও মিঃ যাও একই গোষ্ঠীর, সঠিক হিসেবে সফল পরীক্ষার্থীর চেয়ে তিন জেনারেশন বড়। সে সময়ে বেশ কিছু পথচারী আ' কিউকে ভয় করতে শুরু করে। কিন্তু পরদিন সাধ্যপাল মিঃ যাও-এর বাড়ীতে যাওয়ার জন্য তাকে সমন পাঠায়। তাকে দেখেই বুড়ো ভদ্রলোক রেগে লাল হয়ে চীৎকার করতে থাকে:

"হারামী আ' কিউ! তুমি কি বলেছ আমরা একই গোষ্ঠীর?"

আ' কিউ কোন জবাব দেয় না।

যতই মিঃ যাও তার দিকে তাকায় ততই সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এবং কয়েক কদম এগিয়ে বলে, "এসব বাজে কথার সাহস কোথায় পাও? তোমার মত আত্মীয় আমার কেমন করে থাকতে পারে? তোমার পারিবারিক নাম কি যাও?"

আ' কিউ কোন জবাব দেয় না, চলে আসার কথা ভাবে। এমন সময় মিঃ যাও এগিয়ে এসে তাকে চড় মারে।

"তোমার নাম যাও হবে কি করে? তুমি কি মনে কর তুমি এই নামের যোগ্য?"

যাও নামের ওপর অধিকার রক্ষায় আ' কিউ কোন চেষ্টা করে নি, বাম গাল ঘষতে ঘষতে সাধ্যপালের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। বাইরে আসামাত্র তাকে সাধ্যপালের আর এক পসলা গাল শুনতে হয় এবং নগদ দু'শ দিয়ে ছাড়া পায়। যারা এটা শুনেছে বলেছে নিজের বোকামির জন্য আ' কিউ এই মার খেয়েছে। তার নাম যাও হলেও — যেটা সম্ভব নয় — গর্ব করার চেয়ে তার ভালো করে জানা উচিত ছিল গ্রামে একজন মিঃ যাও বাস করে। এর পর আ' কিউ'র পূর্ব পুরুষদের কথা আর উঠে নি, তাই আজো জানি না তার সত্যিকারের পারিবারিক নাম' কি ছিল।

এই লেখার সময় তৃতীয় অসুবিধা দেখা হয়, আ' কিউ'র ব্যক্তিগত নাম কি-ভাবে লিখতে হবে তা আমি জানি না। তার জীবদ্দশায় সবাই তাকে ডাকত আ' কু-য়েই, কিন্তু মৃত্যুর পর কেউ আ' কুয়েই-এর কথা বলে নি। কেননা সে তাদের এক-জন নয় যাদের নাম "বাঁশের ফলক এবং সিল্কের ওপর"[3] লেখা থাকে। তার নাম টিকিয়ে রাখার কোন প্রশ্ন উঠলে, এই লেখাই হবে প্রথম উদ্যোগ। তাই শুরুতেই ঝামেলা। সমস্যাটি নিয়ে আমি ভালোভাবে ভেবেছি: আ' কুয়েই — এমনকি হতে পারে "কুয়েই" মানে ক্যাসিয়া বা সম্ভ্রান্ত? যদি তার আরেকটি নাম হত "চন্দ্র প্যাভিলিয়ন" অথবা যদি চন্দ্র উৎসবের সময় সে জন্ম দিন পালন করত তাহলে অবশ্যই ক্যাসিয়ার জন্য "কুয়েই" হত। কিন্তু যেহেতু তার অন্য কোন নাম ছিল না — থাকলেও কেউ তা জানত না — এবং কবিতা উপহার পাবার জন্য সে জন্মদিনে কোন দাওয়াত পাঠায় নি, তাই আ' কুয়েই (ক্যাসিয়া) লেখা এক তরফা ব্যাপার হবে। যদি আ' ফু (ধনী) নামে তার কোন বড় বা ছোট ভাই থাকত, তাহলে তাকে নিশ্চয়ই আ' কুয়েই (সম্ভ্রান্ত) ডাকা হত। কিন্তু সে ছিল একেবারে একা; তাই আ' কুয়েই (সম্ভ্রান্ত) লেখার কোন যুক্তি নেই। "কুয়েই" শব্দের সঙ্গে অন্য যেসব অক্ষর রয়েছে সেগুলো আরো বেমানান। একবার কাউন্টি পরীক্ষা পাশ করা মিঃ যাও এর ছেলেকে এই প্রশ্ন করেছিলাম। কিন্তু তার মত একজন পড়ালেখা জানা লোকও বোকা বনে যায়। তার মতে এই নামের ইতিহাস খুঁজে বের করতে না পারার কারণ হচ্ছে পশ্চিমা বর্ণমালা ব্যবহারের সপক্ষে প্রচার চালানোর জন্য ছেন ডুসিউ «নতুন যৌবন» পত্রিকা প্রকাশ করেছে,[4] এবং জাতীয় সংস্কৃতি গোল্লায় যাচ্ছে। শেষ চেষ্টা হিসেবে, আ' কিউ'র বৈধ কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখার জন্য নিজ জেলার একজনকে অনুরোধ করি। আট মাস পরে সে চিঠি লিখে জানায় দলিলপত্রে আ' কুয়েই বলে কোন নাম নেই। এটাই সত্যি, না আমার বন্ধু কোন কাজ করে নি এই

ব্যাপারে নিশ্চিত না হলেও, এভাবে নামের ইতিহাস বের করতে ব্যর্থ হয়ে আমি কোন উপায়ের কথা ভাবতে পারি নি। ধ্বনিবিদ্যার নতুন নিয়ম এখনো সাধারণে চালু হয় নি ভয়ে পশ্চিমা বর্ণমালা ব্যবহার ছাড়া কোন উপায় নেই এবং ইংরেজী বানান অনুযায়ী আ' কুয়েই লিখে তাকে সংক্ষেপে আ' কিউ করা হয়। আনুমানিকভাবে এটা «নতুন যৌবন» পত্রিকার অন্ধ অনুকরণ, এবং আমি নিজে খুব লজ্জিত, কিন্তু যেহেতু মিঃ যাও-এর ছেলের মত একজন লেখাপড়া জানা লোক আমার সমস্যার সমাধান করতে পারে নি, আমি আর •কি করতে পারি?

চতুর্থ সমস্যা দেখা দেয় আ' কিউ'র জন্মস্থান নিয়ে। তার পারিবারিক নাম যাও হলে, জেলাওয়ারীভাবে লোকজনের শ্রেণী বিভাগের পুরনো নিয়ম অনুযায়ী «একশ পারিবারিক নামের»[5] বর্ণনায় হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে "গানসু প্রদেশের থিয়ানশুই এর অধিবাসী"। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই পারিবারিক নাম সন্দেহজনক, তাই আ' কিউ'র জন্মস্থানও অনিশ্চিত থেকে যাবে। অধিকাংশ সময় ওয়েইযুয়াং-এ বাস করলেও, সে প্রায়ই অন্যান্য জায়গায়ও থাকত। তাই তাকে ওয়েইযুয়াং এর অধিবাসী বলা ভুল হবে। বাস্তবে এটা হবে ইতিহাসের বিকৃতি।

একটা ব্যাপার শুধু আমাকে সান্ত্বনা দেয়, তাহল, "আ'" অক্ষরটি সম্পূর্ণ সঠিক। এটা নিশ্চয়ই মিথ্যা উপমার ফলশ্রুতি নয়, এবং জ্ঞানগর্ভ সমালোচনার পরীক্ষা উতরে যেতে সক্ষম। অন্যান্য সমস্যা আমার মত মূর্খ লোকের সমাধানের কাজ নয়। আমি শুধু আশা করতে পারি "ইতিহাস ও গবেষণার অনুরাগী" ডঃ হু শি'র শিষ্য ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে পথ দেখাতে পারে। আমার ভয় হয়, ততদিনে «আ' কিউ'র সত্য ঘটনা» বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে।

উপরোক্ত কথাগুলো ভূমিকা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আ' কিউ'র বিজয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

আ' কিউ'র পারিবারিক নাম, ব্যক্তিগত নাম এবং জন্মস্থান সম্পর্কে অনিশ্চিতি সত্ত্বেও তার "পটভূমি" সম্পর্কেও কিছু অনিশ্চিতি আছে। এর কারণ তার "পটভূমি" সম্পর্কে সামান্যতম মনোযোগ না দিয়ে ওয়েইযুয়াং-এর লোকজন

তাকে ব্যবহার করেছে অথবা তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করেছে। আ' কিউ এ ব্যাপারে নীরব ছিল। কারো সঙ্গে ঝগড়া বাঁধলে সে হয়ত তাকিয়ে বলত: "তোমার চেয়ে আমাদের অবস্থা অনেক ভাল ছিল! নিজেকে তুমি কি ভাব?"

আ' কিউ'র কোন পরিবার ছিল না। সে ওয়েইয়ুয়াং এর ভূমিদেবতার মন্দিরে বাস করত। তার কোন নিয়মিত কাজও ছিল না, শুধু অন্যদের টুকটাক কাজ করে দিত; গম কাটার কাজ হলে কাটত, ধান মাড়াইয়ের কাজ হলে ধান মাড়াত, নৌকো নামানোর দরকার হলে নামিয়ে দিত। কাজে বেশ কিছু সময় লাগলে সে অস্থায়ী মালিকের ঘরে থাকত, কিন্তু শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চলে যেত। তাই' কোন কাজ করার দরকার হলেই লোকজন আ' কিউকে মনে করত, কিন্তু তারা শুধু তার কাজটাই দেখত, "পটভূমি" নয়। কিন্তু কাজ শেষ হতে না হতে আ' কিউকে ভুলে যেত, তার "পটভূমির" কথা কেউ বলত না। একবার এক বুড়ো সত্যি সত্যি বলেছিল, "আ' কিউ কত ভালো কাজের লোক!" সে সময় কোমর পর্যন্ত উলঙ্গ শুকনো, অনুভূতিহীন আ' কিউ তার সামনে দাঁড়িয়েছিল, অন্যেরা জানত না এই মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ না উপহাস করে বলা, কিন্তু আ' কিউ খুব খুশী হয়েছিল।

আবার নিজের সম্পর্কে আ' কিউ'র খুব উঁচু ধারণা ছিল। সে ওয়েইয়ুয়াং এর সবাইকে খাটো করে দেখত, এমনকি দুজন যুবক 'বুদ্ধিজীবী' একটু হাসির যোগ্য নয়, যদিও যুবক বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই হয়ত সরকারী পরীক্ষা পাশ করবে। গ্রামের লোকজন মিঃ যাও এবং মিঃ ছিয়ানকে খুব সম্মান করত, কেননা তারা শুধু টাকাপয়সা ওয়ালা নয়, উভয়েই যুবক বুদ্ধিজীবীর পিতা। শুধু আ' কিউ তাদের বিশেষ খাতির দেখায় নি, নিজে নিজে ভাবত, "আমার ছেলে হয়ত আরো বড় হবে।"

উপরন্তু কয়েকবার শহরে যাবার পর আ' কিউ স্বভাবতঃই আত্মম্ভরি হয়ে ওঠে, একই সময়ে শহুরে লোকদের জন্য তার ঘৃণাও ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, কাঠের তৈরী তিনফুট লম্বা, তিন ইঞ্চি চওড়া টেবিলকে ওয়েইয়ুয়াং এর লোকজন "লম্বা টেবিল" বলত। আ' কিউও এটাকে "লম্বা টেবিল" বলত, কিন্তু শহুরে লোকজন বলত "সোজা টেবিল", তাই সে ভাবত, "এটা ভুল। কি হাস্যকর ব্যাপার!" আবার বড় মাথা ওয়ালা মাছ ভাজলে ওয়েইয়ুয়াং এর লোকজন তাতে পেঁয়াজ পাতা বড়ো বড়ো করে কেটে দিত আর শহুরে লোকেরা দিত ছোট ছোট করে কেটে। সে ভাবত, "এটাও ভুল। কি হাস্যকর ব্যাপার!" কিন্তু ওয়েইয়ুয়াং এর অধিবাসীরা ছিল সত্যিই অজ্ঞ, চাষাভূষা লোক, যারা কখনো শহুরে ভাজা মাছ দেখে নি।

আ' কিউ "যার অবস্থা অনেক ভালো ছিল" যে ছিল বস্তুবাদী এবং "ভালো শ্রমিক" শারীরিক কিছু ত্রুটি না থাকলে সে নিখুঁত মানুষ হতে পারত। কিন্তু সবচে বিরক্তিকর ছিল তার মাথার খুলির কয়েকটি জায়গা যেখানে কোন একসময় দাদ হয়েছিল কিন্তু এখনো দাগ আছে। এটা তার নিজের মাথায় হলেও, ব্যাপারটা আ' কিউ খুব সম্মানজনক মনে করত না, তাই সে'দাদ' বা এধরণের উচ্চারণের যে কোন শব্দ এড়িয়ে যেত। শেষে ব্যাপারটা নিয়ে সে আর একটু বাড়াবাড়ি করে, "উজ্জ্বল" এবং "আলো" নিষিদ্ধ শব্দ করে দেয় এবং আরো পরে "বাতি" এবং "মোমবাতি" শব্দ দুটোও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যখনই এই নিষেধাজ্ঞা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অমান্য করা হত, আ' কিউ রাগে ফেটে পড়ত, তার দাদের দাগ রক্তবর্ণ হয়ে যেত। সে অপরাধীর দিকে তাকাত, তর্কে দুর্বল হলে গাল দিত এবং শক্তি কম হলে আঘাত করত। এসব সংঘর্ষে আ' কিউই হেরে যেত। শেষ পর্যন্ত সে নতুন ফন্দি আঁটে। ক্ষিপ্ত চোখে তাকিয়েই তৃপ্ত থাকত।

এই ক্ষিপ্ত দৃষ্টির পর থেকে ওয়েইযুয়াং এর ভবঘুরেরা তাকে নিয়ে আরো বেশী হাসি-তামাশা করতে থাকে। তাকে দেখা মাত্রই তারা ভান করে চমকে উঠে বলত :

"দেখ! আলো জ্বলে উঠছে।"

আ' কিউ প্রতিদিনের মত ক্ষেপে যেত এবং ক্ষিপ্ত চোখে তাকাত। মোটেও ভয় না পেয়ে তারা বলে চলত, "তাহলে এটা প্যারাফিনের বাতি।"

পাল্টা কিছুর জন্য মাথা চুলকানো ছাড়া আ' কিউ'র কিছুই করার ছিল না। "তোমরা এর যোগ্য নও......" এসময়ে মনে হত তার খুলির দাগগুলো সম্মানের ব্যাপার, সাধারণ দাদের দাগ নয়। আমরা আগেই বলেছি আ' কিউ বস্তুবাদী লোক : তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে সে নিষেধাজ্ঞা প্রায় অমান্য করে ফেলেছে, তাই আর কিছু বলা থেকে বিরত থাকে।

ভবঘুরেরা এতেও খুশী না হয়ে তাকে খোঁচাতে থাকলে ঘুষাঘুষি বেঁধে যেত। তারপর আ' কিউ পরাস্ত হলে, তার বাদামী বেণী টানা হলে, তার মাথা চার পাঁচ বার দেয়ালের সঙ্গে ঠোকা হলে বিজয়ের তৃপ্তিতে তারা হেঁটে চলে যেত। আ' কিউ সেখানে এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকত, ভাবত, "ব্যাপারটা এমন, যেন নিজের ছেলের হাতে মার খেয়েছি। দিন দুনিয়ার কি হচ্ছে......" তারপর সেও জয়ের তৃপ্তিতে চলে যেত।

আ' কিউ যাই ভেবে থাকুক পরে সে লোকজনকে অবশ্যই বলত ; যারা আ' কিউকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করত তারা জানত মানসিক জয়ের এই একটা

উপায় তার আছে। তাই এরপর যারা তার বাদামী বেণী টানত তারা আগেভাগে বলে দিত : "আ' কিউ, এটা পুত্রের হাতে পিতার মার খাওয়া নয়, এটা মানুষের হাতে পশুর মার খাওয়া। তোমাকে বলতে শুনতে চাই : একজন মানুষ একটি পশুকে মারছে।"

তারপর বেণীর গোড়া চেপে ধরে আ' কিউ বলত : "পোকাকে মারধোর — বললে কেমন হয় ? আমি একটি পোকা — তাহলে কি আমাকে যেতে দেবে ?"

সে পোকা হলেও ভবঘুরেরা তাকে যেতে দেবে না। তাদের নিয়ম অনুযায়ী কাছের কোন কিছু একটার সঙ্গে পাঁচ ছয় বার তার মাথা ঠুকবে, তারপর আ' কিউ'র শিক্ষা হয়েছে ভেবে, জয়ের আনন্দে হেঁটে চলে যাবে। দশ সেকেণ্ডের কম সময়ে অবশ্য আ' কিউও জয়ের তৃপ্তিতে হেঁটে যাবে, ভাববে সে "এক নম্বর আত্মমর্যাদাহীন" এবং "আত্মমর্যাদাহীন" বাদ দিলে থাকে "এক নম্বর"। রাজকীয় পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকারী পরীক্ষার্থীও কি "এক নম্বর" নয়? "তোমরা নিজেকে কি ভাব ?"

শত্রুদের হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্য এসব দুষ্ট বুদ্ধি এঁটে আ' কিউ খুশীতে মদের দোকানে যাবে কয়েক বাটি মদ পান করার জন্য ,অন্যাদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করার জন্য, তাদের সঙ্গে আবার ঝগড়া করার জন্য, বিজয়ীর বেশে বেড়িয়ে আসার জন্য, তারপর মনের খুশীতে ফিরে যাবে ভূমি দেবতার মন্দিরে এবং সেখানে বালিশে মাথা রাখা মাত্রই ঘুমিয়ে পড়বে। টাকা থাকলে সে জুয়া খেলত। একদল মাটিতে বসত, তাদের মাঝখানে স্যাণ্ডউইচের মত আ' কিউ, মুখ দিয়ে ঘাম ঝরছে এবং সবচে উচ্চ শোনাচ্ছে তার গলা : "সবুজ ড্রাগনে চারশো!"

"হে — ওখানে খোল!" বাজীওয়ালা, তারও মুখ দিয়ে ঘাম ঝরছে, বাক্স খুলে চীৎকার করবে : "স্বর্গীয় দরজা — কোনায় কিছু নেই। — জনপ্রিয়তায় কোন বাজী নেই। আ' কিউ'র পয়সা দিয়ে দাও!"

"একশো — একশো পঞ্চাশ।"

এই চীৎকারে আ' কিউ'র টাকা ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় অন্যান্য ঘর্মাক্ত লোক-জনের পকেটে। শেষ পর্যন্ত সে বাধ্য হয়ে ভীড় ঠেলে বেরিয়ে গিয়ে পেছন থেকে দেখে। খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার উৎসাহ থাকবে, তার পর অনিচ্ছায় ফিরে যাবে ভূমি দেবতার মন্দিরে। পরদিন ফোলা চোখ নিয়ে কাজে যাবে।

হতভাগ্য আ' কিউ যখন জিতে তখন "হতভাগ্য গোপন আশীর্বাদ" এই প্রবাদের সত্যতা মেলে এবং শেষে সে প্রায় হেরে যায়।

এটা ওয়েইযুয়াং-এ দেবতা পূজা উৎসবের সন্ধ্যার কথা। রীতি অনুযায়ী নাটক হচ্ছে এবং রীতি অনুযায়ীই মঞ্চের কাছে অসংখ্য জুয়ার টেবিল। নাটকের ঢোল

করতালের শব্দ আ' কিউ'র কানে প্রায় তিন মাইল দূরের মনে হচ্ছে, কান শুধু জুয়াড়ীর গান শুনতে অভ্যস্ত। সে বার বার জিতছে, তার তামা পরিণত হচ্ছে রূপোয়, রূপো পরিণত হচ্ছে ডলারে এবং ডলারের সংখ্যা বাড়ছে। উত্তেজনায় সে চীৎকার করে ওঠে :

"স্বর্গীয় দরোজায় দু ডলার।"

সে জানে না প্রথম কে, কিজন্যে মারামারি বাধিয়েছে। গালাগালি, কিল ঘুষি, পায়ের লাথি সব কিছু তার কানে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এবং সে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে জুয়ার টেবিল এবং জুয়াড়ীরা উধাও হয়ে যায়। তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা করছে যেন কিল-ঘুষি লাথি খেয়েছে এবং বিস্ময়ে কিছু লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে। ভুল হয়ে গেছে মনে করে সে ভূমিদেবতার মন্দিরে ফিরে যায় এবং হুঁশ ফিরতে ফিরতে বুঝতে পারে তার ডলারগুলো উধাও হয়ে গেছে। মেলায় জুয়া চালনাকারীদের অনেকেই ওয়েইযুয়াং অধিবাসী নয়। তাই কোথায় সে অপরাধীদের খুঁজবে?

কি সাদা এবং চকচকে রূপোর স্তূপ। সবগুলো তারই ছিল ...... এখন উধাও হয়ে গেছে। ছেলে চুরি করেছে ভেবেও সে শান্তি পায় না। নিজেকে পোকা হিসেবে ভেবেও সে শান্তি পায় না। এই প্রথম সে সত্যি সত্যি পরাজয়ের তিক্ততার স্বাদ পায়।

কিন্তু পরাজয়কে সে পরিবর্তন করে বিজয়ে। ডান হাত দিয়ে নিজের গালে দু'বার সে এতো জোরে চড় কষায় যে বেশ তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। তবে চড় মেরে সে কিছুটা হাল্কা বোধ করে, কারণ সে বুঝতে পারে : যে চড় মেরেছে সে অন্য কেউ নয়, সে নিজেই, এবং যে চড় খেয়েছে সে অন্যজন, কাজেই এটা যেন সত্যি যে, সে চড় মেরেছে অন্য কাউকে — যদিও ব্যথায় তার নিজের গালই জ্ব'লে যাচ্ছিলো। যেন বিজয় অর্জন করেছে এইভাবে সে শুয়ে পড়ে তৃপ্ত হ'য়ে।

আর তাড়াতাড়ি ঘুমিয়েও পড়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

আ' কিউ'র বিজয়ের আরো কিছু কাহিনী

আ' কিউ সবসময় জিতলেও, মিঃ যাও এর চড় খাবার সৌভাগ্যের পর থেকে সে বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

সাধ্যপালকে নগদ দু'শো দেয়ার পর সে ক্ষিপ্ত হয়ে শুয়ে থাকে। তারপর নিজে নিজে বলে : "দুনিয়ার কি হচ্ছে, পুত্র পিতামাতাকে মারছে......" তারপর পুত্রবৎ মিঃ যাও এর মানসম্মানের চিন্তা তার মনোবল বাড়িয়ে দেয়। সে উঠে "স্বামীর কবরের পাশে যুবতী বিধবা" গান গাইতে গাইতে মদের দোকানে যায়। এ সময়ে সে বোধ করে মিঃ যাও অনেকের চেয়েই সেরা।

অবাক ব্যাপার, এই ঘটনার পর থেকে সত্যি সত্যি সবাই তাকে অস্বাভাবিক সমীহ করতে থাকে। সম্ভবতঃ মনে করেছে সে মিঃ যাও এর বাবা, কিন্তু বাস্তবে ঘটনা তা নয়। প্রথা অনুযায়ী ওয়েইযুয়াং-এ সাত নম্বর ছেলে যদি আট নম্বর ছেলেকে অথবা অমুক অমুককে মারে তাহলে তাকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। কোন মারামারি মিঃ যাও এর মত গুরুত্বপূর্ণ লোকের সঙ্গে জড়িত হতে হবে, তাহলেই গ্রামবাসীরা এটাকে আলাপের বিষয় মনে করবে। এবং একবার এটাকে তারা আলাপের মনে করলে, এবং মার দেওয়া লোকটি বিখ্যাত বলেই মার খাওয়া লোকটি তার কিছু সম্মান ভোগ করে। আ' কিউ'র দোষ স্বাভাবিক হিসেবেই নেয়া হয়, এবং মিঃ যাও সম্ভবতঃ ভুল করতে পারেন না। কিন্তু আ' কিউ দোষী হলে সবাই তাকে অস্বাভাবিক সমীহ করবে কেন? এটা ব্যাখ্যা করা কঠিন। আমরা যুক্তি হিসেবে বলতে পারি, বোধ হয় এই কারণে যে আ' কিউ বলেছে সে ও মিঃ যাও একই গোষ্ঠীর, এবং সে মার খেলেও লোকজনের ভয় এতে কিছুটা সত্য আছে, তাই তাকে সমীহ করাই নিরাপদ। অন্যথায় এটা কনফুসীয় মন্দিরে বলির গরুর ব্যাপার হতে পারে, প্রাণী হিসেবে গরু, পাঁঠা এবং শুয়র একই শ্রেণীর হলেও, সন্ন্যাসী তা ভোগ করেছেন বলেই পরে কনফুসিয়াস তা স্পর্শ করার সাহস পান নি।

এরপর কয়েক বছর আ' কিউ উন্নতি করতে থাকে।

এক বসন্তে মনের খুশীতে হাঁটতে গিয়ে সে দেখে উদোম গায়ে, দেয়ার নীচে সূর্যের আলোয় বসে বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং উঁকুন মারছে। এই দৃশ্য দেখে তার নিজের শরীর চুলকাতে থাকে। যেহেতু বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং মামড়ি-পড়া এবং গোঁফওয়ালা, তাই সবাই তাকে ডাকত, "দাদওয়ালা বিড়াল গোঁফ ওয়াং"। আ' কিউ "দাদ" শব্দটা এড়িয়ে গেলেও, এই লোকটার জন্য তার ঘৃণা ছিল সবচে বেশী। আ' কিউ'র মনে হয় মামড়ি–পড়া লোকজন ব্যতিক্রম না হলেও, তার অতিরিক্ত লোমওয়ালা গাল খুব বেশী অস্বাভাবিক এবং তাতে শুধু ঘৃণার উদ্রেক হয়। তাই আ' কিউ তার পাশে বসে। অন্য কোন ভবঘুরে হলে আ' কিউ এত অসতর্কভাবে বসার সাহস পেত না, কিন্তু বিড়াল গোঁফওয়ালা

ওয়াং এর পাশে তার ভয়ের কি আছে? সত্যি বলতে কি, সে যে বসতে রাজী এটাই ওয়াং এর জন্য সম্মানের ব্যাপার।

আ' কিউ তার জীর্ণ জ্যাকেটটি খুলে উল্টে নেয়। কিন্তু হয় এটা সে সম্প্রতি ধুয়েছে বলে অথবা সে খুব জেবড়া-জোবড়া বলে অনেক খোঁজাখুঁজির পর মাত্র তিন চারটে উঁকুন পাওয়া যায়। সে দেখে বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং দ্রুত একটার পর একটা ধরছে এবং পট্‌পট্‌ শব্দে দাঁত দিয়ে মারছে।

আ' কিউ প্রথমে হতাশ হয়, তারপর রেগে যায় ; জঘন্য বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং এতগুলো ধরতে পেরেছে আর সে কিনা ধরেছে সামান্য কটি — কি লজ্জার ব্যাপার! একটা বা দুটো বড় ধরার জন্য সে প্রতীক্ষা করতে থাকে, কিন্তু একটাও নেই, এবং অনেক কষ্টের পর সে মাঝারি একটা ধরে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্র-ভাবে সে সেটা মুখে পুরে দেয় এবং পশুর মত কামড়াতে থাকে ; কিন্তু হাল্কা পট্‌পট্‌ শব্দ শুধু হয়, আবার বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং-এর শব্দের চেয়ে নীচু মানের।

আ' কিউ'র কপাল লাল হয়ে ওঠে। মাটিতে জ্যাকেট ছুঁড়ে সে থুথু ছিটিয়ে বলে, "লোমশ পোকা!"

বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং ঘৃণাভরে তাকায়, "পাঁচড়াওয়ালা কুত্তা, তুমি কাকে গাল দিচ্ছ?"

গত কয়েক বছরের সমীহ আ' কিউ'র গর্ব বাড়িয়ে দিলেও, মারামারিতে অভ্যস্ত — ভবঘুরেদের সঙ্গে দেখা হলেই সে বরং একটু ভয় পায়। এবার সে একটু অস্বাভাবিক ঝগড়াটে বোধ করছে। এরকম একটা লোমওয়ালা প্রাণী তাকে অপমান করার সাহস পায় কোথায়?

পাছার ওপর হাত রেখে আ' কিউ উঠে দাঁড়ায় "যাকে খাটে, তাকে।"

কোট চাপিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং বলে : "পিঠ সুড়সুড় করছে বুঝি?"

ওয়াং পালিয়ে যাচ্ছে মনে করে ঘুষি তুলে আ' কিউ এগিয়ে যায়। কিন্তু সে ঘুষি মারবার আগেই ওয়াং তাকে ধরে এমন হেঁচকা টান মারে যে সে টলতে থাকে। তারপর বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং তার বেণী টানতে টানতে মাথা ঠোকার জন্য দেয়ালের দিকে নিয়ে যেতে থাকে।

মাথা একদিকে কাৎ করে আ' কিউ প্রতিবাদ জানায়, "ভদ্রলোক হাত নয়, মুখ ব্যবহার করে।"

বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং ভদ্রলোক নয়। আ' কিউ'র কথায় কোন কান না দিয়ে সে পর পর পাঁচবার দেয়ালের সঙ্গে তার মাথা ঠুকে এবং এমন জোরে

ধাক্কা মারে যে সে টলতে টলতে দুগজ দূরে গিয়ে পড়ে। তার পরে বিড়াল গোঁফ-ওয়ালা ওয়াং মনের তৃপ্তিতে চলে যায়।

যতদূর মনে পড়ে, এই প্রথমবার এতখানি হেনস্তা হয়েছে আ' কিউ। কেননা সবসময় বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াংকে তার কুৎসিৎ গালের জন্য ব্যঙ্গ করেছে। ওয়াং তাকে ব্যঙ্গ করে নি, মার খাওয়া দূরে থাক। এখন, সবকিছু উল্টে দিয়ে বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং তাকে মেরেছে। বোধ হয় বাজারে লোকজন যা বলেছে সত্যি : "সম্রাট রাজকীয় পরীক্ষা তুলে দিয়েছেন, তাই পরীক্ষা পাশ করা পণ্ডিতদের কোন চাহিদা নেই।" এ কারণে যাও পরিবার মানমর্যাদা হারিয়েছে। একারণেই কি লোকজন তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে?

অস্থিরভাবে আ' কিউ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে।

দূর থেকে আ' কিউ'র আর এক শত্রু এগিয়ে আসে। সে মিঃ ছিয়ান-এর বড় ছেলে যাকে আ' কিউ ঘৃণা করে। শহরে একটি বিদেশী স্কুলে পড়াশোনা করার পর মনে হয় সে জাপান গিয়েছে। ছয়মাস পরে যখন সে ফিরে আসে তার বেণী উধাও হয়ে গেছে এবং পা সোজা হয়ে গেছে। তার মা বহু কান্নাকাটি করেছে এবং বউ তিনবার কূয়ায় ঝাপ দিতে চেয়েছে। পরে তার মা সবাইকে বলেছে : "সে যখন মাতাল ছিল তখন কোন হারামজাদা তার বেণী কেটে দিয়েছে। সে সরকারী আমলা হতে পারত, কিন্তু এখন তাকে অপেক্ষা করতে হবে তা গজানোর জন্য।" আ' কিউ এসব বিশ্বেস করে নি এবং সবসময় তাকে বলত : "মেকী বিদেশী শয়তান" এবং "দালাল বিশ্বাসঘাতক।" তাকে দেখামাত্রই আ' কিউ পুরো দমে তাকে মনে মনে গাল দিতে শুরু করত।

তার নকল বেণী আ' কিউ সবচে বেশী ঘৃণা ও অপছন্দ করত। নকল বেণী লাগাতে হলে একজন মানুষকে মানুষ গণ্য করা যায় না, এবং যেহেতু তার বউ চতুর্থ বার কূয়ায় ঝাপ দিতে যায় নি তাই তাকেও ভালো মেয়েমানুষ বলা যায় না।

এখন এই মেকী বিদেশী শয়তানটা এগিয়ে আসছে।

"টেকো মাথা — গাধা —" অতীতে আ' কিউ তাকে মনে মনে গাল দিয়েছে, যা শোনা যায় নি, কিন্তু আজ মেজাজ খারাপ থাকায় এবং মনের ভাব প্রকাশ করতে চাওয়ায় কথাগুলো মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ে।

কপাল খারাপ, এই টেকো মাথার হাতে ছিল চকচকে, বাদামী একটি লাঠি, আ' কিউ যেটাকে বলেছে 'শোকার্তদের লাঠি।' সে আ' কিউ'র ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মার আসছে বুঝতে পেরে আ' কিউ তাকে জড়িয়ে ধরে। এমন জোরে লাঠির শব্দ হয় যেন তা আ' কিউ'র মাথার ওপরেই পড়েছে।



এখন এই মেকী বিদেশী শয়তান এগিয়ে আসছে।

পাশেই একটি শিশুকে দেখিয়ে আ' কিউ বলে : "তাকে বলেছি।"

ফট্। ফট্। ফট্।

যতদূর মনে করতে পারে এটাই আ' কিউ'র জীবনের দ্বিতীয় বারের হেনস্তা। কপাল ভালো, লাঠির বাড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তার মনে হয় ব্যাপারটা শেষ এবং সেও কিছুটা স্বস্তি বোধ করে। উপরন্তু পূর্বপুরুষদের শিখিয়ে দেওয়া "ভুলে যাওয়ার ক্ষমতা" তাকে ভালো সুবিধে দেয়। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় এবং শুঁড়ীখানার দরোজার কাছে পেঁৗছতে পেঁৗছতে আবার খুশী বোধ করে।

ঠিক সে সময়ে "আত্ম উন্নতি কনভেণ্ট" থেকে এক ছোট্ট সন্ন্যাসিনী তার দিকে এগিয়ে আসে। সন্ন্যাসিনী দেখলেই সবসময় আ' কিউ'র মেজাজ বিগড়ে যায়, তার ওপর এই হেনস্তার পর। যা যা ঘটেছে মনে করতেই তার রাগ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

সে মনে মনে ভাবে, "আজ তোমাকে দেখেছি বলেই কপাল খারাপ।"

সে তার দিকে এগিয়ে শব্দ করে থুথু ফেলতে থাকে, "থু......থু!"

সন্ন্যাসিনী তার দিকে কোন নজর না দিয়ে মাথা নীচু করে এগিয়ে যায়। আ' কিউ তার কাছে যায়, সদ্য নেড়া করা মাথায় হাত বুলিয়ে বোকার মত হেসে ওঠে, "নেড়া মাথা। তাড়াতাড়ি ফিরে যাও...... তোমার সন্ন্যাসী তোমার জন্য অপেক্ষা করছে......"

লজ্জায় লাল হয়ে দ্রুত চলে যেতে যেতে সন্ন্যাসিনী জানতে চায়, "তুমি কাকে হাত বুলাচ্ছ?......"

শুঁড়ীখানার লোকজন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। তার কাজ প্রশংসিত হয়েছে দেখতে পেয়ে আ' কিউ গর্ব বোধ করে।

সন্ন্যাসিনীর গাল টিপে সে বলে : "সন্ন্যাসী তোমাকে হাত বুলাতে পারলে আমি পারব না কেন?"

আবার শুঁড়ীখানার লোকজন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। আ' কিউ আরো তৃপ্ত বোধ করে, এবং যারা সায় জানাচ্ছে তাদের খুশী করার জন্য তাকে চলে যেতে দেয়ার আগে জোরে চিমটি কাটে।

এই ঘটনার সময় সে বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং এবং মেকী বিদেশী শয়তানকে ভুলে যায় যেন সারা দিনের দুর্ভাগ্যের প্রতিশোধ নেয়া হয়ে গেছে। আরো অবাক ব্যাপার, মার খাওয়ার পরের চেয়ে সে আরো বেশী হাল্কা বোধ করে, এত হাল্কা যেন বাতাসে উড়ে যেতে তৈরী।

দূর থেকে ছোট সন্ন্যাসিনীর অশ্রুভেজা কন্ঠ ভেসে আসে, "আ' কিউ, তোমার নির্বংশ মরণ হোক!"

আ' কিউ মনের খুশীতে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

কম তৃপ্তিতে শুঁড়ীখানার লোকজনও অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রেমের ট্র্যাজেডী

বলা হয় এমন অনেক বিজেতা আছে যারা বিজয়ে কোন আনন্দ পায় না যদি তাদের প্রতিপক্ষ বাঘ অথবা ইগলের মত হিংস্র না হয়; তাদের প্রতিপক্ষ যদি ভেড়া বা মুরগীর মত নিরীহ হয় তাহলে বিজয়টা তাদের কাছে শূন্য মনে হয়। অনেক বিজেতা আছে যারা সব শেষ হয়ে গেলে, শত্রু নিহত অথবা আত্মসমর্পণ করলে, ভীষণ ভয়ংকর হলে উপলব্ধি করে কোন শত্রু বা মিত্র অবশিষ্ট নেই — শুধু তারাই আছে, সার্বভৌম, নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত এবং অভাগা। তখন তাদের কাছে বিজয়টা মনে হয় ট্র্যাজেডী। কিন্তু আমাদের নায়ক এতটা মেরুদণ্ডহীন নয়। সে সবসময় মহোল্লসিত। সারা বিশ্বের ওপর চীনের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের এটা একটা প্রমাণ হতে পারে।

আ' কিউ'র দিকে দেখুন, হাল্কা এবং গর্বিত, যেন উড়ে যেতে তৈরী!

অবশ্য এ বিজয় অদ্ভুত পরিণতিহীন নয়। বেশ কিছু সময় ধরে তার উড়ে যাবার কথা মনে হয়েছে এবং সে ভূমি দেবতার মন্দিরে উড়ে গেছে, যেখানে শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে নাক ডাকতে শুরু করবে। আজ সন্ধ্যায় চোখ বন্ধ করাটা তার কাছে খুব কষ্টকর মনে হয়, মনে হয় তার বুড়ো আঙ্গুল এবং তর্জনীতে কিছু একটা ঘটেছে, অন্য দিনের চেয়ে বেশী মসৃণ। বলা শক্ত ছোট সন্ন্যাসিনীর মুখ থেকে নরম এবং মসৃণ কিছু তার আঙ্গুলে লেগে গেছে কিনা অথবা আঙ্গুল তার গালে মসৃণভাবে বুলিয়েছে।

"আ' কিউ, তোমার নির্বংশ মরণ হোক!"

শব্দগুলো আবার তার কানে বাজে। সে ভাবে, "সত্যিই তো, আমার বউ আনা উচিত, কেননা পুত্রহীন কোন পুরুষ মারা গেলে আত্মার জন্য ভাতের ভোগ দেয়ার কেউ থাকবে না . . . . . . আমার একটা বউ আনা উচিত।" কথায় বলে,

"তিনধরণের পাপ আছে, এর মধ্যে সবচে খারাপ হচ্ছে কোন বংশধর না থাকা।" এবং জীবনের একটি ট্র্যাজেডী হচ্ছে "বংশধরহীন আত্মা উপবাসী থাকে।"[6] তাই তার চিন্তা সাধু ও সন্ন্যাসীদের চিন্তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত এবং এটা খারাপ যে সে পরে পাগলের মত ছুটোছুটি করবে।

সে ভাবে, "নারী, নারী! ......"

"......সন্ন্যাসী হাত বুলোয় ......নারী! নারী! ...... নারী!" সে আবার ভাবে।

• আমরা কখনো জানবো না সে সন্ধ্যায় আ' কিউ কখন শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ে। এরপর, সম্ভবতঃ সবসময় তার আঙ্গুলগুলো মনে হয়েছে নরম এবং মসৃণ এবং মাথা ঝিম ঝিম করেছে। "নারী ......" সে ভেবেই চলে।

এ থেকে আমরা দেখতে পাই নারী মানবজাতির জন্য একটা সর্বনাশ।

নারীজাতি দ্বারা ধ্বংস না হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ চীনা পুরুষ সন্ন্যাসী এবং সাধু হতে পারত। ডা জি ধ্বংস করে শাং রাজবংশ, যৌ রাজবংশের মান সম্মান বিসর্জন দেয় বাও সি, আর ছিন রাজবংশের ব্যাপারে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। যদি আমরা ধরে নেই কোন মহিলার কারণে এর পতন হয়েছে তাহলে হয়ত আমরা খুব ভুল হব না। এবং এটা সত্য যে ডোং যুও-র মৃত্যুর কারণ ডিয়াও ছান।[7]

শুরুতে আ' কিউ'র নীতিজ্ঞানও ছিল খুব টনটনে। যদিও আমরা জানি না কোন ভাল শিক্ষক তাকে পথ দেখিয়েছেন কিনা, কিন্তু সে সবসময় "নারী-পুরুষের বিভক্তিতে" বিশ্বাস করত এবং ছোট সন্ন্যাসিনী ও "মেকী বিদেশী শয়তান" কে নিন্দার ব্যাপারে ছিল যথেষ্ট নিরপেক্ষ। তার ধারণা ছিল "সব সন্ন্যাসিনী নিশ্চয়ই গোপনে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে। কোন মহিলা যদি রাস্তা দিয়ে একা চলাফেরা করে তাহলে সে নিশ্চয়ই মন্দলোকদের প্রলুব্ধ করতে চায়। একজন মহিলা ও একজন পুরুষ যখন একসঙ্গে কথা বলে তখন নিশ্চয়ই মিলনের ব্যবস্থা কবতে চায়।" এ ধরণের লোকজনকে সংশোধন করার জন্য সে কড়া করে তাকাবে, চীৎকার করে গাল দেবে এবং জায়গাটা নির্জন হলে পেছন থেকে ছোট্ট পাথর ছুড়বে।

কে ভাবতে পেরেছিল ত্রিশের কোঠায় যখন একজনের "দৃঢ় থাকা"[৪] উচিত তখন সে ছোট্ট এক সন্ন্যাসিনীকে নিয়ে মাথা খোয়াবে। চিরায়ত নিয়ম অনুযায়ী এই ধরণের চিত্তচাঞ্চল্য সবচে নিন্দনীয়। মহিলারা ঘৃণ্য প্রাণী। ছোট সন্ন্যাসিনীর মুখমণ্ডল নরম ও মসৃণ না হলে সে আ' কিউকে যাদু করতে পারত না, ছোট সন্ন্যাসিনীর মুখ কাপড়ে ঢাকা থাকলেও এমনটা ঘটত না। পাঁচ ছয়

বছর আগে একবার মুক্তাঙ্গন অপেরা দেখার সময় সে এক দর্শক মহিলার পায়ে চিমটি কেটেছিল, কিন্তু মহিলার পরণে প্যাণ্ট থাকায় পরে তার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে নি। ছোট সন্ন্যাসিনী তার মুখ কাপড়ে ঢাকে নি এবং এটা বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের দোষের আর একটি প্রমাণ।

আ' কিউ ভাবে, "নারী ......"

যে সব মহিলারা "খারাপ পুরুষদের বশ করতে চায়" সে তাদের ওপর কড়া নজর রাখে, কিন্তু তারা তাকে দেখে হাসে না। সে সব মহিলা তার সঙ্গে কথা বলে তা সে খুব মনোযোগের সঙ্গে শোনে, কিন্তু তাদের কেউ গোপন অভিসারের কথা বলে না। আহ! এটা নারীর ভণিতার আর একটি উদাহরণ, তারা সবাই নকল বিনয়ের ভান করে।

মিঃ যাও এর বাড়ীতে ধান মাড়াইয়ের সময় একদিন সন্ধ্যায় খাবারের পর আ' কিউ পাইপ টানার জন্য রান্নাঘরে বসেছে। অন্য কারো বাড়ী হলে সে সান্ধ্য খাবারের পর বাড়ী চলে যেতে পারত, কিন্তু যাও পরিবারে তাড়াতাড়ি খাওয়া হয়। যদিও নিয়ম ছিল বাতি জ্বালানো চলবে না, খাওয়ার পরই বিছানায় যেতে হবে, নিয়মের কিছু কিছু ব্যতিক্রমও ছিল। মিঃ যাও এর ছেলে কাউন্টি পরীক্ষা পাশ করার আগে পরীক্ষার পড়া তৈরির জন্য তাঁর বাতি জ্বালানোর অনুমতি ছিল এবং আ' কিউ যখন খুচরো কাজে যেত তখন সে ধান মাড়াইয়ের জন্য বাতি জ্বালাতে পারত। নিয়মের এই পরবর্তী ব্যতিক্রমের জন্য কাজ করার আগে আ' কিউ রান্নাঘরে বসে পাইপ টানছিল।

যাও পরিবারের একমাত্র চাকরানী আমা উ থালাবাসন ধোয়ার পর লম্বা বেঞ্চির ওপর বসে আ' কিউ'র সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেয়:

"আমাদের গিন্নী দুদিন কিছু খান নি কেননা কর্তা একজন রক্ষিতা আনতে চান ......"

আ' কিউ ভাবে, "নারী ...... আমা উ ...... এই ছোট বিধবা।"

"অষ্টম চাঁদে আমাদের ছোট গিন্নীর বাচ্চা হবে।"

"নারী ......" আ' কিউ ভাবে।

পাইপ রেখে আ' কিউ উঠে দাঁড়ায়।

আমা উ বলে চলে, "আমাদের ছোট গিন্নী ......"

"আমার সঙ্গে শুবি!" আ' কিউ হঠাৎ এগিয়ে নিজেকে তার পায়ে ছুড়ে দেয়।

এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ নীরবতা নেমে আসে।

"অ্যা!" একমুহূর্তের জন্য বোবা বনে গিয়ে আমা উ হঠাৎ কাঁপতে থাকে,

তারপর, চেঁচাতে চেঁচাতে বেরিয়ে যায় এবং সহসাই তার ফোঁপানি শোনা যায়।

দেয়ালের উল্টো দিকে হাঁটু গেড়ে বসা আ' কিউও বোবা বনে যায়। দুহাতে খালি বেঞ্চি ধরে সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়, বুঝতে পারে কিছু একটা গোল-মাল হয়েছে। আসলে, এই সময়ে সে নিজেই নার্ভাস হয়ে পড়েছে। চোখের পলকে সে কোমরের বেল্টের সঙ্গে পাইপ গুঁজে ধানের কাছে যাওয়া ঠিক করে কিন্তু — ধপাস — তার মাথার ওপর একটি বিরাট ঘুষি নেমে আসে এবং সে ঘুরে তাকিয়ে দেখতে পায় সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থী তার সামনে দাঁড়িয়ে বিরাট বাঁশের লাঠি ঘোরাচ্ছে।

"তুই ...... তুই সাহস পেলি কোথায় ......"

বিরাট বাঁশের লাঠি ঘাড়ের অপর দিকে নেমে আসে। দুহাতে মাথা ঠেকাতে গেলে আঘাতটা আঙ্গুলের গিঁটের ওপর পড়ে, যথেষ্ট ব্যথা লাগে। রান্নাঘরের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাবার সময় মনে হয় একটা বাড়ি তার পিঠেও পড়েছে।

"কচ্ছপের ডিম!" সফল কাউণ্টি পরীক্ষার্থী চীৎকার করে, পেছন থেকে কথ্য চীনা ভাষায় গালাগাল করতে থাকে।

ধান মাড়াইয়ের জায়গায় পালিয়ে গিয়ে আ' কিউ একলা দাঁড়িয়ে থাকে। আঙ্গুলের গিঁটে ব্যথা করছে এবং "কচ্ছপের ডিম" শব্দটা সে ভাবতে থাকে কেননা ওয়েইযুয়াং এর অধিবাসীরা কখনো তা ব্যবহার করে নি, শুধু যারা সরকারী জীবন দেখেছে সেই ধনীরা ব্যবহার করে। এতে সে আরো ভয় পেয়ে যায়। এবং মনের ওপর একটা বিরাট প্রভাব ফেলে। ততক্ষণে "নারী ......" সব চিন্তা উবে গেছে। এই গালাগাল্লি ও পিটুনির পর মনে হয় কিছু একটা হয়ে গেছে এবং সে হাল্কা মনে আবার ধান মাড়াইয়ের কাজ শুরু করে। কিছুক্ষণ পর তার গরম লাগে এবং জামা খোলার জন্য সে কাজ বন্ধ করে।

জামা খুলতে খুলতে সে বাইরে বিরাট হৈ চৈ শুনতে পায়। আ' কিউ সবসময় উত্তেজনায় যোগ দিতে পছন্দ করে বলে শব্দের খোঁজে যায়। সে ধীরে ধীরে বুঝতে পারে শব্দটা আসছে মিঃ যাও-এর ভেতরের উঠোন থেকে। সন্ধ্যা হলেও অনেককেই সেখানে দেখতে পায়, দুদিন উপবাসী গিন্নী সহ যাও পরিবারের সবাই। এ ছাড়া আছে প্রতিবেশী মিসেস জো এবং তাদের আত্মীয় যাও বাইইয়ান, যাও সিছেন।

চাকরানীর ঘর থেকে আমা উকে বের করে নিয়ে আসতে আসতে ছোট গিন্নী বলে :

"বাইরে আয় ...... নিজের ঘরে বসে চিন্তা করবি না!"

পাশ থেকে ফোড়ন কাটে মিসেস জৌ : "সবাই জানে তুমি ভালো মহিলা। তুমি আত্মহত্যার কথা চিন্তা করবে না।"

আমা উ বিলাপ করতেই থাকে, অস্পষ্ট কিছু বিড়বিড়িয়ে বলে।

আ'কিউ ভাবে, "বেশ মজার ব্যাপার। এই ছোট বিধবা আবার কি ঝামেলা বাধিয়েছে?" ব্যাপারটা জানার জন্য সে যাও সিছেন-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় হঠাৎ দেখতে পায় মিঃ যাও-এর বড় ছেলে তার দিকে দৌড়ে আসছে, হাতে বাঁশের বিরাট লাঠি। বাঁশের বিরাট লাঠি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় সে এটার মার খেয়েছে এবং আপাততঃ বুঝতে পারে এই উত্তেজনার সঙ্গে সে কোন না কোন ভাবে জড়িত। মাড়াইয়ের জায়গায় পালানোর আশায় সে ঘুরে দৌড়াতে থাকে, বুঝতে পারে নি বাঁশের লাঠি তার পালানো বন্ধ করে দেবে, তাই সে ঘুরে আবার উল্টো দিকে দৌড়াতে থাকে এবং বিনা কষ্টে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ভূমি দেবতার মন্দিরে ফিরে আসে।

কিছুক্ষণ বসার পর আ' কিউ'র চামড়া শির শির করতে থাকে এবং সে ঠাণ্ডা বোধ করে। বসন্ত হলেও রাতগুলো একটু ঠাণ্ডা এবং খালি গায়ের জন্য নয়। মনে পড়ে সে যাও বাড়ীতে শার্ট ফেলে এসেছে, কিন্তু ভয় হয় আনতে গেলে আবার সফল'কাউন্টি পরীক্ষার্থীর বাঁশের লাঠির স্বাদ পাবে।

তারপর আসে সাধ্যপাল।

সাধ্যপাল বলে : "আ' কিউ, তোর নিকুচি করি। তুই দাগী, যাও বাড়ীর চাকরানীদের থেকে দূরে থাকতে পারিস না। তুই আমার ঘুম নষ্ট করেছিস, তোর নিকুচি করি! ......"

এই গালাগালিতে আ' কিউ'র কিছুই বলার ছিল না। রাত বলে আ' কিউকে দ্বিগুণ অর্থাৎ সাধ্যপালকে নগদ চার'শ দিতে হয়। কোন নগদ টাকা ছিল না বলে সে জামিন হিসেবে তার হ্যাটটি দেয় এবং পাঁচটি শর্তে রাজী হয় :

১. দুষ্কর্মের জন্য পরদিন ভোরে আ' কিউ এক পাউণ্ড ওজনের দুটি লাল মোমবাতি এবং এক প্যাকেট আগরবাতি যাও পরিবারে নিয়ে যাবে।

২. যাও পরিবার ভূত তাড়ানোর জন্য যে তাও গুরুকে আনবে তার খরচ আ' কিউকে দিতে হবে।

৩. আ' কিউ আর কখনো যাও বাড়ীতে পা রাখবে না।

৪. আমা উ'র কোন কিছু ঘটলে আ' কিউ দায়ী হবে।

৫. আ' কিউ তার মজুরি বা শার্টের জন্য ফিরে যাবে না।

আ' কিউ সব ব্যাপারে রাজী হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য তার কোন নগদ টাকা ছিল না। কপাল ভালো, বসন্ত বলে লেপের দরকার ছিল না এবং শর্ত মেটানোর

জন্য নগদ দু'হাজারের বিনিময়ে সে তা বন্ধক দিতে পেরেছিল। খালি পিঠে প্রণাম করার পরও তার কাছে কিছু নগদ টাকা ছিল, কিন্তু হ্যাটের বদলে তা সাধ্যপালকে দেয়ার চেয়ে সে পুরোটাই মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয়।

আসলে, যাও পরিবার আগরবাতিও জ্বালায় নি, মোমও পোড়ায় নি কেননা গিন্নী যখন বুদ্ধের পূজা করেন তখনই এগুলো ব্যবহার করা যায় এবং সে উদ্দেশ্যেই রেখে দেয়া হয়। অষ্টম চাঁদে ছোট গিন্নীর যে বাচ্চা হয় তার কাঁথার জন্য জীর্ণ শার্টের অনেকখানি ব্যবহার করা হয়। বাকীটা আমা উ ব্যবহার করে জুতোর তলি হিসেবে।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবনধারণের সমস্যা

প্রণাম করা ও যাও পরিবারের শর্ত পূরণ করার পর নিয়মমাফিক আ' কিউ ফিরে যায় ভূমি দেবতার মন্দিরে। সূর্য অস্ত গেছে এবং তার মনে হতে থাকে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। ভালোভাবে চিন্তা করে সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে এর কারণ উদাম পিঠ। একটি জীর্ণ জ্যাকেট এখনো আছে মনে করে সে সেটা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে। যখন আবার চোখ খোলে তখন পশ্চিম দেয়ালের ওপর সূর্য জ্বলছে। সে বলতে বলতে উঠে বসে, "নিকুচি করি ......"

ওঠার পর সে আগের মতই রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে থাকে। একসময় বুঝতে পারে কিছু একটা গড়বড় হয়েছে, কিন্তু সেটা উদাম পিঠের শারীরিক অস্বস্তির সঙ্গে তুলনীয় নয়। আপাততঃ সেই থেকে ওয়েইযুয়াং-এর সব মহিলাই আ' কিউকে দেখে লজ্জা পায়। তাকে আসতে দেখলেই দরোজার পেছনে লুকোয়। এমনকি পঞ্চাশ বৎসরের বুড়ী মিসেস জৌও দ্বিধায় অন্যদের সঙ্গে পিছিয়ে যায়, তার এগারো বছরের মেয়েকে বলে ভেতরে যেতে। এটা আ' কিউ'র কাছে খুব অদ্ভুত মনে হয়। সে ভাবে, "হারামজাদী সব। হঠাৎ করে যুবতী নারীর মত লজ্জাবতী হয়ে গেছে।"

বেশ কিছুদিন পর তার আরো বেশী করে মনে হতে থাকে কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। প্রথমতঃ, শুঁড়ীখানা তাকে বাকী দেয়া বন্ধ করে; দ্বিতীয়তঃ, ভূমি দেবতার মন্দিরের বুড়ো কিছু অবাঞ্ছিত মন্তব্য করে যেন আ' কিউকে

চলে যেতে বলতে চায়, এবং তৃতীয়তঃ, অনেকদিন — মনে করতে পারে না কতদিন — কেউ তাকে ভাড়া করতে আসে নি। শুঁড়ীখানার বাকী না দেওয়াটা হজম করতে পারে, বুড়ো চলে যেতে বলতে থাকলে সে তা অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু কেউ তাকে কাজে না লাগালে উপোস করতে হবে, এবং এটা সত্যিই "নিকুচি" করার অবস্থা।

ব্যাপারটা যখন সহ্যের বাইরে তখন আ' কিউ পুরনো মালিকের বাড়ীতে যায় ব্যাপারটা খোঁজ নেয়ার জন্য। কিন্তু মিঃ যাও এর বাড়ীর চৌকাঠ মাড়ানোর অনুমতি তার নেই। কিন্তু সে একটা অদ্ভুত সম্বর্ধনার মুখোমুখি হয়। মুখে বিরক্তির ছাপ নিয়ে একজন লোক বেরিয়ে আসে। যেন আ' কিউ ভিখিরী এভাবে তাকে তাড়িয়ে দিতে দিতে বলে :

"কিছুই নাই, কিছুই নাই! দূর হয়ে যাও।"

আ' কিউ'র কাছে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক থেকে অস্বাভাবিক মনে হয়। সে ভাবে, "অতীতে এসব লোকজনের সবসময় সাহায্য দরকার হত। হঠাৎ করে তাদের কিছু করার নেই এটা হতে পারে না। ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হয়।" ভালো করে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে যখনই তাদের ছুটা কাজের দরকার হয় তখন তারা সিয়াও ডি'কে ডাকে। এই সিয়াও ডি রোগা, পাতলা দেউলিয়া, আ' কিউ'র চোখে বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং এর চেয়েও ছোট লোক। কে ভাবতে পেরেছিল এই ছোট লোকটি তার রুটি-রুজি কেড়ে নেবে? এবার আ' কিউ'র মেজাজ আরো চড়ে যায়, রাগে গজ গজ করতে করতে সে হঠাৎ হাত তুলে বলে, "লোহার ডাণ্ডা মেরে তোমাকে গুড়িয়ে দেব[9] ......"

কয়েকদিন পর মিঃ ছিয়ান এর বাড়ীর সামনে সত্যি সত্যি সে সিয়াও ডি এর দেখা পায়। "যখন দু'শত্রু মুখোমুখি হয়, তখন তাদের চোখে আগুন জ্বলে ওঠে।" আ' কিউ তার দিকে এগিয়ে যায়, সিয়াও ডি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

"গাধা!" আ' কিউ ফোঁস করে ওঠে, তার দিকে ক্ষিপ্তভাবে তাকায়, মুখে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে।

সিয়াও ডি জিজ্ঞেস করে : "আমি পোকা — তাতে চলবে?"

এই বিনয়ে আ' কিউ'র মেজাজ আরো বিগড়ে যায়। কিন্তু তার হাতে লোহার ডাণ্ডা না থাকায় সে শুধু দু'হাত মেলে সিয়াও ডি'র বেণী ধরার জন্য তার দিকে দৌড়ে যায়। এক হাতে বেণী রক্ষা করে সিয়াও ডি আর এক হাতে আ' কিউ'র বেণী ধরার চেষ্টা করে। আর আ' কিউও আর এক হাতে তার বেণী বাঁচানোর চেষ্টা করে। আগে কখনো সিয়াও ডিকে পাত্তা দেয়ার কথা ভাবে নি আ' কিউ। কিন্তু উপোস করে এখন সে প্রতিপক্ষের মত রোগা, পাতলা হয়ে গেছে, তাই

তাদের ব্যাপারটা সমানে সমানে লড়াই মনে হয়। চার হাত দু'মাথা ধরে আছে, দু'জনেই কোমরের কাছে বাঁকা, আধ ঘণ্টার বেশী ছিয়ান পরিবারের সাদা দেয়ালে একটা নীল রং ধনু আকারের ছায়া পড়ে।

বোধ হয় মিটিয়ে দেয়ার জন্য কিছু পথচারী বলে, "ঠিক আছে, ঠিক আছে।"

অন্যেরা চেঁচিয়ে ওঠে, "ভালো, ভালো!" কিন্তু সেটা কি মিটিয়ে দেয়ার জন্য, না বাহবা দেয়ার জন্য না আরো একটু বাঁধিয়ে দেয়ার জন্য তা নিশ্চিত নয়।

কিন্তু দু'জনের কেউই এসব কথায় কান দেয় না। আ' কিউ তিন কদম এগোলে, সিয়াও ডি তিনবার পাক খাবে, তাই তারা দাঁড়িয়ে থাকবে। সিয়াও ডি তিন কদম এগোলে, আ' কিউ তিনবার পাক খাবে, তাই তারা দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রায় আধ ঘণ্টা পর — ওয়েইযুয়াং গ্রামে খুব অল্প কটি ঘন্টিওয়ালা ঘড়ি ছিল, তাই সময় বলা কষ্টকর, বিশ মিনিটও হতে পারে — যখন তাদের মাথা ও নাক মুখ দিয়ে ঘাম ঝরছে, আ' কিউ হাত নামিয়ে নেয় এবং একই মুহূর্তে সিয়াও ডি'রও হাত পড়ে যায়। তারা একই সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, এবং জনতার ভীড় ঠেলে একই সঙ্গে পিছিয়ে যায়।

মাথা ঘুরিয়ে আ' কিউ বলে: "আবার দেখা হবে, তোর নিকুচি করি!

"নিকুচি করি! আবার দেখা হবে......" মাথা ঘুরিয়ে সিয়াও ডিও পাল্টা জবাব দেয়।

আপাততঃ না বিজয়, না পরাজয়ের মধ্যে এই সংগ্রামের অবসান ঘটে, এবং জানা নেই দর্শকরা খুশী হয়েছে না হয় নি, কেননা তাদের কেউ কোন মন্তব্য করে নি। কিন্তু তবু কেউ আ' কিউকে ভাড়া করতে আসে নি।

এক গরম দিনে যখন সুগন্ধী বাতাসে গরমের আভাস, আ'কিউ ঠাণ্ডা বোধ করে, কিন্তু সে সেটা সামলাতে পারত — কিন্তু তার প্রধান চিন্তা খালি পেট। তার তুলোর লেপ, হ্যাট এবং শার্ট অনেক আগে উধাও হয়ে গেছে, এবং তারপর সে তুলা কোট বেচে দিয়েছে। এখন প্যাণ্ট ছাড়া আর কিছু নেই, এবং এগুলো সে খুলে ফেলতে পারে না। এটা সত্যি, তার একটি জীর্ণ জ্যাকেট ছিল, কিন্তু জুতোর তলি তৈরির জন্য দিয়ে না দিলে সেটা ছিল একেবারেই অকেজো। বহুদিন ধরে তার আশা রাস্তায় এক থোক টাকা পাবে কিন্তু কখনো তা সফল হয় নি; সে আরো আশা করেছিল ঘরে এক থোক টাকা পেয়ে যাবে, এবং পাগলের মত তা খুঁজেছে কিন্তু ঘরটা ফাঁকা, একেবারেই ফাঁকা। তার পর সে খাবারের সন্ধানে বাইরে যেতে ঠিক করে।

"খাবারের সন্ধানে" রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার চোখে পড়ে বহু পরিচিত

শুঁড়ীখানা, সেদ্ধ রুটি, কিন্তু এক মুহূর্ত সেদিকে না তাকিয়ে সে চলে যায়, এমনকি লালসাও বোধ হয় নি। এগুলো সে চায় না, যদিও সে নিজে জানে না ঠিক কি চায়?

ওয়েইযুয়াং খুব বড় জায়গা নয় বলে সহসাই সে তা পেছনে ফেলে আসে। গ্রামের বাইরে মূলতঃ ধান ক্ষেত। যতদূর চোখ যায় শুধু সবুজের মেলা, কচি ধান গাছ্ গজিয়েছে, এখানে সেখানে গোলাকার চলমান বস্তুর মত কর্মরত কৃষক। কিন্তু গ্রামজীবনের প্রতি অন্ধ আ' কিউ এগিয়ে চলে, কেননা সে জানে এটা তার "খাবারের সন্ধান" থেকে অনেক দূরে। শেষ পর্যন্ত সে আসে শান্ত আত্ম-উন্নতির কনভেণ্টের দেয়ালের কাছে।

কনভেণ্টের চারদিকে ধান ক্ষেত। নতুন সবুজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এর সাদা দেয়াল এবং পেছনে নীচু মাটির দেয়ালের ভেতরে সবজি বাগান। আ' কিউ এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে, নিজের চারদিকে তাকায়। কেউ চোখে না পড়ায় সে হোশৌউ লতা ধরে নীচু দেয়ালের ওপর উঠেছে। মাটির দেয়াল কাঁপতে থাকে, আ' কিউ ভয় পেয়ে যায়, যাহোক তুঁত গাছের ডালা চেপে সে লাফিয়ে যায়। ভেতরে হরেক রকমের শাক সবজি কিন্তু হলদে মদ, সেদ্ধ রুটি বা অন্য কোন খাবারের কোন চিহ্ন নেই। কচি ডগা ওয়ালা এক ঝাড় বাঁশ। পশ্চিম দেয়ালের কাছে গজিয়েছে, কিন্তু সেগুলো রান্না করা নয়। রাই সরিষার বীজ পেকেছে। শর্ষে গাছে ফুল গজাচ্ছে এবং ছোট বাঁধাকপিগুলো বেশ পাকা মনে হচ্ছে।

পরীক্ষায় ফেল করা পণ্ডিতের মত আ' কিউ'র নিজেকে বিক্ষুব্ধ মনে হয়। বাগানের গেটের দিকে ধীরে ধীরে হেঁটে যাবার সময় সে হঠাৎ আনন্দ বোধ করে কেননা সেখানে তার চোখে পড়ে এক সারি মূলা। সে হাঁটু গেড়ে তুলতে শুরু করে। এমন সময় গেটের পেছন থেকে হঠাৎ এক গোল মাথা দেখা দেয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সরে যায়। আর কেউ নয় সেই ছোট সন্ন্যাসিনী। এই ছোট সন্ন্যাসিনীদের মত লোকজনের জন্য আ' কিউ'র যথেষ্ট উপেক্ষা থাকলেও কখনো কখনো "সাহসিকতার ভালো দিক হচ্ছে সতর্কতা।" সে তাড়াতাড়ি চারটি মূলা তোলে, পাতা ছিঁড়ে ফেলে এবং জ্যাকেটের পকেটে ঢোকায়। ইতোমধ্যে একজন বয়স্কা সন্ন্যাসিনী বেরিয়ে এসেছে।

"আ' কিউ, বুদ্ধ আমাদের রক্ষা করুন। মূলা চুরি করার জন্য কেন তুমি আমাদের বাগানে ঢুকেছ। . . . . . . হায় ভগবান, কি খারাপ কাজ। বুদ্ধ, আমাদের রক্ষা করুন। . . . . . ."

"আমি আবার কখন আপনাদের বাগানে ঢুকে মূলা চুরি করলাম?" তখনো

তার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে পাল্টা জবাব দেয় আ' কিউ।

"এখন—তুমি?" জ্যাকেটের ভাঁজের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে বয়স্কা সন্ন্যাসিনী।

"এগুলো আপনার? বলতে পারবেন এগুলো আপনার? আপনি......"

কথা শেষ না করেই আ' কিউ হনহনিয়ে চলতে শুরু করে, পেছনে পেছনে আসে একটি বিরাট, কালো কুকুর। প্রথমে কুকুরটি সামনের দরজায় ছিল, কিন্তু কেমনে পেছনের বাগানে পেঁৗছেছে সেটা রহস্যময়। ঘেউ করে কুকুরটি তাড়া করে এবং আ' কিউ'র পা কামড়ে দিতে চাচ্ছিল, কপাল ভালো, এমন সময় তার জ্যাকেট থেকে একটি মূলা পড়ে যায়। এবং অবাক হয়ে কুকুরটি এক মুহূর্ত থমকে যায়। এই সময়ে তুঁতগাছ দিয়ে আ' কিউ মাটির দেয়াল ডিঙিয়ে মূলা সমেত কনভেণ্টের বাইরে পড়ে যায়। সে শুনতে পায় তুঁতগাছের পাশে কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করছে এবং সন্ন্যাসিনী মন্ত্র পড়ছে।

সন্ন্যাসিনী আবার কালো কুকুরটি লেলিয়ে দেবে ভয়ে আ' কিউ মূলাগুলো তুলে দৌড়াতে শুরু করে। যেতে যেতে কিছু ছোট পাথর তুলে নেয়। কিন্তু কালো কুকুরটি আর আসে নি। পাথরগুলো ফেলে আ' কিউ এগিয়ে যায়। মূলা খেতে খেতে ভাবে, "এখানে পাওয়ার মত কিছু নেই, শহরে যাওয়াই ভালো......"

তৃতীয় মূলাটি শেষ করতে করতে সে শহরে যাবার ব্যাপারে মন ঠিক করে ফেলে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উত্থান ও পতন

সে বছরের চান্দ্র উৎসবের পর পর্যন্ত ওয়েইযুয়াং আর আ' কিউকে দেখে নি। তার ফিরে আসায় সবাই অবাক হয়ে যায় এবং পুরোটা সময় সে কোথায় ছিল এ নিয়ে ভাবনায় পড়ে যায়। আগে যে কয়বার আ' কিউ শহরে গিয়েছে মনের খুশীতে লোকজনকে আগেই জানিয়েছে কিন্তু এবার সেটা করেনি বলে তার যাওয়াটা কারো নজরে পড়ে নি। সে হয়ত ভূমি দেবতার মন্দিরের বুড়োকে বলে থাকবে কিন্তু ওয়েইযুয়াং-এর রীতি অনুযায়ী শুধু মিঃ যাও, মিঃ ছিয়ান

অথবা সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থী শহরে গেলে সেটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। এমনকি 'মেকী বিদেশী শয়তানের' যাওয়াটাও আলোচিত হয় না, আ' কিউ'র ব্যাপারটা আরো পরের কথা। এতে বোঝা যায় কেন বুড়ো তার হয়ে খবরটা ছড়ায় নি। তাই গ্রামবাসীদের জানার কোন রাস্তা ছিল না।

এবার আ' কিউ'র ফিরে আসা আগের চেয়ে ভীষণ আলাদা এবং বাস্তবে যথেষ্ট বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে এমন সময় সে ঘুম জড়ানো চোখে শুঁড়ীখানার দরজার সামনে আসে, কাউণ্টারের দিকে হেঁটে যায়, কোমরের বেল্ট থেকে বেশ কিছু তামা ও রূপো বের করে কাউণ্টারের ওপর ছুড়ে দেয়। বলে, "নগদ। মদ আন।" তার পরনে একটি নতুন জ্যাকেট, কোমরে ঝুলে আছে বিরাট থলি, এর ভারেই বেল্টটা বাঁকা হয়ে গেছে। ওয়েইযুয়াং-এর রীতি অনুযায়ী কখনো কাউকে অস্বাভাবিক মনে হলে তার সঙ্গে অপমানজনক নয় ভদ্র ব্যবহার করা উচিত। যদিও তারা জানে এ সেই আ'কিউ তবু সে জীর্ণ কোটের আ' কিউ'র চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। পুরনো কথা আছে "পণ্ডিতব্যক্তি তিনদিন দূরে থাকলে তাকে নতুন চোখে দেখা উচিত।" তাই বেয়ারা, মালিক, খদ্দের, পথচারী সবাই স্বভাবতঃই সন্দেহ মেশানো সম্মান প্রকাশ করে। মাথা নেড়ে স্বাগত জানিয়ে মালিক বলে :

"আ কিউ, তাহলে তুমি ফিরে এসেছ।"

"হ্যাঁ, ফিরে এসেছি।"

"তুমি টাকা বানিয়েছ, ... অ্যাঁ ...... কোথায় ?"

"আমি শহরে গিয়েছিলাম।"

পরদিন এই খবরটা পুরো ওয়েইযুয়াং-এ ছড়িয়ে পড়ে। যেহেতু শুঁড়ীখানা, চা দোকান, সর্বত্র লোকজন এই আ' কিউ'র নগদ টাকা, নতুন জ্যাকেটের সাফল্যের কাহিনী শুনতে চায় তাই গ্রামবাসীরা ধীরে ধীরে খবরটা ছড়িয়ে দেয়। ফল হল, তারা আ'কিউকে সম্মানের সঙ্গে খাতির করতে শুরু করে।

আ'কিউ'র কথানুযায়ী, সে সফল এক প্রাদেশিক পরীক্ষার্থীর বাসায় চাকর ছিল। গল্পের এটুকু শুনে সবাই ভয় পেয়ে যায়। এই সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থীর নাম বাই। কিন্তু পুরো শহরে সে একমাত্র সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী বলে তার পদবি ব্যবহারের প্রয়োজন নেই ; যখনই কেউ সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থীর কথা বলেছে, তাকেই বোঝানো হয়েছে। এটা শুধু ওয়েইযুয়াং-এ নয়, ত্রিশ মাইলের মধ্যে একই ব্যাপার, যেন সবাই তার নাম কল্পনা করে নিয়েছে "মিঃ সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী।" এ ধরণের একজনের বাড়ীতে কাজ করা স্বভাবতঃই সম্মানের ব্যাপার ; কিন্তু আ' কিউ'র আরো কথা অনুযায়ী সে এই কাজ আর

করতে চায় নি কেননা এই সফল পরীক্ষার্থী সত্যি সত্যি "কচ্ছপের ডিম।" গল্পের এটুকু শুনে সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিন্তু আনন্দের সঙ্গে, কেননা এতে বোঝা যায় আ' কিউ এ ধরণের লোকের বাড়ীতে কাজের উপযুক্ত নয়, দয়ার কথা দূরে থাক।

আ' কিউ'র কথানুযায়ী তার ফিরে আসার আরো কারণ হচ্ছে সে শহরবাসীদের ব্যাপারে খুশী নয়। কেননা তারা লম্বা বেঞ্চিকে সোজা বেঞ্চি বলে, ভাজা মাছে পেঁয়াজ পাতার কুচি ব্যবহার করে। আর একটা দোষ সে সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে — হাঁটার সময় শহুরে নারীদের চালচলন ভালো নয়। যা হোক, শহরের ভালো দিকও আছে : যেমন ওয়েইযুয়াং-এ সবাই বাঁশের বত্রিশগুটি দিয়ে খেলে, শুধু 'মেকী বিদেশী শয়তান' মাজিয়াং খেলতে পারে, কিন্তু শহরের দুরন্ত শিশুরা পর্যন্ত মাজিয়াং খেলতে পারে। অল্প বয়সের এই যুবক রাস্কেলদের হাতে 'মেকী বিদেশী শয়তানকে' ছেড়ে দেবে, এবং সে সোজাসুজি "নরকরাজার সামনে ছোট্ট শয়তান" বনে যাবে। গল্পের এ অংশ শুনে সবাই লাল হয়ে যায়।

"তোমরা কেউ ফাঁসি দেখেছ?" আ' কিউ জিজ্ঞেস করে, "আহ, সে এক মজার দৃশ্য ...... যখন তারা বিপ্লবীদের ফাঁসি দেয় ...... আহ, সে এক মজার দৃশ্য, এক মজার দৃশ্য ......"মাথা নাড়তে নাড়তে ঠিক উল্টো দিকে দাঁড়ানো যাও সিছেনের মুখে তার থুথু পড়ে। গল্পের এটুকু যারা শুনেছে, তারা ভয়ে কাঁপতে থাকে। তার পর চার দিকে একবার তাকিয়ে সে হঠাৎ তার ডান হাত তুলে, সামনে মাথা বাড়িয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে গল্পের শ্রোতা বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং-এর ঘাড়ের ওপর ফেলে।

"হত্যা কর!" আ' কিউ চীৎকার করে ওঠে।

বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং চমকে যায়, তার পর বিজলীর চমকের মত মাথা সরিয়ে নেয় এবং উপস্থিত সবাই আশঙ্কার আনন্দে কেঁপে ওঠে। এর পর বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং বহুদিন নেশাগ্রস্তের মত কাটায়, আ' কিউ'র কাছে যাবার তার এবং অন্যান্যেরও সাহস হয় নি।

যদিও আমরা বলতে পারি না এ সময়ে ওয়েইযুয়াং-এর লোকজনের চোখে আ'কিউ'র মর্যাদা মিঃ যাও-এর চেয়ে বেশী ছিল কিনা, কিন্তু সত্যের অপলাপ না করে বলতে পারি তা প্রায় সমান ছিল।

কিছুদিনের মধ্যে আ' কিউ'র খ্যাতি হঠাৎ ওয়েইযুয়াং-এর মহিলা মহলেও ছড়িয়ে পড়ে। ওয়েইযুয়াং-এ ছিয়ান ও যাও পরিবার ছিল দুয় হংকারী এবং বাকী দশ ভাগের নয় ভাগ গরীব। তবু মহিলা মহল তো মহিলা মহল এবং অনেকটা যাদুর মত আ' কিউ'র খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। মহিলারা দেখা হলেই

একজন আর একজনকে বলত, "মিসেস জৌ আ' কিউ'র কাছ থেকে একটি নীল সিল্কের জামা কিনেছেন। পুরনো হলেও দাম মাত্র নব্বই পয়সা। এবং সাদা চোখওয়ালা যাও-এর মা (এটা যাচাই করা বাকী, কেননা কেউ বলে এটা যাও সিছেনের মা) বিদেশী গোলাপী ক্যালিকোর তৈরী বাচ্চাদের পোশাক কিনেছেন। প্রায় নতুন, দাম মাত্র নগদ তিনশ, শতকরা আটভাগ বাটা বাদে।"

তারপর, যাদের সিল্কের জামা ছিল না বা বিদেশী ক্যালিকোর প্রয়োজন ছিল তারা কেনার জন্য আ' কিউকে দেখতে খুব উদগ্রীব হয়ে পড়ে। তাকে এড়ানো দূরে থাক, এখন তাকে যেতে দেখলে তারা তার পিছু পিছু গিয়ে তাকে থামতে বলে।

তারা হয়ত জিজ্ঞেস করবে, "আ' কিউ, তোমার কাছে কি আর সিল্কের জামা আছে? না? আমরা বিদেশী ক্যালিকোও চাই। তোমার কাছে কি আছে?"

পরে এই খবর গরীব ঘর থেকে ধনীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কেননা মিসেস জৌ তার সিল্কের জামা নিয়ে এত খুশী হয়েছিলেন যে অনুমোদনের জন্য মিসেস যাও এর কাছে নিয়ে যান। মিসেস যাও মিঃ যাও-এর কাছে এর খুব প্রশংসা করেন।

সেই সন্ধ্যায় খাওয়ার সময় মিঃ যাও তার ছেলে, সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থীর সঙ্গে ব্যাপারটি আলোচনা করেন, তাঁর মতে আ' কিউ'র ব্যাপারটা সন্দেহজনক এবং দরজা জানালার ব্যাপারে তাদের আরো সতর্ক হওয়া উচিত। তারা অবশ্য জানে না আ' কিউ'র কাছে আর কিছু আছে কিনা এবং ভাবে হয়ত ভালো কিছু থেকে থাকবে। যেহেতু মিসেস যাও-এর একটা ভালো, সস্তা ফার জ্যাকেট প্রয়োজন তাই পারিবারিক সলাপরামর্শের পর ঠিক হয় মিসেস জৌকে বলা হবে এখনই আ' কিউ'র খোঁজ নেয়ার জন্য। এ জন্য নিয়মের তৃতীয় ব্যতিক্রম করা হয়, বিশেষ অনুমতি দেয়া হয় সে সন্ধ্যায় বাতি জ্বালানোর।

প্রচুর তেল জ্বলে তবু আ' কিউ'র কোন দেখা নেই। পুরো যাও পরিবার অধৈর্য হয়ে হাই তুলছে, কেউ কেউ আ' কিউ'র বিশৃংখল নিয়মের সমালোচনা করছে, কেউ কেউ রাগে মিসেস জৌকে দায়ী করছে আরো ভালো করে খুঁজে না দেখার জন্য। মিসেস যাও-এর ভয় সেই বসন্তের শর্তাবলীর জন্য আ' কিউ আসতে সাহস পাচ্ছে না, কিন্তু মিঃ যাও এটাকে চিন্তার কারণ মনে করেন না, কারণ তাঁর মতে "এবার তার জন্যে আমি লোক পাঠিয়েছি।" সত্যি সত্যি এবার মিঃ যাও নিজেকে অন্তর্দৃষ্টির মানুষ হিসেবে পরিচয় দেন, শেষ পর্যন্ত মিসেস জৌ-এর সঙ্গে হাজির হয় আ' কিউ।

ভেতরে ঢোকার সময় হাঁফাতে হাঁফাতে মিসেস জৌ বলে: "সে বলছে

তার কাছে কিছু নেই। যখন তাকে বলি এসে নিজে আপনাকে বলার জন্য তখন সে কথা বলেই চলেছে। আমি তাকে বলেছি......"

"স্যার।" হাসার চেষ্টা করে আ' কিউ বলে, থমকে যায় কার্ণিসের নীচে।

এগিয়ে গিয়ে ভালো করে তাকিয়ে মিঃ যাও বলেন: "আ' কিউ, শুনেছি তুমি অনেক টাকা পয়সা বানিয়েছ। খুব ভালো। এখন......তারা বলে তোমার কাছে কিছু পুরনো জিনিষ আছে...... আমাদের দেখার জন্য ওগুলো সব এখানে নিয়ে আস......এর কারণ আমি চাই......"

"আমি মিসেস জৌ'কে বলেছি — কিছুই বাকী নেই।"

"কিছুই নেই?" হতাশ হওয়া ছাড়া মিঃ যাও-এর কিছুই করার থাকে না। "এত তাড়াতাড়ি শেষ হল কি করে?"

"সেগুলো এক বন্ধুর, এবং শুরুতে তেমন বিশেষ কিছু ছিল না। লোকজন কিছু কিনেছে......"

"নিশ্চয়ই কিছু বাকী আছে।......"

"শুধু দরজার একটা পর্দা আছে।"

মিসেস যাও সঙ্গে সঙ্গে বলেন: "তাহলে আমাদের দেখার জন্য দরজার পর্দাটাই নিয়ে আস।"

খুব একটা গা না করে মিঃ যাও বলেন: "ঠিক আছে, কাল আনলে ঠিক আছে? আ' কিউ, ভবিষ্যতে কিছু থাকলে প্রথমেই সেগুলো আমাদের কাছে নিয়ে আসবে.... ."

"আমরা অবশ্যই অন্যদের চেয়ে কম দেব না।" বলে সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থী। প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য দ্রুত আ' কিউ'র ওপর চোখ ঝুলায় তার স্ত্রী।

মিসেস যাও বলেন: "আমার একটি ফার জ্যাকেট প্রয়োজন।"

আ' কিউ রাজী হলেও সঙের মত এমন ভাব দেখায় যে তারা জানে না তাদের নির্দেশ সে মন দিয়ে গ্রহণ করেছে কি না। এতে মিঃ যাও এত হতাশ, বিরক্ত এবং চিন্তিত হয়ে পড়েন যে হাই তোলা বন্ধ হয়ে যায়। সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থীও আ' কিউ'র আচরণে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। বলে: "এধরণের কচ্ছপের ডিমের ব্যাপারে লোকজনের সতর্ক থাকা উচিত। সবচে ভালো হবে সাধ্যপালকে বলে তার ওয়েইযুয়াং-এ থাকা নিষিদ্ধ করে দেয়া।"

মিঃ যাও রাজী হন না, বলেন, তার হয়ত প্রতিহিংসা থাকবে সে ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দাঁড়াবে "ইগল নিজের বাসায় শিকার করে না।" তার নিজ গ্রামের চিন্তার কারণ নেই, তাদের শুধু রাতের বেলা একটু সতর্ক হতে হবে। পিতার এই নির্দেশে মুগ্ধ হয়ে সফল পরীক্ষার্থী আ' কিউকে তাড়িয়ে দেয়ার প্রস্তাব

প্রত্যাখ্যান করে এবং মিসেস জৌকে সতর্ক করে দেয় যাতে কোনভাবেই সে যা বলেছে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

যাহোক, পরদিন যখন মিসেস জৌ তার নীল স্কার্টকে কালো রং করানোর জন্য নিয়ে যায় তখন আ'কিউ সম্পর্কে এই কটাক্ষগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটায় যদিও সে বলে নি সফল পরীক্ষার্থী আ' কিউকে তাড়িয়ে দেয়ার কথা বলেছে। তবুও এটা আ' কিউ'র জন্য ক্ষতিকর হয়। প্রথমে, সাধ্যপাল তার দরজায় এসে দরজার পর্দাটি নিয়ে নেয়। মিসেস যাও দেখতে চেয়েছে বলে আ' কিউ প্রতিবাদ জানালেও সাধ্যপাল ফেরত দেয়না বরং মুখ বন্ধ রাখার জন্য মাসিক ঘুষ দাবী করে। দ্বিতীয়তঃ, তার জন্যে গ্রামবাসীদের সমীহ হঠাৎ বদলে যায়। তারা যা খুশী করার স্বাধীনতা না দেখালেও তাকে যতখানি সম্ভব এড়িয়ে চলে। এটা তার আগের "খুন কর!" ভয়ের চেয়ে আলাদা হলেও, আত্মার প্রতি পুরনোদের মনোভাবের পর্যায়ে দাঁড়ায় ; তারা সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে চলে।

ব্যাপারটা জানতে কিছু ভবঘুরে সতর্কতার সঙ্গে আ' কিউকে প্রশ্ন করতে যায়। এবং কোন কিছু লুকানোর চেষ্টা না করে আ' কিউ সগর্বে তার অভিজ্ঞতার কথা বলে। তারা জানতে পায় সে ছিঁচকে চোর ছিল, দেয়ালে উঠতে পারত না, গর্ত দিয়েও ঢুকতে পারত না, শুধু চোরাই মাল গ্রহণ করত।

এক রাতে সে একটা পোটলা পেয়েছে এবং তার সর্দার আবার চুরি করতে গেছে। এমন সময় ভেতরে একটা বিরাট হৈচৈ শুনতে পেয়ে সে যত দ্রুত সম্ভব পালিয়ে যায়। সেই রাতেই সে শহর থেকে পালিয়ে ওয়েইযুয়াং-এ ফিরে আসে, তারপর আর ওকাজে ফিরে যাওয়ার সাহস হয় নি। এ গল্প আ' কিউ'র জন্য আরো ক্ষতিকর কেননা গ্রামবাসীরা তার কাছ থেকে সম্মানজনক দূরত্ব রেখেছিল, তার শত্রুতা পেতে চায় নি ; কে ভাবতে পেরেছিল সে একটা চোর যার আর চুরি করার সাহস নেই? এখন তারা জানে তাকে তেমন ভয় পাওয়ার কিছুই নেই।

সপ্তম অধ্যায়

বিপ্লব

সম্রাট স্যুয়ান থুং-এর রাজত্ব কালে তৃতীয় বৎসরের নবম চাঁদের চতুর্দশদিনে — যে দিন যাও বাইইয়ান-এর কাছে আ' কিউ তার টাকার ব্যাগ বিক্রী করে — সেদিন মাঝরাতে, তৃতীয় প্রহরের চতুর্থ ঘণ্টার পর কালো ছইওয়ালা এক বিরাট

নৌকা এসে থামে যাও পরিবারের ঘাটে। গ্রামবাসীরা যখন গভীর ঘুমে অচেতন তখন অন্ধকারে নৌকাটি আসে, তাই তারা এসম্পর্কে কিছুই জানতে পারে নি। কিন্তু ভোরবেলা আবার সেটা চলে যায় এবং অনেকেই তা দেখে। তদন্তে জানা যায় এই নৌকার সত্যিকারের মালিক সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী।

এই ঘটনা ওয়েইযুয়াং বিরাট অস্বস্তি সৃষ্টি করে এবং দুপুরের আগেই সকল গ্রামবাসীর বুকের ধুকধুকানি বেড়ে যায়। নৌকার গতিবিধি সম্পর্কে যাও পরিবার চুপচাপ থাকে কিন্তু চা দোকান ও শুঁড়ীখানার গুজব অনুযায়ী বিপ্লবীরা শহরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে এবং লুকানোর জন্য সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী গ্রামে এসেছিলেন। একমাত্র মিসেস জৌ অন্যকথা ভেবেছিলেন। তাঁর মতে সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী ওয়েইযুয়াং গ্রামে কিছু ভাঙা বাক্স রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মিঃ যাও সেগুলো ফিরিয়ে দিয়েছেন। আসলে সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী এবং যাও পরিবারের সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থীর মধ্যে সদ্ভাব ছিল না, তাই দুঃ-সময়ে তাদের বন্ধু হওয়াটাও খুব অস্বাভাবিক, উপরন্তু মিসেস জৌ যাও পরিবারের প্রতিবেশী বলে কি ঘটছে তা তারই ভালো জানার কথা।

তার পর আর একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ে। বলা হয় নিজে না এলেও যাও পরিবারের সঙ্গে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত করে পণ্ডিত একটি দীর্ঘ চিঠি পাঠিয়েছেন এবং অনেক ভাবনা চিন্তার পর মিঃ যাও বুঝতে পারেন যে এতে কোন ক্ষতি হবে না এবং এগুলো এখন তাঁর স্ত্রীর বিছানার নীচে জড়ো করা। বিপ্লবীদের ব্যাপাবে কেউ কেউ বলে তারা সে রাতেই সম্রাট ছোং যেং[10] -এর জন্য শোকের পোশাক — সাদা হ্যালমেট ও সাদা শিরস্ত্রাণ পরে শহরে প্রবেশ করেছে।

আ' কিউ বহুদিন ধরে বিপ্লবীদের কথা জানে এবং এ বছর সে নিজের চোখে বিপ্লবীদের শিরশ্ছেদ হতে দেখেছে। কিন্তু যেহেতু তার মনে হয়েছে বিপ্লবীরা বিদ্রোহী এবং বিদ্রোহ হলে তার জন্য ব্যাপার স্যাপার কষ্টকর হয়ে যাবে, তাই সে সবসময় তাদের ঘৃণা করেছে এবং দূরে থেকেছে। কে ভাবতে পেরেছিল তারা ত্রিশ মাইল জুড়ে পরিচিত একজন সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থীকে ঘাবড়ে দিতে পারে? পরিণতিতে তাদের সম্পর্কে জানতে আ' কিউ'র বেশ কিছু "উদগ্রীব"। সকল গ্রামবাসীর ভীতি তাকে আনন্দ দেয়।

আ' কিউ ভাবে, "বিপ্লব খারাপ জিনিষ নয়। তাদের সবগুলোকে শেষ করে দাও . . . . . . নিকুচি করি তাদের! . . . . . . নিজেই বিপ্লবীদের পক্ষে চলে যেতে চাই।"

সম্প্রতি আ' কিউ কষ্টে আছে এবং সম্ভবতঃ অসন্তুষ্ট, এর ওপর দুপুর বেলা

খালি পেটে দু বাটি মদ টেনেছে। সহসাই সে মাতাল হয়ে পড়ে এবং ভাবতে ভাবতে হাঁটতে গিয়ে মনে হয় বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ, অদ্ভুতভাবে তার মনে হয় সে নিজেই বিপ্লবীদের একজন এবং ওয়েইযুয়াং গ্রামের জনগণ তার হাতে বন্দী। আনন্দে নিজেকে সংযত করতে না পারে সে চীৎকার না করে পারে না :

"বিদ্রোহ। বিদ্রোহ।"

গ্রামবাসীরা আতঙ্কে তার দিকে তাকায়। আ' কিউ আগে কখনো এই করুণ চাহনি দেখে নি এবং তাদেরকে তার কাছে যেন মধ্যগ্রীষ্মে বরফদেয়া জল পানের মত মনে হয়। সুতরাং আরো আনন্দে সে চীৎকার করতে করতে হাঁটতে থাকে :

"ঠিক আছে ...... যা চাই তা নেব। যাকে ইচ্ছা তাকে পছন্দ করব।

"লা, লা, লা, লা।

"ভুল করে ধর্মভাই যেংকে খুন করেছি,

"ভুল করে খুন করেছি ...... হা, হা, হা,

"লা, লা, লা, লা।

"লোহার ডাণ্ডা মেরে তোমাকে গুড়িয়ে দেব।"

ছেলের সঙ্গে দরোজায় দাঁড়িয়ে মিঃ যাও দুজন আত্মীয়ের সঙ্গে বিপ্লব নিয়ে আলোচনা করছিলেন। মাথা হেলিয়ে "লা, লা, লা, লা" গান গাইতে গাইতে চলে যাওয়ার সময় আ' কিউ তাদের দেখে নি।

নীচু স্বরে মিঃ যাও ডাকেন : "বুড়ো কিউ।"

"লা, লা" আ' কিউ গেয়েই চলে, বুঝতে পারে না তার নামের সঙ্গে "বুড়ো" শব্দটি যুক্ত হতে পারে। ভুল শুনেছে মনে করে এবং তার নামের সঙ্গে যুক্ত নয় নিশ্চিত হয়ে, সে গেয়েই চলে "লা, লা, লা, লা।"

"বুড়ো কিউ।"

"ভুল করে খুন করেছি ......"

"আ কিউ।" সফল পরীক্ষার্থী তার নাম ধরে ডাকতে বাধ্য হয়।

শুধু তার পরেই আ' কিউ থামে। "কি?" একদিকে মাথা কাত করে সে জিজ্ঞেস করে।

"বুড়ো কিউ ...... এখন ......" কিন্তু মিঃ যাও-এর কথা আবার হারিয়ে যায়। "তুমি কি এখন ধনী হচ্ছ?"

"ধনী? নিশ্চয়ই। যা পছন্দ তা নেই ......"

"আ' — কিউ, বুড়ো, আমাদের মত তোমার গরীব বন্ধুদের বোধহয় মূল্য

নেই ......" একটু ভয়ে ভয়েই বলে যাও বাইইয়ান, যেন বিপ্লবীকে বাজিয়ে দেখছে।

"গরীব বন্ধু? আপনি অবশ্যই আমার চেয়ে ধনী" জবাব দিয়ে হেঁটে চলে যায় আ' কিউ।

হতাশ, বাকহীন তারা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। তার পর মিঃ যাও ও তার ছেলে বাড়ীর ভেতর চলে যান এবং সান্ধ্যবাতি জ্বালার সময় না হওয়া পর্যন্ত প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করেন। বাড়ী ফিরে গিয়ে যাও বাইইয়ান কোমর থেকে টাকার থলি বের করে বউয়ের হাতে দেয় এবং বাক্সের তলায় লুকিয়ে রাখতে বলে।

কিছু সময় ধরে আ' কিউ'র মনে হয় সে বাতাসে হাঁটছে। ভূমি দেবতার মন্দিরে পেঁাছুতে পেঁাছুতে সে আবার শান্ত হয়ে আসে। সেই সন্ধ্যায় মন্দিরের বুড়োও অপ্রত্যাশিতভাবে তার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করে এবং তাকে চা খেতে দেয়। তার পর আ' কিউ দুটো কেক দাবী করে এবং এগুলো খাওয়ার পর একটা চার আউন্সের ব্যবহৃত মোমবাতি ও একটি মোমদানি দাবী করে। মোম বাতি জ্বালিয়ে সে একা তার ঘরে শুয়ে থাকে। তার নিজেকে অব্যক্ত সতেজ ও সুখী মনে হয় এবং লণ্ঠন উৎসবের মত মোমবাতি জ্বলতে থাকে, সেই সঙ্গে ভেসে চলে তার কল্পনা :

"বিদ্রোহ? মজা হবে ...... সাদা হ্যালমেট ও শিরস্ত্রাণ পরা একদল বিপ্লবী আসবে, হাতে থাকবে তলোয়ার, লোহার ডাণ্ডা, বোমা, বিদেশী বন্দুক, দু'দিকে ধারওয়ালা ছুরি এবং আংটা লাগানো বর্শা। ভূমি দেবতার মন্দিরে এসে তারা চীৎকার করবে : 'আ' কিউ! আমাদের সঙ্গে আস। আমাদের সঙ্গে আস!' এবং তারপর আমি তাদের সঙ্গে যাব ......

"তখন গ্রামবাসীদের হাস্যকর করুণ অবস্থা হবে, হাঁটু গেড়ে তারা মিনতি করবে : 'আ' কিউ, আমাদের জীবন রক্ষা কর।' কিন্তু কে তাদের কথা শুনবে? প্রথম মারা পড়বে সিয়াও ডি এবং মিঃ যাও, তার পর সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থী এবং 'মেকী বিদেশী শয়তান' ...... কিন্তু বোধহয় কয়েকজনকে রক্ষা করব। একসময় বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াংকে রক্ষা করতাম, কিন্তু এখন তাকে চাই না ......

"জিনিষগুলো ...... সোজা গিয়ে বাক্সগুলো খুলব : রূপোর পাত, বিদেশী মুদ্রা, বিদেশী ক্যালিকো জ্যাকেট ...... প্রথমে সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থীর স্ত্রীর 'নিংবো' বিছানাটি মন্দিরে নিয়ে আসব, এবং ছিয়ান পরিবারের টেবিল, চেয়ারও নিয়ে আসব, — অথবা শুধু যাও পরিবাবের গুলো ব্যবহার করব।

নিজে একটা আঙ্গুলও নাড়ব না, কিন্তু সিয়াও ডিকে আদেশ দেব আমার জন্য সেগুলো বহন করতে। সে না চাইলে বাবুগিরি দেখিয়ে চড় মারব . . . . . .

"যাও সিছেন এর ছোট বোন খুব কুৎসিত। কয়েক বছরে মিসেস জৌ এর মেয়ে বিবেচনার মত হবে। 'মেকী বিদেশী শয়তানের' বউ বেণী ছাড়া পুরুষের সঙ্গে ঘুমুতে রাজী, হা! সে ভালো মেয়ে মানুষ হতে পারে না! সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থীর বউয়ের চোখের পাতায় কাটা দাগ আছে . . . . . . অনেকদিন আমা উকে দেখি নি, জানি না সে কোথায় আছে — কি করুণ, তার পা জোড়া কত বড়!"

আ' কিউ একটা সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগেই, নাক ডাকার শব্দ হতে থাকে। চার আউন্সের মোমবাতিটি মাত্র আধইঞ্চি পুড়েছে এবং মোমের লাল আলোয় তার হা করা মুখ আলোকিত হয়ে আছে।

মাথা তুলে পাগলের মত চারদিকে তাকিয়ে আ' কিউ হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে "হো, হো!" কিন্তু চার আউন্সের মোমবাতিটি দেখে সে শুয়ে পড়ে এবং আবার ঘুমোতে শুরু করে।

পর দিন ভোরে সে খুব দেরী করে ওঠে, এবং রাস্তায় বেরিয়ে সবকিছু একই রকম দেখতে পায়। সে তখনো ক্ষুধার্ত, কিন্তু মাথা চুলকিয়েও কোন কিছু মনে করতে পারে না। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে, এবং উদ্দেশ্য অথবা উদ্দেশ্যহীনভাবে শান্ত আত্মউন্নতির কনভেণ্টে না পৌঁছা পর্যন্ত ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে।

সেই বসন্তে যেমন ছিল সেই সাদা দেয়াল ও চকচকে কালো দরজার কনভেণ্টটি তেমনি শান্ত। এক মুহূর্ত ভেবে সে দরজায় আঘাত করে, ভেতরে একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। সে তাড়াতাড়ি কিছু ভাঙ্গা ইটের টুকরো তুলে নেয়, তার পর জোরে আঘাত করতে থাকে, দরোজায় কিছু ছোট দাগ না হওয়া পর্যন্ত আঘাত করতেই থাকে। তার পর শুনতে পায় দরজা খোলার জন্য কেউ আসছে।

ভাঙ্গা ইটের টুকরো হাতে আ' কিউ পা জোড়া ফাঁক করে দাঁড়ায়, কালো কুকুরটার সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত। কনভেণ্টের দরজা একটু খোলে, কিন্তু কোন কালো কুকুর বেরিয়ে আসে না। ভেতরে তাকিয়ে সে শুধু বুড়ী সন্ন্যাসিনীকে দেখতে পায়।

চমকে ওঠে সে জিজ্ঞেস করে: "আবার কেন এসেছ?"

আ' কিউ অস্পষ্ট জবাব দেয়, "বিপ্লব হচ্ছে . . . . . . তুমি জান না?"

"বিপ্লব, বিপ্লব . . . . . . একটা'ত হয়ে গেছে।" জবাব দেয় বুড়ী সন্ন্যাসিনী,

কান্নায় তার চোখ লাল "তোমাদের বিপ্লবের ফলে আমাদের অবস্থা কি হবে মনে হয়?"

অবাক হয়ে আ' কিউ জবাব দেয়, "কি?"

"তুমি জান না? বিপ্লবীরা এখানে এসেছিল।"

"কে?" আ' কিউ'র আরো অবাক হবার পালা।

"সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থী এবং 'মেকী বিদেশী শয়তান'।"

ব্যাপারটা আ' কিউ'র কাছে খুব অবাক মনে হয়, সে বোকা বনে যায়। উন্মত্ততা হারিয়ে ফেলেছে দেখে সন্ন্যাসিনী দ্রুত দরোজা বন্ধ করে দেয়, পরে ধাক্কা দিয়ে আ' কিউ একটুও নাড়াতে পারে না। এবং যখন সে আবার আঘাত করে, কোন জবাব আসে না।

এটা সেই সকালে ঘটে। যাও পবিবারের সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থী দ্রুত খবরটা শোনে। আগের রাতে বিপ্লবীরা শহরে প্রবেশ করেছে শোনা মাত্রই বেণী গুটিয়ে সে ছিয়ান পরিবারের 'মেকী বিদেশী শয়তান'-এর সঙ্গে দেখা করতে যায়, যার সঙ্গে তার আগে কখনো সদ্ভাব ছিল না। যেহেতু সবাই মিলে সংস্কারের জন্য কাজ করার এটাই সময়, তাই তারা খুব অন্তরঙ্গ আলাপ করে, কমরেড বনে যায় এবং বিপ্লবী হবার শপথ গ্রহণ করে।

কিছুক্ষণ মাথা ঘামানোর পর তাদের মনে পড়ে শান্ত আত্ম উন্নতির কনভেণ্টে "সম্রাট দীর্ঘজীবী হোক" লেখা একটি রাজকীয় ফলক রয়েছে। তাদের মনে হয় এটা তখুনি সরিয়ে ফেলা উচিত। তার পর বিপ্লবী কার্যক্রম সমাধা করার জন্য কোন সময় নষ্ট না করে তারা কনভেণ্টে যায়। যেহেতু বুড়ী সন্ন্যাসিনী তাদের থামাতে চেষ্টা করে এবং কিছু কথা বলে তাই তারা তাকে ছিং সরকার মনে করে ঘুষি ও লাঠি দিয়ে তার মাথায় অনেকবার আঘাত করে। তারা চলে যাবার পর নিজেকে গুটিয়ে সে একবার পরিদর্শন করে। রাজকীয় ফলকটি স্বভাবতঃই গুড়ো হয়ে মাটিতে পড়ে আছে এবং দয়ার দেবী গুয়ানইন মূর্তির সামনে মূল্যবান স্যুয়ান ডে[11] ধূপদানিও উধাও হয়ে গেছে।

পরে এটা আ' কিউ জানতে পারে। সে সময় ঘুমিয়ে থাকার জন্য তার দুঃখ হয় এবং তারা তাকে ডাকতে আসে নি বলে রাগ হয়। তার পর নিজে নিজে বলে, "বোধহয় তারা এখনো জানে না আমি বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছি।"

অষ্টম অধ্যায়

বিপ্লব করতে বারণ

দিনে দিনে ওয়েইযুয়াং-এর লোকজন আশ্বস্ত হয়ে ওঠে। খবর শুনে তারা জানতে পারে বিপ্লবীরা শহরে প্রবেশ করলেও, তাদের আগমনে বড়ো রকমের পরিবর্তন হয় নি। ম্যাজিস্ট্রেট এখনো সর্বোচ্চ কর্মচারী, শুধু তার পদবী বদলেছে, সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থীরও একটা পদ মিলেছে। ওয়েইযুয়াং-এর অধিবাসীরা এই নামগুলো পরিষ্কারভাবে মনে রাখতে পারে না — কোন ধরণের সরকারী পদ, এবং সেনাবাহিনীর প্রধান সেই পুরনো ক্যাপ্টেন। শুধু একমাত্র ভয়ের কারণ হচ্ছে তাদের উপস্থিতির পরদিন কিছু খারাপ বিপ্লবী লোকজনের বেণী কেটে গোলমাল সৃষ্টি করেছে। বলা হয় পাশের গ্রামের 'ছি জিন' মাঝি তাদের হাতে পড়েছে এবং তার পর তাকে আর ভালো দেখায় নি। তবু এই বিপদটা মারাত্মক নয়, কেননা শুরুতে ওয়েইযুয়াং-এর গ্রামবাসীরা খুব কমই শহরে যায় এবং যারা শহরে যাবার কথা ভাবছিল, এই বিপদ এড়ানোর জন্য সঙ্গে সঙ্গে মত পাল্টে ফেলে। পুরনো বন্ধুদের খোঁজ করার জন্য আ' কিউ শহরে যাবার কথা ভেবেছিল, কিন্তু খবর শোনা মাত্রই নেতিয়ে যায় এবং চিন্তা ছেড়ে দেয়।

ওয়েইযুয়াং-এ কোন সংস্কার হয় নি বলা ভুল হবে। পরবর্তী কয়েকদিনে মাথার ওপর বেণী পেঁচিয়ে রাখা লোকজনের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ে, এবং স্বভাবতঃই সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থী প্রথমে তা করে। তার পরে যাও সিছেন এবং যাও বাইইয়ান এবং তাদের পরে আ' কিউ। গরম কাল হলে মাথার ওপর বেণী জড়ানো অথবা গিঁট দিয়ে বাধা অদ্ভুত মনে হত না, কিন্তু তখন হেমন্তের শেষ। হেমন্তে গ্রীষ্মের চর্চা হিসেবে যারা বেণী পেঁচিয়েছে, সেটা বীরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত না বললে চলে না। ওয়েইযুয়াং সম্পর্কে যতদূর বলা যায় তাতে এটা সংস্কারের সঙ্গে জড়িত নয় বলা যায় না।

খোলা ঘাড়ে যাও সিছেন এগিয়ে এলে লোকজন মন্তব্য করে, "আহ! একজন বিপ্লবী আসছে!"

এটা শুনে আ' কিউ মুগ্ধ হয়ে যায়। যদিও সে অনেক আগেই শুনেছে কিভাবে সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থী মাথার ওপর বেণী পেঁচিয়েছে, তবু নিজে এটা করার কথা কখনো তার মনে হয় নি। এখন যাও সিছেন এটা করেছে দেখে তার নিজেরও এটা করার ইচ্ছা জাগে। সে তাদের নকল করা ঠিক করে। মাথার

ওপর বেণী পেঁচানোর জন্য সে বাঁশের কাঠি ব্যবহার করে, এবং একটু ইতস্তত: করার পর বাইরে যাবার সাহস সঞ্চয় করে।

রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় লোকজন তার দিকে তাকিয়ে দেখে, কিন্তু কেউ কিছু বলে না। আ' কিউ প্রথমে খুব অসন্তুষ্ট হয়, তার পর ক্ষেপে যায়। সম্প্রতি সহজেই তার মেজাজ বিগড়াচ্ছে। বাস্তবে, তার জীবন বিপ্লবের আগের চেয়ে কষ্টকর নয়, লোকজন তাকে সমীহ করে, এবং দোকানপাট আর নগদ টাকা পয়সা দাবী করে না, তবু আ' কিউ অসন্তুষ্ট। তার মনে হয় যেহেতু বিপ্লব হয়েছে, তাই আরো কিছু হওয়া উচিত। সিয়াও ডিকে দেখতে পেয়ে তার মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায়।

সিয়াও ডিও মাথার ওপর বেণী পেঁচিয়েছে এবং এ কাজে সত্যি সত্যি বাঁশের কাঠি ব্যবহার করেছে। আ' কিউ কখনো ভাবে নি সিয়াও ডি'র একাজ করার সাহস হবে। সে এটা সহ্য করতে পারে না। সিয়াও ডি কে? নিজের অবস্থা ভুলে বিপ্লবী হবার সাহস দেখানোর ব্যাপারে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তখনই তাকে ধরে তার বাঁশের কাঠি ভেঙ্গে ফেলতে, তার বেণী নামিয়ে দিতে এবং মুখে বার বার চড় মারতে তার ইচ্ছে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তাকে ছেড়ে দেয়, শুধু রাগত চোখে তাকায়, থুথু দেয় এবং বলে, "বাহ!"

গত কয়েকদিনে একমাত্র 'মেকী বিদেশী শয়তান' শহরে গিয়েছে। জমা করা বাক্সগুলো ছুতা হিসেবে ব্যবহার করে সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থীর সঙ্গে দেখা করার কথা ভেবেছে যাও পরিবারের সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থী, কিন্তু তার বেণী কাটা যাবে ভয়ে সফর স্থগিত রেখেছে। সে ভীষণ আনুষ্ঠানিক একটা চিঠি লেখে এবং তা শহরে নিয়ে যাবার জন্য 'মেকী বিদেশী শয়তানকে' বলে, তাকে 'স্বাধীনতা দলের' কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কথাও বলে। 'মেকী বিদেশী শয়তান' ফিরে এসে সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থীর কাছে চার টাকা দাবী করে এবং তার পর সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থী তার বুকে একটি রূপোর ব্যাজ পরে। ওয়েইযুয়াং-এর গ্রামবাসীরা অতিসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং বলে এটা "গাব তেল দলের"[12] ব্যাজ, হান লিনের[13] মর্যাদার সমান। এতে হঠাৎ করে মিঃ যাও-এর সম্মান খুব বেড়ে যায়, তার ছেলের চেয়েও বেশী — যখন তার ছেলেই প্রথম রাজকীয় পরীক্ষা পাশ করেছে। ফলে সে সবাইকে খাটো করে দেখতে থাকে এবং আ' কিউকে দেখলে একটু উপেক্ষা করার চেষ্টা করে।

প্রতিনিয়ত উপেক্ষার ফলে আ' কিউ সম্পূর্ণ অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে, এবং এই রূপোর ব্যাজের কথা শোনা মাত্র সে বুঝতে পারে কেন তাকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। গিয়েছ, শুধু এটা বলে একজনকে বিপ্লবী বানানো যায় না, মাথার

ওপর বেণী পেঁচানোও যথেষ্ট নয়, সবচে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসা। তার সারা জীবনে সে মাত্র দু'জন বিপ্লবীকে জানে, এদের একজন ইতোমধ্যেই শহরে মাথা হারিয়েছে, অন্যজন 'মেকী বিদেশী শয়তান'। এখনই গিয়ে 'মেকী বিদেশী শয়তানের' সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা না করলে, তার কাছে কোন পথ খোলা থাকবে না।

ছিয়ান পরিবারের দরজা খোলাই ছিল। আ' কিউ চুপি চুপি ঢুকে পড়ে। ভেতরে ঢুকে সে চমকে ওঠে। দেখতে পায় পুরো বিদেশী কালো কাপড় পরনে 'মেকী বিদেশী শয়তান' উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। সন্দেহ নেই বিদেশী পোশাক, এবং সেই রূপোলী ব্যাজও আছে। তার হাতে লাঠি, যার সঙ্গে আ' কিউ পরিচিত, এবং তার গজানো একফুট বা তার চেয়ে বেশী লম্বা চুল ঘাড়ের ওপর, সন্ন্যাসী লিউ হাইর[14] মত এলোমেলো। তার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যাও বাইইয়ান ও আরো তিনজন। সবাই 'মেকী বিদেশী শয়তানের' কথা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছে।

পা টিপে টিপে ভেতরে গিয়ে আ' কিউ যাও বাইইয়ানের পেছনে দাঁড়ায়। স্বাগত জানানোর জন্য কিছু একটা বলতে চায়, কিন্তু জানে না কি বলতে হবে। এটা পরিষ্কার, সে লোকটিকে 'মেকী বিদেশী শয়তান' ডাকতে পারে না, এবং 'বিদেশী' অথবা 'বিপ্লবী' কোনটাই মানানসই মনে হয় না। বোধহয় সবচে ভালো সম্বোধন হবে "মিঃ বিদেশী।"

কিন্তু 'মিঃ বিদেশী' তাকে দেখে নি, কেননা চোখ তুলে গভীর উদ্দীপনার সঙ্গে সে বলে যাচ্ছে :

"আমি এত আবেগপ্রবণ ছিলাম যে দেখা হবার পর বলে চলি, 'বুড়ো হোং, এর সঙ্গে আমাদের তাল মেলাতে হবে।' কিন্তু সে সবসময় জবাব দেয় 'NO!' — সেটা বিদেশী শব্দ যেটা তোমরা বুঝবে না। না হলে অনেক আগেই আমরা সফল হতাম। এতে বোঝা যায় সে কতখানি সতর্ক। হুবেই যাওয়ার জন্য সে বার বার অনুরোধ করে, কিন্তু আমি রাজী হই নি। কে ছোট শহরে কাজ করতে চায়? ......"

"ওহ ...... এটা ......" আ' কিউ তার বিরতির জন্য অপেক্ষা করে, তারপর কথা বলার জন্য সাহস সঞ্চয় করে। কিন্তু কোন না কোন কারণের জন্য সে তাকে 'মিঃ বিদেশী' সম্বোধন করে নি।

চারজন শ্রোতা চমকে ওঠে এবং আ' কিউ'র দিকে অবাক হয়ে তাকায়। 'মিঃ বিদেশীও' প্রথম বারের মত তার দিকে তাকায়: "কি?"

"আমি ......"

"বাইরে যাও।"

"আমি যোগ দিতে চাই ......"

'শোকের লাঠি' তুলে 'মিঃ বিদেশী' বলেন: "বেরিয়ে যাও।"

তার পর যাও বাইইয়ান এবং অন্যেরা চেঁচিয়ে ওঠে: "মিঃ ছিয়ান তোমাকে বেরিয়ে যেতে বলছেন, শুনতে পাও না?"

মাথা বাঁচানোর জন্য আ' কিউ হাত তোলে এবং কি করছে না ভেবেই গেট দিয়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু 'মিঃ বিদেশী' তাকে তাড়া করেন নি। ষাট কদম দৌড়ানোর পর আ' কিউ গতি কমিয়ে দেয় এবং খুব অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। কেননা 'মিঃ বিদেশী' তাকে বিপ্লবী হওয়ার অনুমতি না দিলে তার জন্য অন্য কোন পথ খোলা নেই। ভবিষ্যতে সে কখনো আশা করতে পারে না সাদা হ্যালমেট ও শিরস্ত্রাণ পরা লোক তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। এক আঘাতে তার সকল ইচ্ছা, আশা, স্বপ্ন এবং ভবিষ্যৎ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। লোকজন যে খবরটা ছড়াতে পারে এবং সিয়াও ডি ও বিড়াল গোঁফওয়ালা ওয়াং এর খুশির জন্য তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতে পারে সেটা দ্বিতীয় ব্যাপার।

আগে কখনো সে এতটা খারাপ মনে করে নি। এমন কি মাথার ওপর বেণী পেঁচানোও তার কাছে উদ্দেশ্যহীন এবং হাস্যকর মনে হয়। প্রতিহিংসা হিসেবে তখনই তার বেণী নামাতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সে তা করে না। সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়. তার পর বাকীতে দু'বাটি মদ পান করার পর ভাল বোধ করে এবং মনের আলোয় আবার দেখতে পায় সাদা হ্যালমেট ও শিরস্ত্রাণের টুকরো টুকরো দৃশ্য।

একদিন সে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়। যখন শুঁড়ীখানা বন্ধ হয়ে আসছে শুধু তখনই ভূমিদেবতার মন্দিরের দিকে পা বাড়ায়।

ফটাশ ......!

সে হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক শব্দ শুনতে পায়, যেটা বাজির শব্দ হতে পারে না। যে সবসময় উত্তেজনা পছন্দ করে এবং অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে ভালবাসে সেই আ' কিউ অন্ধকারে গোলমালের খোঁজে এগিয়ে যায়। মনে হয় সামনে পদশব্দ শুনতে পাচ্ছে। সতর্কতার সঙ্গে শুনছিল, এমন সময় একজন হঠাৎ তার সামনে দৌড়ে আসে। আ' কিউ তাকে দেখা মাত্রই সে ঘুরে দাঁড়ায় এবং যত দ্রুত সম্ভব চলতে থাকে। যখন সে ঘোরে, আ' কিউও ঘোরে, এবং এক মোড়ে ঘোরার পর লোকটি থেমে যায়, আ' কিউও থামে। সে পেছনে কাউকে দেখতে পায় না, এবং দেখে লোকটি সিয়াও ডি।

রেগে আ' কিউ জিজ্ঞেস করে: "কি ব্যাপার?"

হাঁফাতে হাঁফাতে সিয়াও ডি বলে: "যাও...... যাও বাড়ীতে চুরি হয়েছে।"

আ' কিউ'র বুক ধড়ফড় করে ওঠে। তাকে এটুকু বলেই সিয়াও ডি চলে যায়। আ' কিউ দৌড়ায়, তার পর দু বা তিনবার থামে। যেহেতু একবার সে এই পেশায় ছিল, তাই নিজেকে খুব সাহসী মনে হয়। রাস্তার মোড় থেকে বেরিয়ে সে সতর্কতার সঙ্গে শোনে এবং মনে হয় চীৎকার শুনছে, সেও মনোযোগের সঙ্গে তাকায় এবং মনে হয় দেখতে পাচ্ছে সাদা হ্যালমেট ও শিরস্ত্রাণধারী অসংখ্য লোক, বাক্স, আসবাবপত্র এমনকি সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থীর স্ত্রীর নিংবো বিছানা পর্যন্ত বহন করছে, কিন্তু সে তাদের পরিষ্কার দেখতে পায় না। সে কাছে যেতে চায়, কিন্তু পা যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেছে।

সে রাতে কোন চাঁদ ছিল না। গভীর অন্ধকারে ওয়েইযুয়াং খুব নীরব। প্রাচীন সম্রাট ফু সি'র শান্তিপূর্ণ দিনগুলোর মত নীরব। উৎসাহ না হারানো পর্যন্ত আ' কিউ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে, তবু সব কিছু আগের মতই মনে হয়। দূরে লোকজন চলাচল করছে, জিনিষপত্র, বাক্সপেটরা, আসবাবপত্র, সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থীর স্ত্রীর নিংবো বিছানা বহন করছে...... নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে না পারা পর্যন্ত বহন করছে। কিন্তু সে ঠিক করে কাছে যাবে না এবং মন্দিরে ফিরে যায়।

ভূমি দেবতার মন্দিরে আরো অন্ধকার। বড় দরোজা বন্ধ করে সে তার ঘরে যায় এবং কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর এটা তাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা ভাবার মত শান্ত বোধ করে। সাদা হ্যালমেট ও শিরস্ত্রাণধারী লোকজন নিশ্চয়ই এসেছে কিন্তু তাকে ডাকতে আসে নি, তারা বহু জিনিষ নিয়ে গেছে, কিন্তু তার জন্য কোন ভাগ নেই — সবটাই 'মেকী বিদেশী শয়তানের' দোষ, যে তাকে বিদ্রোহ থেকে বাদ দিয়েছে। অন্যথায় এ সময়ে সে ভাগ থেকে বঞ্চিত হয় কি-ভাবে?

যত ভাবে, আ' কিউ তত রেগে যায়, একসময় সে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। হিংসায় মাথা নাড়তে নাড়তে সে বলে, "তাহলে আমার জন্য বিদ্রোহ নয়, শুধু তোমার জন্য? 'মেকী বিদেশী শয়তান', তোমার নিকুচি করি — ঠিক আছে, বিদ্রোহী বনে যাও। বিদ্রোহীর শাস্তি শিরশ্ছেদ। আমি দালাল বনে যাব, দেখব শিরশ্ছেদের জন্য তোমাকে শহরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, — তুমি এবং তোমার গোটা পরিবার...... খতম কর, খতম কর!"

নবম অধ্যায়

মহা মিলন

যাও পরিবারে চুরি হবার পর ওয়েইযুয়াং-এর অধিকাংশ লোকজন খুশীই হয়, আবার ভয়ও করে, এবং আ' কিউও ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু চারদিন পর হঠাৎ গভীর রাতে আ' কিউ'কে শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। এক স্কোয়াড সৈন্য, এক স্কোয়াড মিলিশিয়া, এক স্কোয়াড পুলিশ এবং পাঁচজন গোয়েন্দা চুপি চুপি ওয়েইযুয়াং প্রবেশ করে এবং প্রবেশপথের উল্টোদিকে মেশিন গান বসিয়ে অন্ধকারে ভূমি দেবতার মন্দির ঘেরাও করে। আ' কিউ ছুটে বেরোয় নি। অনেক-ক্ষণ মন্দিরে কিছুই ঘটে নি। ক্যাপ্টেন অস্থির হয়ে ওঠে এবং নগদ বিশ হাজার পুরস্কার ঘোষণা করে। শুধু তখনই দু'জন মিলিশিয়া সাহসে ভর করে দেয়াল ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। ভেতর থেকে তাদের সহযোগিতায় অন্যেরা ভেতরে ঢোকে এবং আ' কিউ'কে বাইরে নিয়ে আসে। মন্দিরের বাইরে মেশিন গানের কাছে না নেওয়া পর্যন্ত সে সচেতন হয় না।

তারা শহরে পেঁছুতে পেঁছুতে দুপুর হয়ে যায়। আ' কিউ দেখতে পায় তাকে একটা জীর্ণ আদালতে নেয়া হয়েছে, যেখানে পাঁচ অথবা ছয়বার পাক খাওয়ার পর তাকে একটি ছোট্ট ঘরে ঠেলে দেয়া হয়। টলতে টলতে কাঠের তৈরী দরজা পেরোতে না পেরোতে তার পেছনে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। ঘরের তিনদিকে সাদা দেয়াল। ভালো করে তাকিয়ে সে ঘরের কোণায় আরো দুজনকে দেখতে পায়।

আ' কিউ একটু অস্বস্তি বোধ করলেও, মোটেও মন খারাপ করে না। সে ভূমি দেবতার মন্দিরে যে ঘরে ঘুমোত তা কোনভাবেই এর চেয়ে ভালো নয়। অন্য দু'জন লোককেও গ্রামবাসী মনে হয়। তারা ধীরে ধীরে তার সঙ্গে আলাপ জমায়। তাদের একজন তাকে বলে যে তার দাদার খাজনার জন্য সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী তাকে শিক্ষা দিতে চেয়েছে, আরেকজন জানে না কেন সে এখানে। যখন তারা আ' কিউ'কে প্রশ্ন করে, সে পরিষ্কার জবাব দেয়, "কারণ আমি বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলাম।"

সে বিকেলে বন্ধ দরোজার বাইরে আ' কিউ'কে এক বিরাট হলঘরে নিয়ে যাওয়া হয়, শেষ প্রান্তে বসে আছে এক ন্যাড়া মাথা বুড়ো। প্রথমে আ' কিউ'র কাছে তাকে সন্ন্যাসী মনে হয়। কিন্তু যখন দেখতে পায় সৈন্যরা গার্ড হিসেবে

দাঁড়িয়ে আছে এবং উভয় পাশে একডজন লম্বাকোট পরিহিত লোক, কারো মাথা এই বুড়োর মত ন্যাড়া, কারো কারো চুল 'মেকী বিদেশী শয়তানের' মত ঘাড়ের ওপর ঝুলে আছে এবং সবাই তার দিকে বিরক্তি সহকারে তাকাচ্ছে, তখন সে বুঝতে পারে সে কোন গুরুত্বপূর্ণ লোক হবে। সঙ্গে সঙ্গে আপনাআপনি তার হাঁটুর জোড়া খুলে যায় এবং সে নতজানু হয়ে পড়ে।

"কথা বলার জন্য উঠে দাঁড়াও! নতজানু হয়ো না" লম্বাকোটের সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে।

বুঝতে পারলেও আ' কিউ দাঁড়ানোর শক্তি পায় না, তার দেহ অনিচ্ছায় উপুড় অবস্থায় চলে গেছে এবং টাল সামলে সে শেষ পর্যন্ত নতজানু হয় :

"দাস। ......" অবজ্ঞাভরে বলে লম্বাকোটের মানুষগুলো। তারা অবশ্য আর দাঁড়ানোর জন্য চাপাচাপি করে না।

আ' কিউ'র ওপর দৃষ্টি রেখে নীচু অথচ পরিষ্কার গলায় ন্যাড়া মাথা বুড়ো বলে :

"সত্য কথা বল, তাহলে কম শাস্তি হবে। আমি সবকিছু জানি। স্বীকার করলে তোমাকে যেতে দেব।"

লম্বাকোটওয়ালা লোকগুলো চীৎকার করে, "স্বীকার কর!"

একমুহূর্তের এলোমেলো চিন্তার পর আ' কিউ বিড়বিড়িয়ে বলে : "সত্য হচ্ছে, আমি চেয়েছিলাম ...... হতে ......"

বুড়ো নরমভাবে জিজ্ঞেস করে : "তাহলে তুমি আস নি কেন?"

" 'মেকী বিদেশী শয়তান' আমাকে আসতে দেবে না।"

"ননসেন্স। এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তোমার সাঙ্গোপাঙ্গরা কোথায়?"

"কি? ......"

"সে রাতে যারা যাও বাড়ীতে চুরি করেছে।"

"তারা আমাকে ডাকতে আসে নি। তারা নিজেরাই জিনিষগুলো সরিয়ে নিয়েছে।" এর উল্লেখ আ' কিউ'কে ক্ষুব্ধ করে তোলে।

"তারা কোথায় গেছে? বললে তোমাকে যেতে দেব।" আরো নরম করে বলে বুড়ো।

"আমি জানি না, তারা আমাকে ডাকতে আসে নি।"

তার পর বুড়োর ইঙ্গিতে আ' কিউ'কে সেই নিষিদ্ধ দরজা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন সকালে আবার তাকে বের করা হয়।

বড় হলঘরের কিছুই বদলায় নি। ন্যাড়া মাথার সেই বুড়ো তখনো সেখানে

বসে আছে এবং আগের মতই আ' কিউ নতজানু হয়।

বুড়ো ধীরে জিজ্ঞেস করে, "তোমার আর কিছু বলার আছে?"

আ' কিউ ভাবে, এবং ঠিক করে আর কিছুই বলার নেই, তাই জবাব দেয়: "কিছুই না।"

তার পর লম্বা কোটের একজন লোক একটি কাগজ ও তুলি নিয়ে এসে আ' কিউ'র সামনে ধরে, সে সেটা তার হাতে গুঁজে দিতে চেয়েছিল। আ' কিউ ভয়ে প্রায় হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল, কেননা জীবনে এই প্রথম তার হাত লেখার তুলির সংস্পর্শে এসেছে। কিভাবে ধরবে সে ভাবছে এমন সময় লোকটি কাগজের এক জায়গা দেখিয়ে তার নাম সই করতে বলে।

লজ্জায়, ভয়ে তুলি ধরে আ' কিউ বলে:

"আমি — আমি — লিখতে পারি না।"

"সে ক্ষেত্রে, সহজ করার জন্য একটা বৃত্ত আঁক!"

আ' কিউ একটা বৃত্ত আঁকার চেষ্টা করে, কিন্তু যে হাতে তুলি ধরেছে তা কাঁপতে থাকে, তাই লোকটি তার জন্যে কাগজটি মাটির ওপর বিছিয়ে দেয়। আ' কিউ নত হয় এবং যেন তার জীবন এর ওপর নির্ভর করছে সেই কষ্টের সঙ্গে একটা বৃত্ত আঁকে। লোকজন হাসবে ভয়ে সে বৃত্তটিকে গোল করা ঠিক করে, কিন্তু সেই তুলিটাই শুধু ভারী ছিল না, এটা তার কথাও শুনবে না। পাল্টা তুলিটি এদিক সেদিক চলতে থাকে। লাইন বন্ধ হবে ঠিক এমন সময় তুলিটি নড়ে গিয়ে একটা তরমুজের বিচির আকার তৈরী করে।

গোলবৃত্ত আঁকতে না পারার লজ্জায় যখন আ' কিউ লজ্জিত তখন লোকটি কোন কথা ছাড়াই কাগজ এবং তুলিটি নিয়ে গেছে। তৃতীয় বারের মত কিছু লোকজন তাকে ঠেলে দরজা দিয়ে নিয়ে যায়।

এবার সে বিশেষভাবে বিরক্ত বোধ করে না। তার মনে হয় এই পৃথিবীতে কোন না কোন সময়ে এটা প্রত্যেকের ভাগ্য জেলের বাইরে ও ভেতরে আসা-যাওয়া, এবং কাগজে বৃত্ত আঁকা, এবং তার বৃত্তটা গোল হয় নি বলে মনে হয় তার সম্মানে কালি পড়েছে। ভাবতে ভাবতে সে সুস্থির হয়ে ওঠে: "একমাত্র বোকারাই গোলবৃত্ত আঁকতে পারে।" এবং এই ভাবনা নিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

সে রাতে অবশ্য সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী ঘুমোতে যেতে পারে না, কেননা সে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী গোঁ ধরে চোরাই মাল উদ্ধার করাই গুরুত্বপূর্ণ, আর ক্যাপ্টেন বলে জনগণের সামনে উদাহরণ সৃষ্টি করাই গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি ক্যাপ্টেন সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থীর সঙ্গে বেশ অবজ্ঞা ভরে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। সুতরাং টেবিলে ঘুষি মেরে

সে বলে, "একশ জনকে ভয় দেখানোর জন্য একজনকে শাস্তি দেয়া। দেখ, বিশ দিনের কম আমি বিপ্লবী পার্টির সদস্য, কিন্তু চুরির একডজন ঘটনা ঘটেছে, কোনটার এখন পর্যন্ত সমাধান হয় নি, ভেবে দেখ তাতে আমার সম্মানের কত-খানি ক্ষতি হচ্ছে। এখন এটার সমাধান হয়েছে, আর তুমি এসে পণ্ডিতের মত তর্ক করছ। তাতে চলবে না! এটা আমার ব্যাপার।"

সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী খুব বেশী বিপর্যস্ত, কিন্তু সে গোঁ ধরেই আছে। বলে চোরাই মাল উদ্ধার না হলে সে সঙ্গে সঙ্গে সহকারী বেসামরিক প্রশাসকের পদে ইস্তফা দেবে। ক্যাপ্টেন বলে, "আপনার যেমন খুশী।"

পরিণতিতে সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী সেরাতে ঘুমায় নি, কিন্তু পরদিন তার পদত্যাগ পত্রও পেশ করে নি।

যে রাতে সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী ঘুমোতে পারে নি তার পরদিন ভোরে তৃতীয় বারের মত আ' কিউ'কে বন্ধ দরজার বাইরে আনা হয়। বড় হলঘরে পেঁাছে সে দেখতে পায় ন্যাড়া মাথা বুড়ো প্রতিদিনের মত সেখানে বসে আছে। আ'কিউও আগের মতই নতজানু হয়।

খুব ভদ্রভাবে বুড়ো তাকে প্রশ্ন করে, "তোমার আর কিছু বলার আছে?"

আ' কিউ ভাবে এবং ঠিক করে তার কিছু বলার নেই, তাই জবাব দেয়: "কিছুই না।"

লম্বা ও খাটো কোটের একদল লোক তাকে বিদেশী কাপড়ের একটা সাদা ফতুয়া পরিয়ে দেয়। আ' কিউ বেশ হতাশ বোধ করে কেননা এটা শোকের পোশাকের কাছাকাছি এবং শোকের পোশাক পরা দুর্ভাগ্যজনক। একই সময়ে হাত পেছনে বেঁধে তাকে কোর্টের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়।

আ' কিউ'কে একটা খোলা গাড়ীতে তোলা হয় এবং খাটো জ্যাকেটের কিছু লোক তার সঙ্গে বসে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী চলতে শুরু করে। সামনে বেশ কিছু সৈন্য ও মিলিশিয়া, তাদের কাঁধে বিদেশী বন্দুক, এবং উভয় পাশে দর্শক, এবং পেছনে কি আ' কিউ তা দেখতে পায় না। হঠাৎ তার মনে হয় — "আমার শিরশ্ছেদের জন্য কি আমি যাচ্ছি?" তার ভয় ধরে এবং চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে যায়। কানের কাছে একটা গুঞ্জন হতে থাকে যেন সে মূর্ছা যাচ্ছে। কিন্তু সে সত্যি মূর্ছা যায় নি। কিছু সময় তার ভয় করলেও. বাকীটা সময় সে শান্ত থাকে। তার মনে হয় এই পৃথিবীতে কখনো কখনো প্রত্যেকের শিরশ্ছেদ-টাই ভাগ্য।

সে তখনো রাস্তা চিনতে পারছে এবং কিছুটা অবাক লাগে: কেন তারা বধ্যভূমিতে যাচ্ছে না? সে জানত না গণ দৃষ্টান্ত হিসেবে তাকে পথে পথে

ঘোরানো হচ্ছে। কিন্তু সে জানলেও একই অবস্থা হোত, সে হয়ত ভাবত না, এই পৃথিবীতে কোন না কোন সময় গণ দৃষ্টান্ত হওয়া প্রত্যেকের ভাগ্য।

তার পর সে বুঝতে পারে তারা বধ্যভূমিতে যাওয়ার জন্য মোড় নিচ্ছে, তাহলে অবশ্যই তার শিরশ্ছেদ হতে যাচ্ছে। পিপীলিকার মত তার পেছনে আসা লোকজনের দিকে সে দুঃখের সঙ্গে তাকায় এবং অপ্রত্যাশিতভাবে রাস্তার পাশে জনতার ভীড়ে আমা উকে দেখতে পায়। এজন্যেই অনেকদিন তাকে দেখে নি : সে শহরে কাজ করছে।

আ' কিউ হঠাৎ উদ্যমহীনতায় লজ্জা পায়, কেননা সে অপেরা থেকে একটি লাইনও গায় নি। ঘূর্ণির মত তার চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে : «স্বামীর কবরের পাশে যুবতী বিধবা» যথেষ্ট বীরত্বপূর্ণ নয়। «বাঘ ও ড্রাগনের যুদ্ধে» "ভুল করে খুন করেছি" শব্দগুলোও দুর্বল। "লোহার ডাণ্ডা মেরে মাথা গুড়িয়ে দেব" এখনো সবচে সেরা। কিন্তু হাত তুলতে গিয়ে সে বুঝতে পারে সেগুলো বাঁধা, সুতরাং সে "তোমাকে গুড়িয়ে দেব" গায় না।

"বিশ বছরে আমি আরেক হয়ে যাব . . . . . ." উত্তেজনায় আ' কিউ অর্ধেক উচ্চারণ করে যেটা সে নিজে আবিষ্কার করেছে কিন্তু আগে কখনো ব্যবহার করে নি। লোকজনের "ভালো, ভালো!" চীৎকার নেকড়ের চীৎকারের মত শোনায়।

গাড়ী ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে চলে। চীৎকারের সময় আ' কিউ'র চোখ আমা উকে খোঁজে, কিন্তু মনে হয় সে তাকে দেখে নি কেননা সে গভীরভাবে সৈন্যদের বিদেশী রাইফেলগুলো দেখছে।

সুতরাং আ' কিউ আর একবার উল্লসিত জনতার দিকে তাকায়।

সেই মুহূর্তে তার চিন্তা আবার ঘূর্ণির মত ঘুরপাক খেতে থাকে। চার বছর আগে পাহাড়ের পাদদেশে সে এক নেকড়ের দেখা পেয়েছিল, যেটা তাকে খেয়ে ফেলার জন্য নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে অনুসরণ করেছে। ভয়ে মরেই যাচ্ছিল। কিন্তু কপালভালো, হাতে কুড়াল থাকায় সে ওয়েইযুয়াং গ্রামে ফিরে আসতে পেরেছে। সে কখনো নেকড়ের চোখ ভোলে নি, উন্মত্ত অথচ ভীত, দুটো আলেয়ার মতো জ্বলছে, যেন দূর থেকে তাকে ছিদ্র করছে। এখন সে নেকড়ের চেয়ে আরো মারাত্মক চোখ দেখতে পাচ্ছে, মরা অথচ তীক্ষ্ণ, তার কথা খেয়ে ফেলার পর যেন তার রক্ত মাংস ছাড়া আরো কিছু খেয়ে ফেলতে আগ্রহী। এবং এই চোখগুলো তাকে একটা বিশেষ দূরত্ব থেকে অনুসরণ করছে।

মনে হয় এই চোখগুলো এক হয়ে গেছে, তার হৃদয় ছিঁড়ে খাচ্ছে।

"বাঁচাও, বাঁচাও!"

কিন্তু আ' কিউ কখনো শব্দগুলো উচ্চারণ করে নি। তার চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার, কানে গুঞ্জন, মনে হয় পুরো শরীরটা হালকা ধূলোর মত ছড়িয়ে পড়ছে।

চুরির প্রতিক্রিয়া হিসেবে সবচে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সফল প্রাদেশিক পরীক্ষার্থী, কেননা চোরাই মালগুলো কখনো উদ্ধার করা হয় নি। তার পুরো পরিবার তিক্ত-ভাবে শোকাহত। তার পরে আসে যাও পরিবার : কেননা সফল কাউন্টি পরীক্ষার্থী চুরির ব্যাপারটা জানাতে শহরে গেলে খারাপ বিপ্লবীরা শুধু তার বেণী কেটে দেয় নি, পণ হিসেবে তাকে নগদ বিশ হাজার দিতে হয়েছে, সুতরাং যাও পরিবারও খুব তিক্তভাবে শোকাহত। সেই থেকে তারা পরাজিত বংশের টিকে থাকা বংশধরের ভূমিকা গ্রহণ করে।

ঘটনার আলোচনায় ওয়েইযুয়াং-এ কোন প্রশ্ন ওঠে নি। স্বভাবতঃই সবাই স্বীকার করে আ' কিউ খারাপ লোক, প্রমাণ হচ্ছে তার মৃত্যুদণ্ড। খারাপ লোক না হলে তার মৃত্যুদণ্ড হবে কিভাবে? কিন্তু শহরে জনমত ছিল উল্টো। অধি-কাংশ লোক অসন্তুষ্ট, কেননা গুলী করে মৃত্যু শিরশ্ছেদের মত সুন্দর দৃশ্য নয় ; এবং সে কি ধরণের হাস্যকর অপরাধী, অপেরা থেকে একটি লাইন না গেয়ে এতগুলো রাস্তা ঘুরেছে। তারা শুধুশুধি তাকে অনুসরণ করেছে।

ডিসেম্বর, ১৯২১

টীকা

1. তিন ধর্ম হল কনফুসীয় মতবাদ, তাওবাদ এবং বৌদ্ধ ধর্ম। কনফুসিয়াস, তাও গুরু, আইনসম্মত গুরু, মোহ গুরু এবং অন্যান্য ধর্মীয় গুরুরা নয়টি স্কুলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

2. হস্তাক্ষত সম্পর্কিত এটি একটি বই, ছিং রাজবংশের ফেং উ লিখিত। এর মধ্যে দশ খণ্ড আছে। "সত্য ঘটনা"-র অর্থ "সঠিক ভাবে শিখিয়ে দেওয়া"।

3. অতীতে, কাগজ আবিষ্কারের আগে লেখার জন্য বাঁশ ফলক এবং সিল্ক ব্যবহার করা হত।

4. ছেন ডুসিউ ছিলেন «নতুন যৌবন» পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। পত্রিকায় চীনা ভাষার বদলে পশ্চিমা বর্ণমালা ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়েছিল।

5. প্রাথমিক স্কুলের পাঠ। এর মধ্যে পারিবারিক নাম মিলিয়ে কবিতা লেখা হয় যাতে সহজে পড়া যায়।

6. এই উদ্ধৃতি চিরায়ত গ্রন্থ «জুও যুয়ান» থেকে নেয়া। চু রাজ্যের যুদ্ধমন্ত্রী জি ওয়েন

(পারিবারিক নাম রে আও) তার ছোট ভাই জি লিয়াংকে আদেশ দিয়েছিল ইয়ুয়ে জিয়াওকে (জি লিয়াং-এর পুত্র) হত্যা করতে। কেননা ইয়ুয়ে জিয়াও এর চেহারা বাঘের মত, আর গলার স্বর নেকড়ের গর্জনের মত। তাকে হত্যা না করলে, রে আও ধ্বংস হবে এবং বংশধর না থাকায় তার আত্মাও উপবাসী থাকবে।

7. ডা জি শাং রাজবংশের শেষ রাজার রক্ষিতা। বাও সি পশ্চিমা যৌ রাজবংশের শেষ রাজার রক্ষিতা। ডিয়াও ছান চীনা ঐতিহাসিক উপন্যাস «তিন রাজ্যের কাহিনী» -এর একজন নায়িকা। হান রাজবংশের শেষ আমলে ডিয়াও ছান ওয়াং ইয়ুনকে সাহায্য করার জন্য নির্মম ও নিষ্ঠুর মন্ত্রী ডোং য়ুও-এর রক্ষিতা হয়। তারপর ডোং য়ুও এবং ল্যু বু-এর মধ্যে গোলমাল বাধিয়ে দেয়। অবশেষে তার উস্কানিতে ল্যু বু ডোং য়ুওকে খতম করে।

8. কনফুসিয়াস বলেছেন, ত্রিশ বছর বয়সে তিনি "দৃঢ়"। পরে একজন লোকের ত্রিশ বছর বয়স বোঝানোর জন্য এই প্রবাদ ব্যবহার করা হত।

9. শাও সিং-এর স্থানীয় অপেরা «ড্রাগন এবং বাঘের সংগ্রাম» -এর একটি বাক্য।

10. ছোং যেং ছিলেন মিং আমলের শেষ সম্রাট (১৬২৮—১৬৪৪)। বিদ্রোহী কৃষক বাহিনীর নেতা লি জিছেং রাজধানী বেইজিং দখলের আগে তিনি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

11. মিং সম্রাট স্যুয়ান ডে'র (খৃঃ ১৪২৬—১৪৩৫) শাসনামলে তামার মহা ধূপদানি তৈরী হয়।

12. "স্বাধীনতা দল" চীনা ভাষায় "জি ইয়ৌ ডাং" উচ্চারণ করা হয়। গ্রামবাসীরা "স্বাধীনতা" -র অর্থ না বুঝার কারণে "জি ইয়ৌ" বদলে "শি ইয়ৌ" বলে যা গাব তেল বোঝায়।

13. ছিং রাজবংশের(১৬৪৪—১৯১১)সর্বোচ্চ সাহিত্য উপাধি ছিল হান লিন।

14. সন্ন্যাসী লিউ হাই ছিলেন চীনের কিংবদন্তিতে একজন অমরাত্মা। তাঁর চুলের এক গুচ্ছ সবসময় কপালের ওপর ঝুলে পড়ে।

গ্রাম্য অপেরা

গত বিশ বছরে মাত্র দু'বার চীনা অপেরা দেখতে গিয়েছি। প্রথম দশ বছরে কখনো যাইনি। ইচ্ছেও হয়নি, সময় সুযোগও হয়নি। গত দশ বছরে মাত্র দু বার গিয়েছি এবং প্রতিবারই কিছু না দেখে চলে এসেছি।

প্রথমবার ১৯১২ সালের কথা। তখন বেইজিং-এ নতুন এসেছি। এক বন্ধু বলে, বেইজিং-এর অপেরা সবচে ভালো এবং এটা দেখার সুযোগ হারানো উচিত নয়। আমার মনে হয়েছিল অপেরা দেখা বিশেষ করে বেইজিং-এ, হয়ত মজার ব্যাপার হবে। তাই তাড়াতাড়ি এক থিয়েটারে যাই। সে থিয়েটারের নাম ভুলে গেছি। অভিনয় শুরু হয়ে গেছে। এমনকি বাইরে থেকে ড্রামের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঠেলাঠেলি করে ঢুকতেই উজ্জ্বল রং-এ চোখে ধাঁধাঁ লেগে যায়, চোখে পড়ে শুধু দর্শকদের মাথা। সারা থিয়েটারে চোখ বুলিয়ে দেখি মাঝখানে কি সীট খালি পড়ে আছে। কষ্ট করে গিয়ে বসতেই কে একজন কিছু বলে ওঠে। কানের ভেতর ঝিঁঝিঁ করছিল। মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয় সে কি বলছে—"দুঃখিত, এই সীটগুলো দখল হয়ে গেছে।"

আমরা পেছনে যাই। তার পর চকচকে বেণীওয়ালা একজন এসে আমাদের পাশে সরিয়ে খালি সীট দেখিয়ে দেয়। একটি বেঞ্চি। আমার উরুর চার ভাগের এক ভাগ চওড়া, কিন্তু পায়ের উচ্চতা আমার পায়ের প্রায় দ্বিগুণ। আমার ওঠার সাহস হয় নি। তারপর মনে হয় এটা শাস্তি দেয়ার যন্ত্র। কাঁপতে কাঁপতে আমি পালিয়ে যাই।

কিছুদূর চলে গিয়েছি। এমন সময় বন্ধুর গলা শুনতে পাই, "কি হয়েছে?" পেছনে তাকিয়ে দেখি সে আমার পিছু পিছু এসেছে। মনে হল খুব অবাক হয়েছে। জানতে চাইল, "কোন কিছু না বলে বেরিয়ে এসেছ কেন?"

আমি বললাম: "আমি দুঃখিত। আমার কানে এমন তালা লেগে গিয়েছিল

যে তোমাকে শুনতে পাইনি।"

এই ঘটনার কথা যখনই ভাবি খুব অবাক লাগে। মনে হয় অপেরাটা হয়ত খুব খারাপ ছিল — অথবা থিয়েটার আমার জন্যে নয়।

দ্বিতীয়বার কখন গিয়েছি সে কথা মনে নেই। কিন্তু হুবেই-এর বন্যাকবলিত-দের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং থান সিনপেই[1] তখনো জীবিত। দু টাকা দিয়ে একটা টিকেট কেনা মানে চাঁদা দেয়া। আর সে টিকেট দিয়ে এক নম্বর থিয়েটারে অপেরা দেখতে যাওয়া যায়। অভিনেতা-অভিনেত্রী সবাই বিখ্যাত, এদের একজন থান সিনপেই। মূলতঃ চাঁদা আদায়কারীদের খুশী করার জন্যই একটি টিকেট কিনি। তার পর সুযোগ বুঝে একজন আমাকে বলে কেন শুধু থান সিনপেই দেখা উচিত। এতে কয়েক বছর আগে কানে তালা লাগার ব্যাপারটা ভুলে থিয়েটারে যাই। আরেকটা ব্যাপার ছিল এত দাম দিয়ে টিকেট কিনেছি যে, না দেখলে খারাপ লাগত। শুনেছি থান সিনপেই শেষের দিকে মঞ্চে আসে এবং এক নম্বর থিয়েটার আধুনিক থিয়েটার বলে সীট নিয়ে ঠেলাঠেলি করতে হয় না। এতে স্বস্তি পাই এবং বেরুনোর আগে রাত নয়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করি। অবাক ব্যাপার। আগের মতই থিয়েটারে লোক ভর্তি। দাঁড়ানোর জায়গা পর্যন্ত নেই। ভিড় ঠেলে পেছনে গিয়ে দাঁড়াই। দেখতে পাই একজন অভিনেতা এক বুড়ীর অভিনয় করছে। তার মুখের প্রত্যেক কোনায় কাগজের পাতলা ছিলকা জ্বলছে এবং পাশে দাঁড়িয়ে আছে 'শয়তানী-সৈন্য'। ভেবে চিন্তে মনে হয় এটা মৌদ্ধলয়ানাব[2] মা, কেননা তার পরেই আসে এক সন্ন্যাসী। অভিনেতাকে চিনতে না পেরে আমার বাম দিকে দাঁড়ানো এক মোটা ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করি। চোখের কোনে অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে তিনি জবাব দেন, "গোং ইয়ুনফু"[3]। অজ্ঞতার লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে যায়। মনে মনে ঠিক করি যেভাবেই হোক আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব না। তার পর দেখি নায়িকা ও তার সখী গান গাইছে, তার পরে আসে এক বুড়ো এবং আরো কিছু চরিত্র। কাউকেই চিনতে পারি নি। তার পর দেখি একদল খুশী মত লড়াই করছে, তার পর দু'জন বা তিন জন লড়াই করছে। নয়টা থেকে দশটা, দশটা থেকে এগারোটা, এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটা, সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটা : থান সিনপেই-র কোন চিহ্ন নেই।

জীবনে কোন কিছুর জন্য কখনো এত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করিনি। পাশের ভদ্রলোকের ফোঁস ফোঁসানি, মঞ্চের ওপর ঢং ঢং আওয়াজ, টুং টাং শব্দ, ঢোল-ঘণ্টার শব্দ, উজ্জ্বল রংয়ের মেলা, রাত্রির বিলম্ব — সব কিছু মিলিয়ে মনে হয় এ জায়গা আমার জন্য নয়। যন্ত্রের মত ঘুরে দাঁড়িয়ে সর্বশক্তি দিয়ে বেরিয়ে

যাবার চেষ্টা করি। বুঝতে পারি সঙ্গে সঙ্গে পেছনের জায়গায় লোক এসে যায় — নিঃসন্দেহে সেই মোটা আমার খালি জায়গা দখল করেছে। পেছনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সামনে এগোনো ছাড়া কোন উপায় ছিলনা। ঠেলতে ঠেলতে শেষ পর্যন্ত দরোজার বাইরে চলে যাই। দর্শকদের জন্য অপেক্ষমাণ রিক্সা ছাড়া বাস্তবে বাইরে কেউ ছিল না। গেটের কাছে একদল লোক দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান-সূচী দেখছে। আরেকদল এমনি দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল, অপেরা শেষে বে-রিয়ে আসা মহিলাদের দেখার জন্য তারা দাঁড়িয়ে আছে। থান সিনপেই কোন দেখা নেই।

রাতের মুক্ত বাতাস দেহের ভেতরে নাড়া দিয়ে যায়। মনে হল এই প্রথম-বারের মত বেইজিং-এ এধরণের মুক্ত বাতাস দেখেছি।

সে রাতেই চীনা অপেরাকে বিদায় জানাই। আর কখনো এ নিয়ে ভাবি নি। ঘটনাচক্রে যখনই কোন থিয়েটার পার হয়েছি কিছুই মনে হয়নি। মনে হয়েছে আমাদের অবস্থান দুই মেরুতে।

কয়েকদিন আগে একটি জাপানী বই পড়ার সুযোগ হয়েছিল — দুর্ভাগ্যবশতঃ বইয়ের নাম এবং লেখকের নাম ভুলে গেছি, কিন্তু বইটি চীনা অপেরা নিয়ে লেখা। এক অধ্যায়ে বলা হয়েছে চীনা অপেরার ঢোল-ঘণ্টা, নাচনকোঁদন — চীৎকারের শব্দে দর্শকদের মাথা ঘুরে যায়। এটা থিয়েটারে প্রদর্শনের অনুপ-যোগী। কিন্তু মুক্তাঙ্গনে প্রদর্শিত হলে এবং দূর থেকে দেখলে ভালো লাগে। আমার মনে হল, যে কথা আমার মনে আসেনি তা'ই এখানে বলা হয়েছে। আমার মনে পড়ে গ্রামে দেখা একটি খুব ভালো অপেরার কথা। সম্ভবতঃ এর প্রভাবেই বেইজিং আসার পর দু'বার অপেরা দেখতে গিয়েছি। খারাপ লাগছে, কেন, ঐ বইয়ের নাম ভুলে গেছি।

ঐ ভালো অপেরা যখন দেখেছি, সেটা অনেক অনেক আগের কথা। আমার বয়স বড়জোর এগারো বা বারো বছরের বেশী হবে না। আমাদের শহর লুযেনে একটা প্রথা ছিল। বিবাহিতা মেয়েরা, যারা শ্বশুরবাড়ীতে দায়িত্ব পায়নি, গরমের সময় বাপের বাড়ী ফিরে যেত। আমার দাদী তখনো বেশ শক্তসমর্থ হলেও মা'কে ঘরের কিছু কাজ করতে হত। গরমের দিনে মা নানাবাড়ীতে খুব একটা থাকতে পারতেন না। পূর্বপুরুষদের কবর জেয়ারতের পর মাত্র কয়েকদিন থাকতে পারতেন। সে সময় আমি মায়ের সঙ্গে নানার বাড়ী গিয়ে থাকতাম। সে গ্রামের নাম পিংছিয়াও। সাগর থেকে খুব দূরে নয়। নদীর তীরে বিচ্ছিন্ন একটি ছোট্ট গ্রাম। ছোট্ট একটি মুদীখানা, জেলে-চাষী মিলিয়ে ত্রিশ পরিবারের বাস। আমার চোখে তা ছিল স্বর্গ। কেননা আমাকে শুধু সম্মানিত অতিথি হিসেবেই তারা দেখে

নি, এসময়ে আমাকে গীতিমালার বইও পড়তে হত না।

খেলার সাথী অনেক ছেলেমেয়ে ছিল। অতদূর থেকে বেড়াতে আসায় কাজ কম করে আমার সঙ্গে খেলার জন্য তারা বাবামায়ের কাছ্ থেকে ছুটি পেত। ছোট্ট গ্রামে এক পরিবারের অতিথি আসলে সব পরিবারের অতিথি। আমরা প্রায় সমবয়েসী ছিলাম। বংশের তালিকায় পুরুষদের খোঁজ নিলে দেখা যেত অনেকেই আমার মামা বা মা'র চাচা। কেননা গ্রামেব প্রত্যেকের একই পারিবারিক নাম এবং সবাই একই গোষ্ঠীর। কিন্তু আমরা খুব ভালো বন্ধু ছিলাম। তাই কখনো ঝগড়া করে যদি মা'র চাচাকে আঘাত করতাম তাহলে গ্রামের ছেলেবুড়োরা একে "বড়দের অপমান করা" বলত না। একশজনের মধ্যে তাদের ৯৯ জন লিখতে বা পড়তে পারত না।

আমাদের সময় কাটত কেঁচো খুঁড়ে তা বড়শিতে আটকিয়ে বাগদা চিংড়ি ধরার জন্য নদীর তীরে শুয়ে থেকে। বাগদা চিংড়ি সবচে বোকা জলজ প্রাণী। নিজেরাই বড়শি গিলে ফেলে। তাই কয়েকঘণ্টায় আমাদের ঝুড়ি ভরে যেত বাগদা চিংড়িতে। নিয়ম ছিল, সবাই সেগুলো আমাকে দেবে। অন্যসময় হয়ত আমরা মহিষ চরাতে নিয়ে যেতাম। হয়ত একটু উন্নত জাতের বলে, অচেনা লোক দেখে গরু-মহিষ ক্ষেপে যায়। তারা আমার সঙ্গে এমন আচরণ করত যে আমি কখনো তাদের কাছে যাবার সাহস পেতাম না। দূরে দাঁড়িয়ে দেখা বা অনুসরণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। এসময় চিরায়ত কবিতা আবৃত্তির ক্ষমতা দিয়ে আমি ছোট বন্ধুদের মুগ্ধ করতে পাবতাম না বরং তারা হেসে কুটোকুটি হয়ে যেত।

আমার মন পড়ে থাকত যাওয়ুয়াং গিয়ে অপেরা দেখার জন্য। দু'মাইল দূরের যাওয়ুয়াং সামান্য বড়ো গ্রাম। অপেরার আয়োজন করার জন্য পিংছিয়াও খুব ছোট্ট গ্রাম ছিল বলে প্রতিবছর যাওয়ুয়াং-এ অপেরার আয়োজনের জন্য কিছু চাঁদা দিত। প্রতিবছর কেন অপেরার আয়োজন করতে হবে এটা জানার জন্য তখন কোন আগ্রহ ছিল না। এখন ভাবলে মনে হয় হয়ত শেষ বসন্ত উৎসব বা গ্রামের উৎসর্গ পূজোর জন্য এটা প্রয়োজন ছিল।

সে বছর যখন বয়স এগারো কি বারো, তখন সেই বহু প্রতীক্ষিত দিনটি আসে। কিন্তু কপাল খারাপ। সে সকালে ভাড়া করার মত নৌকা ছিল না। পিং-ছিয়াও গ্রামে শুধু একটি পাল তোলা নৌকা ছিল। সকালে যেত আর সন্ধ্যায় ফিরে আসত। এটা বড় নৌকা, তাই ভাড়া করার প্রশ্নই ওঠেনা। অন্যগুলো ছিল খুব ছোট, তাই অনুপযোগী। আশেপাশের গ্রামে লোক পাঠিয়েও কোন নৌকা পাওয়া গেল না — সবগুলো ভাড়া হয়ে গেছে। নানীর মেজাজ বিগড়ে

যায়। আগে নৌকা ভাড়া না করার জন্য ভাইবোনদের দোষ দেন এবং খুঁত খুঁত করতে থাকেন। তাঁকে ঠাণ্ডা করার জন্য মা বলেন এসব ছোট্ট গ্রামের অপেরার চেয়ে লুযেন-এর অপেরা অনেক ভালো। প্রতিবছরই কয়েকবার হয়, তাই আজ যাবার দরকার নেই। কিন্তু হতাশায় আমার কেঁদে ফেলার অবস্থা। আমাকে বোঝানোর জন্য মা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। বলেন, আমার এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে নানীর মেজাজ আরো বিগড়ে যায়। আমার অন্যদের সঙ্গেও যাওয়া উচিত নয়, তাহলে নানী চিন্তা করতে থাকবেন।

এক কথায়, সবশেষ। দুপুরের খাওয়ার পর, যখন বন্ধুরা চলে গেছে এবং অপেরা শুরু হয়ে গেছে, আমার মনে হল ঢোল-করতালের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি তারা মঞ্চের সামনে বসে সোয়াবীনের দুধ কিনছে।

সেদিন আমি বাগদা চিংড়ি ধরি নি, বা খুব একটা খাই নি। মা'র মন খুব খারাপ, কিন্তু করার কিছুই ছিলনা। সন্ধ্যায় খাবারের সময় নানী বুঝতে পারেন আমার অবস্থা। বললেন, আমার রাগ হওয়াটা ঠিক, তারা অবহেলা করেছে এবং অতীতে মেহমানদের সঙ্গে কখনো এমন ব্যবহার করা হয়নি। খাওয়ার পর অপেরা থেকে ফিরে আসা ছেলেমেয়েরা আমাদের ঘিরে বসে মনের আনন্দে তা ব্যাখ্যা করে। একমাত্র আমি চুপ; হাই তুলে বলেছে আমার জন্য তারা খুব দুঃখিত। হঠাৎ তাদের মধ্যে সবচে বুদ্ধিমান শুয়াংসীর মাথায় বুদ্ধি খেলে যায়: "বড় নৌকা? আট নম্বর দাদুর নৌকা কি ফিরে আসেনি?" মুহূর্তে আরো কয়েকজন ব্যাপারটা গ্রহণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নৌকা করে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গোঁ ধরে। আমিও খুশী হয়ে উঠি। নানী ভয় পেয়ে যান, আমরা সবাই ছোট এবং নির্ভরযোগ্য নয়। মা বললেন, বয়স্কদের প্রত্যেকে কাল কাজ করবে, তাই আমাদের সঙ্গে তাদের সারা রাত জেগে থাকার কথা বলা ঠিক হবে না। আমাদের ব্যাপারটা ঝুলছে এমন সময় শুয়াংসী প্রশ্নের মানে বুঝতে পেরে বলে: "কথা দিচ্ছি সব ঠিক থাকবে। এটা বড় নৌকা। দাদা স্যুন কখনো লাফালাফি করে না এবং আমরা সবাই সাঁতার জানি।"

সত্যি কথা। বারো জনের মধ্যে এমন কোন ছেলে নেই যে জলে মাছের মত নয়। দু-তিন জন আবার পাকা সাঁতারু।

নানী ও মায়ের সন্দেহ ঘুচে যায়। তারাও আর আপত্তি করে নি। তাদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি।

মনটা হঠাৎ হাল্কা হয়ে যায়। মনে হয় বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছি। বাইরে বেরিয়ে দেখতে পাই ছইওয়ালা নৌকো চাঁদের আলোয় সাঁকোর সঙ্গে নোঙর করা। আমরা নৌকায় লাফিয়ে উঠি। শুয়াংসী ধরে সামনের এবং আফা ধরে পেছ-

নের লগি। অল্পবয়েসীরা আমার সঙ্গে মাঝখানে বসে আর বড়োরা যায় পেছনের দিকে। "সাবধানে যেও" এই কথা বলার জন্য মা বেরিয়ে আসার আগেই আমাদের নৌকো ছেড়ে দিয়েছে। আমরা সাঁকো থেকে কয়েক হাত পেছনে গিয়ে তার পর সাঁকোর নীচ দিয়ে এগিয়ে যাই। চার ছেলে দুটি দাঁড় টানছে। একমাইলের একতৃতীয়াংশ যাবার পর পালা বদল হচ্ছে! কথা, হাসি, চীৎকার সব মিলে যাচ্ছে নদীর কলধ্বনির সঙ্গে। নদীর দু'ধারে মটরশুঁটি আর গমের সবুজ খেত। পাশ কেটে নৌকা উড়ার মত যাওয়ুয়াং-এর দিকে যাচ্ছে।

নদীর ওপর কুয়াশার পর্দা। বাতাসে ভেসে আসছে মটরশুঁটি, গম, জলজ লতার গন্ধ। কুয়াশার অন্ধকার ভেদ করে উঁকি দিচ্ছে চাঁদের আলো। মনে হচ্ছে, দূরে, পালিয়ে যাওয়া বন্যপশুর মত ধূসর পাহাড় আমাদের পাশ কেটে যাচ্ছে। তবু মনে হচ্ছে আমাদের গতি খুব কম। চারবার দাঁড়ের পালা বদলের পর যাও-য়ুয়াং অস্পষ্ট তটরেখা দেখা দেয়। সেই সঙ্গে ভেসে আসে গানের শব্দ। বেশ কিছু বাতিও দেখা যাচ্ছে। মনে হল জেলেদের বাতি না হলে, এগুলো নিশ্চয়ই মঞ্চের ওপর।

আমরা যে শব্দ শুনেছি সেটা সম্ভবতঃ বাঁশীর। বাঁশির সুরে সুরে রাত্রিটাও যেন ছন্দায়িত হয়ে উঠেছে। একটা স্বপ্নের পরিবেশ; মনে হল মটরশুঁটি, গম আর জলজ লতার গন্ধে ভারী বাতাসের মধ্যে ভেসে বহু দূরে চলে যাচ্ছি।

আলোর কাছাকাছি যেতেই বুঝতে পারি ওগুলো জেলেদের আলো। বুঝতে পারলাম এতক্ষণ যা দেখেছি এটা সেই যাওয়ুয়াং নয়। ঠিক নৌকার সামনেই পাইনের বন। এখানে গত বছর খেলেছি, দেখেছি পড়ে আছে ঘোড়ার পাথুরে মূর্তি, তার পাশেই ঘাসের ওপর বসে আছে পাথুরে ভেড়া। বন পেরিয়ে আমা-দের নৌকো বাঁকঘুরে এক খাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে। আর ঠিক সামনেই ধরা দেয় যাওয়ুযাং গ্রাম।

আমাদের চোখ গ্রামের বাইরে খোলা মাঠে বসানো মঞ্চের ওপর। চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট, আশে পাশের অন্য কিছু থেকে আলাদা করা কষ্টকর। মনে হল ছবিতে দেখা রূপকথার জগৎ এখানে সত্য হয়ে ধরা দিয়েছে। নৌকো এখন দ্রুত চলছে। মঞ্চের ওপর লোকজন এবং চোখ ধাঁধানো আলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মঞ্চের কাছে নোঙর করা ছইওয়ালা নৌকার ফলে নদী কালো হয়ে গেছে।

আফা প্রস্তাব করে, "মঞ্চের কাছে জায়গা নেই। চল আমরা দূর থেকে দেখি।"

নৌকোর গতি কমে গেছে। সহসাই আমরা পেঁৗছে যাই। মঞ্চের কাছে

যাওয়া সত্যিই অসম্ভব। মঞ্চের উল্টো দিকে মন্দির থেকে আমাদের নৌকো আরো দূরে নিয়ে যেতে হয়। আমাদের মন খারাপ হয় নি। আমরা চাইনি আমাদের সাদা ছইওয়ালা নৌকো সাধারণ কালো নৌকোর সঙ্গে মিলে যাক, তা ছাড়া আমাদের জন্য জায়গাও ছিল না ......

তাড়াতাড়ি নোঙর করার সময় মঞ্চের উপর আসে লম্বা কালো দাড়িওয়ালা এক লোক। তার পিঠে চারটি পতাকা বাধা। একটি বর্শা দিয়ে সে একদল নিরস্ত্র লোকের সঙ্গে লড়ছে। শুয়াংসী বলে সে খুব বিখ্যাত একরোব্যাট, একটানা ৮৪টি ডিগবাজী খেতে পারে। দিনের বেলা সে নিজে সেটা গুনেছে।

লড়াই দেখার জন্য আমরা নৌকোর সামনের দিকে জড়ো হই, কিন্তু একরোব্যাট একটি ডিগবাজীও খায়নি। নিরস্ত্র কয়েকজন গোড়ালির উপর কয়েকবার মাথা দোলায়, তার পর রণে ভঙ্গ দেয়। তারপর একটি মেয়ে এসে টানা সুরে গান গাইতে থাকে। শুয়াংসী বলে: "সন্ধ্যায় খুব বেশী লোকজন নেই। একরোব্যাটও ব্যাপারটা সহজে নিয়েছে। দর্শক না থাকলে কেউ খেলা দেখাতে চায় না।" ব্যাপারটা বোধগম্য। ততক্ষণে অভিনয় দেখার মত লোকজন আর বেশী নেই। গাঁয়ের লোকজনের পরদিন কাজ আছে, তাই রাত জাগার সুযোগ নেই। তারা ঘুমোতে চলে গেছে। যাওয়ুয়াং এবং আশেপাশের গ্রামের কিছু বেকার লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। স্থানীয় টাকা-পয়সা ওয়ালাদের পরিবার তখনো কালো ছইয়ের নীচে নৌকোর ওপর, কিন্তু অপেরায় তাদের তেমন উৎসাহ নেই। তাদের অনেকেই মঞ্চের কাছে গিয়েছে কেক, ফল অথবা তরমুজের বীজ খাবার জন্য। কাজেই সবমিলিয়ে এদের দর্শক বলা যায় না।

আসলে ডিগবাজীতে আমার খুব একটা আগ্রহ ছিল না। আমি দেখতে চেয়েছিলাম সাদা কাপড়ে জড়ানো সেই সাপের আত্মা যার দু হাত হয়েছে মাথার ওপর, আর সেই হাতে সাপ মাথা লাঠি। দ্বিতীয় পছন্দ হলদে পোশাক পরা বাঘের লাফ। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেও এগুলো আসে নি। মেয়েটির পেছনে পেছনে আসে একবুড়ো, যে যুবকের অভিনয় করছে। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং গুইশেংকে কিছু সোয়াবীন দুধ কিনে দিতে বলি। একটু পরেই ফিরে এসে সে বলে: "নাই। যে বধির লোকটি বিক্রী করে সে চলে গেছে। দিনের বেলা ছিল, তখন আমি দু'বোতল পান করেছি। তোমার জন্য পানি নিয়ে আসছি।"

আমি পানি পান করিনি, যতক্ষণ পারি ঠেকিয়ে রাখি। বলতে পারব না কি দেখেছি, কিন্তু মনে হল অভিনেতাদের চেহারা ধীরে ধীরে অদ্ভুত হয়ে গেছে, চেহারার বৈশিষ্ট্যগুলো মুছে গিয়ে সমতল হয়ে গেছে। অধিকাংশ যুবক হাই

তুলছে এবং বুড়োরা নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। এমন সময় লাল জামা পরা একজন ক্লাউনকে এক পিলারের সঙ্গে বেঁধে এক সাদা দাড়িওয়ালা চাবুক মারতে শুরু করলে আমরা সজাগ হয়ে দেখতে শুরু করি এবং হাসতে থাকি। আমার মনে হয় সেটাই সে সন্ধ্যার সবচে শ্রেষ্ঠ দৃশ্য।

কিন্তু তার পর সেই বুড়ী আসে। এই চরিত্রকে আমার সবচে বড়ো ভয়, বিশেষ করে সে যখন গাইতে বসে। অন্যদের হতাশা দেখে মনে হল আমার মতই তাদের অবস্থা। প্রথমে বুড়ী চলে ফিরে গাইতে থাকে, তারপর মঞ্চের মাঝখানে চেয়ারে বসে পড়ে। আমার অবস্থা কাহিল হয়ে যায়। শুয়াংসী এবং অন্যেরা গালাগালি করতে থাকে। আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকি। অনেকক্ষণ পর বুড়ী তার হাত তোলে। আমার মনে হল সে দাঁড়াবে। কিন্তু আমার আশা সত্বেও, সে নিজের হাত আগের জায়গায় নিয়ে আসে এবং আগের মতই গাইতে থাকে। নৌকোর ভিতর কয়েকজন বালক চীৎকার করতে থাকে এবং অন্যেরা আবার হাই তুলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত শুয়াংসী-এরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। সে বলে, তার ভয় হয় বুড়ী ভোর পর্যন্ত গাইবে। আমাদের বরং চলে যাওয়া ভালো। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যাই এবং বেরুনোব সময়কার উৎসাহ ফিরে আসে। তিন অথবা চারজন নৌকোর মাথার দিকে যায়, গলুই ধরে নৌকো ঘুরায়। বুড়ী গায়িকাকে গাল দিতে দিতে তারা দাঁড় ধরে পাইন বনের দিকে চলতে শুরু করে।

চাঁদের অবস্থা থেকে বোঝা যায়, আমরা খুব একটা দেখি নি। এবং যাওয়ুয়াং ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল মনে হয়। লণ্ঠন-জ্বালা মঞ্চের দিকে ফিরে তাকাতেই মনে হয় আগের মতই আছে, রূপকথার মঞ্চের মত অস্পষ্ট, গোলাপী কুয়াশায় ঢাকা। আবার বাঁশীর সুরেলা শব্দ কানে ভেসে আসে। আমার মনে হল, বুড়ীর গান নিশ্চয়ই শেষ, কিন্তু আবার দেখার জন্য যেতে বলার ইচ্ছে হয় না।

সহসাই পাইন বন পেছনে চলে যায়। নৌকো বেশ দ্রুত চলছে। কিন্তু চারিদিকে এত গভীর অন্ধকার যে, বলা যায় বেশ রাত হয়েছে। তারা অভিনেতাদের নিয়ে গল্প বলা, হাসাহাসি বা গালাগালি করার সময় দাঁড়বাহীরা জোরে দাঁড় টানতে থাকে। নৌকোর সঙ্গে জলের শব্দ এখন আরো পরিষ্কার। নৌকাটাকে মনে হচ্ছে পিঠে একদল ছেলে নিয়ে ফেনার ভেতর ভেসে যাওয়া বিরাট সাদা মাছ। সারা রাত মাছ ধরায় ব্যস্ত কিছু জেলে তাদের ডিঙ্গি থামিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে।

পিংছিয়াও তখনো একতৃতীয়াংশ মাইল দূরে। আমাদের নৌকোর গতি

কমে আসে। দাঁড়বাহীরা জানায় এতক্ষণ দাঁড় টেনে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ আমাদের কোন খাওয়া জোটে নি। হঠাৎ গুইশেংর মাথায় এক চমৎকার বুদ্ধি খেলে যায়। সে বলে লুওহান মটরশুঁটিগুলো পেকে গেছে, নৌকায়ও সামান্য জ্বালানী কাঠ রয়েছে। তাই মটরশুঁটি রান্না করা যেতে পারে। সবাই রাজী হয়ে যায় এবং আমরা তীরের দিকে রওনা হই। নিকষ অন্ধকারে ঢাকা মাঠে শুধু মটরশুঁটি আর মটরশুঁটি।

সবার আগে তীরে লাফিয়ে নেমে শুয়াংসী চীৎকার করতে থাকে, "হে, আফা! এখানে তোমাদের ক্ষেত। ওখানে বুড়ো লিউইর ক্ষেত। আমরা কোন-খান থেকে নেব?"

আমরা সবাই তীরে লাফিয়ে নামতে আফা বলে: "এক মিনিট, আমি একটু দেখে নেই" মটরশুঁটি দেখার জন্য সে একটু ঘোরাঘুরি করে, তার পর সোজা হয়ে বলে: "আমাদের গুলোই নাও, ওগুলো বেশ বড়।" চীৎকার দিয়ে আমরা সবাই আফা পরিবারের ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ি। সবাই গোছা গোছা মটরশুঁটি নিয়ে নৌকায় ছুড়ে মারে। শুয়াংসী ভাবে আরো নিলে এবং আফার মা জানতে পারলে বিপদ হবে। তাই সবাই বুড়ো লিউইর ক্ষেতে যাই আরো কিছু মটরশুঁটির জন্যে।

তার পর আর একদল ছেলে দাঁড় বাইতে শুরু করে। অন্যেরা নৌকোর মাথার কাছে চুলো জ্বালায়। আমি এবং আরো কয়েকজন মটরশুঁটি ভাঙতে থাকি। রান্না হয়ে গেলে নৌকোর হাল ছেড়ে দেই। সবাই মিলে মটরশুঁটি খেতে লেগে যাই। খাওয়া শেষে পাতিল ধুয়ে ফেলি, মটরশুঁটির দানা, খোসা নদীতে ছুড়ে ফেলি, যাতে কোন চিহ্ন না থাকে। শুয়াংসী খচ্খচ্ করতে থাকে। আমরা আট নম্বর দাদুর নৌকোর কাঠ-নুন খরচ করে ফেলেছি। বুড়ো এত সজাগ যে ব্যাপারটা ধরে ফেলবে এবং আমাদের গাল দেবে। কিন্তু কিছু কথা-বার্তার পর ঠিক হলো আমাদের ভয়ের কিছুই নেই। সে আমাদের গাল দিলে আমরা তাকে গত বছর নদীর তীব থেকে নেয়া পাইন ফিরিয়ে দিতে বলব এবং তার মুখের উপর বলব "বুড়োশয়তান।"

নৌকার দিক থেকে হঠাৎ শুয়াংসীর গলা ভেসে আসে, "আমরা ফিরে এসেছি। কোন কিছুই হয় নি। আমি বলি নি, সব ঠিক থাকবে?"

তার মাথার উপর দিয়ে তাকিয়ে দেখি আমরা পিংছিয়াও পৌঁছে গেছি। সাঁকোর কাছে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে — আমার মা। শুয়াংসী মা'র উদ্দেশ্যেই ওসব কথা বলেছে। ঘাটের কাছে যাবার সময় নৌকাটি সাঁকোর নীচ দিয়ে গিয়ে থেমে যায়, তার পর আমরা সবাই তীরে নেমে যাই। মা একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

জানতে চান কেন এত দেরী হল — মাঝ রাত পার হয়ে গেছে। কিন্তু সহসাই তাঁর মুখে হাসি ফিরে আসে এবং তিনি সবাইকে সেদ্ধ ভাত খাওয়াব আমন্ত্রণ জানান।

তারা জানায় আমরা সবাই কিছু খেয়েছি এবং আমাদের ঘুম পাচ্ছে। তাই ঘুমুতে যাওয়াই ভালো এবং সবাই যার যার বাড়ী চলে যায়।

পরদিন দুপুর পর্যন্ত আমি ঘুম থেকে উঠিনি। আট নম্বর দাদুও কাঠ-নুন নিয়ে কোন ঝামেলা বাধান নি। বিকেলে আগের মতই আমরা বাগদা চিংড়ি ধরতে যাই।

"এই ছোট্ট রাসকেল, শুয়াংসী, তুমি কাল আমার মটরশুঁটি চুরি করেছ। তুমি ঠিকমত সেগুলো তোল নি, কিছু পায়ে দলেছ।" তাকিয়ে দেখি মটরশুঁটি বিক্রি করে ডোঙ্গা করে ফিরে আসছে বুড়ো লিউই। ডোঙ্গার তলায় তখনো বেশ কিছু মটরশুঁটি পড়ে আছে।

শুয়াংসী বলে : "হ্যাঁ, আমরা একজন মেহমানকে খাইয়েছি। আমরা তোমার গুলো দিয়ে শুরু করতে চাইনি। দেখ, তুমি আমার বাগদা চিংড়িগুলোকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ।"

আমাকে দেখতে পেয়ে ডোঙা থামিয়ে বুড়ো মুখ টিপে হাসে, "মেহমান? তোমাদের তাই করা উচিত।" তার পর সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, "কালকের অপেরা কি ভালো ছিল?"

আমি সায় দেই, "হ্যাঁ।"

"মটরশুঁটি ভালো লেগেছে?"

আমি আবার সায় দেই, "খুব ভালো।"

আমাকে অবাক করে বুড়ো খুব খুশী হয়ে যায়। আঙ্গুল উল্টে সে তৃপ্তির সঙ্গে বলতে থাকে, "শহরে যারা পড়াশোনা করেছে তারা আসলে জানে কোনটা ভাল। আমি একটি একটি করে মটরশুঁটির বীজ বাছাই করি। গাঁয়ের লোকজন ভালো-মন্দ বিচার করতে পারে না এবং বলে আমার মটরশুঁটি অন্যদের চেয়ে খারাপ। আজ তোমার মা'কে কিছু দেব যাচাই করে দেখার জন্য . . . . . ." তার পর সে ডোঙা নিয়ে চলে যায়।

সন্ধ্যার খাবারের জন্য মা বাড়ীতে ডাকলে দেখতে পাই টেবিলের ওপর এক বিরাট বাটি ভর্তি সেদ্ধ মটরশুঁটি। আমার এবং মায়ের খাওয়ার জন্য বুড়ো লিউ-ই সেগুলো এনেছে। আমি শুনতে পাই মায়ের কাছে সে আমার খুব প্রশংসা করেছে, "সে এত ছোট, তবু জানে কোনটা কি। ভবিষ্যতে সে সব পরীক্ষা পাস করবে। তোমার কপাল ভালো।" কিন্তু মটরশুঁটি খেতে গিয়ে দেখি গত

রাতের মত এত মজা লাগছে না।

আজ পর্যন্ত, সত্যি বলতে কি সে রাতের মত এত মজার মটরশুঁটি কখনো খাই নি বা এত ভালো অপেরা কখনো দেখি নি।

অক্টোবর, ১৯২২

টীকা

1. আর এক নাম থান জিয়াওথিয়ান। তিনি বেইজিং অপেরার বিখ্যাত অভিনেতা।

2. মৌদ্গলয়ানা গৌতম বুদ্ধের শিষ্য ছিলেন। কথিত আছে পাপের অপরাধে তাঁর মা নরকবাসী হয় এবং তিনি তাঁকে উদ্ধার করেন।

3. বেইজিং অপেরার অন্য এক নামকরা অভিনেতা—বুড়ী চরিত্রে অভিনয় করতেন।

নববর্ষে আত্মদান

পুরনো ক্যালেণ্ডারের নববর্ষের পূর্বসন্ধ্যা নতুন ক্যালেণ্ডারের নববর্ষের পূর্বসন্ধ্যার মতই। গ্রাম-গঞ্জের কথা বাদই দিলাম, এমনকি বাতাসেও নববর্ষের আমেজ এসে যায়। সন্ধ্যায় নেমে আসা ধূসর মেঘে ঘনঘন বিজলীর চমক, দেবতাকে বিদায় জানানোর বাজির শব্দ। আশেপাশে সশব্দে পটকা ফোটে, এবং সে শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই বাতাস ভরে যায় বারুদের গন্ধে। এমনি এক রাতে আমি ফিরে আসি আমার গ্রাম, লুযেনে। নিজের গ্রাম হলেও, বেশ কিছু দিন সেখানে আমার কোন বাড়ীঘর ছিল না। তাই এক পরিবারের চার নম্বর ছেলে লু সাহেবের সঙ্গে আপাততঃ থাকতে হয়। তিনি আমাদের একই গোষ্ঠীর এবং আমার পূর্ব জেনারেশনের। তাই তাঁকে চার নম্বর চাচা ডাকতাম। রাজকীয় কলেজের[1] পুরনো ছাত্র এবং নয়া-কনফুসীয় মতবাদে বিশ্বাসী হলেও, তাঁর মাঝে আমি সামান্যই পরিবর্তন দেখেছি। শুধু বয়সে সামান্য বড়, কিন্তু গোঁফ পর্যন্ত নেই। দেখা হওয়ার পর, সামান্য শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর তিনি বললেন আমি মুটিয়ে গেছি। তারপর পরই সংস্কারকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান। আমি জানতাম এটা আমার বিরুদ্ধে নয়, তখনো এই আক্রমণের লক্ষ্য খাং ইয়ৌওয়েই[2] । তবু কথাবার্তা ঠেকে যায়, এবং সহসাই বসার ঘরে আমি একা হয়ে পড়ি।

পরদিন খুব দেরী করে ঘুম থেকে উঠি এবং দুপুরের খাওয়ার পর কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তার পরদিনও একই কাজ করি। তাদের কেউই খুব একটা বদলায় নি, সামান্য বুড়িয়ে গেছে। কিন্তু প্রতিটি পরিবারই "ভোগের" আয়োজনে ব্যস্ত। এটাই লুযেনের বর্ষশেষের সবচে বড়ো উৎসব, যখন লোকজন শ্রদ্ধার সঙ্গে সৌভাগ্য দেবতাকে স্বাগত জানায় এবং নববর্ষের জন্য সৌভাগ্য কামনা করে। তারা হাঁস-মুরগী জবাই করে, শূয়রের মাংস কেনে। পানিতে মেয়েদের হাত লাল না হওয়া পর্যন্ত ধোয়া-মোছা, মাজা-ঘষার কাজ

চলতে থাকে। তাদের কেউ কেউ আবার রূপোলী ব্রেসলেট পরে। মাংস রান্না হয়ে গেলে তার মাঝে এলোমেলোভাবে কিছু কাঠি গুঁজে দেয়া হয়। এটাকেই "ভোগ" বলে। ধূপের শিখা এবং মোমের আলোয় ভোরবেলা এই ভোগ পরিবেশন করা হয়। তার পর তারা সৌভাগ্য দেবতার কাছে মিনতি জানায় এই ভোগ গ্রহণের। শুধু পুরুষরাই পূজারী হতে পারে। ভোগের পর আবার আগের মতই ফুটতে থাকে পটকা। প্রতিবছর, প্রতিপরিবারে এই ঘটনা ঘটে যদি তারা ভোগের সামগ্রী এবং পটকা কিনতে পারে। এ বছরও তারা পুরনো রীতি মেনে চলেছে।

দিনটা ঘোলাটে হয়ে আসে। বিকেলের মধ্যে সত্যি সত্যি বরফ পড়তে শুরু করে। প্লাম-ফুলের পাপড়ির মত বড় একেকটা তুষার-কণা আকাশে ছুটোছুটি করছে। আয়োজনের চাঞ্চল্যে গোটা লুযেন যেন জেগে উঠেছে। চাচার পড়ার ঘরে যখন ফিরে আসি তখন বাড়ীর ছাদ সাদা বরফে ঢেকে গেছে। কামরাটা অনেক উজ্জ্বল মনে হল। দেয়ালে ঝুলছে তাও ধর্মযাজক ছেন থুয়ান[3] এর লেখা "দীর্ঘজীবী" অক্ষরওয়ালা স্ক্রোল। একজোড়া স্ক্রোলের একটি খুলে গিয়ে লম্বা টেবিলের ওপর পড়ে আছে। অন্যটি তখনো দেয়ালে ঝুলছে। তাতে লেখা : "যুক্তি দিয়ে আমরা মনের শান্তি পাই।" জানালার নিচের টেবিলে রাখা বইগুলি আমি আনমনে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম, কিন্তু সেখানে "খাংসী-র অভিধানের[4] " একটি অসম্পূর্ণ সেট, জিয়াং ইয়োং-এর "যু সীর দার্শনিক রচনাবলীর টীকা"-র এক খণ্ড, "চার মহাগ্রন্থের টীকা[5] "-র এক খণ্ড প্রভৃতি এক রাশ বই পেলাম দেখতে। যাই ঘটুক না কেন, কালই চ'লে যাবো ব'লে আমি মন স্থির করলাম।

তাছাড়া, গতকাল সিয়াংলিনের বউয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার ব্যাপারটি অস্বস্তিতে ফেলেছে। বিকেলে তা ঘটে। শহরের পূব এলাকায় এক বন্ধুর কাছে গিয়েছি। বেরিয়ে আসার সময় নদী তীরে তার সঙ্গে দেখা। যে ভাবে আমার দিকে তাকিয়েছে তাতে বুঝতে পারি সে কিছু একটা বলতে চায়। লুযেনে যত লোকের সঙ্গে এবার দেখা হয়েছে কেউ তার মত এত খানি বদলে যায় নি। পাঁচ বছর আগে তার যে চুলে পাক ধরেছিল, এখন তা পুরোপুরি সাদা হয়ে গেছে, চল্লিশের কোঠায় এটা অস্বাভাবিক। মুখ শুকিয়ে হলদে হয়ে গেছে, বেদনার সেই ছাপ আর নেই। দেখে মনে হয় যেন কাঠ খোদাই করা। মাঝে মাঝে চোখের পলক পড়লে বোঝা যায় দেহে এখনো প্রাণ আছে। তার একহাতে ঝুড়ি, তাতে ভাঙ্গা একটি বাটি, আর এক হাতে তার'চে লম্বা বাঁশের খুঁটি, নীচের দিকটা ফাটা। এটা পরিষ্কার : সে ভিখারিণী হয়ে গেছে।



এটা পরিষ্কার : সে ভিখারিণী হয়ে গেছে।

এসে কিছু পয়সা চাইবে এজন্যে আমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি।

সে প্রথমে জিজ্ঞেস করে, "আপনি ফিরে এসেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"খুব ভালো কথা। আপনি লেখাপড়া জানেন, অনেক ঘুরেছেন, অনেক দেখেছেন। আমি আপানাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই।" তার দীপ্তিহীন চোখে হঠাৎ দীপ্তি ফিরে আসে।

কখনো ভাবি নি সে এভাবে কথা বলবে। অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি।

সে দু'পা এগিয়ে আসে। তারপর গোপনে ফিসফিসিয়ে বলে: "ব্যাপারটা হচ্ছে মরণের পর কেউ কি ভূত হয়ে যায়?"

আমার ওপর চোখ রাখতেই একটা অমঙ্গলের ইঙ্গিত দেখতে পাই। স্কুলে অপ্রত্যাশিত পরীক্ষার সময় শিক্ষক পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে যে অবস্থা হয় আমি তার চেয়েও একটা ভীতিকর অবস্থায় পড়ে যাই, মেরুদণ্ডের ভেতর কাঁপুনি ধরে যায়। ব্যক্তিগতভাবে আমি কখনো আত্মার অস্তিত্বের বিষয়টি ভেবে দেখি নি। এখন তাকে কেমন করে জবাব দেব? একটু ইতস্তত: করে আমার মনে হল, এখনকার ঐতিহ্য হচ্ছে আত্মা বিশ্বাস করা, তবু তাকে সন্দেহবাদী মনে হচ্ছে — সম্ভবত: সে আশা করে এটা বলা সঙ্গত হবে, আশা হয়ত অমরত্ব আছে, হয়ত নেই। দুর্দশাগ্রস্তদের দু:খ বাড়িয়ে কি লাভ? একটা অবলম্বনের জন্য আত্মা আছে এটা বলাই বোধ হয় ভাল।

একটু ইতস্তত: করে তাকে বলি: "আমার মনে হয় হয়ত আছে।"

"তাহলে'ত নরকও থাকবে?"

"কি, নরক?" চমকে উঠে শুধু প্রশ্নটি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি, "নরক? যুক্তি হিসেবে থাকা উচিত — কিন্তু প্রয়োজন হিসেবে নয়। এ নিয়ে কে মাথা ঘামায়? ......"

"তাহলে এক পরিবারের যারা মারা গিয়েছে তাদের কি একে অপরের সঙ্গে আবার দেখা হবে?"

"একে অপরের সঙ্গে দেখা হবে কি না ......" বুঝতে পারি আমি একটা বোকা। সকল দ্বিধা ও চিন্তা সত্ত্বেও আমি তার তিনটি প্রশ্নের জবাব দিতে ব্যর্থ হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলি এবং আগে যা ভেবেছি ঠিক তার উল্টোটা বলতে ইচ্ছে করে, "এ ক্ষেত্রে ...... বলতে কি, আমি নিশ্চিত নই ...... বাস্তবে, ভূতের ব্যাপারটি নিয়েও আমি খুব একটা নিশ্চিত নই।"

আরো কিছু উত্ত্যক্তকর প্রশ্ন এড়ানোর জন্য সরে যাই। অস্বস্তি বোধ করতে

করতে দ্রুত চাচার বাড়ী ফিরে আসি। মনে ভয় ধরে, "আমার জবাব তার জন্যে বিপজ্জনক হবে। হয়ত যখন সবাই আনন্দে মেতে উঠেছে, সে খুব একা বোধ করছে, এ ছাড়া আর কি কোন কারণ থাকতে পারে? তার কি কোন পূর্বাশংকা আছে? যদি অন্য কোন কারণ থাকে, এবং কিছু ঘটে, তাহলে আমার জবাবের জন্য আমি কিছুটা দায়ী হব।" শেষ পর্যন্ত নিজে নিজে হেসে উঠি, মনে হয় এ সব কাকতালীয় ব্যাপারের কোন গুরুত্ব নেই, তবু তা মনে গেঁথে রেখেছি; হয়ত এজন্যেই কোন কোন শিক্ষাবিদ আমাকে পাগল বলে। তাছাড়া আগের জবাব পাল্টে আমি পরিষ্কার বলেছি: "আমি নিশ্চিত নই।" তাই যদি কিছু ঘটেও, আমার করার কিছুই থাকবে না।

"আমি নিশ্চিত নই" এটা খুব উপযোগী কথা।

অনভিজ্ঞ এবং হঠকারী যুবকরা প্রায়ই অন্যের সমস্যা নিজের মাথায় তুলে নেয়, অথবা ডাক্তার বাছাই করে, যদি কোন কারণে কিছু উল্টো ঘটে তাহলে হয়ত তাদের দায়ী করা হয়। কিন্তু 'আমি নিশ্চিত নই' একথা বলে একজন সব দায়দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে। এ সময়ে এরকম একটি কথার প্রয়োজনীয়তা আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করি, এমনকি ভিখারিণীর সঙ্গে কথা বলার সময়ও এ ব্যাপারে মাফ নেই।

তবু মনটা খচ্ খচ্ করতে থাকে। এমনকি একরাতের বিশ্রামের পরও ব্যাপারটা মনে গেঁথে থাকে, যেন কোন অস্বাভাবিক ঘটনার পূর্বাশঙ্কা পেয়ে বসেছে। সেই পীড়াদায়ক বরফ আবহাওয়ায়, অন্ধকার পড়ার ঘরে এই অস্বস্তি বেড়েই চলে। চলে যাওয়াই ভালো হবে, কাল আমার শহরে ফিরে যাওয়া উচিত। ফু সিং রেস্তোরায় এক থালা সেদ্ধ হাঙ্গরের ডানার দাম ছিল ১ টাকা। ভাবছি সেই সস্তা ও সুস্বাদু খাবারের দাম বেড়েছে কিনা। যদিও পুরনো সাথীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে, যদিও আমি একা, তবু হাঙ্গরের ডানার স্বাদ নেয়া উচিত। যে ভাবেই হোক, পরদিন চলে যাবার জন্য আমি মন ঠিক করে ফেলি।

আমার জীবনে বহুবার এমন ঘটেছে। যা ভেবেছি ঘটবে তা ঘটে নি, যা ভেবেছি ঘটবে না তাই ঘটেছে। আমার খুব ভয় হয়ত আবার তেমনি কিছু হবে। এবং সত্যি সত্যি অদ্ভুত জিনিষ ঘটতে শুরু করে। সন্ধ্যার দিকে ভেতরের ঘরে আলোচনার মত কথা শুনতে পাই—সহসা কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু শুনতে পাই বেরিয়ে যাবার সময় চাচার চড়াগলা, "আগেও নয়, পরেও নয়, ঠিক এসময়ে—খারাপ চরিত্রের লক্ষণ।"

প্রথমে অবাক, তার পর খুব অস্বস্তি বোধ করি। মনে হয় এ সব কথা আমাকেই উদ্দেশ্য করে বলা। দরজার বাইরে তাকিয়ে দেখি, সেখানে কেউ নেই। সান্ধ্য

খাবারের আগে চা বানানোর জন্য চাকর ছেলেটা আসা পর্যন্ত খুব অস্বস্তির ভেতর কেটে যায়। শেষ পর্যন্ত কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ পাই।

জিজ্ঞেস করি : "এই মাত্র লু সাহেব কার সঙ্গে মেজাজ দেখিয়েছেন?"

"কেন. সিয়াংলিনের বউয়ের সঙ্গে।" সে সংক্ষেপে জবাব দেয়।

আবার জিজ্ঞেস করি : "সিয়াংলিনের বউ? কি হয়েছে?"

"সে মারা গেছে।"

"মারা গেছে?" হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে আসে। চমকে উঠি, হয়ত রংও বদলে যায়। কিন্তু যেহেতু সে মুখ তোলে নি, তাই আমার অনুভূতি বুঝতে পারেনি। নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করি :

"সে কখন মরেছে?"

"কখন? কাল রাতে বা আজকে, আমি নিশ্চিত নই।"

"কেমন করে মরেছে?"

"কেমন করে মরেছে? কেন, দারিদ্রের কারণে।" সে শান্তভাবে জবাব দেয় এবং মাথা তুলে আমার দিকে না তাকিয়েই চলে যায়।

যাহোক, আমার উত্তেজনা খুব একটা স্থায়ী হয় নি। অবশ্যম্ভাবী যা ভেবেছি তা ঘটেছে। "আমি নিশ্চিত নই" আমাকে আর একথার আশ্রয় নিতে হবে না অথবা "দারিদ্রের কারণে" চাকর ছেলেটার এই উক্তিতে স্বস্তি পেতে হবে না। মনটাও হাল্কা হয়ে গেছে। শুধু মাঝে মাঝে কিছু একটা ভারী মনে হচ্ছে। খাওয়ার টেবিলে চাচা গম্ভীরভাবে আমাব সঙ্গে খেতে বসেন। সিয়াংলিনের বউ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম। "ভূত-প্রেত প্রকৃতির সম্পদ"[৩] যদিও তিনি এ কথা পড়েছেন তবু জানি তিনি অনেক কুসংস্কারে বিশ্বাসী এবং এই ভোগের আগে মৃত্যু অথবা অসুস্থতার কথা বলার কোন প্রশ্নই ওঠে না। প্রয়োজন হলে কেউ রেখে ঢেকে ঘুরিয়ে বলতে পারে। কিন্তু কেমন করে করতে হয় জানি না বলে, জিহ্বার কাছে প্রশ্ন আসতে থাকলেও তা আটকে রাখতে হয়। তার গম্ভীর চেহারা দেখে হঠাৎ সন্দেহ হয়, আগেও নয়, পরেও নয়, কিন্তু ঠিক এ সময়ে তাকে বিরক্ত করার জন্য তিনি আমাকে খারাপ চোখে দেখছেন, এবং আমিও বাজে লোক। তাই তার মনকে শান্ত করার জন্য তখনি বলি যে কাল লুযেন ছেড়ে শহরে ফিরে যেতে চাই। তিনিও আর থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন না। চুপচাপ আমরা খাওয়া শেষ করি।

শীতকালে এমনিতে দিন ছোট। এখন বরফ পড়ছে বলে গোটা শহরটা অন্ধকারে ঢেকে গেছে। বাতির আলোর নীচে সবাই ব্যস্ত, কিন্তু জানালার বাইরে সব নীরব। জমা বরফের ওপর নতুন করে বরফ পড়ছে, যেন ফিসফিসিয়ে কথা বলছে,

গোটা ব্যাপারটা আমাকে আরো নিঃসঙ্গ করে দেয়। হারিকেনের হলদে আলোর শিখার পাশে বসে মনে হয় : "বিরক্তিকর, ভাঙ্গা খেলনার মত এই দুঃখী মহিলাকে লোকে ধূলায় ফেলে দিয়েছে, একসময় ধূলায় সে নিজের ছাপ রেখেছে। যারা জীবনকে নিয়ে মেতে আছে তারা তার জীবনকে টেনে চলার এই আকুতিতে অবাক হয়েছে। কিন্তু এখন মরণ তাকে টেনে নিয়েছে। আত্মা আছে কি নেই আমি জানি না। কিন্তু বর্তমান সংসারে যখন কোন অর্থহীন অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায়, যাকে দেখার ব্যাপারে সবাই ক্লান্ত, অথচ তাকে আর দেখা যায় না, সেটা ব্যক্তি ও অন্যের জন্য ভালো।" কান পেতে দেখি জানালার বাইরে বরফ পড়ার শব্দ শোনা যায় কিনা, কিন্তু মনের ভেতর সেই চিন্তা বাসা বেধে থাকে। এক সময় অস্বস্তিও কমে আসে।

শোনা অথবা দেখা তার জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনা পূর্ণঘটনা হিসেবে ফিরে আসে।

সে লুযেনের নয়। এক বছর শীতের শুরুতে আমার চাচার পরিবার যখন চাকরাণী বদল করার চেষ্টা করছে তখন সালিস বুড়ী ওয়েই তাকে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দেয়। সাদা ফিতে দিয়ে তার চুল বাঁধা, পরণে কালো স্কার্ট, নীল জ্যাকেট এবং বিবর্ণ সবুজের কাঁচুলি। বয়স ছাব্বিশের মত, গায়ের চামড়া শুকিয়ে গেছে অথচ গালে গোলাপী আভা। বুড়ী ওয়েই তাকে ডাকে সিয়াংলিনের বউ। সে তার মায়ের প্রতিবেশী। স্বামীর মৃত্যুতে কাজের সন্ধানে ঘুরছে। চাচা ভ্রূ কুটি করেন। সঙ্গে সঙ্গে চাচী বুঝতে পারেন স্বামী বিধবাকে কাজ দিতে রাজী নয়। তাকে বেশ উপযুক্ত মনে হয়। পায়ের পাতা বড় এবং হাত জোড়া মজবুত। দেখে মনে হয় পরিশ্রমী এবং সহজেই বশ মানবে। তাই চাচার ভ্রূ কুটিতে নজর না দিয়ে চাচী তাকে রেখে দেন। শিক্ষানবিসীর সময় সে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করে। যেন বিশ্রামে তার কোন আনন্দ নেই। সে শক্তসবল এবং একাই এক পুরুষের কাজ করে। কাজেই তৃতীয় দিনে তার কাজ পাকা হয়ে যায়, মাসিক পঞ্চাশ পয়সার বিনিময়ে।

সবাই তাকে ডাকে সিয়াংলিনের বউ। তারা তার নাম জিজ্ঞেস করে নি। যেহেতু ওয়েই গ্রামের একজন তাকে প্রতিবেশী বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, তাই তার নামও বোধ হয় ওয়েই। সে কথা কম বলে, জিজ্ঞেস না করলে বলে না, তারপরেও জবাব খুবই ছোট্ট। দিন পনেরো পরে ধীরে ধীরে জানা যায় তার বাড়ীতে রয়েছে দজ্জাল শাশুড়ি এবং দশ বছরের ছোট্ট দেবর। সে কাঠ কাটতে পারে। বয়সে দশ বছরের ছোট তার কাঠুরিয়া স্বামী[7] মারা গেছে সে বছরের

বসন্তকালে। লোকজন শুধু তার কাছ থেকে এটুকুই জানতে পারে।

দিন কেটে যায়। সে আগের মতই কঠোর খাটুনি খাটে। যা পায় তাই খায়, নিজেকে বাঁচিয়ে চলে না। সবাই বলে, লু পরিবার খুব ভালো চাকরাণী পেয়েছে, সে সক্ষম পুরুষের চেয়েও বেশী কাজ করে। বছরের শেষে সে একাই ঘরদোর পরিষ্কার, হাঁস-মুরগী জবাই এবং নববর্ষের ভোগের আয়োজন করে যাতে তার মালিককে বাড়তি লোক ভাড়া করতে না হয়। সেও সন্তুষ্ট, ধীরে ধীরে তার মুখে হাসি ফোটে। মেদ জমে শরীরে। ফিরে আসে ত্বকের সৌন্দর্য।

নববর্ষের পর, একদিন নদীতে চাল ধুতে গিয়ে গোমড়া মুখে ফিরে আসে সিয়াংলিনের বউ। জানায়, নদীর অপর পাড়ে দেখতে মৃত স্বামীর চাচাত ভাইয়ের মত একজনকে ঘুরতে দেখছে। সম্ভবতঃ সে তার খোঁজে এসেছে। ভয় পেয়ে চাচী আরো জানতে চান, কিন্তু আর কোন কথা বের করতে পারেন না। এ কথা শোনা মাত্রই চাচা রেগে গিয়ে বলেন :

"এত ভালো কথা নয়। সে নিশ্চয়ই তার স্বামীর বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে।"

কিছুদিনের মধ্যেই তার পালিয়ে আসার ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যায়।

প্রায় পনেরো দিন পর যখন কি ঘটেছে সবাই ভুলে গেছে, হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় বুড়ী ওয়েই। সঙ্গে নিয়ে আসে চাকরাণীর শাশুড়ি পরিচয়ে এক মহিলাকে — যার বয়স ত্রিশের বেশী। দেখতে গ্রাম্য-নারীর মত হলেও, মাথায় বুদ্ধি পরিষ্কার। বিনয়ের পর সে পুত্রবধূকে নিয়ে যাবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। বলে, বসন্তের শুরুতে অনেক কাজ করতে হবে, অথচ বাড়ীতে শুধু ছেলে বুড়ো রয়েছে, তাই কাজের লোক নেই।

চাচা বলেন : "তার শাশুড়ী তাকে নিয়ে যেতে চায়, তাতে আর আমাদের বলার কি আছে?"

তারপর তার পাওনা মিটিয়ে দেয়া হয়। সব মিলিয়ে এক হাজার সাত শত পঞ্চাশ পয়সা, এক পয়সাও সে খরচ করেনি। চাচী পুরো টাকাটা তার শাশুড়ীর হাতে দিয়ে দেয়। সিয়াংলিনের বউ-এর শাশুড়ি চাচা-চাচীকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যায়। ততক্ষণে দুপুর হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পর চাচী চীৎকার করে ওঠেন : "চাল কোথায়? সিয়াংলিনের বউ কি চাল ধুতে যায় নি?" বোধ হয় ক্ষিদে পাওয়ায় তার দুপুরের খাওয়ার কথা মনে হয়েছে।

সবাই চালের ঝুড়ি খুঁজতে লেগে যায়। চাচী রান্নাঘর থেকে শোবার ঘর পর্যন্ত খোঁজ করেন, কিন্তু কোথাও কোন চিহ্ন নেই। চাচাও বাইরে যান। কিন্তু

ঝুড়ি নেই। শেষ পর্যন্ত নদীর ঘাটে গিয়ে দেখতে পান চালের ঝুড়ি। পাশে পড়ে আছে কিছু শাক-সবজি।

আশে পাশের লোকজন তাকে বলে সেখানে সকাল বেলা নোঙর করে ছিল এক সাদা ছইওয়ালা সাম্পান। ছইয়ের ভেতর কারা ছিল তারা তা জানে না এবং এ ঘটনার প্রতি কেউ কোন নজর দেয় নি। সিয়াংলিনের বউ চাল ধোয়ার জন্য উপুড় হলে সাম্পান থেকে দু'জন লোক লাফিয়ে নামে। জোর করে তারা তাকে সাম্পানে তুলে নেয়। কিছুক্ষণ চেঁচামেচির পর সিয়াংলিনের বউয়ের গলা আর শোনা যায় নি, বোধ হয় তারা তার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়েছিল। এ সময় নদীর ঘাটে উঠে আসে দু'জন মহিলা, একজন অচেনা, অন্যজন বুড়ী ওয়েই। প্রত্যক্ষ-দর্শীরা জানায় তারা সাম্পানের ভেতর তাকিয়ে খুব একটা পরিষ্কার দেখতে পায় নি, তবে মনে হয়েছে পাটাতনের উপর বন্দী হয়ে পড়ে আছে সিয়াংলিনের বউ।

চাচা বললেন: "মান-ইজ্জত সব গেছে। তবু......"

সেদিন চাচী নিজেই দুপুরের খাওয়া তৈরী করেন। চুলা ধরায় তাঁদের ছেলে আনিউ।

দুপুরের খাওয়ার পর আবার আসে বুড়ি ওয়েই।

চাচা বললেন: "মান-ইজ্জত সব গেছে।"

চাচী থালা-বাসন ধোয়ার কাজ করছিলেন। তাকে দেখতে পেয়েই গাল দিতে শুরু করেন: "এর মানে কি? কোন সাহসে আবার এখানে এসেছ? তুমিই তাকে এনে দিয়েছ, আবার ফুসলিয়ে নিয়ে গেছ। লোকজন কি ভাববে? তুমি কি চাও সবাই আমাদের পরিবারকে নিয়ে হাসাহাসি করুক?"

"আমি সত্যিই ঠকেছি। এখন ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে এসেছি। সে যখন কাজের কথা বলেছিল তখন কি আমি জানতাম সে শাশুড়ীর মত না নিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়েছে? আমি খুব দুঃখিত। আমি বুড়িয়ে বোকা হয়ে গেছি, কোন কিছুর বালাই করি না, তাই আপনাদের দুঃখ দিয়েছি। আমার কপাল ভালো আপনারা খুব দয়ালু এবং আমাদের মত ছোটলোকদের কষ্ট দেন না। ভুলের মাশুল হিসেবে এবার আমি আপনাদের একটি ভালো কাজের মেয়ে খুঁজে দেব।"

চাচা বললেন: "তবু......"

তারপরে সিয়াংলিনের বউয়ের ব্যাপারটা মিটে যায়। অল্পদিনের মধ্যে সবাই ভুলেও যায়।

শুধু চাচী প্রায়ই সিয়াংলিনের বউয়ের কথা বলতেন। কেননা পরে যেসব চাকরাণী এসেছে তারা হয় অলস, নয়ত চুরি করে খায়. অথবা দুটোই, একটাও

ভালো জুটেনি। কাজের বেলায় তিনি বলতেন : "জানিনা তার কি হয়েছে?" ভাবটা, তাকে ফিরে পেতে চান। কিন্তু পরবর্তী নববর্ষের মধ্যে তিনিও আশা ছেড়ে দেন।

নববর্ষের ছুটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় আধা মাতাল অবস্থায় ভক্তি জানানোর জন্য আসে বুড়ী ওয়েই। বলে, ওয়েই গ্রামে মায়ের বাড়ীতে কয়েকদিন থেকেছে বলে তার আসতে দেরী হয়েছে। কথাবার্তার ফাঁকে তারা সিয়াংলিনের বউকে নিয়েও আলোচনা করে।

খুশীতে বুড়ী ওয়েই বলে : "সে? সে এখন সুখে আছে। যখন শাশুড়ী তাকে বাড়ীতে ধরে নিয়ে গেছে, তখন সে তাকে হে গ্রামের হে পরিবারের ছয় নম্বর ছেলের কাছে বিয়ে দেবার কথা দিয়েছে। বাড়ীতে পেঁৗছতে না পেঁৗছতেই সবাই তাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে তাড়িয়ে দেয়।"

চাচী অবাক হয়ে যান, "কি ধরণের শাশুড়ি!"

"আপনি বড় লোকের মত কথা বলেন। আমরা গেঁয়ো গরীব মেয়েলোক, আমরা ওসব মানি না। তার ছোট দেবর রয়েছে, যার বিয়ে হতে হবে। স্বামী না পেলে, দেবরের বিয়ের যৌতুক কোথায় জুটবে? কিন্তু তাব শাশুড়ী চালাক-চতুর, দর কষাকষি করতে জানে, তাই তাকে পাহাড়ী এলাকায় বিয়ে দিয়েছে। একই গাঁয়ের কারো সঙ্গে বিয়ে দিলে এত টাকা পেত না। খুব কম মেয়েই দূর পাহাড়ে কাউকে বিয়ে করতে রাজী হয় বলে সে নগদ ৮০ হাজার পেয়েছে। এখন ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে, উপহারের জন্য খরচ হয়েছে পঞ্চাশ হাজার, বিয়ের খরচ দিয়ে এখনো হাতে দশ হাজার রয়েছে। ভেবে দেখুন, সে দরাদরি করতে কত পাকা।......"

"কিন্তু সিয়াংলিনের বউয়ের কি মত ছিল?"

"এটা রাজী হওয়া বা না হওয়ার কথা নয়। অবশ্য যে কেউ আপত্তি করত। তারা তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে পালকিতে তুলে, বরের বাড়ী নিয়ে যায়। তার পর, বউ সাজিয়ে বিয়ে পড়িয়ে ঘরে বন্দী করে দেয়। ব্যস। কিন্তু সিয়াংলিনের বউ ভিন্ন জাতের মেয়ে লোক। আমি শুনেছি সে অনেক কষ্ট করেছে, পণ্ডিতের বাড়ীতে কাজ করেছে বলে অন্যদের চেয়ে আলাদা। আমরা ঘটকালি করি, অনেক কিছু দেখেছি। বিধবাদের যখন বিয়ে হয়, কেউ কেউ চেচাঁমেচি, কান্না-কাটি করে, কেউ গলায় দড়ি দেয়ার হুমকি দেয়, কেউ স্বামীর বাড়ীতে নেয়ার পর পিঁড়িতে বসতে চায় না, কেউ কেউ বিয়ের বাতি পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলে। কিন্তু সিয়াংলিনের বউ অন্যদের চেয়ে আলাদা। তারা বলেছে, পুরো পথ গালা-গাল দিতে দিতে ও চীৎকার করতে করতে যখন সে হে গ্রামে পেঁৗছে, তখন

তার গলা ভেঙ্গে গেছে। তাকে পালকি থেকে জোর করে বার করা হয়। বেহারা দু'জন এবং তার দেবর সর্বশক্তি দিয়েও তাকে বিয়েতে রাজী করাতে পারেনি। ঠিক যখন তারা বাধন শিথিল করেছে — হায় বুদ্ধ — তখনই সে টেবিলের কোণায় মাথা ঠুকে মাথা ফাটিয়ে ফেলে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। দু মুঠো ধূপের ছাই এবং দু'পলতে লাল কাপড়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়েও তারা রক্ত বন্ধ করতে পারেনি। সবশেষে সবাই মিলে জোর করে তাকে স্বামীর সঙ্গে বাসরঘরে বন্দী করে দেয়। সে গালাগাল দিতে থাকে। কি ভয়ংকর ব্যাপার!" সে মাথা নাড়ে, চোখ নামিয়ে নেয়, আর কোন কথা বলে না।

চাচী জিজ্ঞেস করে : "তার পর কি ঘটেছে?"

চোখ তুলে বুড়ী ওয়েই বলে : "তারা বলে পর দিন সে ওঠেনি।"

"এবং তার পর?"

"তার পর? তার পর সে ওঠে। বছরের শেষে সে ছেলের মা হয়। নতুন বছরে তার বয়স হয়েছে দু বছর।[৪] বাড়ীতে যখন ছিলাম তখন কেউ কেউ হে গ্রামে যায়। ফিরে এসে বলে তারা তাকে এবং তার ছেলেকে দেখেছে। মা-ছেলে দু'জনেরই শরীর ভালো। বাড়ীতে কোন শাশুড়ি নেই। জীবন যাপনে তার স্বামী শক্তসমর্থ পুরুষ। বাড়ীটা নিজের। ভালো, ভালো, সে এখন সুখে আছে।"

এরপর আমার চাচীও সিয়াংলিনের বউয়ের কথা বলা ছেড়ে দেন।

কিন্তু সিয়াংলিনের বউয়ের সুখের কাহিনী শোনার দু বছর পর, এক হেমন্তে সে চাচার বাড়ীর চৌকাঠে দেখা দেয়। টেবিলের ওপর রাখে গোলাকার ঝুড়ি, কার্নিশের নীচে বিছানার পুঁটলি। আগের মত চুলে সাদা ফিতে, পরণে কালো স্কার্ট, নীল জ্যাকেট, বিবর্ণ সবুজ কাঁচুলি। তার চামড়া শুকিয়ে গেছে, গালের গোলাপী আভাও নষ্ট হয়ে গেছে। তার চোখজোড়া আধবোজা, কাঁদতে কাঁদতে চোখের সেই আভা নেই। ঠিক আগের মতই, দয়া দেখিয়ে বুড়ী ওয়েই তাকে নিয়ে আসে, চাচীর কাছে সব কিছু খুলে বলে :

"এটা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ব্যাপার। তার স্বামী এত শক্তসমর্থ ছিল, কেউ ভাবতেই পারেনি সে টাইফয়েডে মারা যাবে। প্রথমে একটু ভাল বোধ হলে সে এক থালা ঠাণ্ডাভাত খায় এবং আবার জ্বর আসে। ভাগ্যভালো তার ছেলে ছিল। সে কাজ করতে পারে, তা কাঠ কাটা হোক, চা-পাতা তোলা হোক অথবা রেশমী পোকার চাষ হোক। তাই সে প্রথমে চালিয়ে নেয়। কিন্তু তার পর কে ভেবেছে তার ছেলেকেও নেকড়ে নিয়ে যাবে? বসন্তের শেষ হলেও, গ্রামে প্রায়ই নেকড়ে আসে — কিন্তু তবু কেউ সেটা ভাববে কি করে? এখন সে একে-

বারে একা। বাড়ী দখল করতে এসে স্বামীর বড় ভাই তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে। তাই পুরনো মালিকের কাছে ফিরে আসা ছাড়া তার কোন পথ নেই। এবার তাকে বাধা দেয়ার কেউ নেই, আপনাদেরও নতুন চাকরানী দরকার, তাই তাকে এখানে নিয়ে এসেছি। আমার মনে হয়, নতুন চাকরানীর চেয়ে, আপনাদের কাজকাম জানা পুরনো চাকরানীই ভালো।......"

উদাস চোখ তুলে সিয়াংলিনের বউ বলে: "আমি সত্যি একটি বোকা, সত্যিই...... আমি শুধু জানতাম বরফ পড়ার সময় গুহায় খাবার থাকে না বলে বুনো পশুরা গ্রামে আসে। আমি জানতাম না এগুলো বসন্তেও আসে। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে আমি দরজা খুলে দেই। এক ঝুড়ি মটরশুঁটি দিয়ে চৌকাঠের কাছে বসিয়ে আমাও'কে খোসা ছড়াতে বলি। সে খুব শান্ত ছেলে এবং যা বলেছি সবসময় তা করেছে; সে বাইরে যায়। তার পর বাড়ীর পেছনে গিয়ে কাঠ কাটি, চাল ধুয়ে আনি। চাল যখন চুলোর ওপর তখন মটরশুঁটি সেদ্ধ করার জন্য আমাও'কে ডাকি। কিন্তু কোন জবাব নেই। বাইরে খুঁজতে গিয়ে দেখি মাটিতে ছড়িয়ে আছে মটরশুঁটি, কিন্তু আমাও নেই। সে খেলবার জন্য কখনো কারো বাড়ীতে যায়নি। যেখানেই তার খোঁজে গিয়েছি, কোথাও তার দেখা মেলেনি। পাগল হয়ে ছেলের জন্য সকলের হাতে পায়ে ধরতে থাকি। সর্বত্র খোঁজাখুঁজির পর সন্ধ্যায় সবাই পাহাড়ে খুঁজতে যায়। কাঁটা ঝোপে আটকে আছে আমাওয়ের এক পাটি ছোট্ট জুতো। সবাই বলে: 'সর্বনাশ, তাকে নিশ্চয়ই নেকড়ে খেয়েছে।' একটু এগিয়ে সবাই দেখতে পায় তার হাড়গোড় পড়ে আছে নেকড়ের গুহায়। তখনো ছোট্টহাতে শক্তভাবে ধরা আছে সেই ঝুড়ি। ......" এই বলে সে কাঁদতে থাকে, কথা আর শেষ করতে পারে না।

চাচী প্রথমে মন ঠিক করতে না পারলেও গল্প শেষ হতে হতে তাঁর চোখের কোণা লাল হয়ে ওঠে। খানিক চিন্তা করে চাকরদের ঘরে তার জিনিষপত্র রাখতে বলেন চাচী। বুড়ী ওয়েই এমনভাবে দম ফেলে যেন বিরাট বোঝা নেমে গেছে। প্রথমবারের চেয়ে সিয়াংলিনের বউকে একটু সহজ মনে হয়। পথ দেখানো ছাড়াই সে জিনিষপত্র নিয়ে যায়। সেই থেকে সে আবার লুযেনে চাকরানীর কাজ করতে থাকে।

সবাই আগের মত তাকে ডাকে সিয়াংলিনের বউ।

সে অনেক বদলে গেছে। তিন দিনও যায়নি। তার কর্তা ও গিন্নী উপলব্ধি করে সে আর আগের মত চটপটে নেই। তার স্মৃতিশক্তি আরো খারাপ হয়ে গেছে। ভাবলেশহীন মুখে কোন হাসি নেই। চাচীও বিরক্তি প্রকাশ করতে শুরু করেন। সে যখন আসে চাচা আগের মত ভ্রূ কুঁচকালেও, খুব একটা আপত্তি

তোলেন নি। কেননা চাকরানী পাওয়া কষ্টকর ব্যাপার। শুধু চাচীকে গোপনে সাবধান করে দিয়েছিলেন সিয়াংলিনের বউদের মত মহিলাদের দেখতে দুঃখী মনে হলেও, তাদের আত্মার প্রভাব খুব খারাপ। সে সাধারণ কাজ করলে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু পূর্বপুরুষদের ভোগের কোন কিছু ছুঁতে পারবে না। তাদের নিজেদেরই সব কাজ করতে হবে। সে স্পর্শ করলেই সবকিছু অপবিত্র হয়ে যাবে এবং পূর্বপুরুষরা তা গ্রহণ করবে না।

আমার চাচার বাড়ীতে সবচে বড়ো ঘটনা "পূর্বপুরুষদের জন্য ভোগের" অনুষ্ঠান এবং এ সময়েই সবচে ব্যস্ত থাকতে হত সিয়াংলিনের বউকে। কিন্তু এখন তার হাতে কাজ খুব কম। ঘরের মাঝখানে খাবার টেবিল রেখে তার সামনে পর্দা টাঙিয়ে সে আগের মতই মদের পাত্র এবং খাবার কাঠি সাজাতে শুরু করে।

চাচী তাড়াতাড়ি চীৎকার করে ওঠে: "সিয়াংলিনের বউ, তুমি রেখে দাও। আমিই ওগুলো সাজাব।"

সে ভয়ে হাত সরিয়ে মোমবাতি আনতে যায়।

চাচী আবার চীৎকার করে ওঠে: "রেখে দাও সিয়াংলিনের বউ। আমিই ওগুলো আনব।"

কয়েকবার ঘোরাঘুরি করে কোন কাজ না পেয়ে সিয়াংলিনের বউ ইতস্ততঃ করে চলে যায়। সেদিন সারা দিন সে চুলোর কাছে বসে আগুন জ্বালায়।

শহরের লোকজন তাকে আগের মতই ডাকে সিয়াংলিনের বউ, কিন্তু আগের চেয়ে ভিন্ন স্বরে। এবং তারা কথা বললেও তাদের ব্যবহার আলাদা। এতে তার খারাপ লাগে না। শুধু উদাস নয়নে সকলকে এ কাহিনী বলে। যা দিনে-রাতে কখনোই তার মন থেকে মুছে যায় না।

সে বলতে শুরু করে: "আমি সত্যি একটা বোকা, সত্যিই ...... আমি শুধু জানতাম বরফ পড়ার সময় গুহায় খাবার থাকে না বলে বুনো পশুরা গ্রামে আসে। আমি জানতাম না এগুলো বসন্তেও আসে। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে আমি দরজা খুলে দেই। এক ঝুড়ি মটরশুঁটি দিয়ে চৌকাঠের কাছে বসিয়ে আমাও'কে খোসা ছড়াতে বলি। সে খুব শান্ত ছেলে এবং যা বলেছি সবসময় তা করেছে; সে বাইরে যায়। তারপর বাড়ীর পেছনে গিয়ে কাঠ কাটি, চাল ধুয়ে আনি। চাল যখন চুলোর ওপর তখন মটরশুঁটি সেদ্ধ করার জন্য আমাও'কে ডাকি। কিন্তু কোন জবাব নেই। বাইরে খুঁজতে গিয়ে দেখি মাটিতে ছড়িয়ে আছে মটরশুঁটি, কিন্তু আমাও নেই। সে খেলবার জন্য কখনো কারো বাড়ীতে যায় নি। যেখানেই তার খোঁজে গিয়েছি, কোথাও তার দেখা মেলে নি। পাগল

হয়ে ছেলের জন্য সকলের হাতে পায়ে ধরতে থাকি। সর্বত্র খোঁজাখুঁজির পর সন্ধ্যায় সবাই পাহাড়ে খুঁজতে যায়। কাঁটা ঝোপে আটকে আছে আমাওয়ের এক পাটি ছোট্ট জুতো। সবাই বলে: 'সর্বনাশ, তাকে নিশ্চয় নেকড়ে খেয়েছে।' একটু এগিয়ে সবাই দেখতে পায় তার হাড়গোড় পড়ে আছে নেকড়ের গুহায়। তখনো ছোট্টহাতে শক্তভাবে ধরা আছে সেই ঝুড়ি। . . . . ." তার পরেই সে কাঁদতে শুরু করে এবং তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

এ কাহিনী আবেগময়। পুরুষরা শুনে হাসি বন্ধ করে বিষন্নভাবে চলে যায়। মহিলারা শুনে শুধু তার অপরাধই ক্ষমা করে না, সেই দুঃখে মুখে বিদ্রূপাত্মক ভাব সরিয়ে কাঁদতেও শুরু করে। কিছু কিছু বুড়ী যারা রাস্তায় তার কাহিনী শোনেনি, তার দুঃখের কাহিনী শুনতে তার খোঁজ করে। যখন তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, সে কাঁদতে শুরু করে তখন তাদেরও চোখের কোণে জমা জল পড়তে থাকে। তার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সন্তুষ্ট হয়ে মন্তব্য করতে করতে চলে যায়।

নিজের দুঃখের কাহিনী বার বার বলতে তার ভালো লাগে। প্রায়ই তিন চার জন জড়ো হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই এ কাহিনী সকলের মুখস্থ হয়ে যায়। এমনকি বুদ্ধের ভয়ে ভীত বুড়ীদের চোখেও একফোটা জল দেখা যেত না। শেষ পর্যন্ত, সবাই তার কাহিনী মুখস্থ বলতে পারত। তাই সে কথা বলতে শুরু করলেই তারা বিরক্ত এবং উত্যক্ত বোধ করত।

সে বলত: "আমি সত্যিই বোকা, সত্যিই . . . . . ."

"তুমি শুধু জানতে বরফ পড়ার সময় পাহাড়ে খাবার কিছু থাকেনা বলে বুনো পশুরা গ্রামে নেমে আসে।" এই বলে তারা তাকে থামিয়ে দিত এবং চলে যেত।

সে সেখানে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। তার পর চলে যেত, যেন সেও মুষড়ে পড়েছে। কিন্তু এ চিন্তা তার মাথায় বার বার ঘুরে আসত। ছোট্ট ঝুড়ি, মটরশুঁটি, লোকজনের ছেলেমেয়ে দেখলেই সে আমাওয়ের গল্প বলতে শুরু করত। দু তিন বছরের বাচ্চাকে দেখলেই সে বলত: "আহা, আমার আমাও যদি আজ বেঁচে থাকত, তাহলে সেও এতো বড় হত . . . . . ."

ছেলেমেয়েরা তার চোখ দেখে ভয় পেত এবং মায়েদের আঁচল টেনে ধরে বাড়ীতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করত। তার পর সে সেখানে একা দাঁড়িয়ে থাকত এবং হতাশ হয়ে হেঁটে চলে যেত। শেষ পর্যন্ত সবাই জেনে যায় তার ব্যাপারটা কি। শুধু একটা ছেলে উপস্থিত থেকে একটু হেসে বললেই হত "সিয়াংলিনের বউ তোমার আমাও বেঁচে থাকলে কি সে এত বড় হত না?"

সে বোধ হয় বুঝতে পারেনি বার বার বলার পর লোকজনের কাছে তার কাহিনী পুরনো হয়ে গেছে, শুধু ঘৃণা ও বিরক্তি বাড়ায়। লোকজন যেভাবে হাসত তাতে সে বুঝতে পারত তাদের কোন আগ্রহ নেই এবং তারও এ গল্প বলার আর প্রয়োজন নেই। সে শুধু তাদের দিকে তাকিয়ে থাকত একটা কথাও বলত না।

লুযেনের লোকজন জাঁকজমকের সঙ্গে নববর্ষ উদ্‌যাপন করে। ২০শে ডিসেম্বর থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়। সে বছর চাচার বাড়ীতে অস্থায়ীভাবে এক চাকর নিয়োগ করা হয়। তার পরেও কাজ থাকায় চাকরানী হিসেবে আসে লিউ-মা। হাঁস-মুরগী জবাই করতে হবে, কিন্তু লিউমা নিরামিষাশী। মাছমাংস ছোঁবে না, হাঁস-মুরগী জবাই করবে না, শুধু থালাবাসন ধুতে পারবে। চুলোর আগুন দেয়া ছাড়া সিয়াংলিনের বউয়ের অন্য কোন কাজ নেই। সে বসে বসে লিউমা'র থালাবাসন ধোয়া দেখে। হাল্কা বরফ পড়তে থাকে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে হাই তুলে সিয়াংলিনের বউ বলতে শুরু করে। যেন নিজের কাছেই বলছে : "আমি সত্যিই বোকা ছিলাম।"

অধৈর্য হয়ে তাকিয়ে লিউমা বলে : "সিয়াংলিনের বউ, তুমি আবার শুরু করেছ। জিজ্ঞেস করি তোমার কপালের এই কাটা দাগ, ওটা কি ঐ সময়ের নয়?"

সে অস্পষ্ট জবাব দেয় : "অ্যা, হ্যাঁ।"

"বলি, রাজী হলে কেমন করে?"

"আমি?"

"হ্যাঁ। আমি মনে করি তোমার নিশ্চয়ই মত ছিল, না হলে......"

"ওহ, তুমি জান না সে কত শক্তিশালী ছিল।"

"আমি বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি না, সে এত শক্তিশালী ছিল যে তুমি তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পার নি। তোমার নিশ্চয়ই মত ছিল, আর এখন তার শক্তির অজুহাত দিচ্ছ।"

"ওহ...... একবার চেষ্টা করে দেখ, তাহলে দেখবে।" সে হেসে ওঠে।

লিউমা'র ভাঁজপড়া মুখে হাসি ফোটে, দেখতে আখরোটের মত। তার বিচির মত চোখজোড়া সিয়াংলিনের বউয়ের কপাল থেকে চোখের ওপর এসে থামে। যেন অস্বস্তিতে পড়েছে, সিয়াংলিনের বউ সঙ্গে সঙ্গে হাসি বন্ধ করে দেয়, চোখজোড়া সরিয়ে নেয়। তাকিয়ে থাকে তুষার কণার দিকে।

লিউমা বলতে থাকে : "সিয়াংলিনের বউ, সেটা খুব খারাপ কাজ হয়েছে। যদি নিজেকে ধরে রাখতে অথবা মরে যেতে ভালো হত। দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে দু বছরের কম ঘর করে তুমি পাপিষ্ঠা হয়েছ। একবার ভেবে দেখ, পরলোকে

যখন দু'জনের ভূত তোমাকে নিয়ে ঝগড়া করবে তখন তুমি কার সঙ্গে যাবে? নরকের যম তখন বাধ্য হয়ে তোমাকে দু'টুকরো করে ওদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন। আমার মনে হয়, সত্যিই ...... "

তার চেহারায় ভয় ফুটে উঠে। একথা সে পাহাড়ে কখনো শোনেনি।

"আমার মনে হয় এই বিপদ এড়ানোর জন্য আগেভাগে তোমার কিছু ব্যবস্থা নেয়া উচিত। ভূমি দেবতার মন্দিরে গিয়ে নিজের নামে একটি চৌকাঠ কিনে দরজায় রেখে এস। হাজার হাজার লোক এই কাঠ মাড়িয়ে মন্দিরে প্রবেশ করবে। তাহলে তোমার পাপ মোচন হবে, পরলোকে আর কোন দুঃখ কষ্ট হবে না।"

সে সময় সিয়াংলিনের বউ কোন কথা বলেনি। কিন্তু সেটা মনে রেখেছে। কেননা পরদিন ঘুম থেকে ওঠার পর তার চোখের নীচে দেখা যায় কালো দাগ। নাস্তার পর সে গ্রামের পশ্চিম সীমানায় ভূমি দেবতার মন্দিরে যায় চৌকাঠ কিনতে। প্রথমে পুরোহিত রাজী হন নি। কিন্তু সিয়াংলিনের বউ কাঁদতে শুরু করলে তিনি ইচ্ছের বিরুদ্ধে রাজী হলেন। দাম হাঁকলেন বার টাকা।

সে অনেক আগেই লোকজনের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছে, কেননা আ-মাও'র গল্প সবাই ঘৃণা করে। কিন্তু লিউমা'র সঙ্গে তার কথাবার্তা সেদিন ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে তার ব্যাপারে নতুন করে উৎসাহ দেখায় এবং তাকে কথা বলাতে আসে। পুরো বিষয়টা এখন তার কপালের কাটা দাগ নিয়ে।

কেউ হয়ত একজন চেঁচিয়ে বলে: "সিয়াংলিনের বউ, বলি এত কিছুর পর রাজী হলে কি করে?"

আরেকজন তার কাটা দাগের দিকে তাকিয়ে বলবে: "দেখে দয়া হয়, শুধুশুধি ঐ আঘাতটা পেয়েছ।"

সম্ভবতঃ তাদের হাসি এবং গলার স্বরে সে বুঝতে পেরেছিল তারা তাকে নিয়ে মজা করছে। তাই টু শব্দ না করে তাদের দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকত। শেষ পর্যন্ত মাথাও ঘোরাত না। সারাদিন সে মুখ বন্ধ রাখে। তার কপালের কাটা দাগ সবাই লজ্জার বিষয় মনে করে। সে নীরবে বাজার করে, ঝাড়ু দেয়, তরি-তরকারী ধোয়, ভাত রাঁধে। প্রায় এক বছর পর সে চাচীর কাছ থেকে বেতনের জমা টাকা নিয়ে বার টাকায় পরিবর্তন করে। এবং ছুটি নিয়ে আবার গ্রামের পশ্চিম সীমানায় যায়। খাওয়ার চেয়েও কম সময়ে তৃপ্ত চিত্তে ফিরে আসে, চোখে মুখে অভাবনীয় প্রশান্তি। খুশী মনেই ভূমি দেবতার মন্দিরে চৌকাঠ কিনে দেয়ার কথা চাচীকে জানায়।

দক্ষিণায়নের দিকে পূর্বপুরুষদের স্মরণ করার সময় সে আগের চেয়েও বেশী কাজ করে। চাচীকে ভোগের থালাবাসন সাজাতে দেখে এবং আনিউ'র

সঙ্গে টেবিল টানতে দেখে সেও নিশ্চিত মনে মদের গ্লাস আর খাবারের কাঠি আনতে যায়।

চাচী চেঁচিয়ে ওঠে : "ওগুলো রেখে দাও, সিয়াংলিনের বউ।"

আগুনে ছ্যাঁকা খাওয়ার মত এক ঝটকায় সে হাত সরিয়ে নেয়, ফ্যাকাশে হয়ে যায় মুখ। মোমবাতি আনতে যাবার বদলে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে হতভম্ব হয়ে। ধূপ জ্বালাতে এসে চাচা সরে যেতে বললে শুধু তখনই সে বাইরে যায়। এই বার সে অনেকখানি বদলে যায়। পরদিন শুধু তার চোখ দুটোই বসে যায়নি মনোবলও সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যায়। অন্ধকার আর ছায়া দেখে নয়, লোকজন দেখেও সে ভয় পায়। এমনকি নিজের কর্তা ও গিন্নীকে দেখেও দিনের বেলায় গর্ত থেকে বের করা ইঁদুরের মত সে ভীতু হয়ে পড়ে। সারাদিন কাঠের পুতুলের মত বসে থাকতো। ছয় মাস যেতে না যেতেই তার চুল পেকে যায় এবং স্মৃতি এতো দুর্বল হয়ে যায় যে সে প্রায়ই কাজের কথা এমনকি ভাত ধোয়ার কথা ভুলে যেত।

"সিয়াংলিনের বউয়ের কি হয়েছে? তখন তাকে না রাখলেই ভালো হত।" কখনো কখনো তার সামনে এসব বলে চাচী তাকে হুঁশিয়ার করে দিতেন।

কিন্তু সে একইরকম থাকে। তার অবস্থা ভালো হবার কোন আশা থাকে না। শেষ পর্যন্ত তারা তাকে তাড়িয়ে দেয়া ঠিক করে এবং বুড়ী ওয়েই-এর কাছে চলে যেতে হবে। আমি লুযেনে থাকার সময় তারা শুধু এ নিয়ে কথা বলত। কিন্তু পরে যা ঘটেছে তাতে বোঝা যায় তারা এই কাজ করেছে। আমার চাচার বাড়ী থেকে যাবার পর সে ভিখারিণী হয়েছে না বুড়ী ওয়েই-এর কাছে যাবার পর ভিখারিণী হয়েছে, আমি জানি না।

কানের কাছে বাজী পোড়ানোর শব্দে জেগে ওঠি। চোখে পড়ে মটরশুঁটির মত বড় হলদে বাতির শিখা। চাচার বাড়ীতে ভোগের উৎসবের বাজী পোড়ানোর শব্দও কানে আসে। বুঝতে পারি ভোর হয়ে এসেছে। আমি বোকা বনে যাই। দূরে এলোমেলো বাজীর শব্দ আকাশে গোলমেলে মেঘের স্তূপের মত মনে হয়, যেন গোটা শহরকে ঢেকে দেয়ার জন্য তুষার কণার সঙ্গে মিলেছে। এই সব শব্দের ভেতরে, সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত যে সন্দেহ আমার মনে দানা বেঁধেছিল তা উৎসবের আনন্দে হারিয়ে যায়। মনে হয় স্বর্গ মর্ত্যের দেবতারা ভোগ ও ধূপ গ্রহণ করেছেন, এবং লুযেনবাসীদের অফুরন্ত সৌভাগ্য দেয়ার জন্য আকাশে বসে মাথা নাড়ছেন।

ফেব্রুয়ারী ৭, ১৯২৪

টীকা

1. ছিং রাজবংশের সর্বোচ্চ শিক্ষালয়।

2. খাং ইয়ৌওয়েই, বিখ্যাত সংস্কারক, তিনি সাংবিধানিক রাজতন্ত্রেব প্রবক্তা ছিলেন।

3. ছেন থুয়ান, দশম শতাব্দীর প্রথমদিককার নির্জনবাসী সন্ন্যাসী।

4. সম্রাট খাং সী-এর (১৬৬২-১৭২২) উদ্যোগে সংকলিত চীনা অভিধান। ১৬৬২-১৭২২ সাল পর্যন্ত রাজত্বকারী ছিং বংশীয় সম্রাট খাং সী-এর উদ্যোগে প্রণীত একটি চীনা অভিধান।

5. কনফুসিয়াসের গ্রন্থাবলী (রচনাবলী)।

6. কনফুসিয়াসের বাণী।

7. পুরনো চীনের গ্রামের নিয়ম অনুযায়ী এগার বার বছবের কিশোরের সঙ্গে যুবতী নারীব বিয়ে হত। যাতে শ্বশুর বাড়ীতে বউয়ের শ্রম ব্যবহার করা যায়।

8. চীনের পুরনো প্রথানুযায়ী জন্মের বাচ্চার বয়স এক বছর হিসেব করা হত এবং নববর্ষে তার বয়সের সঙ্গে এক বছর যোগ করা হত।

শুঁড়ীখানায়

উত্তর থেকে দক্ষিণপূর্বে যাওয়ার সময় আমি বাড়ী ও S শহর যাবার জন্য পথ পরিবর্তন করি। শহরটি আমার আদি শহর থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে এবং ডিঙি নৌকায় অর্ধেক দিনে পোঁছে যাওয়া যায়। এখানে একটি স্কুলে প্রায় একবছরের মত মাষ্টারী করেছি। বরফের পর শীতের তীব্রতায় প্রকৃতি এখন ধূসর। আলসেমি আর মন পোড়ানি থেকে কয়েকদিন আমি S শহরের "লুওসি" সরাইখানায় থাকি। আগে সেটা এখানে ছিল না। শহরটি ছোট। পেয়ে যাব মনে করে পুরনো কয়েকজন সহকর্মীর খোঁজ করি। কিন্তু কেউ সেখানে ছিল না। অনেক আগেই তারা যার যার পথে চলে গেছে। স্কুলের সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখি স্কুলের নাম ও চেহারা বদলে গেছে, নিজেকে বিদেশীর মত মনে হয়। দু ঘণ্টার কম সময়ে সব উৎসাহ উবে যায় এবং আসার জন্য নিজেকে গাল দিতে থাকি।

আমি যে সরাইখানায় ছিলাম সেখানে ঘর ভাড়া নেয়া যায়, খাওয়া মেলে না। বাইরে থেকে খাবার আনানো যায়, কিন্তু মোটেও সুস্বাদু নয়, মাটির মত স্বাদ। জানালার বাইরে ময়লা, দাগওয়ালা দেয়ালে শেওলা পড়েছে। উপরে অসীম আকাশ সাদা, ফ্যাকাশে, এবং বিবর্ণ। উপরন্তু হাল্কা বরফ পড়তে শুরু করেছে। দুপুরের খাওয়াটা ভালো হয় নি। সময় কাটানোর মতও কিছু ছিল না। তাই অতীতের বহু চেনা শুঁড়ীখানা "এক ব্যারেল হাউজ"র কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে হোটেল থেকে খুব দূরে হবে না। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে শুঁড়ী-খানার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি। আসলে একঘেয়েমি কাটাতে চেয়েছিলাম। মদ পান করতে চাই নি। "এক ব্যারেল হাউজ" তখনো সেখানে আছে। সরু, কারুকার্য খচিত সম্মুখভাগ, পুরনো সাইনবোর্ড বদল হয় নি। কিন্তু মালিক থেকে শুরু করে বেয়ারা পর্যন্ত এমন কেউ ছিল না যাকে আমি জানি — "এক

ব্যারেল হাউজও” পুরো বিদেশী বনে যাই। তবু ঘরের কোনায় বহু চেনা সিঁড়ি টপকে আমি ছোট্ট দোতলায় উঠে যাই। সেখানে সেই পাঁচটি কাঠের টেবিল তেমনি আছে। শুধু পেছনের জানালার আগে ছিল কাঠের জাফরি কাটা, এখন তার বদলে এসেছে কাঁচ।

“এক ক্যাটি হলদে মদ। খাবার? দশটুকরো ভাজা বিনকার্ড, সঙ্গে মরিচের ঝোল।”

আমার সঙ্গে ওপরে উঠে আসা বেয়ারাকে আদেশ দিয়ে পেছনে গিয়ে জানালার ধারে এক টেবিলে বসি। উপরতলায় কামরাটা একেবারে খালি। তাই সবচে ভালো সীটে বসে নীচের পরিত্যক্ত আঙ্গিনা দেখার সুযোগ হয়। সম্ভবতঃ আঙ্গিনাটি শুঁড়ীখানার নয়। অতীতে বহুবার এর দিকে তাকিয়েছি, কখনো কখনো বরফ পড়ার সময়। এখন উত্তরের দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত চোখের কাছে দৃশ্যটা অদ্ভুত ঠেকছে, কয়েকটি পুরনো প্লাম গাছ, বরফের প্রতিদ্বন্দ্বী। ফুলে ফুলে ভরে আছে, যেন শীতের কথা জানে না। প্রায় ভেঙ্গেপড়া প্যাভিলিয়নের পাটে দাঁড়িয়ে আছে একটি ক্যামেলিয়া। গাঢ় সবুজ গায়ে তার লাল ফুলের মেলা। বরফের ভেতর আগুনের মত জ্বলছে, যেন রাগী, বিক্ষুব্ধ, দর্শকের তৃষ্ণাকে অবজ্ঞা করছে। হঠাৎ এখানে স্তূপীকৃত বরফের স্যাঁৎসেঁতে কথা মনে পড়ে। চকচকে, জমাটবাধা, উত্তরের শুকনো বরফের মত নয়, যা হঠাৎ দমকা বাতাসে উড়তে শুরু করে এবং কুয়াশার মত আকাশ ঢেকে দেয়। ......

“স্যার. আপনার মদ ......” অসতর্কভাবে বলে কাপ, কাঠি, মদের পাত্র এবং খাবার নামিয়ে রাখে বেয়ারা। মদ এসে গেছে। আমি টেবিলের দিকে ঘুরে সবকিছু ঠিকঠাক করে কাপ ভর্তি করে নেই। মনে হল উত্তর অবশ্যই আমার বাড়ী নয়, তবু দক্ষিণে এসে নিজেকে বিদেশী হিসেবে গণ্য করতে পারি। সেখানে পাউডারের মত উড়ে যাওয়া বরফ, এখানে জমাটবাধা নরম বরফ দুটোই আমার কাছে অচেনা মনে হয়। বিষণ্ণ মনে, আলসে ভঙ্গীতে আমি এক চুমুক মদ পান করি। মদ একেবারে খাঁটি, ভাজা বিনকার্ড রান্নাও চমৎকার। একমাত্র দুর্ভাগ্য মরিচের ঝোল খুব হাল্কা, কিন্তু S শহর-এর লোকেরা কখনো এই তীব্র গন্ধ বুঝতে পারে নি।

বোধ হয় বিকেল বলে, শুঁড়ীখানার পরিবেশ ছিল না। তিন কাপ মদ পান করেছি। কিন্তু আমি ছাড়া সেখানে কাঠের মাত্র চারটি খালি টেবিল পড়ে আছে। পরিত্যক্ত আঙ্গিনার দিকে তাকিয়ে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হল, তবু অন্য কোন খদ্দের আসুক চাই নি। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে খুব অস্বস্তি লাগে, কিন্তু

বেয়ারাকে দেখতে পেয়ে সে ভাবটা কেটে যায়। তাই আরো দু'কাপ মদ পান করি।

ভাবি, "এবার নিশ্চয়ই খদ্দের," কেননা পায়ের শব্দ বেয়ারার চেয়ে অনেক মন্থর। যখন বুঝতে পারি সে সিঁড়ির শেষ মাথায় উঠে এসেছে তখন এই অনাহূত সঙ্গীকে দেখার জন্য মাথা তুলি। চমকে দাঁড়িয়ে যাই। আমি কখনো ভাবি নি সব জায়গা বাদ দিয়ে এখানে অপ্রত্যাশিতভাবে কোন বন্ধুর দেখা পাব —যদি সে এখনো আমাকে বন্ধু ডাকতে দেয়। নবাগত আমার পুরনো সহপাঠী, যখন শিক্ষক ছিলাম তখন সহকর্মী ছিল। অনেক খানি বদলে গেলেও তাকে দেখা মাত্রই চিনতে পারি। তার চলার গতি মন্থর হয়ে এসেছে, আগেকার চটপটে, তৎপর ল্যু ওয়েইফু-এর মত নয়।

"আহ —ওয়েইফু, তুমি? তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হওয়ার কথা কখনো ভাবিনি।"

"ওহ, তুমি? আমিও কখনো ভাবি নি......"

তাকে আমার সঙ্গেই বসতে বলি। একটু ইতস্তত: করে, মনে হল সে বসতে রাজী। প্রথমে ব্যাপারটা আমার কাছে খুব অবাক লেগেছে, তারপর দুঃখ পেয়েছি, রাগও হয়েছে। তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখি চুল দাড়ি আগের মত উসকো খুসকো, মুখ ফ্যাকাশে এবং আয়ত, কিন্তু সে আরো শুকিয়ে গেছে এবং দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাকে খুব শান্ত মনে হল অথবা সম্ভবত: উদ্যমহীন, কালো ভুরুর নীচে তার চোখ জোড়া সতর্কতা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু যখন সে ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত আঙ্গিনার দিকে তাকাল তখন তার চোখে হঠাৎ ভেসে উঠল সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যা স্কুলে বহুবার দেখেছি।

খুশীতে ও কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে আমি বললাম, "প্রায় দশবছর আমরা একে অপরকে দেখি নি। বহুদিন আগে শুনেছি তুমি জিনান-এ থাকতে কিন্তু এত আঁটকুড়ে ছিলাম যে কখনো লিখি নি......"

"আমারও একই অবস্থা। মা'র সঙ্গে আমি দুবছরের বেশী থাইইউয়ানে আছি। যখন তাকে নিতে এসেছি তখন শুনেছি তুমি চলে গেছ, চিরতরে।"

জিজ্ঞেস করলাম, "থাইইউয়ান-এ তুমি কি করছ?"

"এক দেশীর বাড়ীতে মাষ্টারী করছি।"

"এবং তার আগে?"

"তার আগে?" সে পকেট থেকে একটি সিগারেট বের করে, ধরিয়ে মুখে নিল। তার পর ধোঁয়ার দিকে তাকাতে তাকাতে চিন্তা করে বলল, "শুধু তুচ্ছ কাজ, কিছু না করার সমান।"

আরো জিজ্ঞেস করল দুজনের ছাড়াছাড়ির পর আমার কি হয়েছে! আমি তাকে মোটামুটি একটা ধারণা দেই, বেয়ারাকে ডেকে একটা কাপ ও কাঠি আনতে বলি যাতে সে আমার মদে ভাগ বসাতে পারে। সেই সঙ্গে আরো দু ক্যাটি মদ গরম করতে বলি। খাওয়ার অর্ডারও দেই। অতীতে আমরা কখনো ভদ্রতা দেখাই নি, কিন্তু এখন এত ভদ্রতা দেখানো শুরু হল যে কেউই কোন খাবার পছন্দ করবে না। শেষ পর্যন্ত বেয়ারার সুপারিশে চার ধরনের খাবার ঠিক হয় : মৌরি মসলা দেয়া মটর শুঁটি, ঠাণ্ডা মাংস, ভাজা বিনকার্ড এবং নোনা মাছ।

"ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারি আমি একটা বুদ্ধু!" একহাতে সিগারেট, অন্য হাতে মদের কাপ নিয়ে সে কষ্টের হাসি হেসে বলে, "যখন যুবক ছিলাম তখন মৌমাছি অথবা মাছির থেমে যাওয়া দেখেছি। ভয় পেলে উড়ে যায়, কিন্তু ছোটবৃত্তে একটু উড়ে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসে। আমি ভেবেছিলাম এটা খুবই বোকামি এবং করুণ। কিন্তু ভাবি নি আমি নিজে ফিরে আসব, শুধু ছোট একটা বৃত্তে ওড়ার পর। ভাবি নি তুমিও ফিরে আসবে। তুমি কি আর একটু উড়তে পারতে না?"

"সেটা বলা শক্ত। বোধ হয় আমিও শুধু ছোটবৃত্তে উড়েছি।" কষ্টের হাসি হেসে বললাম, "কিন্তু তুমি ফিরে এলে কেন?"

"খুব তুচ্ছ একটা কারণে।" এক চুমুকে মদের কাপ শেষ করে, সিগারেটে কয়েকটা টান দিল এবং চোখ আর একটু মেলল, "তুচ্ছ — কিন্তু তুমি সেটাও শুনতে পার।"

গরম গরম খাবার এবং মদ এনে টেবিলের ওপর রাখে বেয়ারা। ভাজা বিনকার্ডের ধোঁয়া ও সুবাসে পুরো দোতলা ভরে ওঠে, বাইরে বরফ পড়তে থাকে আরো তীব্রভাবে।

সে বলে চলে, "বোধ হয় তুমি জানতে, আমার একটা ছোটভাই তিন বছর বয়সের সময় মারা যায় এবং গ্রামেই তার কবর হয়। আমি পরিষ্কার মনে করতে পারি না সে দেখতে কেমন ছিল, কিন্তু মা'কে বলতে শুনেছি সে খুব আদরের সন্তান ছিল। এবং আমার খুব ভক্ত ছিল। এখনো তার কথা বলতে মায়ের চোখে জল আসে। এবার বসন্তে চাচাত ভাই আমাদের লেখে তার কবরের পাশে মাটি ধীরে ধীরে প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে, তার ভয় সহসাই সেটা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে, আমাদের এখনই কিছু একটা করা উচিত। একথা জানতে পেরেই মা খুব বিচলিত হয়ে পড়েন এবং কয়েকরাত ঘুমোতে পারেন নি — তুমি জান তিনি চিঠি পড়তে পারেন। কিন্তু আমি কি করতে পারি? আমার টাকা নেই, সময় নেই : করার কিছুই ছিল না।

"এখন নববর্ষের ছুটি উপলক্ষে দক্ষিণে আসতে পেরেছি, তার কবর সরানোর জন্য।" আর এক কাপ মদ শেষ করে সে জানালা দিয়ে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "উত্তরে কি কখনো এমন জিনিষ পাবে? গভীর বরফে ফুল, এবং বরফের নীচে তাজা মাটি। তাই পরশু আমি ছোট্ট একটি কফিন কিনি। আমার ধারণা মাটির নীচে যেটা আছে সেটা অনেক আগে পচে গেছে। তুলা ও বিছানা নিয়ে চারজন কামলা ভাড়া করি এবং কবর সরানোর জন্য গ্রামে যাই। হঠাৎ নিজেকে খুব সুখী মনে হয়, কবর খোঁড়ায় উদগ্রীব, যে ছোট্ট ভাই আমার ভক্ত ছিল তার মৃতদেহ দেখায় উদগ্রীব, সেটা ছিল আমার জন্য এক নতুন অনুভূতি। কবরে পৌঁছে দেখি মাত্র দু'ফুট দূরে নদীর জল এসে গেছে। গরীব গোরে দুবছর কোন মাটি দেয়া হয় নি, তাই ডুবে গেছে। বরফের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি চারজন কামলাকে বলি, 'ওটা খোঁড়।'

"আমি সত্যিই নিরীহ লোক। বুঝতে পারি সে মুহূর্তে আমার গলা ছিল একটু অস্বাভাবিক এবং সারাজীবনে এরকম একটা আদেশই আমি দিয়েছি। কিন্তু কামলাদের কাছে তা মোটেও অদ্ভুত মনে হয় নি এবং তারা খোঁড়ার কাজে লেগে যায়। তারা কফিনের কাছে পৌঁছতেই আমি একবার তাকিয়ে দেখি। সত্যি সত্যিই কফিনের কাঠ পচে গেছে শুধু কিছু কাঠের টুকরো পড়ে আছে। আমার বুকের ধুক ধুকানি বেড়ে যায় এবং ছোট্ট ভাইকে দেখার জন্য সতর্কতার সঙ্গে সেগুলো সরাই। অবাক হয়ে যাই। বিছানা, কাপড়চোপড়, হাড় কিছুই নেই! ভাবলাম 'সবকিছু পচে গেছে, কিন্তু শুনেছি চুল পচা সবচে কষ্টকর, বোধ হয় কিছু চুল আছে।' তাই সতর্কতার সঙ্গে মাটির দিকে তাকাই যেখানে বালিশ থাকার কথা, কিন্তু কিছুই নেই। সামান্যতম চিহ্নও নেই।"

হঠাৎ লক্ষ্য করি তার চোখের কোনা লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি এটা মদের প্রভাব। সে খুব সামান্যই খেয়েছে, কিন্তু একটানা মদ পান করে চলেছে। তাই সে এক ক্যাটিরও বেশী পান করেছে এবং তার দৃষ্টি ও অঙ্গভঙ্গি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে আমার চেনা ল্যু ওয়েইফু-এর মত। আমি বেয়ারাকে ডেকে আরো দু ক্যাটি মদ গরম করতে বলি। তার পর ফিরে মদের কাপ নিয়ে তার মুখোমুখি বসে নীরবে তার যা বলার তা শুনতে থাকি।

"আসলে এটা আবার সরানোর দরকার ছিল না। দরকার ছিল মাটি সমান করা, কফিন বিক্রী করা, তাহলেই ব্যাপারটা চুকে যেত। অবশ্য কফিন বিক্রী করার সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব বাধলেও, দাম খুব কম হলে যে দোকান থেকে কিনেছি তারা ফেরত নিত। এবং কমপক্ষে মদের জন্য কিছু পয়সা বাঁচাতে পারতাম।

কিন্তু তা করি নি। আমি তবু বিছানা পাতি, যেখানে তার মৃতদেহ ছিল সেখান থেকে কিছু মাটি নিয়ে তুলায় জড়াই, নতুন কফিনে রাখি। তার পর বাবাকে যেখানে কবর দেয়া হয়েছে সেই কবর স্থানে নিয়ে যাই এবং তাঁর পাশেই কবর দেই। কফিনের চারদিকে ইট দিয়েছি বলে কাজ তদারকের জন্য কাল প্রায় সারাদিন ব্যস্ত ছিলাম। এভাবেই বলতে পারি কাজটা শেষ, অন্ততঃপক্ষে মা'কে ধোকা দেয়া ও তাঁর মনকে শান্ত করার জন্য যথেষ্ট। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি এভাবেই আমার দিকে তাকাবে। এতখানি বদলে যাওয়ার জন্য কি তুমি আমাকে দোষ দাও? আমার এখনো মনে পড়ে সে সময়ের কথা যখন আমরা একসঙ্গে ভূমি দেবতার মন্দিরে যেতাম মূর্তির দাড়ি টেনে তোলার জন্য, কিভাবে এমনকি হাতাহাতি হওয়া পর্যন্ত আমরা চীনের বিপ্লবীকরণের প্রক্রিয়া নিয়ে সারাদিন আলোচনা করেছি। কিন্তু আমি এখন এমন, পাশ কাটাতে এবং আপোষ করতে রাজী। কখনো কখনো ভাবি: 'যদি পুরনো বন্ধুরা এখন আমাকে দেখত তা হলে বন্ধু হিসেবে স্বীকার করত না।' কিন্তু আমি এখন এধরণের।"

সে আরেকটি সিগারেট ধরায়।

"তোমার ভাব দেখে মনে হয় এখনো আমার ওপর আশা রাখ। স্বভাবতঃই আমি আগের চেয়ে অনেক অনুভূতিহীন, কিন্তু এখনো কিছু কিছু ব্যাপার বুঝতে পারি। এজন্যেই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করি, একই সঙ্গে অস্বস্তিও লাগে। ভয় হয়, এখনো আমার উপর আশা আছে এমন বন্ধুদের হতাশ করছি ......" সে থামে। সিগারেটে কয়েক টান দিয়ে ধীরে ধীরে বলতে থাকে, "মাত্র আজ, ঠিক এই 'এক ব্যারেল হাউজ' আসার আগে আমি তুচ্ছ একটা কাজ করেছি। তবু এটা করতে পেরে আমি খুশী। পূব সীমানায় আমার পুরনো প্রতিবেশীর নাম ছাংফু। সে ছিল মাঝি এবং তার মেয়ের নাম ছিল আশুন। সে সময় যখন আমার বাড়ীতে আসতে তখন তাকে দেখে থাকবে। নিশ্চয়ই চোখ পড়ে নি কেননা সে তখন খুব ছোট ছিল। বড় হতে হতে সে সুন্দরী হয় নি, সাধারণ গোলাকার মুখ এবং গায়ের চামড়া শুকনো। শুধু তার চোখজোড়া ছিল অস্বাভাবিক রকমের বড়, চোখের অক্ষিপক্ষ্ম খুব লম্বা এবং সাদাটে অংশ মেঘহীন রাতের আকাশের মত পরিষ্কার — মানে বাতাস না থাকলে উত্তরের মেঘহীন আকাশ যেমন। এখানে এতটা পরিষ্কার নয়। সে খুব কাজের ছিল। ছোটবেলায় মা'কে হারিয়েছে। তার কাজ ছিল ছোটভাই ও বোনকে দেখাশোনা করা, এবং বাপকেও তাকে শুশ্রূষা করতে হত। সবকিছুই সে ভালোভাবে করত। সে খুব হিসেবীও ছিল, তাই ধীরে ধীরে সংসারের অবস্থাও ফিরে আসে। এমন কোন প্রতিবেশী ছিল না যে তার প্রশংসা করত না, এমনকি ছাংফুও প্রায়ই তার প্রশংসা করত।

এবার যখন বেড়াতে বেরিয়েছি তখন তার কথা মায়ের মনে পড়ে — বুড়ো মানুষের স্মৃতি বড় টনটনে। তার মনে পড়ে একবার কাউকে মাথায় কৃত্রিম লাল ফুল পরতে দেখে আশুনেরও নিজের পরতে ইচ্ছে হয়েছিল। না পেয়ে সে সারারাত কাঁদে এবং বাপের মার খায়। এজন্যে দু বা তিন দিন তার চোখ ফোলা ও লাল ছিল। এ লাল ফুলগুলো অন্য প্রদেশের এবং S শহরে কেনা যায় না। তাই সে কখনো পাওয়ার আশা কেমন করে করে? এবার দক্ষিণে আসার সময় মা বলেছেন তার জন্য দুজোড়া কিনতে।

"একাজে জ্বালাতনের চেয়ে আমি বরং খুশীই হয়েছিলাম। আশুন এর জন্য কিছু একটা করতে পেরে আমি খুব খুশী হয়েছিলাম। পরশু বছর মা'কে নেয়ার জন্য আমি আসি। এবং একদিন ছাংফুকে বাড়ীতে পেয়ে তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেই। সে সাদা ময়দার পায়েস খাওয়ার জন্য আমাকে দাওয়াত করতে চায় এবং বলে এর সঙ্গে চিনি মিশিয়েছে। দেখ, যে মাঝির বাড়ীতে চিনি আছে সে নিশ্চয়ই গরীব নয় এবং নিশ্চয়ই ভালো খায়। গড়িমসি করে রাজী হই কিন্তু অনুরোধ করি যেন আমাকে সামান্য খেতে দেয়। সে বুঝতে পারে এবং আশুনকে বলে, 'এসব পণ্ডিতদের ক্ষিধে নেই। তুমি ছোট বাটি ব্যবহার করতে পার কিন্তু চিনি বেশী দেবে।' যাহোক যখন সে পায়েস তৈরী করে নিয়ে আসে দেখতে পাই বড় বাটি, যা সারাদিনের খাবার। এটা সত্য ছাংফু-এর বাটির তুলনায় এটাকে ছোটই দেখায়। সারাজীবনে আমি ময়দার পায়েস খাই নি। স্বাদ নিতে গিয়ে দেখি সত্যিই বিস্বাদ, যদিও খুব মিষ্টি। আমি অমনোযোগের সঙ্গে কয়েক বার খাই, তার পর ঠিক করি আর খাবনা। সে সময়েই চোখে পড়ে ঘরের কোনায় দূরে দাঁড়ানো আশুন। তারপর কাঠি রেখে দেওয়ার সাহস আমার আর নেই। তার মুখে ভয় ও আশার চিহ্ন — ভয় এইজন্যে যে রান্না খারাপ হয়েছে, আশা এই জন্যে যে তা আমাদের ভালো লাগবে। আমি বুঝতে পারি প্রায় সবটা পড়ে থাকলে সে হতাশ হবে, দুঃখ পাবে। তাই সাহসে ভর করে মুখ হা করে ভেতরে ঢেলে দেই, ঠিক ছাংফু-এর মত দ্রুত খাওয়া। তখনই কাউকে জোর করে খাওয়া-নোর কষ্ট বুঝতে পারি। আমার মনে পড়ে ছোটবেলায় গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে কৃমির ঔষধ খাওয়ার কথা। তখন এরকম কষ্ট হত।আমার কোন ক্ষোভ হয় নি। খালি বাটি নিতে এসে তার মুখের আধো হাসি আমার সব অস্বস্তি ভুলিয়ে দেয়। সে রাতে বদহজমের কারণে ভালোভাবে ঘুমোতে না পারলেও, দুঃস্বপ্ন দেখলেও কামনা করেছি তার জীবন সুখী হোক, তার ভালোর জন্য পৃথিবীটা বদলে যাক। এসব চিন্তা অতীতের স্বপ্নের অবশেষ। পরমুহূর্তে নিজে হেসে উঠি এবং তাড়াতাড়ি সেগুলো ভুলে যাই।

"আগে জানতাম না সে কৃত্রিম ফুলের জন্য মার খেয়েছে। কিন্তু মায়ের কাছে শুনতেই পায়েসের কথা মনে পড়ে এবং আমি অহেতুক মনোযোগী হয়ে উঠি। প্রথমে থাইইউয়ান শহরে খোঁজ করি, কিন্তু কোন দোকানে সেগুলো ছিল না। শুধু জিনান শহরে যাবার পর ......"

ক্যামেলিয়ার বাঁকানো ডাল থেকে বরফ ঝরে পড়ায় জানালার বাইরে একটা মর্মর শব্দ ওঠে। তারপর গাছের ডালগুলো সোজা হয়ে যায়। মোটা ও কালো পর্ণরাজি এবং রক্ত রাঙা ফুল আরো বেশী চোখে পড়ে। আকাশের রং আরো পরিষ্কার হয়ে যায়। বোধহয় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় ছোট্ট চড়ুই কিচির মিচির করতে থাকে। বরফ ঢাকা মাটিতে তাদের খাওয়ার কিছু নেই তাই হয়ত তাড়াতাড়ি নীড়ে ফিরে যাবে।

সে একমুহূর্ত জানালা দিয়ে তাকায়। ফিরে এক কাপ মদ পান করে। সিগারেটে কয়েকটি টান মারে। তারপর বলতে থাকে, "শুধু জিনান যাবার পর আমি কিছু কৃত্রিম ফুল কিনি। জানতাম না এ ধরণের ফুলের জন্যই সে মার খেয়েছে কিনা, কিন্তু এগুলোও ভেলভেটের তৈরী। জানতাম না তার গভীর না হাল্কা রং পছন্দ। তাই একগোছা লাল ও একগোছা গোলাপী ফুল কিনি এবং সবগুলো এখানে নিয়ে আসি।

"ঠিক আজ বিকেলে দুপুরের খাওয়ার পর পরই আমি ছাংফুকে দেখতে যাই। এজন্যেই এক দিন বেশী থেকেছি। তার বাড়ী সেখানে ঠিকই আছে, শুধু একটু অন্ধকার দেখাচ্ছে। অথবা সেটা শুধু কল্পনাও হতে পারে। তার ছেলে এবং দ্বিতীয় মেয়ে আযাও গেটে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনেই বড়ো হয়েছে। আযাও বোনের চেয়ে বেশ আলাদা এবং তাকে ফ্যাকাসে দেখায়। কিন্তু আমাকে তাদের বাড়ীর দিকে আসতে দেখেই দৌড়ে ভেতরে চলে যায়। ছোট্ট ছেলেকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি ছাংফু বাড়ীতে নেই। 'আর তোমার বড়দি?' সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ বড় হয়ে যায়, জানতে চায় কেন তার খোঁজ করছি। উপরন্তু তাকে খুব ক্ষিপ্ত মনে হয়, যেন আমাকে মারবে। ইতস্ততঃ করে সরে যাই। আজকাল আমি আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাই না ......

"আগের চেয়ে এখন লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে আমার কতখানি ভয় সে সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই। ভালোকরেই জানি আমি কত খানি অনাহূত, কেন জোর করে নিজেকে অন্যের ওপর চাপাব? কিন্তু এবার বুঝতে পারি আমার দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হবে। তাই একটু ভেবে তাদের বাড়ীর উল্টো দিকের লাকড়ির দোকানে যাই। দোকানীর মা বুড়ী ফা তখনো সেখানে আছে, এবং আমাকে চিনতে পারে। সে আমাকে দোকানের ভেতর বসতে

বলে। সামান্য কুশলাদির পর তাকে বলি কেন S শহরে ফিরে এসেছি এবং ছাংফুর খোঁজ করছি। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতেই আমার টনক নড়ে :

"'কি দুর্ভাগ্য, আপনার আনা ফুলগুলো পরার কপাল নেই আশুন-এর।'

"তারপর আমাকে সে পুরো ঘটনাটা বলে। বলে, 'বোধহয় গত বসন্তের কথা। আশুন শুকনো এবং মনমরা দেখাতে থাকে। তারপর প্রায়ই সে হঠাৎ হঠাৎ কেঁদে ওঠে এবং জিজ্ঞেস করলেও কিছু বলে না। কখনো কখনো সে সারারাত কাঁদত। শেষ পর্যন্ত ছাংফু মেজাজ হারিয়ে তাকে গাল দিত, বলত বিয়ের জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে পাগল হয়ে গেছে। হেমন্তে, প্রথমে তার ঠাণ্ডা লাগে, তারপর বিছানা নেয়। এরপর আর কখনো ওঠে নি। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে সে ছাংফুকে বলে, অনেক আগেই সে তার মায়ের মত হয়ে গেছে। প্রায়ই কাশির সঙ্গে রক্ত আসে এবং রাতের বেলা ঘাম হয়। সে এটা লুকিয়ে রাখে এই ভয়ে যে সে তার জন্য চিন্তা করবে। এক সন্ধ্যায় তার চাচা ছাংগেং এসে টাকা দাবী করে। — সে প্রায়ই তা করত। না দিলে সে হেসে বলত, "বড়াই করো না। তোমার মানুষটি আমার সমান নয়।" এটা তাকে বিচলিত করে। লজ্জায় সে জিজ্ঞেস করতে পারত না, শুধু কাঁদত। একথা জানা মাত্রই ছাংফু তাকে বলে তার হবু বর কত ভালো মানুষ; কিন্তু ততদিনে অনেক দেরী হয়ে গেছে। তাছাড়া সে তাকে বিশ্বেসও করত না। সে বলত, "ভালোই হয়েছে আমার এ দশা হয়েছে। এখন আর কিছুই যায় আসে না।"'

"বুড়ী আরো বলে, 'তার বর যদি ছাংগেং-এর মত এত ভালো না হয় তাহলে খুব দুঃখজনক ব্যাপার হবে। সে মুরগী চোরও হবে না, তাহলে কেমনতরো মানুষ হবে? কিন্তু যখন সে তার শেষকৃত্যে আসে তখন নিজের চোখে আমি তাকে দেখেছি, তার কাপড় চোপড় পরিষ্কার এবং সে খুব সুদর্শন। কাঁদতে কাঁদতে বলেছে বিয়ের জন্য এ কয়বছর নৌকায় অনেক কষ্ট করে সে পয়সা জমিয়েছে, কিন্তু এখন কনেই মরে গেছে। বোঝা যায় সে খুব ভালো মানুষ এবং ছাংগেং যা বলেছে সব মিথ্যা। দুঃখ হয় আশুন এমন একটা রাসকেল মিথ্যাবাদীকে বিশ্বাস করেছিল এবং বিনা কারণে মরেছে। কিন্তু আমরা কাউকে দোষ দিতে পারি না, এটা আশুন এর কপাল।'

"এই যেহেতু ঘটনা, তাই আমার কাজও ফুরিয়ে যায়। কিন্তু যে দু গোছা ফুল এনেছি তার কি হবে? সেগুলো আযাওকে দেয়ার জন্য তাকে বলি। এই আযাও আমাকে দেখা মাত্রই পালিয়ে যায়, যেন আমি নেকড়ে অথবা দৈত্য। আমি সত্যিই সেগুলো তাকে দিতে চাই নি। যাহোক, আমি সেগুলো তাকে দেই। মা'কে বলি আশুন সেগুলো পেয়ে খুশী হয়েছে এবং তাই হবে। এসব

তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে কে মাথা ঘামায়? যে কেউ কোনভাবে সেটা কাটাতে চায়। নববর্ষ কাটানোর পর আগের মতই কনফুসীয় মতবাদ পড়ানোর জন্য আমি ফিরে যাব।"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, "তুমি কি তা পড়াচ্ছ?"

"নিশ্চয়ই। তুমি কি ভেবেছিলে আমি ইংরেজী পড়াচ্ছি? প্রথমে আমার দু'জন ছাত্র ছিল, একজন পড়ত «গানের বই», অন্যজন«মেনসিয়াস»। সম্প্রতি একজন ছাত্রী পেয়েছি, যে «মেয়েদের নীতিমালা» পড়ছে। আমি এমনকি অংকও পড়াই না। এই নয় যে পড়াব না, কিন্তু তারা তা চায় না।"

"আমি সত্যি কখনো ভাবতে পারি নি তুমি এমন বই পড়াবে।"

"তাদের বাবা চায় তারা এগুলো পড়ুক। আমি বিদেশী, তাই সবকিছু আমার কাছে সমান। এসব তুচ্ছ ব্যাপারে কে মাথা ঘামায়? এসব বিষয়ে গুরুত্ব দেয়ার কোন দরকার নেই।"

তার মুখ এত লাল হয়ে উঠেছে যেন সে যথেষ্ট মাতাল, কিন্তু তার চোখের সে দীপ্তি আর নেই। আমার হাই উঠল, কিন্তু কিছুক্ষণ বলার কিছুই পেলাম না। কয়েকজন খদ্দের ওঠার সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল। প্রথম জন বেঁটে, গোলগাল ও ফোলা মুখ, দ্বিতীয় জন লম্বা, লাল নাক। তাদের পেছনে আছে আরো কয়েকজন। তারা আসার সময় পুরো দোতলা নড়ে ওঠে। ল্যু ওয়েইফু-র দিকে তাকাই, তার চোখ আমাকেই খুঁজছে। তারপর বেয়ারাকে বললাম বিল আনতে।

যাবার জন্য তৈরী হতে হতে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার বেতন কি বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট?"

"মাসে পাই বিশ টাকা, যথেষ্ট নয়।"

"ভবিষ্যতে কি করতে চাও?"

"ভবিষ্যতে? আমি জানি না। শুধু একবার ভাব : অতীতে আমরা যেভাবে ভেবেছি সেভাবে কি কোন জিনিষ ঘটেছে? আমি কোন ব্যাপারে নিশ্চিত নই, এমনকি কাল কি করব সে ব্যাপারেও না, এমনকি পরমুহূর্তে কি করব সে ব্যাপারেও না......"

বেয়ারা বিল এনে আমাকেই দেয়। ল্যু ওয়েইফু আর আগের মত ভদ্রতা দেখাল না, শুধু আমার দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর সিগারেট পান করতে করতে আমাকেই বিল দেয়ার সুযোগ দিল।

শুঁড়ীখানা থেকে আমরা একসঙ্গে বেরিয়ে যাই। তার হোটেল আমার যাবার পথের উল্টো দিকে, তাই দরজায় আমরা বিদায় জানাই। হোটেলের দিকে

যেতে যেতে ঠাণ্ডা বাতাস এবং বরফ এসে মুখে লাগে। তবু নিজেকে বেশ সতেজ মনে হয়। আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে সাদা, ভেসে যাওয়া গভীর বরফের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার বাড়ী ও রাস্তা।

ফেব্রুয়ারী ১৬, ১৯২৪

সুখী পরিবার

—স্যু ছিনওয়েন এর রীতি অনুযায়ী

"......একজন যা ভাবে তাই লেখে : অনেকটা সূর্যালোকের মত, অফুরন্ত ঔজ্জ্বল্য থেকে উৎসারিত, লোহা বা পাথরে আঘাত করলে উৎসারিত স্ফুলিঙ্গের মত নয়। এটাই একমাত্র সত্যিকারের শিল্প। এ ধরণের লেখকই সত্যিকারের শিল্পী...... কিন্তু আমি...... আমি কোন পর্যায়ের?"

এ পর্যন্ত ভেবেই সে হঠাৎ বিছানা থেকে লাফিয়ে নামে। তার মনে হয় সংসার চালানোর জন্য লিখে অবশ্যই কিছু পয়সা রোজগার করা উচিত। ইতোমধ্যেই সে "সুখী মাসিক" মুদ্রাকরের কাছে পাণ্ডুলিপি পাঠানো ঠিক করেছে, কেননা সম্মানীর হার বেশ উচুঁ। কিন্তু সেক্ষেত্রে বিষয়বস্তু হবে সীমিত, না হলে লেখাই গৃহীত হবে না। ঠিক আছে সীমিতই হোক। 'ইয়াং জেনারেশনের' মনে কোন প্রশ্নটাগুলি সবচে বেশী স্থান দখল করে আছে? ......নিশ্চয়ই গুটিকয়েক নয়, হয়ত অনেকগুলো, প্রেম, বিয়ে, পরিবার সম্পর্কে...... নিশ্চয়ই বহু লোক এসব প্রশ্ন নিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে আছে, এমনকি এখন আলোচনাও করছে। তাহলে, পরিবার নিয়ে লেখা যাক! কিন্তু কিভাবে লেখা যায়? ...... অন্যথায় তা গৃহীত হবে না! কুলক্ষণে কিছু ভেবে লাভ কি? তবু......

বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে চার পাঁচ কদমে সে টেবিলের কাছে পৌঁছে যায়। বসে সবুজ লাইনওয়ালা কাগজ নিয়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে শিরোনামা লেখে: "সুখী পরিবার"।

সঙ্গে সঙ্গে তার কলম থেমে যায়। মাথা তুলে সে সিলিং-এর দিকে চোখ রাখে এবং এই সুখী পরিবারের জন্য একটা পরিবেশ ভাবার চিন্তা করে।

তার মনে হল "বেইজিং? তাতে হবে না। এটা খুব মৃত শহর, এমনকি আবহাওয়া পর্যন্ত। এমনকি এই পরিবারের চারদিকে উচুঁ দেয়াল তুললেও বাতাসকে ঠেকানো যাবে না। না, তাতে চলবে না। জিয়াংসু এবং যেজিয়াং যেকোন দিন যুদ্ধ শুরু করতে পারে, এবং ফুজিয়ান প্রশ্নের বাইরে। সিচুয়ান? গুয়াংডোং? এগুলোও যুদ্ধের ভেতর। শানডোং অথবা হোনান হলে কেমন হয়? ......না, এর যেকোন একটা অপহৃত হতে পারে, তাহলে সুখী পরিবার অসুখী হয়ে যাবে। শাংহাই এবং থিয়ানজিন-এর 'বিদেশী এলাকায়' ভাড়া খুব বেশী ......বিদেশে কোথাও? হাস্যকর। আমি জানি না ইয়ুন্নান এবং গুইযৌ কেমন, যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব দুর্বল ......"

সে মাথা ঘামাতে থাকে। ভালো জায়গার কথা চিন্তা করতে না পেরে মোটামুটি ঠিক করে A। যাহোক, তার পর সে ভাবে: আজকাল স্থান ও লোকের নামের বানানের ব্যাপারে ইংরেজী বর্ণমালা ব্যবহারে অনেকেই আপত্তি জানায়, কারণ তাতে পাঠকের উৎসাহ কমে যায়। বোধ হয় সুবিধের জন্য গল্পে এবার তা ব্যবহার না করাই ভালো। তা হলে কোনটা ভালো জায়গা হবে? হুনানেও যুদ্ধ চলছে, ডালিয়ানে আবার ভাড়া বেড়েছে। শুনেছি ছাহার, জিলিন এবং হেইলোং-জিয়াং-এ রাহাজানি হয়, তাহলে তাতেও চলবে না ......"

আরেকটি ভালো জায়গার জন্য সে আবার মাথা ঘামাতে থাকে, কিন্তু কোন লাভ হয় না। তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক করে A হবে সেই জায়গা যেখানে তার সুখী পরিবার বাস করবে।

"যাহোক, এই সুখী পরিবারকে A -এই থাকতে হবে। এ নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। স্বভাবতঃই পরিবারে রয়েছে স্বামী ও স্ত্রী — কর্তা ও গিন্নী — যারা ভালোবেসে বিয়ে করেছে। তাদের বিয়ের কাবিননামায় চল্লিশটির বেশী শর্ত রয়েছে, তাই তাদের রয়েছে বিশেষ সমতা ও পূর্ণ স্বাধীনতা। উপরন্তু তারা দু'জনেই উচ্চ শিক্ষিত এবং 'সংস্কৃত এলিট' গোষ্ঠীর ......। জাপান ফেরতা ছাত্র আর ফ্যাশন নয়, তাই ধরা যাক তারা পশ্চিম ফেরতা ছাত্র। বাড়ীর কর্তা সবসময় বিদেশী স্যুট পরে, তার কলার বরফের মত সাদা। তার স্ত্রীর চুল সামনের দিকে চড়ুই-এর বাসার মত কোঁকড়ানো, তার মুক্তার মত সাদা দাঁত সবসময় উঁকি মারে, কিন্তু সে চীনা পোশাক পরে ......"

"তাতে হবে না, তাতে হবে না! পঁচিশ ক্যাটি!" জানালার বাইরে পুরুষের গলা শুনতে পেয়ে সে অনিচ্ছাভরে তাকায়। জানালার পর্দা দিয়ে আসা সূর্যের আলো তার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, শুনতে পায় লাকড়ির বোঝা ফেলার শব্দ। আবার ফিরে সে ভাবে, "এতে কিছু যায় আসে না। 'পঁচিশ ক্যাটি', কিসের?

— তারা 'সংস্কৃত এলিট', শিল্পের জন্য নিবেদিত। যেহেতু তারা উভয়েই সুখী পরিবেশে গড়ে উঠেছে তাই রুশীয় উপন্যাস পছন্দ করে না। অধিকাংশ রুশীয় উপন্যাসে নীচু শ্রেণীর বর্ণনা, তাই সেগুলো এমন পরিবারের উপযুক্ত নয়। 'পঁচিশ ক্যাটি?' কুছ পরোয়া নেই। তাহলে তারা কি ধরণের বই পড়ে? — বায়রণের কবিতা? কীটস? তাতে চলবে না, কোনটাই নিরাপদ নয় — আহ, পেয়েছি! তাদের দু'জনেই পড়তে পছন্দ করে «আদর্শ স্বামী»। যদিও নিজেও এবই পড়িনি, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা এই বইয়ের এত প্রশংসা করে যে আমি নিশ্চিত এই দম্পতিও তা উপভোগ করে। এবই তুমি পড়, আমি পড়ি — তাদের প্রত্যেকের এক কপি বই আছে, পরিবারে সর্বমোট দু কপি বই . . . . . ."

পেটের ভেতর শূন্যতা বোধ করতেই সে কলম রেখে দেয়। হাতের ওপর মাথা রাখে, অক্ষধুরার উপর দাঁড়ানো ভূমণ্ডলের মত।

সে ভাবে, ". . . . . . তাদের দু'জন মাত্র দুপুরের খাওয়া খাচ্ছে। তুষার শুভ্র কাপড়ে টেবিল ঢাকা, বাবুর্চি খাওয়া নিয়ে আসছে — চীনা খাবার। 'পঁচিশ ক্যাটি' কিসের? কুছ পরোয়া নেই। চীনা খাবার হবে কেন? পশ্চিমারা বলে চীনা খাবার সবচে প্রগতিশীল, খেতে সবচে মজা, সবচে স্বাস্থ্যসম্মত; তাই তারা চীনা খাবার খায়। প্রথম বাটি আনা হয়েছে, কিন্তু এই প্রথম বাটিতে কি আছে? . . . . . ."

"লাকড়ী . . . . . ."

চমকে উঠে সে মাথা ঘুরায়। দেখতে পায় নিজের গিন্নী তার বাঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঘোলাটে চোখজোড়া তার মুখের ওপর।

"কি" সে ক্ষেপে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, বুঝতে পারে গিন্নী আসায় তার কাজের ক্ষতি হয়েছে।

"সব লাকড়ী শেষ, তাই আজকে আরো কিছু কিনেছি। গত বার পর্যন্ত দশ ক্যাটির দাম ছিল নগদ দু'শ চল্লিশ, কিন্তু আজকে সে দাবী করছে দু'শ ষাট। ধর যদি তাকে আড়াই'শ দেই?"

"ঠিক আছে, আড়াই'শ হোক।"

"সে ওজনে খুব ফাঁকি দিয়েছে। সে বলছে সাড়ে চব্বিশ ক্যাটি, কিন্তু ধর যদি আমি গুনি সাড়ে তেইশ?"

"ঠিক আছে। সাড়ে তেইশ ক্যাটি গোন।"

"তাহলে পাঁচে পাঁচে পঁচিশ, তিন পাঁচে পনেরো . . . . . ."

"ওহ, পাঁচে পাঁচে পঁচিশ, তিন পাঁচে পনেরো . . . . . ." সে আরো এগোতে

পারে না। একমুহূর্ত থেমে যে সবুজ লাইনওয়ালা কাগজে লিখেছিল "সুখী পরিবার" তাতে কলম দিয়ে অংক কষতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর বলার জন্য সে মাথা তোলে : "নগদ পাঁচ'শ আশি।"

"তাহলে আমার কাছে যথেষ্ট নেই। আরো আশি বা নব্বই কম......"

সে টেবিলের ড্রয়ার খুলে সমস্ত টাকা বের করে — বিশ এবং ত্রিশ তাম্রমুদ্রার মাঝামাঝি — তারপর গিন্নীর বাড়ানো হাতে তা দেয়। তারপর তাকে চলে যেতে দেখে এবং টেবিলে ফিরে বসে। যেন মাথার ভেতর লাকড়ি ঢুকেছে। পাঁচে পাঁচে পঁচিশ — যত্রতত্র আরবী সংখ্যা তার মগজে তখনো আটকে আছে। সে হাই তুলে আবার জোরে দম ফেলে, যেন এভাবে সে 'লাকড়ী' পাঁচে পাঁচে পঁচিশ, এবং মাথায় আটকে থাকা আরবী সংখ্যা দূর করে দিতে পারবে। দম ফেলার পর মনে হয় বুক একটু হাল্কা হয়েছে। তারপর সে আবার এলোমেলো ভাবতে থাকে :

"কোন ডিশ? যতক্ষণ উল্টো কিছু হবে, ততক্ষণ কিছু যায় আসে না। ভাজা শূয়রের মাংস অথবা চিংড়ি, সামুদ্রিক শসা খুব সাধারণ খাবার। আমি তাদের 'ড্রাগন ও বাঘ' খাওয়ানো উচিত। কিন্তু সেটা কি ঠিক? কেউ কেউ বলে এটা সাপ এবং বিড়ালের তৈরী, গুয়াংডোং-এর উঁচু শ্রেণীর খাবার। শুধু বিশেষ ভোজে খাওয়া হয়। এক জিয়াংসু রেস্তোরার খাবার তালিকায় এই নাম দেখেছি। জিয়াংসুর লোকজনের সাপ অথবা বিড়াল খাওয়ার কথা নয়। ঐ যে একজন বলেছে, এটা নিশ্চয়ই ব্যাঙ ও বান মাছের তৈরী। তা হলে এখন এই দম্পতি দেশের কোন অঞ্চলের হবে? কুছ পরোয়া নেই। দেশের যে কোন অঞ্চলের লোক তাদের সুখী পরিবারের ক্ষতি না করে সাপ ও বিড়াল ডিশ খেতে পারে (অথবা ব্যাঙ ও বান মাছের)। যেভাবেই হোক, প্রথম ডিশটা হতে হবে 'ড্রাগন এবং বাঘ' তাতে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

"এখন টেবিলের মাঝখানে রয়েছে এই 'ড্রাগন ও বাঘ' খাবারের পাত্র। তারা একসঙ্গে কাঠি তোলে, খাবারের দিকে তাক করে, একে অপরের দিকে মিষ্টি করে হাসে, বিদেশী ভাষায় বলতে থাকে :

" 'My dear, please.'

" 'Please you eat first, my dear.'

" 'oh no, please you !.'

"তারপর তারা একসঙ্গে কাঠি তোলে এবং একসঙ্গে সাপের একটুকরো মাংস তোলে — না, না, সাপের মাংস খুব অদ্ভুত শোনায়, বান মাছের টুকরো বলাই ভালো হবে। তা হলে, ঠিক হয়ে গেল 'ড্রাগন ও বাঘ' খাবার ব্যাঙ ও বান



"তাহলে আমার কাছে যথেষ্ট নেই।
আরো আশি বা নব্বই কম......"

মাছের তৈরী। তারা একসঙ্গে বান মাছের দু'টুকরো তুলে নেয়, ঠিক একই আয়তনের। পাঁচে পাঁচে পঁচিশ, তিন পাঁচে . . . . . . কুছ্ পরোয়া নেই। একই সঙ্গে তারা মুখে পোরে . . . . . .'' ইচ্ছের বিরুদ্ধে সে ঘুরতে চায় কেননা পেছনে সোরগোল ও আসা-যাওয়া সম্পর্কে সে সচেতন। সে ঘেমে ওঠে এবং চিন্তা করতে থাকে :

''এটা ভাবাবেগপূর্ণ মনে হচ্ছে। কোন পরিবার এভাবে ব্যবহার করবে না। কিসের জন্য আমার মন এত আনচান করছে? ভয় হয় এমন ভালো বিষয় কখনোই লেখা হবে না — অথবা বোধ হয় তাদের ফেরত্তা ছাত্র হবার প্রয়োজন নেই, যারা চীনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছে তারাও এমনি আচরণ করবে। তারা দু'জনেই বিশ্ববিদ্যালযের গ্রাজুয়েট, 'সংস্কৃত এলিট,' এলিট, ... লোকটি একজন লেখক, মহিলাও একজন লেখিকা অথবা সাহিত্য প্রেমিক। অথবা মহিলা একজন কবি, লোকটি কবিতা প্রেমিক, নারীত্বকে সম্মান করে। অথবা

শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না, ফিরে তাকায়।

তার পেছনে বইয়ের শেলফের পাশে বাঁধাকপির স্তূপ দেখা যাচ্ছে। নীচে তিনটা, তার উপর দুটো, সবচে উপরে একটা। অনেকটা ইংরেজী A -র মত।

''ওহ'' চমকে উঠে সে হাই তোলে। মনে হচ্ছে গাল পুড়ে যাচ্ছে, শিরদাঁড়ায় কাঁটা উঠা নামা করছে। ''আহ।'' শিরদাঁড়ায় কাঁটার অনুভূতি থেকে রেহাই পাবার জন্য সে বড় করে দম ফেলে, তারপর ভাবতে থাকে, ''সুখী পরিবারের বাড়ীতে অবশ্যই অনেক কামরা থাকতে হবে। গুদামে বাঁধাকপির মত জিনিষ রাখা হয়। কর্তার পড়ার ঘর আলাদা, দেয়াল জুড়ে বইয়ের শেলফ, স্বভাবতঃই সেখানে কোন বাঁধাকপি নেই। বইয়ের শেলফগুলো চীনা ও বিদেশী বইয়ে ভর্তি, অবশ্যই 'আদর্শ স্বামী' বইটিও আছে — সবমিলিয়ে দু কপি। শোবার ঘর আলাদা, ঘরে একটি তামার খাট বা প্রথম জেলের কয়েদীদের তৈরী একটি সাধারণ এলম কাঠের খাট হলেও চলবে। বিছানার নীচ খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন . . . . . .।'' সে নিজের বিছানার নীচে তাকায়। সব লাকড়ী শেষ, মরা সাপের মত পেঁচানো কিছু খড়ের দড়ি পড়ে আছে।

''সাড়ে তেইশ ক্যাটি। . . . . . .'' তার মনে হয় বিছানার নীচে লাকড়ীর অন্তহীন পাহাড় গড়ে উঠছে। তার মাথা আবার ব্যথা করে। সে উঠে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে যায় দরজা বন্ধ করার জন্য। দরজায় হাত রাখা মাত্র বুঝতে পারে বাড়াবাড়ি হচ্ছে। ধূলাভর্তি পর্দা টানতে গিয়ে সে ভাবে, ''এর সাহায্যে একজনকে বন্দী করা এড়ানো যায়, আবার দরজা খোলা রাখার অস্বস্তিও এড়ানো যায়।

এটা 'মধ্যপন্থার'[1] সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।"

"......তাহলে, কর্তার পড়ার ঘরের দরজা সবসময় বন্ধ থাকে।" সে ফিরে গিয়ে বসে ভাবতে থাকে, "যে কেউ কোন কাজে এলে অবশ্যই প্রথমে দরজায় আঘাত করবে, ভেতরে ঢোকার জন্য অনুমতি নেবে। এটাই একমাত্র কাজ যা করা উচিত। এখন ধরা যাক, কর্তা তাঁর পড়ার ঘরে বসে আছেন এবং সাহিত্য নিয়ে আলোচনার জন্য এলেন গিন্নী, তিনিও আঘাত করবেন...... অবশ্য একজন আশ্বস্ত হতে পারে — তিনি কোন বাঁধাকপি ভেতরে আনবেন না।

"'Come in, please, my dear.'

"সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য কর্তার সময় না থাকলে কি হবে? দরজার মৃদু আঘাত শুনে তিনি কি তাঁকে উপেক্ষা করবেন? তাতে বোধ হয় চলবে না। বোধ হয় এর সব কিছুই 'আদর্শ স্বামী' বইতে বলা আছে — সেটা নিশ্চয়ই চমৎকার উপন্যাস। এ লেখার টাকা পেলে আমাকে অবশ্যই ঐ বইয়ের একটি কপি কিনতে হবে পড়ার জন্য।"

চড়!

তার পিঠ শক্ত হয়ে যায়। অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে তাদের তিন বছরের মেয়ের মাথায় স্ত্রীর আঘাতের ফলেই এই শব্দ।

তার পিঠ তখনো শক্ত। মেয়ের ফোঁপানি শুনতে শুনতে সে ভাবে, "সুখী পরিবারে...... দেরীতে ছেলেমেয়ের জন্ম হয়। হ্যাঁ, দেরীতে। অথবা কোন ছেলেমেয়ে না থাকাই বোধ হয় ভালো হবে, বন্ধনহীন মাত্র দুজন — অথবা হোটেলে থাকাই বোধ হয় ভালো হবে, কোন কিছু ছাড়াই একজন লোক ......" মেয়ের ফোঁপানি বাড়ায় উঠে দাঁড়িয়ে পর্দা সরিয়ে সে ভাবে, "ছেলেমেয়েরা যখন চারপাশে কাঁদছে তখন 'পুঁজি' বইটি লিখেছিলেন কার্ল মার্কস। তিনি নিশ্চয়ই মহান লোক ......" সে বাইরে যায়। বাইরের দরজা খোলে এবং তার নাকে এসে লাগে প্যারাফিনের তীব্র গন্ধ। মুখ নীচু করে মেয়েটি দরোজার দক্ষিণে শুয়ে আছে। তাকে দেখতে পেয়েই সে আরো জোরে কাঁদতে থাকে।

"সেখানে, সেখানে সব ঠিক আছে। কেঁদো না, কেঁদো না। লক্ষী মেয়ে।" তাকে তোলার জন্য সে নীচু হয়।

এটা করে সে ঘুরে তাকিয়ে দেখে দরজার বাম পাশে তার ক্ষিপ্ত বউ দাঁড়িয়ে, তার পিঠও টান করা, হাতজোড়া নিতম্বের উপর, যেন ব্যায়াম করতে যাচ্ছে।

"তোমাকে এসেও আমাকে গাল দিতে হয়। তুমি কোন কাজ করো না,

শুধু ঝামেলা বাড়াও — এমনকি প্যারাফিন বাতিটিও উল্টে গেছে। আজ সন্ধ্যায় কি জ্বালাব? ......"

"সব, সব ঠিক আছে! কেঁদো না, কেঁদো না।" স্ত্রীর কাঁপা গলা উপেক্ষা করে সে মেয়েকে ঘরের ভেতর নিয়ে যায় এবং মাথায় হাত বুলাতে থাকে। সে আবার বলে, "লক্ষী মেয়ে।" তারপর সে তাকে নামিয়ে দেয়, একটি চেয়ার টানে এবং বসে পড়ে। পায়ের মাঝখানে তাকে রেখে সে হাত তোলে। বলে, "কেঁদো না, লক্ষী মেয়ে। বাবা তোমার জন্য 'বিড়াল' খেলবে।" একই সময়ে সে ঘাঁড় বাঁকায়, জিহ্বা বের করে দূর থেকে দুবার হাতের তালু চাটে, তার পর গোলাকারভাবে সেগুলো মুখের কাছে নিয়ে আসে।

"আহা! পুসি।" মেয়েটি হাসতে শুরু করে।

"এইত, এইত, পুসি।" সে আরো কয়েকবার হাত ঘোরায়, তার পর বন্ধ করে। চোখে জল নিয়ে মেয়েটি তখনো হাসছে। হঠাৎ তার মনে হয় তার মিষ্টি, নির্দোষ মুখ পাঁচ বছর আগে ঠিক তার মায়ের মুখের মত, বিশেষ করে তার উজ্জ্বল ঠোঁট জোড়া, যদিও সেগুলো আরো ছোট। সে এক উজ্জ্বল শীতের দিন যখন সে তার জন্য সব বাধা অতিক্রমের, সব কিছু বিসর্জনের সিদ্ধান্ত শুনতে পায়, চোখে জল নিয়ে হাসতে হাসতে সেও ঠিক এমনিভাবে তার দিকে তাকিয়ে ছিল । সে হতাশ হয়ে বসে পড়ে, যেন একটু নেশাগ্রস্ত।

ভাবে, "আহা, মিষ্টি ঠোঁট।"

হঠাৎ দরজার পর্দা সরে গিয়ে ভেতরে ঢোকানো হয় লাকড়ী।

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে এলে সে দেখতে পায় তখনো চোখে জল নিয়ে লাল ঠোঁট জোড়া ফাঁক করে মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে আছে। "ঠোঁট ......" সে পাশ কাটিয়ে তাকায় লাকড়ী কোথায় আনা হচ্ছে দেখার জন্য। "বোধ হয় এটা কিছু না, পাঁচে পাঁচে পঁচিশ, নয়-এ নয়-এ একাশি, সেই একই কথা! ...... এবং এক জোড়া বিষন্ন চোখ ......" একথা ভাবতে ভাবতে শিরোনাম ও সংখ্যা লেখা সবুজ লাইন দেয়া কাগজটি ছিনিয়ে নেয়, মুড়ে ফেলে, আবার খোলে মেয়ের নাক ও চোখ মুছে দেয়ার জন্য। "লক্ষী মেয়ে, গিয়ে নিজে নিজে খেলা কর।" বলতে বলতে সে তাকে সরিয়ে দেয় এবং কাগজের দলাটি আবর্জনার ঝুড়িতে ছুড়ে মারে।

তৎক্ষণাৎ মেয়ের জন্য তার দুঃখ হয়। তার চোখজোড়া চলে যাওয়া মেয়েটিকে অনুসরণ করে, কানে আসে লাকড়ীর শব্দ। মনোযোগ দেয়ার জন্য সে ফিরে চোখ বন্ধ করে, সকল এলোমেলো চিন্তা হটিয়ে দেয়ার জন্য, চুপচাপ ও শান্তভাবে সেখানে বসে থাকে।

দেখতে পায় একটি গোল, কালো বর্ডার দেয়া, মাঝখানে গোলাপী ফুল তার বাম চোখের বাম দিক থেকে ঠিক উল্টো দিকে গিয়ে হারিয়ে গেল, তার পর আসে মাঝখানে গভীর সবুজ ওয়ালা একটি উজ্জ্বল সবুজ ফুল, সবশেষে এক বোঝা বাঁধাকপি যেগুলো তার চোখের সামনে বিরাট ইংরেজী অক্ষর A -র মত ধরা দেয়।

ফেব্রুয়ারী ১৮, ১৯২৪

টীকা

1 কনফুসিয়াসের বাণী।

সাবান

পড়ন্ত আলোয় উত্তরের জানালার দিকে পিঠ দিয়ে আট বছরের মেয়ে সিউ-এরকে নিয়ে মৃতদের জন্য কাগুজে টাকা লাগাচ্ছিল সিমিং-এর বউ। তখনই সে শুনতে পায় কাপড়ের জুতো পায়ে কারো মন্থর ও ভারী পায়ের শব্দ। বুঝতে পারে স্বামী ফিরে এসেছে। কোন নজর না দিয়েই সে টাকা লাগাতে থাকে। কিন্তু কাপড়ের জুতোর শব্দ ক্রমেই কাছে আসতে থাকে, শেষ পর্যন্ত তার কাছে এসে থামে। তখন সে চোখের সামনে সিমিংকে না দেখে পারে না। ঘাড় কুঁজো করে জ্যাকেটের নীচে কাপড়ের গাউনের পকেটে সে এলোমেলো কি যেন হাতড়াচ্ছে।

আঁতিপাঁতি করে খোঁজার পর অবশেষে ছোট্ট আয়তাকার একটি প্যাকেট বের করে সে স্ত্রীর হাতে দেয়। নিতে নিতে একটা অচেনা গন্ধ তার নাকে লাগে, অনেকটা জলপাইয়ের মত। সবুজ মোড়কের ওপর ছোট্ট ছোট্ট নকশাওয়ালা একটি সোনালী সীল। নেয়ার জন্য ও দেখার জন্য সামনে এগিয়ে আসে সিউএর, কিন্তু দ্রুত তাকে সরিয়ে দেয় তার মা।

প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, "কেনাকাটা করছিলে?

"হ্যাঁ।" সে তার হাতের প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সবুজ মোড়কটি খোলা হয়। তার নীচে আর একটি খুব পাতলা কাগজ, সেটাও সবুজ। কাগজটা খুলে না ফেলা পর্যন্ত জিনিষটা চোখে পড়ে নি। চকচকে ও শক্ত, সবুজ, কিন্তু খুব সুন্দর নকশা করা। পাতলা কাগজটি ঘিয়ে রংয়ের। জল-পাইয়ের মত অথচ অজানা গন্ধটা আরো তীব্র হয়ে ওঠে।

"এটা সত্যিই খুব ভালো সাবান।"

সে সাবানটা ছোট্ট শিশুর মত তার নাকের কাছে তুলে ধরে এবং বলতে

বলতে শুঁকে দেখে।

"ওহ . . . . . . হ্যাঁ। ভবিষ্যতে শুধু এটা ব্যবহার করবে . . . . . ."

কথা বলার সময় বউ লক্ষ্য করে স্বামী তার ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। কখনো কখনো ঘাড় ঘষতে গিয়ে আঙুলে কর্কশ লেগেছে। জানে এটা বহুদিনের জমা ময়লা, কিন্তু কখনো তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। এখন চোখের সামনে এই অচেনা গন্ধের বিদেশী সবুজ সাবানের দিকে তাকিয়ে সে লজ্জায় লাল না হয়ে পারে না, লজ্জায় তার কানের লতি পর্যন্ত লাল হয়ে যায়। মনে মনে সে সন্ধ্যায় খাবারের পর এই সাবানটি দিয়ে ভালো করে গোসল করার কথা ঠিক করে।

নিজে নিজে বিড়বিড়িয়ে বলে : "কিছু কিছু জায়গা আছে যেগুলো রিঠা দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা যায় না।"

"মা, আমি ওটা নেই?" সবুজ কাগজের দিকে সিউএর হাত বাড়াতেই, বাইরে খেলা করা ছোট্ট মেয়ে যাওএর-ও দৌড়ে আসে। সিমিং-এর বউ জলদি তাদের সরিয়ে দেয়, ভাঁজ মত পাতলা কাগজটি ভাঁজ করে, আগের মতই সবুজ কাগজটি জড়ায়, তার পর ধোয়ামোছার স্ট্যাণ্ডের উপর সর্বোচ্চ তাকে রাখার জন্য ক্ষান্ত হয়। পুরো একবার তাকিয়ে সে কাগুজে টাকার দিকে ফেরে।

"স্যুয়েছেং!" মনে হয় সিমিং-এর কিছু একটা মনে পড়েছে। বউয়ের উল্টো দিকে উচঁ চেয়ারে বসে সে একটা লম্বা-ক্লান্ত শব্দ করে।

"স্যুয়েছেং!" বউ তাকে ডাকতে সাহায্য করে।

সে টাকা লাগানো বন্ধ করে, কিন্তু টু শব্দটি শুনতে পায় না। যখন দেখে স্বামী মাথা ঘুরিয়ে অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছে, তখন নিজেকে অপরাধী মনে হয়।

কর্কশ গলায় সমস্ত জোরে সে চীৎকার করে ওঠে : "স্যুয়েছেং!"

চীৎকারে কাজ হয়। তারা শুনতে পায় চামড়ার জুতোর শব্দ কাছে আসছে এবং স্যুয়েছেং তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার পরনে হাফপ্যাণ্ট, গোল মুখ ঘামে চিক চিক করছে।

সে রেগে জিজ্ঞেস করে : "কি করছিলে? বাবা ডাকছিল শুনতে পাও নি কেন?"

"আমি বাগুয়া (হেক্সিগ্রাম) বক্সিং চর্চা করছিলাম . . . . . ." সে সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বাবার দিকে তাকায়, যেন তার কি প্রয়োজন জিজ্ঞেস করতে চায়।

"স্যুয়েছেং, আমি তোমাকে এ-ডু-ফু-র অর্থ জিজ্ঞেস করতে চাই।"

"এ-ডু-ফু? ...... এর মানে কি ক্ষিপ্ত রমণী নয়?"

"যত্ত সব বাজে কথা। কি চিন্তা!" সিমিং হঠাৎ ক্ষেপে যায়। "আমি কি মহিলা প্রাণী?"

স্যুয়েছেং দু পা ঘুরে আগের চেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। যদিও কখনো কখনো বাবার হাঁটার ভঙ্গি তাকে বেইজিং অপেরার বুড়ো মানুষদের হাঁটার কথা মনে করিয়ে দেয়, সে কখনো সিমিংকে নারী হিসেবে গণ্য করে নি। এখন সে বুঝতে পারে তার জবাবটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে।

"যেন আমি জানি না 'এ-ডু-ফু'র অর্থ ক্ষিপ্ত রমণী। তোমাকে কি সেটা জিজ্ঞেস করতে হবে? তোমাকে বলছি এটা চীনা নয়, বিদেশী শয়তানদের ভাষা। তুমি জান এর অর্থ কি?"

"আমি ...... আমি জানি না।" স্যুয়েছেং আরো অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

"বাহ! এমন একটা ছোট্ট জিনিষ না জানলে এত টাকা পয়সা খরচ করে তোমাকে স্কুলে পাঠাচ্ছি কেন? তোমার স্কুল বড়াই করে যে তারা উচ্চারণ ও উপলব্ধিতে গুরুত্ব দেয়, তবু তারা তোমাকে কিছুই শেখায়নি। যে এই শয়তানের ভাষা বলে তার বয়স চৌদ্দ পনেরোর বেশী হবে না। তোমার চেয়ে সামান্য ছোট, তবু তারা এসব নিয়ে কথা বলে, আর তুমি আমাকে মানেটা পর্যন্ত বলতে পারনা। আবার মুখ ফুটে বলছ 'আমি জানি না।' এখনই গিয়ে আমার জন্য মানে জেনে দাও।"

"হ্যাঁ!" গলার ভেতর থেকে জবাব দেয় স্যুয়েছেং, তারপর সসম্ভ্রমে চলে যায়।

একটু বিরতি দিয়ে গদগদ কণ্ঠে সিমিং বলে: "বুঝি না, আজকাল ছাত্র-ছাত্রীরা কি করে? বলতে কি, গুয়াংস্যু-এর সময়ে আমি স্কুল খোলার পক্ষে ছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারি নি কত বড় পাজি হবে। আমরা কি ধরনের 'স্বাধীনতা' ও 'মুক্তি' পেয়েছি? সত্যিকারের লেখা পড়া উঠে গেছে, সব আজগুবি ব্যাপার। স্যুয়েছেং-র জন্য বেশ কিছু পয়সা খরচ করেছি, কিন্তু সব জলে গেছে। তাকে এই আধা-বিদেশী, আধা-চীনা স্কুলে পাঠাতে কম ঝামেলা হয় নি, যেখানে তারা ইংরেজী বলার ও বুঝার উপর গুরুত্ব দেয়। তুমি মনে করবে সব ঠিক হওয়া উচিত। কিন্তু — বাহ! — এক বছর পড়ার পর সে এ-ডু-ফু পর্যন্ত বুঝতে পারে না। সে নিশ্চয়ই এখনো পুরনো বই পড়ছে। বলি, এমন স্কুল দিয়ে কি লাভ? সবগুলো বন্ধ করে দাও।"

কাগুজে টাকা তৈরী করতে করতে বউ সহানুভূতির সঙ্গে বলে, "হ্যাঁ,

সবগুলো বন্ধ করে দেওয়াই ভালো।”

“সিউএর এবং তার বোনের স্কুলে যাবার দরকার নেই। নয় নম্বর দাদু বলেছেন, ‘মেয়েদের লেখাপড়া করে কি লাভ?’ যখন তিনি মেয়েদের স্কুলের বিরোধিতা করেছিলেন তখন আমি তাঁর সমালোচনা করেছিলাম, এখন বুঝতে পারি বুড়োদের কথাই ঠিক। ভেবে দেখ, কি রকম নোংরাভাবে মেয়েরা রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, এখন তারা চুলও কেটে ফেলতে চায়। (এই ছোট চুলওয়ালা স্কুলের ছাত্রীদের চেয়ে আর কোন কিছুই আমাকে এত বিরক্ত করে না)। বলি: সৈন্য এবং দুর্বৃত্তদের একটা ওজর আছে, কিন্তু এই মেয়েরা সবকিছুকে উল্টে দেয়। তাদের সত্যিই খুব কড়া শাসন দরকার......”

“হ্যাঁ, যেন পুরুষদের সন্ন্যাসী হলেই যথেষ্ট নয়, মেয়েদেরও সন্ন্যাসিনীর মত দেখাতে হবে।”

“স্যুয়েছেং!”

একটি বাঁধানো, ছোট্ট বই হাতে দৌড়ে আসে স্যুয়েছেং। বইটি বাবার হাতে দেয়।

এক জায়গায় দেখিয়ে বলে, “এটা দেখতে এমন। এখানে......”

সিমিং নিয়ে তা দেখে। সে জানে এটা অভিধান, কিন্তু অক্ষরগুলো খুব ছোট এবং অনুভূমিকভাবে ছাপানো। ভুরু কুঁচকে সে জানালার কাছে গিয়ে স্যুয়েছেং-এর দেখানো অধ্যায়টি পড়ার জন্য চোখ ঘোরায়।

“‘পারস্পরিক সাহায্যের জন্য ১৮ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা।’ — না, তা হতে পারে না — এটা উচ্চারণ করে কি ভাবে?” সে সামনে “শয়তানের” শব্দের দিকে নির্দেশ করে।

“অদ্ভুতলোক” (oddfellows)

“না, না, তা নয়।” সিমিং আবার হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে ফেলে। “আমি তোমাকে বলেছি এটা খারাপ ভাষা, এক ধরনের গালি, আমার মত কাউকে গাল দেয়ার জন্য। বুঝতে পার? গিয়ে দেখ।”

স্যুয়েছেং তার দিকে কয়েকবার তাকায়, কিন্তু নড়েনা।

“এটা ধাঁধার মত। সে এটার আগামাথা বের করবে কি করে? সে ভালোভাবে দেখার আগে তোমার সবকিছু তাকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয়া উচিত।” স্যুয়েছেং দোটানায় পড়েছে দেখে তার মায়ের খারাপ লাগে এবং ছেলের পক্ষ হয়ে সে হস্তক্ষেপ করে।

স্ত্রীর দিকে ফিরে সিমিং দীর্ঘশ্বাস ফেলে, “বড়ো রাস্তায় যখন গুয়াংরুনসিয়াং-এ সাবান কিনছিলাম তখন এটা ঘটে। তিনটি ছাত্রও তখন সেখানে কেনাকাটা

করছিল। তাদের কাছে হয়ত আমাকে খুঁৎখুঁতে মনে হয়েছে। আমি চল্লিশ পয়সার দামের বেশী পাঁচ ছয়টি সাবান দেখি, এবং সবগুলো ফিরিয়ে দিই। তারপর দশ পয়সা দামের একটি দেখি, কিন্তু সেটা খুব বাজে, একেবারেই গন্ধ নেই। গড়পড়তা হিসেব করতে গিয়ে ২৪ পয়সায় এই সবুজটা কেনাই ভাল মনে করি। দোকান-দার সেই উন্নাসিক যুবকদের একজন, যাদের চোখ কপালে, তাই সে কুত্তার মত মুখ লম্বা করে। সে সময় সেই হঠকারী ছাত্রগুলো একে অপরকে ইশারা করতে থাকে এবং শয়তানের ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। পয়সা দেয়ার আগে আমি সাবানটি খুলে দেখতে চেয়েছিলাম — কে জানে ঐ বিদেশী কাগজে মোড়া জিনিষ খারাপ না ভাল? কিন্তু সেই উন্নাসিক ছোকরা শুধু বারণ করেনি বরং খুব অযৌক্তিক, এমন কতগুলো কটু মন্তব্য করে যে ছাত্ররা হো হো করে হেসে ওঠে। দলের মধ্যে সবচে ছোটটি সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বলে এবং অন্যেরা হাসতে শুরু করে। কাজেই এটা নিশ্চয়ই কোন খারাপ শব্দ হবে।" সে স্যুয়েছেং-এর দিকে ফিরে তাকায়। "'খারাপ শব্দ' বিভাগে এটা খুঁজে দেখ।"

গলার ভেতর থেকে "হ্যাঁ" বলে স্যুয়েছেং বিনয়ের সঙ্গে চলে যায়।

"তবু তারা চীৎকার করে 'নতুন সংস্কৃতি! নতুন সংস্কৃতি।' যখন পৃথিবীর এই দশা। এটা কি যথেষ্ট খারাপ নয়?" ছাদের আড়ার দিকে তাকিয়ে সিমিং বলে চলে, "এইসব ছাত্রদের, সমাজের কোন নৈতিকতা নেই। কোন সমাধান বের করতে না পারলে চীন ধ্বংস হয়ে যাবে। তার অবস্থা কি করুণ ছিল ......

আনমনে খুব একটা গা না করে বউ জিজ্ঞেস করে "কি?"

"একটি মাতৃভক্ত কন্যা ......" তার চোখ ফিরে আসে বউয়ের ওপর, কণ্ঠে সমীহ ভাব, "বড় রাস্তায় দু'জন ভিখিরী ছিল। তাদের একজন একটি মেয়ে, আঠারো বা উনিশ বছর বয়স। আসলে এ বয়সে ভিক্ষে করা খুব খারাপ তবু সে ভিক্ষে করছে। তার সঙ্গে ছিল সত্তর বছরের এক বুড়ী, মাথার চুল সাদা এবং অন্ধ। তারা সেই কাপড়ের দোকানের ছাঁইচের নীচে ভিক্ষা করছিল এবং সবাই বলাবলি করছিল তার মাতৃভক্তি নিয়ে। বুড়ী তার দিদিমা। নিজে অভুক্ত থেকে যা কিছু মেয়েটি পেয়েছে দিদিমার হাতে তুলে দিয়েছে। তুমি কি মনে কর লোকজন এমন মাতৃভক্ত মেয়েকে ভিক্ষে দেবে?"

বুদ্ধি পরীক্ষা করার জন্য সে বউয়ের চোখের উপর নিজের চোখ রাখে।

বউ কোন জবাব দেয় না। বরং তার চোখের উপর চোখ রাখে, যেন আরো কিছু জানতে চায়।

সবশেষে সে নিজে নিজেই জবাব দেয়। "বাহ — না! আমি অনেকক্ষণ

ধরে দেখেছি এবং শুধু একজনকে একপয়সা দিতে দেখেছি। অনেকেই তাদের চারদিকে জড়ো হয়, শুধু ব্যঙ্গ করার জন্য। দু'জন ইতর লোক ছিল। একজন ধৃষ্টতা দেখিয়ে বলে: 'আফা! জিনিষের উপর ময়লা দেখে দমে যেও না। তুমি যদি দুটো সাবান কেন এবং তাকে ভালো করে মাজাঘষা কর, তাহলে খুব একটা খারাপ হবে না।' কথা বলার ভঙ্গি দেখ।"

বউ নাক দিয়ে জোরে শব্দ করে মাথা নামিয়ে ফেলে। কিছুক্ষণ পর অনেকটা আনমনেই জিজ্ঞেস করে, "তুমি কি তাকে কোন পয়সা দিয়েছো?"

"আমি? — না, দু'এক পয়সা দিতে আমার খুব লজ্জা করেছে। জান, সে সাধারণ ভিখিরিণী নয়......"

"হুম!" তাকে বলতে শেষ করতে না দিয়েই সে উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে রান্নাঘরে চলে যায়। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, খাবারের সময়ও হয়ে এসেছে।

সিমিংও উঠে দাঁড়ায় এবং উঠোনের দিকে হেঁটে যায়। বাইরে তখনো বেশ আলো। দেয়ালের কোণায় বাগুয়া (হেক্সিগ্রাম) বক্সিং চর্চা করছিল স্যুয়েছেং। এটা তার বাড়ীতে পড়াশোনা এবং একাজে সে দিনরাত্রির মাঝামাঝি একঘণ্টা সময় ব্যয় করে। প্রায় ছয়মাস ধরে বক্সিং চর্চা করছে স্যুয়েছেং। অনুমোদনের ভঙ্গীতে সিমিং ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, তারপর পেছনে হাত নিয়ে উঠোনে হাঁটতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠোনের একমাত্র চিরসবুজ গাছটি অন্ধকারে ঢেকে যায়, ছেঁড়াতুলার মত সাদা মেঘের ভেতর তারা মিটমিট করতে থাকে। রাত নেমেছে। সিমিং তার মেজাজ চেপে রাখতে পারেনা। তার ইচ্ছে হয় মহৎ কাজ করতে, খারাপ ছাত্র এবং দুষ্ট সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে। ধীরে ধীরে সে সাহসী হয়ে ওঠে, তার পদশব্দ দীর্ঘ হয় এবং জুতোর শব্দ ভারী হতে হতে খাঁচার ভেতর মুরগী ও তার বাচ্চাগুলোকে জাগিয়ে দেয়। সেগুলো ভয়ে কিচমিচ করে ওঠে।

ঘরের ভেতর আলো দেখা দেয়। অর্থাৎ সন্ধ্যাকালীন খাবার তৈরী। মাঝখানে টেবিলের চারদিকে জড়ো হয় পুরো পরিবার। টেবিলের একমাথায় বাতি, আর এক মাথায় বসে সিমিং। তার গোলাকার মুখ স্যুয়েছেং-এর মত, বাড়তি একজোড়া গোঁফ আছে। সবজি স্যুপের ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে তাকে মন্দিরের বিত্ত দেবতার মত দেখা যেতে থাকে। বাম দিকে বসেছে সিমিং-এর বউ এবং যাওএর এবং ডান দিকে বসেছে স্যুয়েছেং এবং সিউএর। বাটিতে কাঠির আঘাতে বৃষ্টির মত শব্দ হচ্ছে। কেউ টু শব্দ না করলেও, তাদের খাবার টেবিল খুব জীবন্ত মনে হয়।

যাওএর তার বাটি উল্টে ফেলে। টেবিলের অর্ধেক জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে স্যুপ।

যত বড় সম্ভব ছোট চোখ মেলে সিমিং। যখন বুঝতে পারে বেচারী কেঁদে ফেলবে তখন চোখ ফিরিয়ে নেয় এবং কাঠি দিয়ে বাঁধাকপি তুলে নেয়। কিন্তু সেটা উধাও হয়ে গেছে। ডানে বামে তাকিয়ে দেখে স্যুয়েছেং সেটা হাঁ করা মুখে পুরছে। হতাশ হয়ে সিমিং কিছু হলদে পাতা তুলে নেয়।

"স্যুয়েছেং।" সে ছেলের দিকে তাকায়। "তুমি কি সেই শব্দটা পেয়েছ না পাও নি?"

"কোন শব্দ? — না, এখনো পাই নি।"

"বাহ! নিজের দিকে দেখ। ভালো ছাত্রও নয়, কোন বুদ্ধিও নেই, শুধু খেতে জান! তোমার সেই মাতৃভক্ত মেয়ের কাছ থেকে শেখা উচিত — ভিখিরী হলেও, নিজে উপোষ করে হলেও সে তার দিদিমাকে খুব সম্মান করে। তোমরা উন্নাসিক ছাত্ররা এসবের কি জান? তোমরা ঐ ইতর লোকদের মত বড় হবে

"আমি একটা ব্যাপার ভেবে দেখেছি, কিন্তু জানি না সেটা ঠিক কিনা ...... আমার মনে হয় তারা হয়ত বলেছে 'oldfool'।"

"ওটাই ঠিক। একেবারে ঠিক। ঠিক এ রকম শব্দ ছিল: 'oldfool' তার অর্থ কি? তুমিও একই দলের, তুমি নিশ্চয়ই জান।"

"জানি? — আমি নিশ্চিত জানি না।"

"ননসেন্স। আমাকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা কর না। তোমরা সব পাজী।"

"বাজ পড়লেও এমন হয় না।" হঠাৎ ফেটে পড়ে সিমিং-এর বউ। "আজ তোমার মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে কেন? এমনকি খাবার সময়ও একজনের জন্য অন্যজনকে দায়ী করছ। এই বয়সের ছেলেরা কি বোঝে?"

"কি?" সিমিং পাল্টা জবাব দিতে যাচ্ছিল এমন সময় দেখতে পায় রাগে বউয়ের গাল কাঁপছে. রং বদলে গেছে এবং চোখে ভয়ের চিহ্ন। সে জলদি গলার স্বর পাল্টে ফেলে। "আমার মেজাজ বিগড়াচ্ছে না। আমি শুধু স্যুয়েছেংকে বলছি একটু বুদ্ধি রাখার জন্য।"

"সে বুঝবে কি করে তোমার মনে কি আছে?" তাকে আগের চেয়ে আরো রাগী দেখায়। "তার বুদ্ধি থাকলে আরো আগে বাতি জ্বালিয়ে বা টর্চ নিয়ে সেই মাতৃভক্ত মেয়েকে খুঁজতে যেত। তুমি তাকে একটা সাবান কিনে দিয়েছ, আর একটা কিনে দেয়া দরকার ......"

"ননসেন্স। ঐ ইতর লোকরাই এসব বলবে।"

"আমি অত নিশ্চিত নই। তুমি যদি তাকে আর একটা সাবান কিনে দিয়ে

ভালো করে ঘষামাজা কর, তারপর পুজো কর, তাহলে গোটা পৃথিবীতে শান্তি আসবে।"

"তুমি এমন কথা বল কি করে? এটার সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে? কারণ, আমার মনে পড়েছিল তোমার কোন সাবান নেই ......"

"ঠিক আছে একটা সম্পর্ক আছে। বিশেষ করে মাতৃভক্ত মেয়ের জন্য এটা কিনেছিলে। তাই গিয়ে ভালো করে ঘষামাজা কর। আমি এটা আশা করি না। আমি চাইনা। আমি তার গৌরবের ভাগী হতে চাই না।"

"সত্যিই, তুমি এমন কথা বল কি করে?" বিড়বিড় করে সিমিং। "তোমরা মেয়েরা ......" বাগুয়া (হেক্সিগ্রাম) বক্সিং-এর পর স্যুয়েছেং-এর মুখের মত তার মুখ দিয়ে ঘাম ঝরছে, বোধহয় খাবার খুব গরম ছিল।

"আমাদের মেয়েদের কি হয়েছে? আমরা মেয়েরা তোমরা পুরুষদের চেয়ে অনেক ভালো। তোমরা পুরুষরা আঠারো উনিশ বছরের ছাত্রীদের গাল দেও, আঠারো উনিশ বছরের ভিখিরিণীদের প্রশংসা কর, তোমাদের মন এত নোংরা। সত্যিই, ঘষামাজা। — বিরক্তিকর।"

"তুমি কি শোন নি? ঐ ইতরদের একজন একথা বলেছে।"

"সিমিং।" বাইরের অন্ধকার থেকে বজ্রকণ্ঠ ভেসে আসে।

"ডাওথোং? আমি আসছি।" সিমিং জানে, এটা উচুঁ গলার জন্য বিখ্যাত হো ডাওথোং। সদ্য ছাড়া পাওয়া অপরাধীর মত আনন্দে সে পাল্টা জবাব দিয়েছে।

"স্যুয়েছেং, জলদি করে বাতি জ্বালিয়ে হো কাকাকে লাইব্রেরীতে নিয়ে যাও।"

একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে ডাওথোংকে পশ্চিমের ঘরে নিয়ে যায় স্যুয়েছেং। তাদের পেছনে পেছনে আসে বু ওয়েইইউয়ান।

"আমি দুঃখিত, আমি তোমাদের স্বাগত জানাই নি। আমাকে মাফ করে দিও।" তখনো মুখ ভর্তি ভাত নিয়ে সিমিং উঠে গিয়ে মাথা নীচু করে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে স্বাগত জানায়। "তোমরা কি আমাদের সঙ্গে চারটে ডালভাত খাবে না? ......"

"আমরা খেয়েছি।" ওয়েইইউয়ান এগিয়ে এসে তাকে স্বাগত জানায়। "নৈতিক পুনরুজ্জীবন সাহিত্য লীগের অষ্টাদশ রচনা ও কবিতা প্রতিযোগিতার কারণে আমরা এখানে ছুটে এসেছি। আগামীকাল কি সতেরো তারিখ নয়?"

"কি? আজ কি ষোল তারিখ?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে সিমিং।

"দেখ, তোমার কেমন ভুলো-মন?"

"তাহলে আজকেই সংবাদপত্র অফিসে আমাদের কিছু পাঠাতে হবে, যাতে কাল তারা প্রকাশ করে।"

"আমি ইতোমধ্যে শিরোনামা ঠিক করেছি। দেখ, এতে চলবে কিনা।" বলতে বলতে রুমালের ভেতর থেকে একটুকরো কাগজ বের করে সিমিং-এর হাতে তুলে দেয় ডাওথোং।

সিমিং মোমবাতির দিকে এগিয়ে যায়। কাগজের ভাঁজ খোলে তার পর এক শব্দ এক শব্দ করে পড়ে :

"'প্রেসিডেণ্টের কাছে পুরো জাতির নামে আমরা বিনয়ের সঙ্গে একটি রচনা প্রস্তাব করছি, এই ঘুণেধরা পৃথিবী ও জাতীয় চরিত্র রক্ষা করার জন্য তিনি একটি আদেশ দেবেন কনফুসীয় মতবাদ বিকাশের এবং মেনসিয়াসের মায়ের পূজো করার জন্য।' খুব ভালো। খুব ভালো। একটু লম্বা হয়ে গেল না কি?"

"তাতে কিছু হবে না।" জোরে জবাব দেয় ডাওথোং, "আমি হিসেব করে দেখেছি বিজ্ঞাপনে খুব একটা খরচ হবে না। কিন্তু কবিতার নাম কি হবে?"

"কবিতার নাম?" সিমিং-এর হঠাৎ খুব সম্মানিত মনে হয়। "আমি একটা ভেবেছি। 'মাতৃভক্ত মেয়ে' কেমন হয়? এটা সত্য ঘটনা, তার প্রশংসা করা উচিত। আজ বড় রাস্তায় . . . . . ."

"না, না, তাতে হবে না।" দ্রুত হস্তক্ষেপ করে ওয়েইইউয়ান, সিমিংকে থামানোর জন্য হাত নাড়তে থাকে। "আমিও তাকে দেখেছি। কিন্তু সে এ এলাকার নয়। আমি তার কথা বুঝি নি, সেও আমার কথা বোঝে নি। আমি জানি না সে কোন এলাকার। সবাই বলে সে মাতৃভক্ত, কিন্তু যখন তাকে জিজ্ঞেস করি কবিতা লিখতে পারে কিনা, সে মাথা নাড়ে। লিখতে পারলে, খুব ভালো হত।"

"কিন্তু যেহেতু আনুগত্য এবং মাতৃভক্তি এত গুরুত্বপূর্ণ, তাই সে কবিতা লিখতে না পারলে খুব একটা যায় আসেনা।"

"সেটা ঠিক নয়। সম্পূর্ণ উল্টো।" হাততুলে সিমিং-এর দিকে দৌড়ে যায় ওয়েইইউয়ান ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। "সে যদি কবিতা লিখতে পারত তাহলে খুব মজা হত।"

"আমরা এই শিরোনামটাই ব্যবহার করি।" সিমিং তাকে সরিয়ে দেয়। "ব্যাখ্যা দিয়ে এটাই ছাপানো হোক। প্রথমতঃ এতে তার প্রশংসা করা হবে, দ্বিতীয়তঃ সমাজের সমালোচনায় এটা ব্যবহার করা যাবে। পৃথিবীর কি হচ্ছে? আমি অনেকক্ষণ দেখেছি, কাউকে দেখি নি তাকে একটি পয়সা দিতে — লোক-

জন বড় নির্দয়! . . . . . ."

"আহা, সিমিং!" ওয়েইইউয়ান আবার দৌড়ে আসে। "তুমি সন্ন্যাসীদের সামনে নেড়ামাথাকে গাল দিচ্ছ। আমি তাকে কিছু দেই নি কেননা তখন আমার কাছে কোন পয়সা ছিল না।"

"ওয়েইইউয়ান, এত স্পর্শকাতর হয়ো না।" সিমিং আবার তাকে পাশে সরিয়ে দেয়। "অবশ্য তুমি একটা ব্যতিক্রম। আমাকে শেষ করতে দাও। তাদের চারদিকে অনেক লোকজন ছিল, কেউ সম্মান দেখায় নি, শুধু বিদ্রূপ করেছে। আরো দু'জন ইতর ছিল, তারা আরো ধৃষ্ট। তাদের একজন বলে, 'আফা! তুমি যদি দুটো সাবান কিনে তাকে ভালো করে মাজাঘষা কর তাহলে ব্যাপারটা মন্দ হবে না। 'ভেবে দেখ . . . . . ."

"হা, হা! দুটো সাবান!" ডাওথোং হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়ে, তাদের কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। "সাবান কেন! হো, হো, হো!"

চমকে উঠে ভয় পেয়ে যায় . . . . . . "ডাওথোং! ডাওথোং! এত গোলমাল করো না!"

"ভালো মাজাঘষা! হো, হো, হো!"

"ডাওথোং।" সিমিংকে খুব কঠোর দেখায়। "আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করছি। তুমি এত গোলমাল করছ কেন, প্রায় সবার কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। আমার কথা শোন: আমরা দুটো শিরোনামই ব্যবহার করে সোজা সংবাদপত্র অফিসে পাঠিয়ে দেব, যাতে আগামীকাল অবশ্যই প্রকাশিত হয়। দুটোই নিয়ে যাবার জন্য তোমাদের কষ্ট করতে হবে।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। নিশ্চয়ই।" সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয় ওয়েইইউয়ান।

"হা, হা! ভালো মাজাঘষা! হো হো!"

ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে সিমিং, "ডাওথোং"।

চীৎকারে ডাওথোং-এর হাসি বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাখ্যা লেখার পর একটি কাগজে তা নকল করে ডাওথোংকে সঙ্গে নিয়ে খবরের কাগজের অফিসের জন্য বেরিয়ে পড়ে ওযেইইউয়ান। মোমবাতির আলোয় তাদের পথ দেখিয়ে দেয় সিমিং। তার পর ভয়ে ভয়ে হলঘরের দরজায় ফিরে আসে। একটু ইতস্ততঃ করে শেষ পর্যন্ত চৌকাঠ মাড়ায়। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে তার নজরে পড়ে টেবিলের মাঝখানে সাবানের ছোট্ট, সবুজ আয়তাকার প্যাকেট, বাতির আলোয় সুন্দর নকশাওয়ালা সোনালী লেখা চকচক করছে।

টেবিলের শেষ মাথায় মেঝের ওপর খেলছে সিউএর ও যাওএর। ডান দিকে বসে অভিধানে কিছু একটা দেখছে স্যুয়েছেং। সবশেষে, বাতি থেকে দূরে

ছায়ার ভেতর উচুঁ চেয়ারের ওপর বউকে দেখতে পায় সিমিং। তার অনুভূতিহীন মুখে আনন্দ বা ক্ষোভ নেই, সে কোন কিছুর দিকেও তাকিয়ে দেখছে না।

"সত্যি, ভালো মাজাঘষা! বিরক্তিকর!"

পেছনেই সিউএর-এর অস্পষ্ট গলা শুনতে পায় সিমিং। সে ফিরে তাকায়, কিন্তু সে নড়ছে না। শুধু যাওএর তার মুখের ওপর দুটি ছোট হাত চেপে ধরে যেন কাউকে লজ্জা দিচ্ছে।

এটা তার জায়গা নয়। ফু দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে পায়চারী করার জন্য সে উঠোনে আসে। সে শান্ত হবার কথা ভুলে গেছে তাই বাচ্চাওয়ালা মুরগীটি আবার কিচমিচ করতে থাকে। এক সময় ধীরে ধীরে হেঁটে সে আরো দূরে যায়। অনেকক্ষণ পর, হলঘরের বাতি সরে যায় শোবার ঘরে। মাটিতে চাঁদের আলো মনে হচ্ছে সূতোবিহীন কাপড় এবং উজ্জ্বল মেঘের ভেতর প্রায় পূর্ণ চাঁদটাকে মনে হচ্ছে যশমপাথরের থালা।

তার খারাপ লাগে। মাতৃভক্ত মেয়ের মতই তার নিজেকে মনে হয় "সম্পূর্ণ অবহেলিত এবং একা।" সে রাতে গভীর রাত পর্যন্ত সে ঘুমোতে পারে নি।

পরদিন ভোরের মধ্যে ব্যবহারের ফলে সাবানটির মর্যাদা বেড়ে যায়। অন্যান্য দিনের চেয়ে দেরীতে উঠে সে দেখতে পায় ধোয়ামোছার ষ্টাণ্ডে কাত হয়ে তার স্ত্রী ঘাড় পরিষ্কার করছে। বড় কাকড়ার বের করা বুদ্বুদের মত তার কানের দু'-পাশে বুদ্বুদ জমা হয়েছে। রিঠার ছোট্ট সাদা বুদ্বুদ এবং এই বুদ্বুদের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। এরপর থেকে সিমিং-এর বউয়ের গা থেকে সবসময় জলপাইয়ের মত একটি অচেনা গন্ধ আসতে থাকে। প্রায় ছয়মাস অন্য কোন গন্ধ পাওয়া যায় নি। যারা পেয়েছে, তাদের কাছে এটা চন্দনকাঠের গন্ধ মনে হয়েছে।

মার্চ ২২, ১৯২৪

'জনবিদ্বেষী'

১

ওয়েই লিয়ানশু এর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের ব্যাপারটা এখন ভাবতে গেলে খুব অবাক লাগে। শেষকৃত্য দিয়ে এর শুরু এবং শেষ।

' S ' শহরে থাকার সময় প্রায়ই শুনেছি সে অদ্ভুত লোক। প্রাণীবিদ্যা পড়ার পর হাইস্কুলে ইতিহাসের মাষ্টারী নেয়। অন্যদের সঙ্গে সে কাটখোট্টা ব্যবহার করত, কিন্তু তাদের ব্যাপারে নিজেকে জড়াতেও ভালবাসত। বলত পারিবারিক ব্যবস্থা উঠে যাওয়া উচিত, কিন্তু বেতন পেয়েই টাকাটা দিদিমার কাছে পাঠিয়ে দিত। শহরে গুজবের জন্ম দেয়ার মত তার অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। এক হেমন্তে আমি ওয়েই নামের কিছু আত্মীয়ের সঙ্গে হানশিশানে থাকি। তাদের সঙ্গে তার দূর আত্মীয় সম্পর্ক ছিল। অথচ তারা তাকে খুব সামান্যই বুঝত, এমনভাবে তার দিকে তাকাত যেন সে বিদেশী। বলত : "সে আমাদের মত নয়।"

এটা খুব অদ্ভুত ব্যাপার নয়। বিশ বছর ধরে চীনে আধুনিক স্কুল থাকলেও, হানশিশানে একটা প্রাইমারী স্কুল ছিল না। পড়াশোনার জন্য একমাত্র সেই সে পাহাড়ী গ্রাম ছেড়েছিল, তাই গ্রামবাসীদের চোখে সে ছিল নিঃসন্দেহে খেয়ালী। সে প্রচুর পয়সা বানিয়েছে এই বলে তারা তাকে হিংসেও করত।

হেমন্তের শেষদিকে মহামারী আকারে গ্রামে আমাশয় দেখা দেয়। ভয়ে আমি শহরে ফিরে যাবার কথা ভাবি। শুনেছিলাম তার দিদিমারও এই অসুখ হয়েছে এবং বয়সের কারণে তার অবস্থা মারাত্মক। উপরন্তু গ্রামে একজন ডাক্তারও ছিল না। দিদিমা ছাড়া ওয়েই'র কোন আত্মীয়স্বজন ছিল না, তিনি একটি চাকরানী নিয়ে সাধারণ জীবন যাপন করতেন। ছোটবেলায় এতিম হয়ে যাওয়ায়, দিদিমাই তাঁকে বড় করেন। আগে তার জীবন ছিল কষ্টের, কিন্তু

বর্তমানে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই কাটছিল। বউ, ছেলেমেয়ে না থাকায় তার পরিবার ছিল নির্ঝঞ্ঝাট, এবং সম্ভবতঃ এই কারণেও তাকে খেয়ালী মনে করা হত।

পায়ে হাঁটা পথে শহর থেকে গ্রামের দূরত্ব ছিল ত্রিশ মাইলের বেশী, এবং নৌপথে বিশ মাইলের বেশী। তাই ওয়েইকে আনতে চারদিন লাগবে। এ ধরণের উল্টো পথের গ্রামে এমন ঘটনা খুব বড়ো সংবাদ, সকলের মুখে মুখে ফেরে। পরদিন খবর আসে বুড়ীর অবস্থা খুব খারাপ এবং খবর দেয়ার জন্য লোক গেছে। যাহোক, ভোরের আগেই সে মারা যায়, তার শেষ কথা ছিল :

"নাতি আমার, তোমাকে কেন দেখতে দিলে না?"

শেষকৃত্যের সময়ে ওয়েই-এর ফিরে আসার প্রত্যাশায় গোষ্ঠীর বয়স্করা, নিকট আত্মীয়, দিদিমার পরিবারের লোকজন এবং অন্যেরা সেই কামরায় জড়ো হয়। কফিন এবং কাপড় সবকিছু আগেই ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় এই নাতিকে সামলানো নিয়ে। সবাই আশা করেছিল সে শবানুগমনের নিয়মকানুন বদলের দাবী করবে। আলাপ আলোচনার পর তারা তার জন্য অবশ্যপালনীয় তিনটি শর্ত ঠিক করে। প্রথমতঃ তাকে শোকের পোশাক পরতে হবে, দ্বিতীয়তঃ কফিনকে প্রণাম করতে হবে, তৃতীয়তঃ বৌদ্ধ ও তাও সন্ন্যাসীদের প্রার্থনা করতে দিতে হবে। সংক্ষেপে, পুরানো রীতি অনুযায়ী সব কিছু করতে হবে।

সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে, তারা ঠিক করে ওয়েই বাড়ী পৌঁছার সময় তারা সদলবলে উপস্থিত থাকবে, আপোষ যাতে না করতে হয় সেজন্যে আলোচনায় শক্তি জোগাতে। ঠোঁট চাটতে চাটতে গ্রামবাসীরা ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। "আধুনিক", "বিদেশী রীতিনীতির অনুসারী" হিসেবে ওয়েই সবসময় নিজেকে অযৌক্তিক প্রমাণ করেছে। ঝগড়া একটা বাঁধবেই, হয়ত মজার কিছু ঘটনাও ঘটতে পারে।

আমি শুনেছি সে বিকেলে বাড়ী ফিরে আসে। ঢোকার সময় দিদিমার চিতাকে প্রণাম করে। বুড়োরা সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোয়। তারা তাকে হলঘরে ডাকে, দীর্ঘ ভূমিকার পর মূল বিষয়ের অবতারণা করে। একবাক্যে কথা বলে তারা তাকে তর্ক করার সুযোগ দেয় নি। তাদের কথা শেষ হলে একটা গভীর নীরবতা নেমে আসে। ভয়ের সঙ্গে সব চোখ তাকিয়ে থাকে তার ঠোঁটের দিকে। কিন্তু অভিব্যক্তি না বদলে সে সোজা জবাব দেয় :

"ঠিক আছে।"

এটা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তাদের মন হাল্কা হয়ে যায়, কিন্তু হৃদয় আরো ভারী হয়ে ওঠে। কেননা উদ্বেগের জন্য ব্যাপারটা ছিল খুবই "খেয়ালী"। খবরের জন্য অপেক্ষাকারী গ্রামবাসীরা হতাশ হয়ে পড়ে। তারা বলাবলি করতে

থাকে, "অদ্ভুত ব্যাপার। সে বলেছে : 'ঠিক আছে।' চল, গিয়ে দেখি।" ওয়েই এর "ঠিক আছে" বলার অর্থ সব কিছু পুরানো রীতি অনুযায়ী হবে এবং তাতে দেখার কিছু নেই। তবু তারা দেখতে চায় এবং সন্ধ্যার পর পুরো হলঘর দুশ্চিন্তামুক্ত লোকের ভীড়ে ভরে যায়।

যারা গিয়েছে তাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। প্রথমে উপহার হিসেবে ধূপ এবং মোমবাতি পাঠিয়েছি। যখন পৌঁছি তখন সে মৃতের শরীরে কাফন পরাচ্ছে। তার গড়ন হাল্কাপাতলা, মুখটা চৌকোণা, এলোমেলো চুলের নীচে অনেকটা লুকানো কালো ভুরু এবং গোঁফ। তার কালো চোখ জ্বলজ্বল করছে। অভিজ্ঞ লোকের মত সে মৃতদেহ নড়াচড়া করে, লোকজনের চমক লেগে যায়। স্থানীয় নিয়ম অনুযায়ী একজন বিবাহিত মহিলার শেষকৃত্যে তার পরিবারের লোকজন সবকিছু ভালোভাবে হলেও খুঁত বের করবে; যাহোক সে চুপচাপ থাকে, অভিব্যক্তিহীন মুখে তাদের ইচ্ছে মেনে চলে। আমার সামনে দাঁড়ানো পাকাচুলের এক বুড়ী হিংসা ও সম্মানের সঙ্গে নিঃশ্বাস ফেলে।

লোকজন প্রণাম করে, তারপর বিলাপ করে। তাদের বিলাপের সময় মহিলারা কীর্তন গাইতে থাকে। কফিনের ভেতর মৃতদেহ রাখা হলে সবাই আবার প্রণাম করে, তারপর কফিনের ডালা না নামানো পর্যন্ত বিলাপ করে। এক-মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে আসে তারপর বিস্ময় ও অসন্তোষের গুঞ্জরণ ওঠে। আমিও হঠাৎ বুঝতে পারি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ওয়েই এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে নি। সে শুধু শোকাহতের মাদুরে বসে থাকে, তার কালো চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে।

এই বিস্ময় ও অসন্তোষের পরিবেশে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অসন্তুষ্ট শোকাহতরা চলে যেতে উদ্যত হয়, কিন্তু গভীর চিন্তায় মগ্ন ওয়েই তখনো মাদুরে বসে আছে। হঠাৎ তার চোখ দিয়ে জল পড়ে, তারপর সে নিঝুম রাতের ঊষর প্রান্তরে আহত নেকড়ের মত টানা বিলাপ শুরু করে, তার যন্ত্রণার সঙ্গে মিলে যায় ক্ষোভ এবং দুঃখ। এটা রীতির বাইরে তাই বিস্ময়ে আমরা হতবাক হয়ে যাই। একটু ইতস্ততঃ করার পর কেউ কেউ তাকে থামানোর চেষ্টা করে, ধীরে ধীরে লোক বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার চারদিকে একটা ভীড় জমে যায়। কিন্তু লোহার মূর্তির মত নিশ্চল সে সেখানে বসে বিলাপ করতে থাকে।

হতবুদ্ধি হয়ে লোকজন সরে পড়ে। প্রায় আধঘণ্টা বিলাপ করে ওয়েই হঠাৎ থামে। তারপর শোকাহতদের কাউকে কিছু না বলে সোজা ভেতরে চলে যায়। পরে খবর পাওয়া যায় সে দিদিমার ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

দুদিন পর, শহরে ফেরার প্রাক্কালে আমি শুনতে পাই গ্রামবাসীরা আলাপ করছে কিভাবে ওয়েই দিদিমার স্মরণে দিদিমার অধিকাংশ আসবাবপত্র পুড়ে ফেলা ও বাকীগুলো তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুশয্যায় সেবাকারী চাকরানীকে দিয়ে দেবার মনস্থ করেছে। এমনকি বাড়ীটাও অনির্দিষ্টকালের জন্য চাকরানীকে ধার দেয়া হবে। ওয়েই এর আত্মীয় স্বজন তর্ক করে গলা ফাটিয়ে ফেলে, কিন্তু তার কথার নড়চড় হয় না।

ফেরার পথে, কৌতূহল বলে আমি তার বাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার সময় সমবেদনা জানানোর জন্য ভেতরে যাই। শোকের সাদা পোশাক পরে সে আমাকে স্বাগত জানায়। ব্যবহার আগের মতই নিরুত্তাপ। ব্যাপারটা মনে গেঁথে না রাখার জন্য আমি তাকে অনুরোধ করি। কিন্তু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করার বদলে সে শুধু বলে : "তোমার উদ্বেগের জন্য ধন্যবাদ।"

২

সে বছর শীতের শুরুতে ' S ' শহরের এক বইয়ের দোকানে তৃতীয় বারের মত আমাদের দেখা হয়। আমরা পরিচিত এটা দেখাতে একে অপরকে দেখে মাথা নাড়ি। কিন্তু সে বছরের শেষদিকে চাকুরি হারানোর পর আমরা বন্ধু হয়ে যাই। তারপর বহুবার ওয়েই-এর সঙ্গে দেখা করি। প্রথমতঃ, আমার করার কিছু ছিল না, দ্বিতীয়তঃ, বলা হত রক্ষণশীল মনোভাব সত্ত্বেও সে প্রয়োজনে হাত-পা বাধা লোকদের সান্ত্বনা দেয়। যাহোক, ভাগ্য ক্ষণস্থায়ী বলে, ফকির চিরদিন ফকির থাকে না, তাই তার স্থায়ী বন্ধু প্রায়ই ছিল না। রটনা সত্যি হয়। কেননা কার্ড দেয়াব সঙ্গে সঙ্গে সে আমার সঙ্গে দেখা করে। দুটো কামরা মিলিয়ে তার একটি বসার কামরা বানানো হয়েছে, টেবিল, চেয়ার এবং বুককেস ছাড়া আসবাবপত্র খুব বেশী নেই। "আধুনিক" হিসেবে তার মারাত্মক খ্যাতি থাকলেও তার শেলফে আধুনিক বইয়ের সংখ্যা ছিল খুবই কম। সে জানত, আমি চাকুরি হারিয়েছি ; কিন্তু সৌজন্য বিনিময়ের পর অতিথি ও স্বাগতিক উভয়ে চুপচাপ বসে থাকে, কারো কিছু বলার নেই। আমি লক্ষ্য করেছি সে খুব তাড়াতাড়ি সিগারেট শেষ করে এবং আঙুলে প্রায় ছ্যাঁকা লাগার মত অবস্থা হলে মাটিতে ফেলে দেয়।

আরেকটি সিগারেট ধরাতে গিয়ে সে হঠাৎ বলে, "একটি সিগারেট নাও।"

আমি একটা নেই। এবং সিগারেট টানার ফাঁকে ফাঁকে মাষ্টারী, বই এসব

নিয়ে আলাপ করি, তবু বলার মত সামান্য বিষয়। চলে আসার কথা ভাবছি এমন সময় দরজার বাইরে চীৎকার ও পায়ের শব্দ শুনতে পাই এবং চারটি শিশু দৌড়ে ভেতরে আসে। বড়টির বয়স আট অথবা নয়, সবচে ছোটটির চার অথবা পাঁচ। তাদের হাত, মুখ, কাপড়চোপড় খুব নোংরা, দেখে আদর করতে ইচ্ছে করে না ; তবু ওয়েই-এর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পাশের কামরায় যেতে যেতে সে বলে :

"ডালিয়াং, এরলিয়াং তোমরা সবাই আস। কাল যে মাউথ-অর্গ্যান চেয়েছিলে সেটা এনেছি।"

শিশুরা তার পেছনে দৌড়ে যায় এবং একটি মাউথ-অর্গ্যান নিয়ে তৎক্ষণাৎ ফিরে আসে। কিন্তু বাইরে যাওয়া মাত্রই তারা ঝগড়া বাধিয়ে দেয় এবং একজন চীৎকার করে ওঠে।

তাদের অনুসরণ করতে করতে সে বলে, "প্রত্যেকের জন্য একটা, ঠিক এক রকমের। ঝগড়া করো না।"

জিজ্ঞেস করি, "এরা কার ছেলেমেয়ে?"

"বাড়ীওয়ালার। তাদের মা নেই, শুধু দিদিমা আছে।"

"তোমার বাড়ীওয়ালা বিপত্নীক?"

নিষ্প্রাণ হাসি হেসে সে বলে, "হ্যাঁ। তিন চার বছর আগে তার বউ মারা গেছে। সে আর দ্বিতীয় বিয়ে করে নি। না হলে, আমার মত কুমারের কাছে সে ঘর ভাড়া দিত না।"

এতদিন কেন বিয়ে করে নি এটা জিজ্ঞেস করতে আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু আমি তাকে খুব ভালোভাবে জানতাম না বলে জিজ্ঞেস করি নি।

একবার ভালোভাবে জানলে সে খুব আলাপী। তার মাথায় চমৎকার চমৎকার বুদ্ধি আছে। তার কিছু কিছু অতিথি আমাকে উত্ত্যক্ত করেছে। ফলশ্রুতিতে, বোধহয় ইয়ু ডাফু এর রোমান্টিক গল্প পড়ার কারণে তারা প্রতিনিয়ত নিজেদের বলত, "হতভাগ্য যুবক" বা "অচ্ছুৎ" এবং অলস ও রাগী কাঁকড়ার মত বড় চেয়ারে বসে সবসময় হাই তুলত, ধূমপান করত এবং ভুরু কুঁচকে থাকত।

এছাড়া ছিল বাড়ীওয়ালার ছেলেমেয়ে। নিজেদের মধ্যে সবসময় ঝগড়াঝাঁটি করত। থালাবাসন ভাঙত, কেকের জন্য হাত পাতত এবং কান ফাটানো চীৎকার করত। তবু তাদের দেখলে ওয়েই-এর নিষ্প্রাণ ভাবটা কেটে যেত। মনে হত তারা তার জীবনের সবচে মূল্যবান সম্পদ। একবার তৃতীয় শিশুটির হাম হয়েছিল। সে এত চিন্তিত হয়ে পড়ে যে তার কালো মুখ আরো কালো হয়ে যায়।

অসুখটা মারাত্মক হয় নি। তারপর ছেলেদের দিদিমা তার উদ্বেগ নিয়ে টিপ্পনী কেটেছিল।

আমার অস্থিরতা অনুমান করতে পেরে একদিন এক সুযোগে সে বলে, "শিশুরা সবসময় ভাল। তারা এত নির্দোষ......"

আমি আনমনে জবাব দেই, "সবসময় নয়।"

"সবসময়। ছোটদের বড়দের মত দোষ নেই। বড় হয়ে যদি তারা খারাপ হয়, যেটা তুমি মনে কর, সেটা তাদের পরিবেশের প্রভাব। মূলত তারা খারাপ নয়, কিন্তু নির্দোষ...... আমি মনে করি চীনের ভবিষ্যৎ এদের মধ্যেই নিহিত।"

"আমি একমত নই। খারাপ না হলে, বড় হয়ে তারা খারাপ হবে কি ভাবে? উদাহরণ হিসেবে একটা বীজের কথাই ভাব। যেহেতু ভেতরে পাতা, ফুল, ফলের ভ্রূণ আছে বলেই পরে সেগুলো গজায়। কারণ নিশ্চয়ই থাকতে হবে......।" চাকরি হারাবার পর থেকে বড় আমলাদের মত যারা পদত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে, আমি বৌদ্ধ সূত্র পড়ছি। আমি বৌদ্ধ দর্শন বুঝতে না পারলেও, এলোপাতাড়ি কথা বলে যাচ্ছি।

যাহোক, ওয়েই বিরক্ত হয়। একবার আমার দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলে নি। আমি বলতে পারব না তার কিছু বলার ছিল না, না সে তর্ক করা প্রয়োজন মনে করে নি। কিন্তু তাকে আগের মত নিষ্প্রাণ দেখায়, এবং যা আগে দীর্ঘ সময় করে নি, চুপচাপ বসে এক সঙ্গে পর পর দুটি সিগারেট পান করে। তৃতীয়টার জন্য হাত বাড়াতেই আমি উঠে আসি।

আমাদের ছাড়াছাড়ি তিনমাস স্থায়ী হয়। তারপর, আংশিক ভুলে যাওয়ার কারণে এবং আংশিক ঐ "নির্দোষ" শিশুদের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কারণে সে শিশুদের সম্পর্কে আমার মন্তব্য ক্ষমা করে দেয়। অথবা আমি সে রকম ধরে নিয়েছি। ঘটনাটি ঘটে আমার ঘরে। একদিন মদ পান করার পর বিষন্ন নয়নে সে মাথা তুলে বলে :

"ভেবে দেখ, সত্যিই অবাক ব্যাপার। এখানে আসার পথে বাণ হাতে একটি ছোট শিশু দেখেছি। সে বাণটি আমার দিকে তাক করে চীৎকার করে, 'খতম কর!' সে ভালভাবে হাঁটতে পর্যন্ত শেখে নি......"

"সে নিশ্চয়ই পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত।"

একথা বলা মাত্র আমি আবার তা ফিরিয়ে নিতে চাই। যাহোক, মনে হয় সে একটা পাত্তা দেয় নি, মদ পান করেই চলে। সেই সঙ্গে চলতে থাকে তীব্র ধূমপান।

বিষয় বদলানোর চেষ্টায় বলি, "আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছি, তুমি সাধারণতঃ লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করো না। আজকে হঠাৎ কি মনে করে এলে? আমি তোমাকে একবছরের বেশী জানি, তবু এই প্রথমবার তুমি এখানে।"

"আমি এইমাত্র তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম: আমার বাড়িতে আপাততঃ আমার সঙ্গে দেখা করো না। আমার ওখানে পিতা-পুত্র আছে যারা একেবারে বিরক্তিকর। ধরতে গেলে মানুষ নয়।"

"পিতা-পুত্র? তারা কে?" আমার অবাক হবার পালা।

"আমার চাচাত ভাই এবং তার ছেলে। ছেলেটি দেখতে বাবার মত।"

"আমার মনে হয় তারা শহরে এসেছে তোমাকে দেখতে এবং ভালো সময় কাটাতে।"

"না। তারা এসেছে ছেলেটিকে যাতে পোষ্য হিসেবে গ্রহণ করি সে ব্যাপারে আলাপ করতে।"

"কি? ছেলেটিকে পোষ্য হিসেবে গ্রহণ করা?" আমি বিস্ময়ে হা হয়ে যাই। "কিন্তু তুমি বিবাহিত নও।"

"তারা জানে আমি বিয়ে করব না। কিন্তু তাদের কিছু যায় আসেনা। আসলে তারা গ্রামে আমার সেই জীর্ণ বাড়ীটি ভোগ করতে চায়। তুমি জান, আমার অন্য কোন সম্পত্তি নেই ; টাকা পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তা খরচ করে ফেলি। আমার শুধু ঐ বাড়ীটা আছে। জীবনে তাদের উদ্দেশ্য আপাততঃ ঐ বাড়ীতে বসবাসকারী বুড়ী চাকরানীকে তাড়িয়ে দেয়া।"

তার মন্তব্যের এই দোষদর্শিতা আমাকে অবাক করে দেয়। যাহোক তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলি :

"আমার মনে হয় না তোমার আত্মীয় স্বজন এত খারাপ হতে পারে। তারা কিছুটা মান্ধাতা আমলের। উদাহরণ স্বরূপ, সে বছর তুমি যখন খুব কাঁদছিলে তখন তারা আগ্রহ নিয়ে এসেছিল তোমাকে বোঝাতে......"

"আমি যখন ছোট ছিলাম তখন বাবা মারা গেলে আমি খুব কেঁদেছিলাম, কেননা তারা বাড়ীটি নিয়ে যেতে এবং দলিলে আমার টিপসই নিতে চেয়েছিল। তখন তারাও আগ্রহ নিয়ে এসেছিল আমাকে বোঝাতে......" সে ওপরের দিকে তাকায়। যেন বাতাসে সেই পুরনো দিনের ছবি খুঁজছে।

"মূল ব্যাপার হচ্ছে তোমার কোন ছেলেমেয়ে নেই। তুমি বিয়ে কর না কেন?" কথা পাল্টানোর জন্য একটা পথ পেয়েছি এবং এটা অনেকদিন ধরে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছি। মনে হল সুবর্ণ সুযোগ এসে গেছে।

অবাক হয়ে সে আমার দিকে তাকায়। তারপর হাঁটুর দিকে চোখ নামিয়ে ধূমপান করতে থাকে। আমি আমার প্রশ্নের কোন জবাব পাই নি।

৩

তবু শান্তিতে তাকে এই অর্থহীন অস্তিত্ব ভোগ করতে দেয়া হয় নি। ধীরে ধীরে স্বল্প পরিচিত কাগজে তার বিরুদ্ধে বেনামী সমালোচনা প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং স্কুলে তার সম্পর্কে গুজব ছড়ানো হয়। এসব পুরনো দিনের সাধারণ গুজব নয়, উদ্দেশ্যমূলকভাবে ক্ষতিকর। আমি জানতাম এসব হচ্ছে ম্যাগাজিনে যেসব প্রবন্ধ সে লিখেছে তার ফলাফল, তাই আমি গুরুত্ব দেই নি। " S " শহরের লোকজন ভয়হীন তর্কের চেয়ে আর কোন কিছুকে এত অপছন্দ করে না, এবং যে কেউ এর দোষে দায়ী হলে গোপন আক্রমণের শিকার হবে। এটাই নিয়ম এবং ওয়েইও সেটা জানত। বসন্তে যখন শুনলাম স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে পদত্যাগ করতে বলেছে, স্বীকার করব তখন আমিও অবাক হয়ে যাই। অবশ্য, এটা শুধু আশা করেছিলাম এবং আমার বন্ধু রক্ষা পাবে মনে করাতেই অবাক হয়েছিলাম। সাধারণ অবস্থার চেয়ে " S " শহরের লোকজন নিজেদের খুব একটা হিংসুটে প্রমাণ করে নি।

সে হেমন্তে শানইয়াং-এর একটি স্কুলে যাবার ব্যাপারে আলাপ আলোচনায় আমি নিজের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তাই তার সঙ্গে দেখা করার সময় ছিল না। অবসর পেতে পেতে প্রায় তিনমাস কেটে যায়, তবু তার সঙ্গে দেখা করার কথা মনে হয় নি। একদিন বড় রাস্তা দিয়ে যাবার সময় একটি পুরনো বইয়ের দোকানের সামনে থামি। সেখানে ওয়েই-এর সংগ্রহ থেকে "সিমা ছিয়ান- এর ঐতিহাসিক রেকর্ড সম্পর্কে মন্তব্যের" প্রথমদিককার একটি সংস্করণ দেখে অবাক হয়ে যাই। সে পণ্ডিত নয় কিন্তু বই ভালোবাসে এবং জানতাম বিশেষ করে এই বইটি সে মূল্যবান মনে করত। নিশ্চয়ই কষ্টে পড়ে সে এটা বিক্রী করেছে। চাকরি হারানোর দু তিন মাস পরে সে এত গরীব হয়ে যাবে ভাবতেও অবাক লাগে। তবু টাকা হাতে এলেই সে টাকা খরচ করে এবং কখনো সঞ্চয় করে নি। আমি ঠিক করি তার সঙ্গে দেখা করব। একই রাস্তায় আমি এক বোতল মদ, দু প্যাকেট বাদাম ও দুটি ভাজা মাছের মুড়ো কিনি।

তার দরজা বন্ধ ছিল। দুবার ডাকি, কিন্তু কোন জবাব নেই। ঘুমিয়ে আছে মনে করে আমি জোরে ডাকি, সঙ্গে সঙ্গে দরজায়ও আঘাত করি।

ছেলেমেয়েদের দিদিমা, মোটা মহিলা, ছোট চোখ, উল্টো দিকের জানালা দিয়ে অধীরভাবে মাথা বের করে বলে, "সে বোধ হয় বাইরে গেছে।"

জিজ্ঞেস করি, "কোথায় গেছে?"

"কোথায়? কে জানে—কোথায় যেতে পারে? আপনি অপেক্ষা করতে পারেন, সে সহসাই ফিরে আসবে।"

ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে তার বসার ঘরে যাই। অনেক পরিবর্তন হয়েছে, শূন্যতায় নির্জন মনে হচ্ছে। সামান্য কিছু আসবাবপত্র আছে। তার লাইব্রেরীতে রয়েছে সে সব বিদেশী বই যেগুলো বিক্রী করা যায় নি। ঘরের মাঝখানে রয়েছে সেই টেবিলটি যার চারদিকে বসত সেই সব হতভাগ্য, সাহসী যুবক, অস্বীকৃত প্রতিভাশালী ব্যক্তি এবং নোংরা ও গোলমেলে ছেলেমেয়েরা। এখন সবকিছুই শান্ত মনে হচ্ছে, টেবিলের ওপর ধূলোর পাতলা আস্তর পড়েছে। বোতল এবং প্যাকেট নামিয়ে রেখে একটি চেয়ার টেনে দরজার দিকে মুখ করে টেবিলের পাশে বসে পড়ি।

সহসাই দরজা খুলে যায়। ছায়ার মত নিঃশব্দে কেউ ভেতরে প্রবেশ করে। ওয়েই। গোধূলির আলোয় হয়ত তার মুখ অন্ধকার দেখাচ্ছে, কিন্তু অভিব্যক্তি বদলে নি।

"আহ, তুমি? কতক্ষণ হল এসেছ?" মনে হল খুশী হয়েছে।

বললাম, "খুব বেশীক্ষণ হয় নি। তুমি কোথায় ছিলে?"

"তেমন কোথাও না। একটু হাঁটছিলাম।"

একটি চেয়ার টেনে নিয়ে সেও টেবিলের কাছে বসে। আমরা মদ পান করতে শুরু করি এবং তার চাকুরি হারানোর ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করি। যাহোক, প্রত্যাশিত মনে করে সে এব্যাপারে খুব একটা আলাপ করতে চায় নি। সে এধরণের বহু ঘটনা দেখেছে। মোটেও অদ্ভুত নয়, আলোচনার মত ব্যাপারও নয়। চিরাচরিতভাবেই সে খুব মদ পান করে এবং সমাজ ও ইতিহাস পাঠ নিয়ে আলোচনা করে। কোন একটা কারণে আমি শূন্য বইয়ের শেলফের দিকে তাকাই এবং "সিমা ছিয়ান-এর ঐতিহাসিক রেকর্ড সম্পর্কে মন্তব্য" মনে করে নিঃসঙ্গতা ও দুঃখ বোধ সম্পর্কে সচেতন হই।

"তোমার বসার ঘর খালি মনে হচ্ছে......। সম্প্রতি তোমার অতিথির সংখ্যা কি কমে গেছে?"

"কেউ নেই। আমার মেজাজ ভালো না থাকলে তারা মজা পায় না। মেজাজ খারাপ থাকলে লোকজন অস্বস্তি বোধ করে। যেভাবে লোকজন শীতকালে পার্কে যায় না......"

পরপর দু'চুমুক মদ পান করে সে চুপ করে থাকে। হঠাৎ চোখ তুলে জিজ্ঞেস করে, "আমার মনে হয় চাকরির ব্যাপারে তুমি সুবিধে করতে পার নি?"

যদিও জানি মদের ঘোরে সে তার মনোভাব প্রকাশ করছে, তবু তার প্রতি লোকের ব্যবহারে আমার খুব রাগ হয়। কিছু একটা বলতে যাব এমন সময় সে কান খাড়া করে, তারপর কিছু বাদাম তুলে বাইরে বেরিয়ে যায়। বাইরে ছেলে-মেয়েদের হাসি চীৎকার শুনতে পাই।

কিন্তু সে বাইরে যেতে না যেতেই ছেলেমেয়েরা শান্ত হয়। মনে হয় চলে গেছে। সে তাদের পিছু পিছু গিয়ে কিছু বলে, কিন্তু আমি কোন জবাব শুনতে পাই নি। তারপর ছায়ার মত নীরবে সে ফিরে আসে, এবং মুঠোয় ভরা বাদাম ঠোঙায় রেখে দেয়।

নীচু গলায় ব্যঙ্গ করে বলে, "আমি যা দেই তারা তাও খেতে চায় না।"

যদিও খারাপ লাগে তবু জোর করে হেসে বলি, "বুড়ো ওয়েই, তুমি নিজেকে শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছ। তোমার সহযাত্রীদের এত খারাপ ভাব কেন?"

সে অবিশ্বাসের হাসি হাসে।

"আমি এখনো শেষ করি নি। আমার মনে তুমি লোকজনকে আমার মত মনে কর, যারা সময় কাটানো বা তোমার খরচে আনন্দ করার জন্য মাঝে মাঝে এখানে আসে।"

"না, করি না। কখনো কখনো করি। বোধহয় কিছু একটা নিয়ে আলাপ করার জন্য তারা আসে।"

"তাহলে তুমি ভুল করছ। লোকজন এমন নয়। তুমি আসলে নিজেকে রেশমগুটির ভেতর গুটিয়ে ফেলছ। তোমার আর একটু হাসিখুশী হওয়া উচিত।" আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

"হয়ত বা। কিন্তু আমাকে বল, এই রেশমগুটির সুতো আসে কোত্থেকে? অবশ্য, ঐ ধরণের লোক অনেক আছে, আমার দিদিমার কথাই ধর। যদিও আমার শিরায় তার কোন রক্ত নেই, আমি তার ভাগ্য পেতে পারি। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসেনা, আমি ইতোমধ্যে নিজেকে তার ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছি......"

আমার মনে পড়ে তার দিদিমার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে কি ঘটেছে। আমি ঠিক চোখের সামনে তা দেখতে পাচ্ছি।

খোলাখুলি বলেই ফেলি: "আমি এখনও বুঝতে পারি না তুমি এত কেঁদে-ছিলে কেন?"

"দিদিমার শেষকৃত্যে? না, তুমি বুঝবে না।" সে বাতি জ্বালায়। ধীরে

ধীরে বলে, "মনে হয় আমরা দু'জন বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম সেই কারণে। তুমি জান, এই দিদিমা আমার দাদুর দ্বিতীয় স্ত্রী। বাবার যখন তিন বছর বয়স তখন তার মা মারা যায়।" চিন্তা করতে করতে সে ধীরে ধীরে মদ পান করে এবং একটি ভাজা মাছের মুড়ো শেষ করে।

"প্রথমে এটা জানতাম না। ছোটবেলা থেকেই ধাঁধার ভেতর ছিলাম। সে সময় বাবা জীবিত ছিলেন, সংসারের অবস্থাও ভালো ছিল। নববর্ষের সময় আমরা পূর্বপুরুষদের মূর্তি ঝুলিয়ে দিতাম এবং বড় ভোগের আয়োজন করতাম। সুন্দর পোশাক পরানো সেই মূর্তিগুলো দেখা আমার জন্য একটা বিরল আনন্দের ব্যাপার ছিল। সে সময় একজন চাকরানী আমাকে একটি মূর্তির কাছে নিয়ে বলত : 'এটাই তোমার আসল দিদিমা। তাকে প্রণাম কর যাতে তিনি তোমাকে রক্ষা করতে এবং সুস্থ ও সবল হয়ে বেড়ে উঠতে আশীর্বাদ করেন।' আমি বুঝতে পারতাম না একজন থাকা সত্ত্বেও আর একজন দিদিমা কোত্থেকে এল। কিন্তু 'আমার নিজের' এই দিদিমাকে আমি পছন্দ করতাম। বাড়ীর দিদিমার মত তিনি এত বুড়ী নন। যুবতী এবং সুন্দরী, সোনালী এমব্রয়ডারী করা লাল পোশাক পরণে, মাথায় মুক্তো দেয়া মুকুট, দেখতে আমার মায়ের মত। তাঁর দিকে তাকালে, মনে হত তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, এবং তাঁর ঠোঁটে একটু মৃদু হাসি দেখা দিত। আমি জানতাম তিনি আমাকে খুব পছন্দ করতেন।

"কিন্তু বাড়ীতে দিদিমাকেও আমার খুব পছন্দ হত। সারাদিন তিনি জানালার কাছে বসে ধীরে ধীরে বুননের কাঁটা চালাতেন। যত আনন্দেই আমি তাঁর সামনে হাসতাম বা খেলা করতাম অথবা ডাকতাম, কখনো তাঁকে হাসাতে পারি নি। মনে হত তিনি নিষ্প্রাণ, অন্য ছেলেমেয়েদের দিদিমার মত নয়। তবু, আমি তাঁকে পছন্দ করতাম। তারপর, বয়স বাড়া বা তিনি আমার আসল দিদিমা নয় এটা জানার কারণে আমি তাঁর প্রতি ধীরে ধীরে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ি নি। বরং প্রতিদিন যন্ত্রের মত তাঁর বুননিতে বিরক্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু তিনি বদলান নি। তিনি সেলাই করতে থাকেন, আমার দেখাশোনা করেন এবং আগের মতই আমাকে রক্ষা করেন ; কদাচিৎ হাসলেও, কখনো আমাকে গাল দেন নি। বাবার মৃত্যুর পরও একই অবস্থা চলতে থাকে। পরে আমরা প্রায় তাঁর সেলাইয়ের ওপরই বেঁচে ছিলাম। আমি স্কুলে না যাওয়া পর্যন্ত একই রকম চলতে থাকে

তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় বাতি দপ দপ করে ওঠে। বইয়ের শেলফের নীচে রাখা একটি ছোট টিন থেকে তেল ভরার জন্য সে উঠে দাঁড়ায়।

"এমাসে দুবার তেলের দাম বেড়েছে।" সলতে উসকে দিয়ে ধীরে ধীরে

বলে, "প্রতিদিন জীবন কষ্টকর হয়ে পড়ছে। স্কুলের পড়া শেষ না করা পর্যন্ত তিনি একই রকম ছিলেন এবং চাকুরি পাওয়ার পর আমাদের জীবনে নিরাপত্তা আসে। মনে হয় অসুস্থ হওয়া পর্যন্ত তিনি বদলান নি, তারপর আর চলতে পারেন নি, বিছানা নিতে হয়েছে ......"

"মনে হয় তার শেষের দিনগুলো খুব খারাপ ছিল না। তিনি অনেক দিন বেঁচেছিলেন, তাই আমার দুঃখ করার দরকার ছিল না। তাছাড়া, বিলাপ করার কি আরো লোক ছিল না? এমনকি যারা তাঁর জিনিষ লুটের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, তারাও বিলাপ করেছে অথবা দুঃখে মাথা নত করেছে।" সে হেসে ওঠে। "যাহোক, সে সময় তাঁর পুরো জীবন আমার মনে ভেসে ওঠে — এক-জনের জীবন যে নিজের জন্য নিঃসঙ্গতা সৃষ্টি করেছে এবং তার তিক্ততার স্বাদ নিয়েছে। মনে হয় তাঁর মত অনেক লোক ছিল। আমি তাদের জন্য কাঁদতে চেয়েছি; কিন্তু বোধ হয় আমি খুব বেশী অনুভূতি প্রবণ হয়ে পড়েছিলাম ......"

"তোমার বর্তমান উপদেশ হচ্ছে আমি তার ব্যাপারে কেমন বোধ করেছি। কিন্তু সেসময় আমার ধারণা ছিল ভুল। নিজের কথা বলতে গেলে, বড় হতে হতে তার ব্যাপারে আমি নিষ্প্রাণ হয়ে গেছি ......"

সে একটু থামে। আঙ্গুলের ফাঁকে সিগারেট। মাথা নত করে চিন্তায় ডুবে যায়। বাতি দপ দপ করে ওঠে।

যেন নিজেকে বলছে, এমনভাবে সে বলে, "কেউ তোমার জন্য দুঃখ করবে না একথা জেনে বেঁচে থাকা কষ্টকর।" একটু থেমে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, "মনে হয় তুমি সাহায্য করতে পারবে না? সহসাই কিছু একটা করার ব্যবস্থা করতে হবে।"

"তোমার অন্য কোন বন্ধু নেই যাকে জিজ্ঞেস করতে পার?" অন্যকে সাহায্য করব কি, তখন নিজেকেই সাহায্য করার মত অবস্থা আমার ছিল না।

"গুটি কয়েক আছে, কিন্তু তাদের অবস্থা একই ......"

যখন উঠে আসি তখন পূর্ণিমার চাঁদ অনেক ওপরে, রাত নিঝুম।

৪

শানইয়াং-এর মাষ্টারী খুব সুখের ব্যাপার ছিল না। এক পয়সা বেতন না পেয়ে আমি দু'মাস পড়িয়েছি। তারপর সিগারেটের খরচ কমাতে হয়েছে। কিন্তু স্কুলের কর্মচারীরা, এমনকি যারা মাসে পনেরো, ষোল টাকা বেতন পায়

তারাও অল্পতেই তৃপ্ত। দারিদ্রে জর্জরিত হয়ে তারা লৌহকঠিন হয়ে গেছে। রোগা পাতলা হলেও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে, কাজের মাঝে পদস্থরা বাধা দিলে বিনয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে। এভাবেই তারা সাধারণ জীবন যাপন ও উচ্চ মানসিকতা পোষণ করছে। যে কোনভাবে এটা আমাকে ওয়েই-এর শেষ কথাগুলো মনে করিয়ে দেয়। সে তখন খুব কষ্টে আছে এবং আগের অবিশ্বাস হারিয়ে ফেলায় প্রায়ই তাকে বিব্রত দেখায়। যখন শুনেছে চলে যাচ্ছি, গভীর রাতে আমাকে বিদায় জানাতে আসে। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে তোতলাতে থাকে:

"ওখানে কি আমার জন্য কোন ব্যবস্থা হবে? এমনকি মাসিক বিশ থেকে ত্রিশ টাকার বিনিময়ে নকল করার কাজ হলেও চলবে। আমি ......"

আমি অবাক হয়ে যাই। ভাবতে পারি নি সে এত ছোট কিছু একটা ভাববে। কিভাবে জবাব দিতে হবে তাও জানি নি।

"আমি ...... আমাকে আর একটু বাঁচতে হবে ......"

"সেখানে পৌঁছার পর দেখব। যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেখব।"

সে সময় এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কথাগুলো প্রায়ই আমার কানে বাজত, যেন এখনো ওয়েই আমার সামনে তোতলাচ্ছে: "আমাকে আর একটু বাঁচতে হবে।" তার ব্যাপারে আমি অনেককে উৎসাহী করে তোলার চেষ্টা করি, কিন্তু কোন লাভ হয় নি। যেহেতু চাকরির সংখ্যা অল্প এবং বেকারের সংখ্যা বেশী, তাই সাহায্য করতে না পারার জন্য এসব লোক প্রায়ই ক্ষমা চাইত এবং আমিও তাকে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখতাম। টার্ম শেষ হতে হতে অবস্থা খারাপ থেকে খারাপ হয়। স্থানীয় কিছু বদমাতব্বর সম্পাদিত পত্রিকা «যুক্তি» আমাকে আক্রমণ করতে শুরু করে। স্বভাবতঃই কোন নাম উল্লেখ করা হয় নি কিন্তু সরাসরি ইঙ্গিত দেয়া হয় আমি স্কুলে গোলমাল পাকাচ্ছি। এমনকি ওয়েই সম্পর্কে আমার সুপারিশকে বলা হয় দল পাকানোর ফন্দি।

তাই আমাকে চুপ থাকতে হয়। পড়ানো ছাড়া আমি চুপচাপ ঘরে শুয়ে থাকতাম। এমনকি জানালা দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া বের হলে ভয় হত তারা বলবে আমি গোলমাল পাকাচ্ছি। স্বভাবতঃই ওয়েই-এর জন্য আমার কিছু করার ছিল না। শীতের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে।

সারাদিন বরফ পড়তে থাকে। সন্ধ্যা পর্যন্ত বরফ পড়া বন্ধ হয় নি। বাইরেটা এত নীরব যে নীরবতার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। মৃদু আলোয় চোখ মুদে আমি সেখানে চুপচাপ বসে থাকি, কল্পনা করতে থাকি তুষার কণা পড়ছে, জমে উঠছে বরফের স্তূপ। বাড়ীতে নববর্ষের সময় হয়ে এসেছে এবং সবাই খুব ব্যস্ত হবে। নিজেকে শিশুর মত মনে হয়। মনে হয় পেছনের উঠোনে একদল ছেলেমেয়ের

সঙ্গে বরফ মানুষ বানাচ্ছি। কালো কয়লা দিয়ে তৈরী বরফ মানুষের চোখ হঠাৎ ওয়েই-এর চোখ হয়ে যায়।

"আমাকে আর একটু বাঁচতে হবে।" আবার সেই একই কণ্ঠস্বর।

"কিসের জন্য?" আমি অসতর্কভাবে জিজ্ঞেস করি, সঙ্গে সঙ্গে নিজের ব্যর্থ মন্তব্যে সজাগ হয়ে ওঠি।

এই জবাব আমাকে জাগিয়ে দেয়। উঠে বসে সিগারেট ধরিয়ে জানালা খুলে দেই। দেখি ভীষণ বরফ পড়ছে। দরজায় শব্দ শুনি, একটু পরেই দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে চাকর। তার পায়ের শব্দ আমার চেনা। সে ছয় ইঞ্চির বেশী লম্বা একটি খাম আমার হাতে দেয়। ঠিকানা এলোমেলো, কিন্তু তাতে ওয়েই-এর নাম দেখতে পাই।

' S ' শহর ছেড়ে আসার পর এই প্রথম সে চিঠি লিখেছে। জবাব দিতে ব্যর্থ-তার কথা জানায় তার নীরবতায় আমি অবাক হই নি। কখনো কখনো মনে হয়েছে তার নিজের কিছু খবর আমাকে জানানো উচিত। চিঠিটি একটু অবাক ব্যাপার। খুলে ফেলি। ব্যস্ততার মধ্যে লেখা চিঠিতে বলা হয়েছে :

"......শেন ফেই,

"তোমাকে কি বলে সম্বোধন করব? তোমার পছন্দমত সম্বোধনের জন্য খালি জায়গা রেখে দিয়েছি। আমার জন্য তা একই রকম হবে।

"এ পর্যন্ত তোমার মোট তিনটি চিঠি পেয়েছি। একটি সাধারণ কারণে জবাব দেই নি : আমার টিকেট কেনার পর্যন্ত পয়সা ছিল না।

"হয়ত তুমি জানতে চাইবে আমার ভাগ্যে কি ঘটেছে। সোজা কথায় বলতে গেলে : আমি ব্যর্থ হয়েছি। ভেবেছিলাম আগে ব্যর্থ হয়েছি, তখন ভুল হয়েছিল। এখন, আমি সত্যিই ব্যর্থ। আগে কেউ একজন ছিল যে চাইত আমি আর একটু বাঁচি, আমিও তা আশা করেছিলাম, কিন্তু তা কষ্টকর মনে হয়েছে। এখন কোন দরকার নেই, তবু আমাকে বেঁচে থাকতে হবে......

"আমি কি বাঁচব?

"যে চেয়েছে আমি একটু বেশী বাঁচি সে নিজে বাঁচতে পারে নি। শত্রুর ফাঁদে আটকা পড়ে সে নিহত হয়েছে। কে তাকে হত্যা করেছে? কেউ জানে না।

"পরিবর্তন এত দ্রুত ঘটে! গত ছয় মাস আমি প্রায় ভিখিরী ছিলাম! সত্যি, আমাকে ভিখিরী বলা যেত। যাহোক, আমার উদ্দেশ্য ছিল। আদর্শের জন্য

আমি ভিক্ষা করতে, ঠাণ্ডা ও ক্ষিধের কষ্ট পেতে, নিঃসঙ্গ হতে এবং দুঃখকষ্ট ভোগ করতে রাজী ছিলাম। কিন্তু নিজেকে ধ্বংস করতে চাই নি। তাই দেখ, একজন যে চেয়েছে আমাকে বাঁচাতে, সে অখণ্ডনীয় প্রমাণিত হয়েছে। এখন আর কেউ নেই, একজনও না। একই সঙ্গে মনে হয় আমার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই, এবং আমার মতে আমার কিছু লোকেরও তা নেই। তবু আমি বেঁচে থাকার ব্যাপারে সজাগ, যারা চায় না আমি মরে যাই তাদের মুখে থুথু দেয়ার জন্য, এমন কেউ নেই যে চায় আমি সুন্দরভাবে বেঁচে থাকি, কাজেই কেউ কোন দুঃখ পাবে না। আমি এধরণের লোকদের দুঃখ দিতে চাই না। কিন্তু এখন কেউ নেই, একজনও নয়। কি মজা! চমৎকার! আগে যা অপছন্দ এবং বিরোধিতা করেছি এখন তা করছি। আগে যা বিশ্বাস এবং সমর্থন করেছি এখন তা ত্যাগ করছি। আমি সত্যিই ব্যর্থ — কিন্তু জিতে গেছি।

"তুমি কি মনে কর আমি পাগল? মনে করছ আমি বীর বা মহান পুরুষ হয়ে গেছি? না, ব্যাপারটা তা নয়। ব্যাপারটা খুব সোজা; আমি জেনারেল ডু'র পরামর্শদাতা হয়েছি, তাই মাসিক বেতন ৮০ টাকা।

"......শেন ফেই,

"তুমি আমাকে কি ভাববে? তুমিই ঠিক কর। আমার জন্য সব সমান।

"বোধহয় তোমার এখনো আমার পুরনো বসার ঘরের কথা মনে আছে, যেখানে আমাদের প্রথম ও শেষ কথা হয়েছিল। আমি এখনো এটা ব্যবহার করছি। এখন নতুন অতিথি, নতুন ঘুষ, নতুন তোষামোদী, পদোন্নতির নতুন আবদার, নতুন প্রণাম, নতুন মাজিয়াং এবং মদের খেলা, নতুন গর্ব ও বিরক্তি, নতুন অনিদ্রা এবং রক্ত বমি......

"শেষ চিঠিতে বলেছিলে তোমার মাষ্টারী ভালো চলছে না। তুমি কি পরামর্শদাতা হতে চাও? বল, তাহলে আমি তোমার জন্য ব্যবস্থা করব। আসলে, দরজার কাজ করলেও একই অবস্থা হবে। একই অতিথি, ঘুষ এবং তোষামোদী থাকবে......

"এখানে খুব বরফ পড়ছে। তোমার ওখানে কেমন? এখন মাঝরাত। কিছু রক্ত বমি হওয়ায় আমার অবস্থা শান্ত হয়েছে। মনে পড়ে হেমন্ত থেকে পর পর তিনবার তুমি আমাকে লিখেছ — বিস্ময়কর! আমি তোমাকে এই সংবাদ দিচ্ছি, আশা করি আঘাত পাবে না।

"আমি বোধহয় আর লিখব না, তুমি আমার পুরনো নিয়ম জান। তুমি যদি সহসাই আস, আমাদের আবার দেখা হতে পারে। তবু, মনে হয় আমরা ভিন্ন

পথ নিয়েছি, তুমি বরং আমাকে ভুলে যাও। আমার জন্য কাজ ঠিক করার চেষ্টা করায় তোমাকে হৃদয়ের অন্তকরণ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দয়া করে আমাকে ভুলে যাও, আমি 'ভালই' চালাচ্ছি।

ওয়েই লিয়ানশু

১৪ ডিসেম্বর।"

চিঠিটি আমাকে "আঘাত" না দিলেও, তড়িঘড়ি করে পড়ার পর, আবার সতর্কতার সঙ্গে সেটা পড়ি। আমি অস্বস্তি এবং মুক্ত বোধ করি। অন্ততঃ তার জীবন নিরাপদ, এবং তা নিয়ে আর চিন্তা করার দরকার নেই। যে কোনভাবে, আমি এখানে কিছুই করতে পারব না। আমি তাকে লেখার কথা ভাবি, কিন্তু বুঝতে পারি বলার কিছুই নেই।

আসলে, তাকে ধীরে ধীরে ভুলে যাই। আমার মনের চোখে তার চেহারা আর হরহামেশা ভেসে ওঠে নি। যাহোক, তার চিঠি পাবার দশ দিনেরও কম সময়ে, ' S ' শহর সাপ্তাহিকী আমাকে তাদের কাগজ পাঠাতে শুরু করে। নীতি হিসেবে আমি এধরণের কাগজ পড়ি না, কিন্তু যেহেতু আমাকে পাঠানো হচ্ছে তাই কিছু কিছু বিষয়ের ওপর চোখ বুলাই। এটা আমাকে ওয়েই-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কেননা পত্রিকায় প্রায়ই তার সম্পর্কে প্রবন্ধ বা কবিতা ছাপা হত «তুষার ঝড়ের রাতে বুদ্ধিজীবী ওয়েই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ», «পরামর্শ-দাতা ওয়েই-এর ঘরে কবি জমায়েত», এবং আরো অনেক কিছু। একবার, তারা «গাল-গল্প»নাম দিয়ে তার এমন কিছু গল্প প্রকাশ করে যেগুলো বিদ্রূপ বলে বিবেচিত হয়েছে, কিন্তু এখন "খেয়ালী প্রতিভার কাহিনী" হয়ে গেছে। অর্থ, একমাত্র একজন অস্বাভাবিক মানুষ এ ধরণের অস্বাভাবিক কাজ করতে পারে।

যদিও এসব থেকে তার কথা মনে পড়ত, তবু তার স্মৃতি আমার কাছে ধূসর হয়ে আসে। তবু সব সময় মনে হয় আমার ওপর তার নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় হয়েছে। এতে সব সময় অকারণে আমি একটা অস্বস্তি ও অদৃশ্য চেতনা বোধ করতে থাকি। যাহোক, হেমন্তের মধ্যে কাগজ আসা বন্ধ হয়ে যায়। শানইয়াং পত্রিকা দীর্ঘ প্রবন্ধ "গুজবে সত্যের উপস্থিতি"র প্রথম কিস্তি প্রকাশ করতে শুরু করে। এতে জোর দিয়ে বলা হয় কিছু কিছু ভদ্রলোক সম্পর্কে গুজব ক্ষমতাবানের কানে পৌঁছেছে। আক্রান্তদের মধ্যে আমার নাম ছিল। তখন আমাকে খুব সর্তক হতে হয়। যাতে আমার সিগারেটের ধোঁয়া অন্যের নজরে না পড়ে সে ব্যাপারে সতর্ক হতে হয়। এই সমস্ত সতর্কতায় এত সময় কেটে যায় যে অন্য কোন ব্যাপারে নজর দিতে পারি নি, এবং স্বভাবতঃই ওয়েই-এর কথা ভাবার

অবসর ছিল না। আমি আসলে তাকে ভুলে যাই।

গরম পর্যন্ত আমি চাকরি রক্ষা করতে পারি নি। মে মাসের শেষে আমাকে শানইয়াং ছাড়তে হয়।

৫

ছয় মাসের বেশী আমি শানইয়াং, লিছেং এবং থাইগু ঘোরাঘুরি করি, কিন্তু কোন কাজ জোটাতে পারি নি। তাই ' S ' শহরে ফিরে যাওয়া ঠিক করি। বসন্তের প্রথম দিকে এক বিকেলে সেখানে পেঁৗছি। মেঘলা দিন, সবকিছু কুয়াশায় ঢাকা। পুরনো হোস্টেলে খালি কামরা থাকায় সেখানেই থাকি। পথে ওয়েই-এর কথা ভাবতে শুরু করি। পেঁৗছার পর ঠিক করি সান্ধ্য খাবারের পর তার সঙ্গে দেখা করতে যাব। বিখ্যাত ওয়েনসী কেকের দুটো প্যাকেট নিয়ে কয়েকটি সেঁৎসেঁতে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাই। বহু ঘুমন্ত কুকুর সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে তার দরজায় পেঁৗছি। মনে হল ভেতরে উজ্জ্বল আলো। ভাবলাম, পরামর্শদাতা হওয়ায় তার ঘরে আলো বেশী এবং নিজে নিজেই হেসে ওঠি। ওপরে তাকিয়ে দেখি, দরজার ওপর একটি সাদা কাগজ লাগানো। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে মনে হয় হয়ত ছেলেমেয়েদের দিদিমা মারা গেছে ; কিন্তু সোজা ভেতরে চলে যাই।

স্বল্পালোকিত উঠোনে একটি কফিন, পাশেই ইউনিফর্ম পরা সৈন্য অথবা আর্দালী, ছেলেমেয়েদের দিদিমার সঙ্গে কথা বলছে। ছোট পোশাকের কিছু শ্রমিকও সেখানে ঘোরাফেরা করছে। আমার বুকের ভেতর দ্রুত ওঠা-নামা করতে থাকে। ঠিক সে সময়ে সে আমার দিকে তাকায়।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, "আহ, তুমি ফিরেছ? আগে এলে না কেন?"

"কে . . . . . . কে মারা গেছে?" এতক্ষণে আমি জেনে গেছি, তবু জিজ্ঞেস করি।

"পরামর্শদাতা ওয়েই গত পরশু মারা গেছেন।"

আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখি। বসার ঘরে স্বল্প আলো, বোধহয় একটি বাতি জ্বলছে, সামনের ঘরটিতে শেষকৃত্যের পরদা ঝোলানো এবং মহিলার নাতি-নাতনীরা সে ঘরের সামনে জড়ো হয়েছে।

সামনে এগিয়ে সামনের কামরার দিকে দেখিয়ে মহিলা বলে, "তার মৃতদেহ ওখানে। মিঃ ওয়েই-এর পদোন্নতির পর আমি তাঁকে সামনের কামরাটিও ভাড়া

দিয়েছিলাম, সেখানেই এখন তিনি আছেন।"

শেষকৃত্যের পর্দায় কোন কিছু লেখা ছিল না। সামনে একটি লম্বা টেবিল, তারপর একটি বর্গাকার টেবিল, ওপরে ডজন খানেক থালাবাসন ছড়ানো। ভেতরে ঢোকার সময় লম্বা সাদা গাউনের দুজন লোক হঠাৎ এসে আমার পথ রোধ করে দাঁড়ায় তাদের চোখ মরা মাছের চোখের মত, বিস্ময়ে ও অবিশ্বাসে আমার ওপর নিবদ্ধ। তড়িঘড়ি করে ওয়েই-এর সঙ্গে সম্পর্ক বর্ণনা করি এবং গৃহকর্ত্রীও এগিয়ে এসে আমার বক্তব্য সমর্থন করে। তারপর তাদের হাত ও চোখজোড়া নেমে যায় এবং মৃতের উদ্দেশে সম্মান জানানোর জন্য আমাকে ভেতরে যেতে দেয়।

সম্মান দেখানোর সময় পাশেই মেঝে থেকে একটি বিলাপ ভেসে আছে। নীচে তাকিয়ে দেখি দশ বছরের একটি শিশু, সাদা পোশাক পরণে, মাদুরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। তার চুল ছোট করে ছাঁটা, এবং তাতে কিছু শণ বাধা।

পরে জানতে পারি এই লোকদু'জনের একজন ওয়েই-এর চাচাত ভাই, তার সবচে নিকট আত্মীয়, আর একজন দূর সম্পর্কের ভাগনে। আমি ওয়েইকে দেখার অনুমতি চাই, কিন্তু সেটা "বিনয়" বলে তারা আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে পর্দা উঠিয়ে দেয়।

এবার আমি মৃত ওয়েইকে দেখি কিন্তু অবাক ব্যাপার, গায়ে রক্তে ভেজা কোঁচকানো জামা থাকলেও এবং মুখ শুকনো দেখালেও, অভিব্যক্তি অপরিবর্তিত। বন্ধ চোখ ও মুখ নিয়ে সে এত শান্তভাবে ঘুমিয়ে আছে যে শ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে কিনা তা নাকে আঙ্গুল দিয়ে অনুভব করতে লোভ হয়।

জীবিত এবং মৃত সবকিছুই মৃতের মত নিশ্চুপ। চলে আসার সময় তার চাচাত ভাই আমাকে সম্বোধন করে বলে, বিশেষ করে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে, যখন সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, সেসময় ওয়েই-এর এই অকাল মৃত্যু শুধু তার সাধারণ পরিবারেব জন্য বিপর্যয় নয়, বন্ধুদের জন্যও দুঃখের। মনে হল ওয়েই-এর মৃত্যুর জন্য সে ক্ষমা চাইছে। গ্রামবাসীদের মধ্যে এ ধরণের বাক্‌পটুতা বিরল। যাহোক, এই বলে সে আবার নীরব হয়ে যায় এবং জীবিত ও মৃত সবকিছুই মৃতের মত নিশ্চুপ হয়ে যায়।

দুঃখবোধ নয়, নিরানন্দ মনে আমি বুড়ীর সঙ্গে আলাপ করার জন্য উঠোনে যাই। সে জানায় সহসাই শেষকৃত্য হবে। তারা কাফনের জন্য অপেক্ষা করছে এবং যখন কফিন বন্ধ করা হবে তখন কয়েকটি রাশির লোক কাছে থাকবে না। সে বকবক করেই চলে, কথা বানের মত আসতে থাকে। সে ওয়েই-এর অসুস্থতা, জীবনের কিছু ঘটনার কথা বলে, এমনকি কিছু সমালোচনাও করে।

"জানেন, কপাল ফেরার পর মিঃ ওয়েই সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে যান। তিনি সবসময় গর্বে মাথা উচুঁ করে চলতেন। তার পুরনো রীতিতে লোকজনের সঙ্গে ব্যবহার বন্ধ করে দেন। আপনি কি জানতেন তিনি বুদ্ধুর মত ব্যবহার করতেন এবং আমাকে 'ম্যাডাম' ডাকতেন। শেষে, সে মুখ টিপে হাসে, আমাকে ডাকত 'বুড়ী কুত্তী'। খুব হাস্যকর ব্যাপার। যখন লোকজন তাকে সিয়ানজ্যুশু-এর মত দুর্লভ ঔষধি পাঠাত তখন খাওয়ার বদলে তিনি সেগুলো উঠোনে ফেলে দিতেন। ঠিক এখানে এবং ডেকে বলতেন; 'বুড়ী কুত্তী, তুমি এগুলো নাও।' কপাল ফেরার পর তাঁর দর্শনপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল বহু, তাই তাঁর জন্য সামনের কামরাটা খালি করে দিয়ে পাশের একটিতে সরে যাই। সবসময় মজা করার জন্য বলেছি, কপাল ফেরার পর তিনি সম্পূর্ণ বদলে যান। এক মাস আগে আসলে এখানে সব মজা দেখতে পারতেন। প্রায় প্রতিদিন মদের আসর, গালগল্প, হাসিঠাট্টা, গান বাজনা, কবিতা লেখা এবং মাজিয়াং খেলা ......

"ছেলেমেয়েরা বাপমা'কে যা ভয় পায় তারচে বেশী তিনি ভয় পেতেন ছেলেমেয়েদের, বলতে গেলে তাদের সামনে নতমুখে চলতেন। কিন্তু সম্প্রতি সেটাও বদলে যায়, এবং খুব মজা করতে পারতেন আমার নাতি-নাতনীরা তাঁর সঙ্গে খেলতে ভালোবাসত এবং যখনই পারত তাঁর ঘরে যেত। তিনি যতসব বাস্তব চুটকি ভেবে রাখতেন। যেমন, তারা যদি তাঁকে কিছু কিনে দেয়ার কথা বলত তাহলে তিনি তাদের কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করতে বা লাফিয়ে প্রণাম করতে বাধ্য করতেন। আহ, সেটা ছিল মজার। দু'মাস আগে আমার দ্বিতীয় নাতি মিঃ ওয়েই-কে একজোড়া জুতো কিনে দিতে বলেছিল এবং তাঁকে তিনবার লাফিয়ে প্রণাম করতে হয়েছে। সে এখনো সেগুলো পড়ছে, এখনো ছিঁড়ে যায় নি।"

সাদা পোশাকের একজন বেরিয়ে এলে সে কথা বন্ধ করে দেয়। আমি ওয়েই-এর অসুস্থতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি, কিন্তু খুব সামান্যই সে বলতে পারে। সে শুধু জানে, অনেকদিন ধরেই ওয়েই-এর ওজন কমে যাচ্ছিল, তারা এনিয়ে মাথা ঘামায় নি কেননা তাঁকে সবসময় খুব উৎফুল্ল দেখাত। এক মাস আগে তারা শুনতে পায় তাঁর কাশির সঙ্গে রক্ত আসছে, কিন্তু মনে হয় তিনি ডাক্তার দেখান নি। তারপর তাঁকে বিছানায় পড়ে থাকতে হত এবং মৃত্যুর তিনদিন আগে তিনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তাঁর চাচাত ভাই সেই গ্রাম থেকে এতটা পথ আসে তাঁর টাকা পয়সা জমা আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে, কিন্তু তিনি একটি কথাও বলেন নি। তাঁর চাচাত ভাই মনে করে তিনি ভান করছেন, কিন্তু কেউ কেউ বলে যক্ষ্মায় মৃত্যুপথযাত্রীরা বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে ......।

বুড়ী হঠাৎ ফিসফিসিয়ে বলে, "কিন্তু মিঃ ওয়েই বড় অদ্ভুত লোক ছিল।

তিনি কখনো টাকা পয়সা জমান নি, সবসময় জলের মত খরচ করেছেন। তাঁর চাচাত ভাই এখনো সন্দেহ করে আমরা তাঁর কাছ থেকে কিছু হাতিয়েছি। খোদা জানে, আমরা কিছুই পাই নি। তিনি সবকিছু এলোমেলো খরচ করেছেন! আজকে কিছু কেনা, কাল সেটা বিক্রী করা অথবা ভেঙ্গে ফেলা — খোদা জানে কি ঘটেছে। তিনি যখন মারা যান তখন কিছুই ছিল না, সব খরচ হয়ে গেছে! না হলে সবকিছু আজ এত বিষণ্ন হতো না......।

"তিনি শুধু অপচয় করেছেন, ঠিক কাজ করতে চান নি। এই বয়সে তাঁর বিয়ে করা উচিত ছিল। আমি সেটা ভেবেছিলাম এবং তাঁকে বলেছিলাম। তখন তাঁর জন্য এটা সহজ হত। ভালো পরিবার না পাওয়া গেলে তিনি কিছু রক্ষিতা রাখতে পারতেন। লোকজনের মান সম্মান ঠিক রাখা উচিত। কিন্তু যখনই তা বলতাম তিনি শুধু হাসতেন। বলতেন, 'বুড়ী কুত্তী, তুমি সবসময় লোকজনের এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাও।' দেখেন, তিনি কখনো আন্তরিক ছিলেন না, ভালো পরামর্শ শুনতেন না। আমার কথা শুনলে, পরলোকে তাঁকে একা চলতে হত না, অন্ততঃ আপনজনরা বিলাপ করত......"

কিছু কাপড় নিয়ে একজন দোকানী আসে। মৃতের তিনজন আত্মীয় অন্তর্বাসটি তুলে পর্দার পেছনে অদৃশ্য হয়ে যায়। সহসাই পর্দা ওঠে; মৃতের দেহে নতুন অন্তর্বাসটি পরানো হয়েছে, এবং তারা তাঁর কাপড় পরাতে শুরু করেছে। তাঁকে বিশাল লাল ডোরা দেয়া সামরিক পোশাক এবং চকচকে সামরিক ব্যাজওয়ালা জামা পরাতে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। আমি জানতাম না এগুলো কোন পদমর্যাদার বা কিভাবে সে সেটা পেয়েছে। দেহটি কফিনে রাখা হয়। ওয়েই সেখানে অদ্ভুতভাবে শুয়ে আছে, পায়ের কাছে চামড়ার একজোড়া বাদামী জুতো, কোমরের কাছে কাগজের একটি তলোয়ার, এবং শুকনো ও বিবর্ণ মুখের কাছে একটি সামরিক টুপি।

তিনজন আত্মীয় কফিনের কাছে বিলাপ করে। তারপর বিলাপ থামিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে। বুড়ীর তিন নম্বর নাতির মত চুলে শণ বাধা ছেলেটি উঠে যায় — সন্দেহ নেই তাদের রাশি ভিন্ন।

গোরখোদকরা কফিনের ঢাকনা খুলতেই শেষ বারের মত ওয়েইকে দেখার জন্য আমি এগিয়ে যাই।

অদ্ভুত পোশাকে, চোখ মুখ বন্ধ করে সে নির্বিকার শুয়ে আছে। মনে হচ্ছে তার ঠোঁটে পরিহাসের হাসি, হাস্যকর মৃতদেহকে উপহাস করছে।

তারা পেরেক মারা শুরু করতেই নতুন করে বিলাপ শুরু হয়। আমি খুব বেশীক্ষণ তা সহ্য করতে পারি নি, তাই উঠোনে চলে যাই। তারপর, যেকোন-

ভাবে গেটের বা[illegible] চলে যাই। সেঁৎসেঁতে রাস্তা আলোকিত। আকাশে তাকিয়ে দেখি মেঘ সরিয়ে পূর্ণ চাঁদ উঠেছে, ছড়িয়ে দিয়েছে শীতল আলো।

যেন কোন শক্ত প্রতিবন্ধক ভাঙতে চাই এভাবে আমি হনহনিয়ে চলি, কিন্তু অসম্ভব। আমার কানে কিছু একটা বাজছে, এবং অনেক অনেক পর তা ফেটে পড়ে। একটা দীর্ঘ চীৎকার, নিঝুম রাতের উষর প্রান্তরে আহত নেকড়ের চীৎকার, যন্ত্রণার সঙ্গে ক্ষোভ এবং দুঃখ মিশ্রিত।

তারপর আমার মন হাল্কা হয়ে আসে। চাঁদের আলোয় খোরা বিছানো, সেঁৎসেঁতে রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যাই।

অক্টোবর ১৭, ১৯২৫

অতীতের জন্য অনুশোচনা

জুয়ানশেং-এর মূল হস্তাক্ষরে

আমি চাই, যদি পারি, জিজুন ও আমার নিজের খাতিরে আমার দুঃখ ও অনুশোচনা বর্ণনা করতে।

হোষ্টেলের উপেক্ষিত কোনায় এই জীর্ণ কামরাটি এত নীরব এবং ফাঁকা। সময় সত্যি উড়ে যায়। জিজুনের প্রেমে পড়েছি এক বছর পেরিয়ে গেছে, তাই এই মৃত্যুর নীরবতা ও শূন্যতা থেকে মুক্তি পেয়েছি। কপাল মন্দ, ফিরে আসার পর এই কামরাটিই খালি ছিল। ভাঙা জানালা, বাইরে প্রায় বিবর্ণ লোকাস্ট গাছ ও উইস্টারিয়া লতা এবং ভেতরের চৌকোনো টেবিল আগের মতই আছে। চুনকাম খসে যাওয়া দেয়াল, কাঠের বিছানাও একই রকম আছে। জিজুনের সঙ্গে থাকতে শুরু করার আগে যে রকম ছিলাম রাতের বেলা ঠিক তেমনি বিছানায় একা শুয়ে থাকি। গত বছর এমনভাবে মুছে গেছে যেন তা কখনো আসেনি — যেন আশায় বুক বেধে জিযাও গলিতে একটি ছোট্ট ঘর বাঁধার জন্য কখনো এই জীর্ণ কামরার বাইরে যাই নি।

এটাই সব নয়। এক বছর আগে এই নীরবতা ও শূন্যতা অন্যরকম ছিল—সব সময় একটা প্রত্যাশা ছিল। জিজুনের আগমনের আশায় দীর্ঘ ও অস্থির প্রতীক্ষার সময় ইটের রাস্তায় উঁচু হিলের শব্দে চঞ্চল হয়ে উঠতাম। তারপর দেখতাম তার হাস্যময়ী মলিন গোলাকার মুখ, পাতলা, পরিষ্কার বাহু জোড়া, ডোরাকাটা সুতি ব্লাউজ এবং কালো স্কার্ট। আমি দেখবো ব'লে কখনো সে জানালার ও-ধারের প্রায় বিবর্ণ লোকাস্ট গাছ থেকে নিয়ে আসতো নতুন একটি পাতা, কখনো নিয়ে আসতো বুড়ো উইস্টারিয়া লতা থেকে ঝুলে পড়া বেগনী রঙের পুষ্পগুচ্ছ, — ঐ গাছের কাণ্ডটি লোহার তৈরী ব'লে মনে হতো।

এখন শুধু আগেকার সেই শূন্যতা ও নীরবতা। জিজুন আর আসবে না — কখনো না।

জিজুনের অনুপস্থিতিতে আমি এই জীর্ণ কামরায় কিছুই দেখি নি। হয়ত নেহাত এক খেয়েমি থেকে একটি বই হাতে নিয়েছি — বিজ্ঞান অথবা সাহিত্য, আমার কাছে সবই সমান। পড়ে যাচ্ছি, পড়ে যাচ্ছি। এক সময় বুঝতে পারি অনেকগুলো পাতা ওল্টানো হয়েছে কিন্তু একটা শব্দও মনে নেই। শুধু কান এত সজাগ ছিল যে মনে হত গেটের বাইরে জিজুন সহ সকলের পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। প্রায়ই মনে হত তার পায়ের শব্দ কাছে থেকে কাছে আসছে — তার পর তা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসত। একসময় মিলিয়ে যেত অন্যদের পায়ের শব্দের ভীড়ে। আমি চাকরের ছেলেকে ঘৃণা করতাম। তার জুতোর নীচে কাপড়েব শব্দ জিজুনের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। পাশের বাড়ীর মেয়েলী পুরুষটাকেও ঘৃণা করতাম। সে মুখে ক্রীম মাখত এবং প্রায়ই নতুন চামড়ার জুতো পরত। তার পায়ের শব্দ প্রায়ই জিজুনের পায়ের শব্দের মত শোনাত।

তার রিক্‌শা কি উল্টে গেছে? সে কি ট্রামের ধাক্কায় আহত হয়েছে?

মাথায় হ্যাট পরে তাকে দেখতে যাব এমন সময় মনে পড়ে তার চাচা মুখের ওপর আমাকে গালি দিয়েছে।

হঠাৎ হয়ত শুনতে পাই সে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে এবং যে সময়ে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য বাইরে যাব ততক্ষণে সে মুখেহাসি নিয়ে উইস্টারিয়া পেরিয়ে গেছে। বোধ হয় চাচার বাড়ীতে তার সঙ্গে খুব একটা খারাপ ব্যবহার করা হয়নি। আমি শান্ত হয়ে আসব, এবং এক মুহূর্ত চুপচাপ দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকার পর পরিবারের অত্যাচার, ঐতিহ্য মুছে ফেলা, নারী পুরুষের সমতা, ইবসেন, রবীন্দ্রনাথ, শেলী প্রভৃতি সম্পর্কে আমার কথার শব্দে সেই জীর্ণ কামরাটি ভরে ওঠবে...... সে মাথা নাড়বে, হাসবে, চোখে থাকবে শিশুর মত অবাক বিস্ময়। দেয়ালে টাঙানো ছিল ম্যাগাজিনের পাতা থেকে কাটা শেলীর তামার তৈরী আবক্ষমূর্তির ছবি। এটা শেলীর সবচে ভালো ছবি, কিন্তু যখনই তাকে দেখিয়েছি সে দ্রুত এক নজর দেখেছে, তারপর অস্ব-স্তিতে মাথা নুইয়ে ফেলেছে। এসব ব্যাপারে, জিজুন বোধ হয় নিজেকে পুরনো ধারণা থেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে পারেনি। পরে মনে হয়েছে সাগরে ডুবে যাওয়া শেলী বা ইবসেনের ছবি টাঙানোই বোধ হয় ভালো ছিল। কিন্তু কখনো তা পারি নি। এখন এ ছবিটাও উধাও হয়ে গেছে।

"আমিই আমার কর্ত্রী। আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কারো কোন অধি-কার নেই।"

কিছুক্ষণ নীরব চিন্তার পর সে পরিষ্কার, দৃঢ় ও গম্ভীরভাবে এই কথাগুলো

বলে—আমরা তার এখানে বসবাসকারী চাচা ও গ্রামে বসবাসকারী বাবার সম্পর্কে আলাপ করছিলাম। তখন আমরা একে অপরকে ছয়মাস ধরে চিনি। ততদিনে আমি তাকে আমার দৃষ্টিভঙ্গি, আমার জীবনে যা ঘটেছে, আমার ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা সব বলেছি। আমি খুব সামান্যই গোপন করেছি, সে আমাকে পুরোপুরি বুঝেছে। তার এই সামান্য কটি কথা আমার হৃদয়ের গভীরে আলোড়ন তোলে এবং তার পর বহুদিন আমার কানে বাজে। হতাশাবাদীরা যেভাবে দেখেছে চীনা মহিলারা ততখানি অকর্মণ্য নয়, এবং অদূর ভবিষ্যতে তাদের পুরো মর্যাদায় দেখতে পাব—এটা জানতে পেরে এক অব্যক্ত আনন্দে আমার মন ভরে যায়।

যতবার তাকে বিদায় জানিয়েছি, ততবার কয়েক কদম পেছনে ছিলাম। বুড়োর গোঁফওয়ালা মুখ সবসময় ময়লা জানালার সঙ্গে সেঁটে থাকত, তাই নাকটাও চ্যাপ্টা হয়ে যেত। বাইরের উঠোনে পৌঁছলে দেখতাম উজ্জ্বল কাঁচের জানালার পাশে সেই ছোট্ট মানুষটার মুখ, ক্রীম মাখা। ডাইনে-বাঁয়ে না তাকিয়ে গর্বভরে হেঁটে গিয়ে জিজুন তাদের দেখত না। আমিও গর্বভরে হেঁটে ফিরে আসতাম।

"আমি আমার কর্ত্রী। আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কারো কোন অধিকার নেই।" এ ব্যাপারে সে পুরোপুরি মন ঠিক করে ফেলেছে। আমাদের দু'জনের মধ্যে সে সবচে পরিষ্কার এবং দৃঢ়। আধা কৌটা ক্রীম বা চ্যাপ্টা নাক সম্পর্কে সে কি পরোয়া করে?

এখন পরিষ্কারভাবে মনে করতে পারি না তার জন্যে আমার সত্যিকারের, আবেগময় ভালোবাসা কিভাবে প্রকাশ করেছিলাম। শুধু এখনই নয়—এটা ঘটার পর পরই আমার স্মৃতি খুব ভোঁতা হয়ে যায়। রাত্রে যখন ভাবতাম তখন যা বলেছি তার সামান্যই মনে করতে পারতাম; তার পর একত্রে থাকতে শুরু করার দু এক মাস পর এই টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলোও স্বপ্নের মত উধাও হয়ে যায়। আমার শুধু মনে পড়ে কিভাবে পনেরো দিন আগে কি বলতে হবে, কি করতে হবে, এবং প্রত্যাখ্যাত হলে মনের অবস্থা কি হবে তার মহড়া দিয়েছিলাম। কিন্তু ঠিক সময়ে তার কোন প্রয়োজন হয়নি। উত্তেজনায়, সিনেমায় যা দেখেছি অবচেতনভাবে তাই করেছি। এ কথা মনে পড়লে ভীষণ লজ্জা পায়, কিন্তু শুধু এটুকুই পরিষ্কার মনে করতে পারি। এমনকি এখন পর্যন্ত অন্ধকার ঘরে নিঃসঙ্গ একটি বাতির মত এটা আমাকে পথ দেখায়। অশ্রুসজল চোখে আমি তার হাত জড়িয়ে ধরি, তার পর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ি......।

সে সময় জিজুনের প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত আমি পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করি নি। শুধু

জানতাম, সে আমাকে গ্রহণ করেছে। মনে পড়ে প্রথমে তার মুখ মলিন তার পর ধীরে ধীরে লালচে হয়ে যায় — আগে যা কখনো দেখি নি বা পরেও না। তার শিশুর মত চোখে দেখা দেয় আশংকা মিশ্রিত দুঃখ এবং আনন্দের দুটা। বিভ্রান্তিতে সে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে চায়, যেন জানালা দিয়ে উড়ে যেতে ভালো লাগবে। তার পর বুঝতে পারি সে রাজী হয়েছে, জানিনা সে কি বলেছে বা আদৌ কিছু বলেছে কিনা।

তার অবশ্য সব কিছু মনে ছিল। আমি যা বলেছি সে একটানা বলতে পারত, যেন মুখস্থ করেছে। সে আমার প্রতিটি আচরণ পুংখানুপুংখ বর্ণনা করে, যেন চোখের সামনে ছবি দেখছি। এর মাঝে সিনেমার সেই দৃশ্যও ছিল যা ভুলে যেতে আগ্রহী ছিলাম। রাতের বেলা যখন সব নীরব, তখন আমাদের সময় হত পর্যালোচনার। আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন ও পরীক্ষা করা হোত, বলা হত সেই অনুষ্ঠানে যা যা বলা হয়েছে তা স্মরণ করার জন্য, কিন্তু প্রায়ই সে শূন্যস্থান পূরণ করত বা আমার ভুল শুধরে দিত, যেন আমি নীচু মানের ছাত্র।

ধীরে ধীরে এ সব পর্যালোচনা কমে আসে এবং দূরে চলে যায়। কিন্তু যখনই দেখেছি সে নরম চোখে টোল পড়া গালে শূন্যে তাকিয়ে আছে তখনই মনে হয়েছে সে সেই পুরনো পাঠ স্মরণ করছে। ভয় হত সে সিনেমা থেকে নকল করা আমার হাস্যকর অভিনয় দেখছে। আমি জানতাম, সে তা অবশ্যই দেখতে চাইবে, বা দেখার জন্য জেদ করবে।

কিন্তু সে এটাকে হাস্যকর মনে করেনি। যদিও আমার মনে হয়েছে হাস্যকর বা অপমানজনক, তার মোটেও তা মনে হয়নি। জানতাম, এর কারণ সে আমাকে গভীর আবেগে ভালোবাসে।

গত বছরের বসন্তের শেষ দিকটা সবচে সুখের ও ব্যস্ত সময়। আমি তখন অনেক শান্ত এবং আমার মনের একটা অংশ শরীরের মতই সক্রিয়। এটা তখনকার কথা যখন আমরা একত্রে বাইরে যেতে শুরু করি। আমরা বেশ কয়েকবার পার্কে গিয়েছি, কিন্তু প্রায়ই গিয়েছি বাড়ী খোঁজার জন্য। পথে সব সময় উন্মুখ দৃষ্টি, ব্যঙ্গাত্মক হাসি অথবা অপমানজনক চাহনির ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিলাম। মনে হত, সতর্ক না হলে কাঁপুনি ধরে যাবে। প্রতি মুহূর্তে নিজের স্বার্থে আমার সকল গর্ব এবং ঔদ্ধত্য স্মরণ করতে হত। এসব ব্যাপারে সে ছিল নির্ভীক এবং একেবারে অভেদ্য। ধীরে ধীরে এগোত, এত ধীরে যেন চোখের সামনে কেউ নেই।

বাড়ী খুঁজে পাওয়া খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন না

কোন ছুতায় আমাদের নিষেধ করা হোত। আর কিছু কিছু আমরা নিজেরাই বাদ দিয়েছি উপযুক্ত নয় বলে। প্রথম দিকে আমরা খুব খুঁৎখুঁতে ছিলাম — বিশেষভাবে খুঁৎখুঁতে নয় কেননা অধিকাংশ বাড়ীতেই আমরা বাস করতে পারতাম না। পরে, সব কিছু সহ্য করে নেয়ার কথা বলি। একটা বাড়ী পাবার আগে আমরা বিশটির বেশী বাড়ী দেখেছি — জিযাও গলির উত্তরমুখী দু কামরার ছোট্ট একটা বাড়ী। বাড়ীওয়ালা ক্ষুদে সরকারী চাকুরে, কিন্তু বুদ্ধিমান। তিনি শুধু মাঝের এবং পাশের কামরাগুলো দখলে রেখেছেন। তাঁর পরিবারে ছিল স্ত্রী, কয়েকমাসের একটি বাচ্চা এবং গ্রাম থেকে আনা একটি চাকরানী। ছেলেটি যতক্ষণ না কাঁদবে, সবকিছু বেশ শান্ত থাকবে।

সাধারণ কথা, আসবাবপত্র কিনতেই আমার জমানো টাকার অনেকটা চলে যায়, এবং জিজুনও তার সোনার আংটি ও কানের দুল বিক্রী করে দিয়েছে। আমি তাকে বাধা দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে পীড়াপীড়ি করায় আমি ব্যাপারটা নিয়ে চাপ দেই নি। আমি জানতাম, ঘরের ব্যাপারে অংশ না থাকলে সে অস্বস্তি বোধ করবে।

ইতোমধ্যে সে চাচার সঙ্গে ঝগড়া করেছে — আসলে তিনি এত রেগে গিয়েছেন যে তাঁকে ত্যাজ্য করেছেন। আমিও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি — তারা ভেবেছে আমাকে ভাল পরামর্শ দিচ্ছে, আসলে তারা আমার হয়ে ভয় পেত বা হিংসে করত। তবু, আমরা খুব শান্ত ছিলাম। অফিস থেকে বেরুনোর সময় সন্ধ্যা হয়ে এলেও এবং রিক্সাওয়ালা ধীরে ধীরে চললেও, শেষ পর্যন্ত সময় আসত যখন আমরা আবার একত্র হতাম। প্রথমে আমরা নীরবে একে অপরের দিকে তাকাতাম, তার পর গা এলিয়ে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করতাম, শেষ পর্যন্ত বিশেষ কিছু চিন্তা না করে মাথা নত করে চুপ হয়ে যেতাম। ধীরে ধীরে আমি বইয়ের মত তার শরীর, মন পড়তে শিখি। মাত্র তিন সপ্তাহে তার সম্পর্কে অনেক কিছু জানি এবং প্রথমে অজানা কিন্তু পরে উপলব্ধি করা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান সত্যিকার প্রতিবন্ধক অতিক্রম করি।

দিন যেতে যেতে জিজুন আরো জীবন্ত হয়ে ওঠে। সে ফুল পছন্দ করত না। আমি মেলায় দুটি ফুলের টব কিনেছিলাম কিন্তু চারদিন পর অযত্নে সেগুলো ঘরের কোণে শুকিয়ে যায়। সবকিছু দেখার মত সময় আমার ছিল না। সে জীবজন্তু ভালোবাসত, হয়ত সরকারী কর্মচারীর বউয়ের কাছ থেকে পেয়ে থাকবে। এবং এক মাসের কম সময়ে আমাদের পরিবারের সংখ্যা বেড়ে যায়। আমাদের চারটি মুরগীর বাচ্চা বাড়ীওয়ালীর একডজনের সঙ্গে উঠোনে জায়গা করে নেয়। কিন্তু দুই গিন্নীই সেগুলো আলাদা করতে পারত, নিজেরটা চিনে

নিতে পারত। এ ছাড়া ছিল মেলায় কেনা একটি চিত্রা কুকুর। আমার বিশ্বাস তার একটা নাম ছিল, কিন্তু জিজুন তাকে একটা নতুন নাম দেয়—আস্নুই। নামটা পছন্দ না হলেও আমিও ডাকতাম আস্নুই।

এটা সত্যি যে প্রতিনিয়ত ভালোবাসার নবায়ণ দরকার, বেড়ে ওঠা উচিত এবং সৃষ্টি করা উচিত। যখন একথা জিজুনকে বলতাম সে বুঝতে পেরে মাথা নাড়ত।

আহা, সে সন্ধ্যাগুলো কত শান্ত, মধুর ছিল।

সুখ এবং শান্তি সংহত করতে হয় যাতে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। যখন আমরা হোষ্টেলে ছিলাম তখন মাঝেমধ্যে মত পার্থক্য বা ভুলবোঝাবুঝি হত, কিন্তু জিযাও গলিতে যাওয়ার পর এই সব সামান্য মতবিরোধও উবে যায়। আমরা বাতির আলোয় একে অপরের মুখোমুখি বসে স্মৃতিচারণ করতাম, ঝগড়াঝাঁটির পর যে মিলন তার আনন্দ উপভোগ করতাম।

জিজুনের শরীরে মেদ জমে এবং তার গাল গোলাপী হয়ে ওঠে, কিন্তু দুর্ভাগ্য সে খুব ব্যস্ত ছিল। সংসারের ব্যস্ততায় তার কথা বলার সময় ছিল না, বই পড়া বা বাইরে বেরুনোর সময় ছিল আরো কম। প্রায়ই বলতাম আমাদের একটা চাকরানী পেতে হবে।

আরেকটা জিনিষ আমাকে বিব্রত করত। সন্ধ্যায় যখন ফিরে আসতাম দেখতাম সে অশান্তি লুকানোর চেষ্টা করছে। এর চেয়ে বেশী খারাপ লাগত যখন দেখতাম সে জোর করে হাসার চেষ্টা করছে। ভাগ্যভালো, আবিষ্কার করতে পারি এর কারণ ক্ষুদে কর্মচারীর বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া এবং ঝগড়ার কারণ মুরগীর বাচ্চা। কিন্তু সে আমাকে বলবেনা কেন? লোকজনের নিজের বাড়ী থাকা দরকার। এটা কোনভাবেই বাস করার জায়গা নয়।

আমার নিজেরও রুটিন ছিল। সপ্তাহের ছয়দিন আমি বাড়ী থেকে অফিস, অফিস থেকে বাড়ী আসা-যাওয়া করতাম। অফিসে টেবিলে বসে বিরামহীন সরকারী দলিল এবং চিঠিপত্র নকল করতাম। বাড়ীতে তাকে সঙ্গ দিতাম অথবা চুলো জ্বালাতে, ভাত রাঁধতে অথবা রুটি বানাতে সাহায্য করতাম। এটা ঘটে যখন আমি রান্না করতে শিখি।

তবু, হোষ্টেলের চেয়ে অনেক ভালো খেয়েছি। রান্না-বান্না জিজুনের খুব একটা রপ্ত না থাকলেও সে মনে-প্রাণে তা করার চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে তার বিরামহীন উদ্বেগ আমাকেও উদ্বিগ্ন করে তোলে এবং এভাবেই আমরা একত্রে টক মিষ্টির স্বাদ গ্রহণ করি। সে সারা দিন রান্না নিয়েএত খাটুনি করত

যে ঘামে তার ছোটচুল মাথায় লেগে যেত এবং তার হাত কর্কশ হয়ে ওঠে।

তারপর তাকে মুরগীছানা ও আস্তুই খাওয়াতে হত...... অন্য যে কেউ এটা করতে পারত না।

আমি তাকে বলেছি, এভাবে কাজ করে হাড়্ডিসার হয়ে যাওয়ার চেয়ে আমি বরং খাব না। সে টুঁশব্দ না করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, অনেকটা চিন্তিতভাবে, এবং ভালোভাবে খুব একটা বলতে পারি নি। তবু সে আগের মতই কঠোর খাটুনি খাটতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত আঘাতটি আসে ডাবল টেন্‌থ উৎসবের আগের সন্ধ্যায় আমি চুপচাপ বসে ছিলাম আর সে থালাবাসন পরিষ্কার করছিল। এমন সময় দরজায় শব্দ শুনতে পাই। দরজা খুলে দেখতে পাই অফিসের ম্যাসেঞ্জার, সে আমার হাতে একটি স্লিপ দেয়। বুঝতে পারি এটা কি। আলোয় নিয়ে দেখতে পাই সত্যিই লেখা আছে :

কমিশনারের আদেশে,
শি জুয়ানশেংকে বরখাস্ত করা হোল।

সচিবালয়।
৯ অক্টোবর।

আমরা হোষ্টেলে থাকার সময়ই এটা অনুমান করতে পেরেছিলাম। সেই মুখে ক্রীমওয়ালা ছিল কমিশনারের ছেলের জুয়াড়ী বন্ধুদের একজন। সে গুজব ছড়াতে এবং গোলমাল পাকাতে বাধ্য। আমি শুধু অবাক হয়েছি এটা আগে ঘটেনি। আসলে এটা কোন আঘাত ছিল না, কেননা ইতোমধ্যে ঠিক করে ফেলেছি কোথাও কেরানী হিসেবে কাজ করতে বা পড়াতে পারব। অথবা যদিও কষ্টকর হবে, কিছু অনুবাদের কাজ করতে পারব। আমি «স্বাধীনতার বন্ধু» পত্রিকার সম্পাদককে জানতাম এবং কয়েক মাস আগে তাঁর সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করেছিলাম। আগের মতই, আমার বুক কাঁপতে থাকে। যেটা সবচে পীড়া দেয় তাহল ভয়হীন জিজুনেব পর্যন্ত মুখ শুকিয়ে যায়। মনে হচ্ছে সে সম্প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

সে বলল : "এতে কি হয়েছে? আমরা নতুন করে শুরু করব, নয় কি? আমরা......"

সে শেষ করেনি, মনে হল গলা ধরে এসেছে। বাতিও অস্বাভাবিক মৃদু মনে

হল। মানুষ সত্যিই হাস্যকর প্রাণী, এত ক্ষুদ্র ব্যাপারে ভেঙে পড়ে। প্রথমে আমরা নীরবে একে অপরের দিকে তাকাই, তার পর কি করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা শুরু করি। শেষ পর্যন্ত ঠিক করি জমানো টাকা দিয়ে যত খানি সম্ভব হিসেব করে চলব। কাগজে কেরানীগিরি বা মাষ্টারীর জন্য বিজ্ঞাপন দেব। একই সঙ্গে আমার বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যা করে «স্বাধীনতার বন্ধু» সম্পাদকের কাছে লিখব এবং এই বিপদে আমাকে সাহায্য করার জন্য একটি অনুবাদ গ্রহণ করতে বলব।

"যেমন কথা তেমন কাজ। চল, আমরা নতুন করে শুরু করি।"

আমি সোজা টেবিলে যাই এবং তেল ও ভিনিগারের শিশি সরিয়ে রাখি। জিজুন নিয়ে আসে মৃদু বাতি। প্রথমে বিজ্ঞাপনটি লিখি, তারপর অনুবাদের জন্য কিছু বই নির্বাচিত করি। বাড়ী বদলের পর বইগুলো উল্টে দেখিনি এবং প্রতিটি বইয়ে ধূলার আস্তর পড়েছে। সবশেষ চিঠিটি লিখি।

অনেকক্ষণ চিঠির শব্দ নিয়ে ইতস্ততঃ করি এবং চিন্তা করার জন্য লেখা বন্ধ করে মৃদু আলোয় তার দিকে তাকিয়ে দেখি, তাকে আবার গভীর চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছে। আমি কখনো কল্পনা করিনি এরকম একটা ক্ষুদ্র ব্যাপার জিজুনের মত দৃঢ় ও সাহসী একজনের ভেতর এত বড় পরিবর্তন আনতে পারে। সে সম্প্রতি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে — ব্যাপারটা শুধু সে সন্ধ্যায় শুরু হয়নি। এটা আমাকে আরো দমিয়ে দেয়। হঠাৎ আমার সামনে একটা শান্তজীবন ভেসে ওঠে — চোখের সামনে ভেসে ওঠে হোষ্টেলের সেই জীর্ণ কামরার নীরবতা। ভালো করে তাকিয়ে দেখব এমন সময় নিজেকে আবার আবিষ্কার করি সেই মৃদু আলোয়।

অনেকক্ষণ পর চিঠিটি শেষ হয়। খুব দীর্ঘ চিঠি। লেখার পর এত ক্লান্ত হয়ে পড়ি যে উপলব্ধি করি সম্প্রতি আমিও দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমরা ঠিক করি পরদিন বিজ্ঞাপনটি পাঠিয়ে দেব এবং চিঠিটি ডাকে দেব। তার পর নীরবে এক সঙ্গে উঠে দাঁড়াই, যেন একে অপরের শক্তি ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কে সচেতন এবং এই নতুন যাত্রা থেকে নতুন আশার আলো দেখতে পাই।

আসলে বাইরে থেকে এই আঘাত আমাদের ভেতর নতুন শক্তি জোগায়। অফিসে আমি খাঁচার ভেতর বুনো পাখীর মত ছিলাম, বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট দানা-পানি মিলত, কিন্তু মেদ জমার জন্য যথেষ্ট নয়। সময়ে এটা পাখার ব্যবহার হারিয়ে ফেলবে যাতে কখনো খাঁচার বাইরে এলেও আর উড়তে না পারে। এখন, যে কোন মূল্যে আমি খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছি এবং অবিলম্বে নতুন-ভাবে মুক্ত আকাশে ভেসে বেড়াতে হবে, যাতে পাখা নাড়তে পারি।

অবশ্য সরাসরি একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন থেকে আমরা কোন ফলাফল আশা করতে পারি না। আবার অনুবাদও খুব সহজ কাজ নয়। কিছু পড়ার সময় মনে হয় তা বুঝতে পারছেন, কিছু অনুবাদের সময় সর্বত্র সমস্যা দেখা দেয় এবং খুব ধীরে ধীরে কাজ এগোয়। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করার কথা ঠিক করি। পনেরো দিনেরও কম সময়ে একটি প্রায় নতুন অভিধানের কিনারা আমার আঙ্গুলের ছাপে কালো হয়ে যায়, বোঝা যায় কত গুরুত্ব সহকারে আমি আমার কাজকে গ্রহণ করেছি। «স্বাধীনতার বন্ধু» সম্পাদক জানান তাঁর পত্রিকা কখনো একটি ভালো পাণ্ডুলিপি উপেক্ষা করবে না।

কপাল মন্দ, এমন কোন কামরা ছিল না যেখানে শান্তিতে বসা যায় এবং জিজুন আগের মত এত শান্ত বা সহানুভূতিশীল ছিল না। আমাদের কামরাটি থালাবাসন এবং ধোঁয়ায় এত ভর্তি ছিল যে সেখানে বসে ধীরে সুস্থে কাজ করা অসম্ভব ছিল। অবশ্য এজন্যে আমার নিজেকেই দোষ দেয়া উচিত — পড়ার ঘরের ব্যবস্থা করার ক্ষমতা নেই সেটা আমারই দোষ। তাছাড়া রয়েছে আস্থই এবং মুরগীর ছানা। মুরগীর ছানাগুলো এখন মুরগী হয়েছে এবং দু পরিবারের মধ্যে আগের চেয়ে অনেক বেশী ঝগড়ার ছুতো হয়েছে।

এ ছাড়া রয়েছে প্রতিদিন খাওয়ার অন্তহীন ব্যাপার। মনে হয় জিজুনের সমস্ত প্রচেষ্টা আমাদের খাওয়ার ব্যাপারে নিবেদিত। মানুষ খাওয়ার জন্য বাঁচে, এবং বাঁচার জন্য খায়, একই সঙ্গে আস্থই এবং মুরগীগুলোকেও খাওয়াতে হয়। আপাত দৃষ্টিতে মনে হত সে যা শিখেছে সব ভুলে গেছে এবং বুঝত না খাওয়ার জন্য ডেকে আমার চিন্তার স্রোতে বাধা দিচ্ছে। যদিও আমি বসেছি, মাঝে মাঝে অসন্তোষ দেখিয়েছি, কিন্তু কোন নজর দিত না এবং কোন উদ্বেগ ছাড়া খেয়ে চলত।

আমার কাজের কারণে নিয়মিত খাওয়া দাওয়া অসম্ভব এটা বুঝতে তার পাঁচ সপ্তাহ লাগে। যখন উপলব্ধি করতে পারে তখন বোধহয় বিরক্ত হয়েছিল, কিন্তু কিছুই বলেনি। তার পর আমার কাজ দ্রুত এগোতে থাকে এবং সহসাই আমি ৫0,000 শব্দ অনুবাদ করে ফেলি। আমাকে শুধু পাণ্ডুলিপি মাজাঘষা করতে হবে এবং আরো দুটি ছোট লেখার সঙ্গে «স্বাধীনতার বন্ধু» সম্পাদকের কাছে পাঠানো যায়। খাওয়ার ব্যাপারটা মাথা ব্যথা রয়ে গেছে। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কিছু যায় আসেনা, কিন্তু পরিমাণ যথেষ্ট ছিল না। এখন সারাদিন বাড়ীতে বসে মাথার কাজ করি আগের চেয়ে ক্ষিধে আরো কমে গেছে। খাসী গোস্তের সঙ্গে মিশিয়ে আস্থইকে ভাত দেয়া হত বলে যথেষ্ট ভাতও থাকত না। সম্প্রতি তা'ও প্রায়ই কপালে জুটছে না। সে বলত আস্থই এত শুকিয়ে গেছে যে দেখে খারাপ

লাগে এবং বাড়ীওয়ালী আমাদের ভেংচি কাটে। সে উপহাস সহ্য করতে পারত না।

তাই শুধু মুরগীগুলো আমার উচ্ছিষ্ট খেতে পেত। এটা উপলব্ধি করতে অনেক সময় লাগে। আমি খুব সচেতন ছিলাম। যাহোক, বুঝতে পারি — "এ পৃথিবীতে আমার অবস্থান" হাকসলীর ভাষায় "কুকুর এবং মুরগীর মাঝামাঝি কোথাও।"

পরে, অনেক তর্কবিতর্ক এবং পীড়াপীড়ির পর মুরগীগুলো আমাদের টেবিলে আসতে থাকে। দশদিনের বেশী আমরা ও আস্থুই তা উপভোগ করি। এগুলো খুব শুকনো ছিল, কেননা অনেকদিন ধরে প্রতিদিন সামান্য সরগম পেয়েছে। এর পর জীবন আরো শান্তিপূর্ণ হয়ে পড়ে। শুধু জিজুনকে মনে হয়ে মনমরা এবং তাদের অভাবে দুঃখিত। সে গোমড়া-মুখো হয়ে পড়ে। মানুষ কত সহজে বদলে যায়!

যাহোক, আস্থুইকেও ত্যাগ করতে হয়। কোথাও থেকে চিঠির আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম এবং কুকুরটিকে পেছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে তাকিয়ে রাখার মত খাবার জিজুনের অনেকদিন ছিল না। উপরন্তু শীত দ্রুত এগিয়ে আসছে, এবং জানতাম না উনুনের ব্যাপারে কি করতে হবে। তার ক্ষিধে অনেকদিন ধরে একটা বিরাট বোঝা, এ ব্যাপারে আমরা খুব সচেতন ছিলাম। তাই কুকুরটাকেও চলে যেতে হয়।

যদি গলায় দড়ি দিয়ে বাজারে বিক্রীর জন্য নিয়ে যেতাম তাহলে হয়ত কিছু পয়সা পাওয়া যেত। কিন্তু আমরা কেউ সেটা করতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত মাথায় কাপড় দিয়ে তাকে পশ্চিম দরজার বাইরে নিয়ে ছেড়ে দেই। যখন আমার পেছনে দৌড়ে আসে তখন ধাক্কা দিয়ে এক অগভীর গর্তে ফেলে দেই।

বাড়ী ফিরে দেখি পরিবেশ আরো শান্ত। কিন্তু জিজুনের বেদনা দেখে অবাক হয়ে যাই। তাকে কখনো এত বিষন্ন দেখিনি। এটা আস্থুইর কারণে, কিন্তু ব্যাপারটা এত গভীরভাবে নেয়ার কি আছে? আমি কুকুরটিকে গর্তে ফেলে দেয়ার কথা তাকে বলিনি।

সে রাতে তার অভিব্যক্তিতে একটা নিষ্প্রাণ ভাব ধরা পড়ে।

না বলে পারলাম না, "সত্যিই, জিজুন, তোমার আজ কি হয়েছে?"

"কি?" সে আমার দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

"তোমাকে এত দেখাচ্ছে ......"

"কিছুই না — কিছুই না"

শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারি সে আমাকে নিষ্ঠুর ভেবেছে। আসলে, আমি যখন একা ছিলাম তখন ভালই ছিলাম, যদিও পারিবারিক বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে আমার ভীষণ গর্ব ছিল। কিন্তু নতুন বাড়ীতে আসার পর পুরনো সব বন্ধুদের কাছ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। তবু, এসব থেকে ছাড়া পেতে পারলে আমার কাছে অনেক রাস্তা খোলা ছিল। এখন তার জন্যে আমাকে এসব কষ্ট করতে হচ্ছে — বিশেষ করে আসুইকে তাড়ানোটা ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সেটা বোঝার ব্যাপারেও জিজুনকে এখন বুদ্ধু মনে হচ্ছে।

যখন সুযোগ বুঝে তাকে এটা বোঝাতে চেয়েছি তখন সে বুঝতে পারার মত মাথা নেড়েছে। কিন্তু তার পরবর্তী ব্যবহারে বোঝা যায় সে এটা গ্রহণ করেনি বা আমাকে বিশ্বাস করেনি।

ঠাণ্ডা আবহাওয়া এবং তার শীতল চাহনির ফলে বাড়ীতে থাকা দায় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কোথায় যেতে পারি? তার শীতল চাহনি এড়িয়ে রাস্তা অথবা পার্কে যেতে পারি কিন্তু বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস দেহে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত পাবলিক লাইব্রেরীতে স্বর্গের সন্ধান পাই।

বিনামূল্যে প্রবেশ করা যায় এবং পাঠকক্ষে দুটি চুলো আছে। আগুন খুব হাল্কা হলেও, উনুনের আগুন দেখেই আমার গরম লাগে। পড়ার মত কোন বই নেই, পুরনোগুলো অচল, এবং বলতে গেলে নতুন কোন বই নেই।

কিন্তু পড়ার জন্য আমি সেখানে যাই নি। সেখানে আমার মত আরো কিছু লোক ছিল, কখনো কখনো এক ডজন। প্রত্যেকের পরণেই আমার মত স্বল্প কাপড়। ঠাণ্ডা থেকে দূরে থাকার জন্য আমরা পড়ার ভান করি। এটা ভালো হয়। পথে হয়ত আপনার সঙ্গে এমন লোকের দেখা হয় যারা আপনার দিকে ঘৃণাভরে তাকায়, কিন্তু এখানে সে ধরণের কোন ঝামেলা নেই। কেননা আমার সব পরিচিতেরা অন্য উনুনের পাশে জড়ো হয়েছে বা নিজের বাড়ীর উনুনের সামনে বসে আগুন পোহাচ্ছে।

পড়ার মত বই না থাকলেও, চিন্তা করার মত নীরবতা পেয়েছিলাম। সেখানে একা বসে অতীত সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে বুঝতে পারি গত ছয় মাস ভালোবাসা — অন্ধ ভালোবাসার — জন্য আমি জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষা করেছি। সর্বপ্রথমে আসে জীবন ধারণের কথা। ভালোবাসার আগে জীবন ধারণের ব্যবস্থা করতে হয়। যারা সংগ্রাম করে তাদের জন্য একটা পথ খোলা থাকা উচিত এবং আমি এখনো পাখা নাড়া ভুলে যাই নি, যদিও আগের চেয়ে অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছি......।

ঘর এবং পাঠক ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসে। দেখতে পাই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে জেলে, ট্রেঞ্চে সৈনিক, গাড়ীতে সম্মানিত ব্যক্তি, ষ্টক একসচেঞ্জে দালাল, পাহাড়ী বনে বীর, মঞ্চে শিক্ষক, অন্ধকারে নিশাচর ও চোর।......জিজুন বহু দূরে। আসুইর ব্যাপারে রাগ করে এবং রান্নায় মজে গিয়ে সে তার সমস্ত সাহস হারিয়ে ফেলেছে। অবাক ব্যাপার হচ্ছে তাকে বিশেষভাবে শুকনো দেখাচ্ছে না......।

ঠাণ্ডা বাড়ে। উনুনের ধীরে জ্বলা শক্ত কয়লা পুড়ে গেছে, এবং বন্ধ হওয়ার সময় হয়ে এসেছে। সেই শীতল চাহনির মোকাবেলা করতে আমাকে জিযাও গলিতে ফিরে যেতে হবে। সম্প্রতি আমি কখনো কখনো উষ্ণতা অনুভব করেছি, কিন্তু সেটা আমার মেজাজ আরো বিগড়ে দেয়। মনে পড়ে এক সন্ধ্যায় যে শিশু-সুলভ চাহনি অনেকদিন দেখিনি তা হোষ্টেলের একটি ঘটনার কথা হাসি দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়ার সময় জিজুনের চোখে ভেসে ওঠে। কিন্তু তার চোখে সবসময় একটা ভীতির চাহনিও ছিল। সম্প্রতি তার চেয়ে বেশী আমি তার সঙ্গে নিষ্প্রাণ ব্যবহার করেছি, এটা তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। কখনো কখনো তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য জোর করে কথা বলেছি বা হেসেছি। কিন্তু আমার হাসি ও কথার শূন্যতা ঘৃণিত বিদ্রূপের মত যে ভাবে আমার কানে প্রতিধ্বনিত হয়েছে তা সহ্যের বাইরে।

জিজুনও হয়ত এটা অনুভব করে থাকবে, কেননা এর পর সে কাঠের মত জড়তা হারিয়ে ফেলে এবং লুকানোর শত চেষ্টাতেও মাঝে মাঝে উদ্বেগ প্রকাশ করে। সে আরো সোহাগের সঙ্গে আমার দেখাশোনা করতে থাকে।

আমি সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সাহস ছিল না। যখনই কথা বলার জন্য মন ঠিক করেছি, সেই শিশুসুলভ চাহনি আমাকে আপাততঃ হাসতে বাধ্য করেছে। কিন্তু আমার হাসি আমাকেই ব্যঙ্গ করে এবং আমার নিষ্প্রাণ ভাব কেটে যায়।

তার পর সে পুরনো প্রশ্ন তুলতে ও নতুন পরীক্ষা করতে শুরু করে। তার প্রতি ভালোবাসা দেখানোর জন্য বাধ্য হয়ে আমি মেকী জবাব দেই। ভণ্ডামি আমার হৃদয়ে গাঁথা হয়ে যায়, এবং মিথ্যার চাপে দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে। আমার বিষন্নতায় প্রায়ই অনুভব করতে থাকি সত্য বলার জন্য যথেষ্ট সাহস দরকার, যে মানুষের সাহসের অভাব এবং ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়েছে সে কখনো নতুন পথের সন্ধান পাবে না। আরো সত্য হচ্ছে, সে বেঁচে থাকতে পারেনা।

তার পর জিজুনকে বিক্ষুব্ধ দেখাতে শুরু করে। প্রথমবার ঘটে এক সকালে

খুব তীব্র শীতের সকালে, অথবা আমি তাই কল্পনা করেছিলাম। ঘৃণায় মিইয়ে গিয়ে আমি গোপনে নিজে নিজে হাসি। সে যত মতবাদ, বুদ্ধিদীপ্ত নির্ভীক কথা শিখেছে সবকিছু ফাঁকা। তবু সে সেটা জানত না। অনেক আগে সে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে এবং বুঝতে পারেনি জীবনে প্রথম কাজ হচ্ছে জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা। এবং এটা করতে হলে লোকজনকে হাতে হাত মিলিয়ে অথবা একা এগিয়ে যেতে হবে। সে শুধু জানে অন্যের আঁচল ধরে থাকতে। এতে সংগ্রামীর জন্য সংগ্রাম কষ্টকর হয় এবং উভয়ের ধ্বংস ডেকে আনবে।

বুঝতে পারি আমাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ ছাড়াছাড়ি। তাকে একটা সুস্পষ্ট ছাড়াছাড়ি করতে হবে। হঠাৎ তার মৃত্যুর কথা ভাবি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা পাই এবং নিজেকে গাল দেই। কপালভালো তখন সকাল, এবং তাকে সত্য বলার মত অনেক সময় রয়েছে। এর ওপরেই নির্ভর করছে আমাদের নতুনভাবে শুরু করা বা না করা।

আমি ইচ্ছে করে অতীতকে টেনে আনি। সাহিত্যের বিদেশী লেখক ও তাঁদের লেখা, ইবসেনের «পুতুলের সংসার» এবং «সাগর ফেরা নারী»-র কথা বলি। সাহসের জন্য নোরার প্রশংসা করি . . . . . . আগের বছর এর সব কিছুই হোষ্টেলের সেই জীর্ণ কামরায় বলা হয়েছে, কিন্তু এখন সবকিছু ফাঁকা মনে হচ্ছে। মুখ থেকে কথা বেরিয়ে যাবার সময় নিজেকে এই সন্দেহ থেকে মুক্ত করতে পারলাম না যে আমার পেছনে এক অদৃশ্য দুরন্ত শিশু রয়েছে যে তোতাপাখীর মত আমার কথা নকল করছে।

সে শোনে, মাথা নাড়ে, তার পর চুপ করে থাকে। যা বলার ছিল তড়িঘড়ি করে শেষ করি এবং আমার কণ্ঠ শূন্যতার ভেতর হারিয়ে যায়।

আর একবার নীরবতার পর সে বলে : "হ্যাঁ, কিন্তু জুয়ানশেং, আমার মনে হয় সম্প্রতি তুমি অনেকখানি বদলে গেছ। ঠিক কিনা ? আমাকে বল।"

এটা ছিল আঘাত, কিন্তু নিজেকে সামলে নেই এবং আমার মতামত ও প্রস্তাব ব্যাখ্যা করি : নতুনভাবে জীবন শুরু করা এবং একসঙ্গে ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাওয়া।

ব্যাপারটা ভালোভাবে বোঝানোর জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে বলি :

". . . . . . তাছাড়া, দ্বিধা না করে তোমার সাহসে এগিয়ে যাওয়া উচিত। তুমি আমাকে সত্য বলতে বলেছিলে। আমাদের ভণ্ডামি করা উচিত নয়। সত্যি কথা বলতে— কারণ হচ্ছে আমি তোমাকে আর ভালোবাসিনা। আসলে এতে তোমার ভাল হবে, কোন অনুশোচনা ছাড়াই তোমার পক্ষে কাজ করা সহজ হবে . . . . . ."

আমি একটা নাটক আশা করেছিলাম। কিন্তু নীরবতা নেমে আসে। মরা মানুষের মত তার চেহারা ধূসর হয়ে যায়, কিন্তু এক মুহূর্তে সেই রং এবং চোখে শিশুসুলভ চাহনি ফিরে আসে। ক্ষুধার্ত শিশু যেভাবে মা'কে খোঁজ করে সেভাবে সে চারদিকে তাকায়, কিন্তু শুধু শূন্যের দিকে। ভয়ে সে আমার চোখ এড়িয়ে যায়।

এই দৃশ্য সহ্য করা সম্ভব ছিল না। ভাগ্য ভালো, বেলা বেশী বাড়েনি। ঠাণ্ডা হাওয়ার ভেতর জলদি লাইব্রেরীতে চলে যাই।

সেখানে আমার লেখা সবগুলো ছোট প্রবন্ধসহ «স্বাধীনতার বন্ধু» পত্রিকাটি দেখতে পাই। অবাক হয়ে যাই এবং মনে হয় আমার নতুন জীবন ফিরে আসছে। মনে হয়, "আমার সামনে অনেক রাস্তা খোলা আছে। কিন্তু এভাবে চলতে পারে না।"

আমি পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে শুরু করি যাদের সঙ্গে অনেকদিন দেখা করি নি, কিন্তু একবার বা দু'বারের বেশী যাই নি। স্বভাবতঃই তাদের ঘরগুলো গরম, কিন্তু সেখানে মনে হয় হাড়্ডির ভেতর ঠাণ্ডা লাগছে। সন্ধ্যায় বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা একটি ঘরের ভেতর গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকি।

একটি বরফের সুই আমার কলজে ছিদ্র করে দেয়। প্রতিনিয়ত অনুভূতিহীনতার কষ্ট পেতে থাকি। মনে হয়, "আমার সামনে অনেক রাস্তা খোলা আছে। কেমন করে পাখা নাড়তে হয় ভুলে যাই নি।" হঠাৎ তার মৃত্যুর কথা মনে হয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা পাই এবং নিজেকে গাল দেই।

লাইব্রেরীতে প্রায়ই হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত সামনে নতুন পথ দেখতে পাই। কল্পনা করি সে সাহসের সঙ্গে বাস্তবকে মোকাবেলা করেছে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে এই ঠাণ্ডা বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। চলে গেছে, আমার প্রতি কোন বিদ্বেষ না নিয়ে। তার পর মনে হয় মেঘের মত শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি, ওপরে নীল আকাশ, নীচে উঁচু পাহাড় এবং অসীম সাগর, উঁচু দালান কোঠা, যুদ্ধক্ষেত্র, মটর গাড়ী, রাস্তা, ধনী লোকের বাড়ী, কর্মব্যস্ত বাজার এবং অন্ধকার রাত ......

উপরন্তু সত্যি সত্যি মনে হয় হাত বাড়ালেই নতুন জীবন।

যাহোক, আমরা বেইজিংয়ের তীব্র শীত কাটিয়ে দেই। কিন্তু আমরা দুষ্ট ছেলের হাতে বাধা পড়া ড্রাগনমাছি, যে দড়িতে বেধে ইচ্ছে মত ঘোরাচ্ছে। জীবন্ত হলেও অসহায়, সর্বনাশটা শুধু সময়ের ব্যাপার।

জবাব পাবার আগে«স্বাধীনতার বন্ধু» সম্পাদকের কাছে তিনটি চিঠি লিখে-

ছিলাম। খামের ভেতর ছিল দুটি বইয়ের টোকেন, একটি ২০ পয়সার, অন্যটি ৩০ পয়সার। কিন্তু টাকা চেয়ে আমি নয় পয়সা ডাক খরচ দিয়েছি, এবং শুধুশুধি সারাদিন উপোস থেকেছি।

যাহোক, মনে হয় যা চেয়েছি শেষ পর্যন্ত তা পেয়েছি।

শীত গিয়ে বসন্ত আসে। বাতাসও এত হিম শীতল নয়। বাইরে ঘোরাঘুরি করে আমি আরো সময় কাটাই এবং সাধারণতঃ সন্ধ্যার আগে ঘরে ফিরি না। এক অন্ধকার সন্ধ্যায় অন্যান্য দিনের মতই অবসন্ন আমি ঘরে ফিরি। গেটের দিকে দেখে মনটা এত খারাপ হয়ে যায় যে পা থেমে আসে। শেষ পর্যন্ত কামরায় পেঁৗছি। ভেতরে অন্ধকার। বাতি জ্বালানোর জন্য ম্যাচ খুঁজতেই ঘরটাকে মনে হয় অস্বাভাবিক নীরব এবং শূন্য।

হতভম্ব হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এমন সময় জানালার ফাঁক দিয়ে সেই কর্মচারীর বউ আমাকে ডাকে।

সহজভাবে বলে : "জিজুনের বাবা আজ এসেছিলেন, তাকে নিয়ে গেছেন।"

এটা আমি আশা করি নি। আমার মনে হল মাথার পেছনে আঘাত লেগেছে এবং বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকি।

শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করি : "সে চলে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"সে — সে কি কিছু বলেছে?"

"না। শুধু বলেছে আপনি ফিরে এলে বলার জন্য যে সে চলে গেছে।"

আমি এটা বিশ্বাস করতে পারি নি, তবু কামরাটা এত অস্বাভাবিক নীরব এবং শূন্য। জিজুনের জন্য সর্বত্র তাকিয়ে দেখি, কিন্তু চোখে পড়ে পুরনো রংচটা ছড়ানো ছিটানো আসবাবপত্র, বোঝা যায় কাউকে অথবা কোন কিছু লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। মনে হল সে হয়ত চিঠি রেখে গেছে বা কিছু লেখে রেখে গেছে, কিন্তু কিছুই না। শুধু লবণ, শুকনো মরিচ, ময়দা, অর্ধেক বাঁধাকপি একসঙ্গে জড়ো করা, পাশে কিছু পয়সা। এগুলো আমাদের পার্থিব জিনিস, সতর্কতার সঙ্গে সে আমার জন্য রেখে গেছে, কোন কথা না বলে আরো কিছুদিন বেঁচে থাকার জন্য এগুলো ব্যবহারের ইঙ্গিত দিয়ে।

পরিবেশের চাপে আমি উঠোনে দৌড়ে যাই। সেখানে চারদিকে অন্ধকার। মাঝের কামরার জানালায় উজ্জ্বল আলো। সেখানে বাচ্চাটাকে হাসানোর জন্য তারা মজা করছে। আমার মন হাল্কা হয়ে আসে এবং এই নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবার জন্য পথ খুঁজতে চেষ্টা করি : উঁচু পর্বত এবং জলাভূমি, বড় রাস্তা,

উজ্জ্বল আলোর নীচে খাবার, ট্রেঞ্চ, গভীর কালো রাত, শাণিত ছুরির ঝলকানি, শব্দহীন পায়ের আওয়াজ . . . . . .

আমি হাল্কা বোধ করি, যাতায়াতের খরচের কথা ভাবি এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

চোখ বন্ধ করে শুয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি, কিন্তু মাঝরাতের আগেই তা ভেঙে যায়। অন্ধকারে হঠাৎ মনে হয় জড়ো করা মুদিখানার জিনিস দেখছি, তার পর আমার দিকে মিনতিভরা শিশুসুলভ চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকা জিজুনের পাণ্ডুর মুখ ভেসে ওঠে। যখন আমি সজাগ হয়ে ওঠি তখন ওখানে কিছুই ছিল না।

তবু আমার মন খুব ভারী মনে হয়। এভাবে তার কাছে সত্য বলার চেয়ে আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারলাম না কেন? এখন সে জানে তার জন্য রয়েছে পিতার নিষ্ঠুরতা — যে মহাজনের মত তার সন্তানসন্ততিদের প্রতি হৃদয়হীন — এবং পথচারীদের শীতল চাহনি। এ ছাড়া আছে শূন্যতা। নিষ্ঠুরতা এবং শীতল চাহনির ভেতর শূন্যতার বোঝা বহন করে দিন কাটানো কত মারাত্মক! শেষ পর্যন্ত কবরে একটা পাথরও মেলে না।

জিজুনকে আমার সত্য বলা উচিত হয়নি। যেহেতু একে অপরকে ভালোবেসেছি, তাই তার কাছে মিথ্যে বলে যাওয়া উচিত ছিল। সত্য যদি সম্পদ হয় তাহলে এটা জিজুনের কাছে শূন্যতার বোঝা হওয়া উচিত ছিল না। অবশ্য মিথ্যাও শূন্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা এত নির্মম বোঝা হত না।

ভেবেছিলাম সত্য বলে দিলে জিজুন নিঃসংকোচে সামনে এগিয়ে যাবে, ঠিক যখন একসঙ্গে থাকতে শুরু করি সেভাবে। কিন্তু আমার ভুল হয়েছে। ভালোবাসার কারণে তখন তার ভয় ছিল না।

ভণ্ডামির বোঝা বহন করার মত সাহস আমার ছিল না, তাই সত্যের বোঝা তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছি। যেহেতু সে আমাকে ভালোবেসেছে, তাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও শীতল চাহনির ভেতর তাকে এই বোঝা বহন করতে হবে।

আমি তার মৃত্যুর কথা ভেবেছি . . . . . . বুঝতে পেরেছি আমি একটা নপুংসক। সত্য হোক, ভণ্ডামি হোক, শক্তির দিকেই আমার ঝুঁকে পড়া উচিত। তবু, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আশা করেছে আমি আর একটু বাঁচতে পারব . . . . . .

আমি জিযাও গলি ছাড়তে চেয়েছিলাম, সেখানে ভীষণ শূন্যতা এবং নিঃ-

সঙ্গতা। ভেবেছিলাম একবার বেরিয়ে যেতে পারলে মনে হবে জিজুন তখনো আমার পাশে। অথবা নিদেন পক্ষে সে শহরে আছে, যে কোন সময় আসতে পারে, হোষ্টেলে থাকার সময় যেভাবে এসেছে।

যাহোক আমার চিঠিগুলোর জবাব আসে না। বন্ধুদের কাছে চাকরির দরখাস্তেরও একই অবস্থা হয়। পুরনো এক পারিবারিক পরিচিতের সঙ্গে দেখা করা দরকার ছিল। অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা করতে যাই নি। আমার চাচার পুরনো সহপাঠী, সম্মানিত বয়স্ক ডিগ্রীধারী। বেইজিং-এ অনেক বছর ধরে আছেন এবং পরিচিত লোকের সংখ্যা ব্যাপক।

দারোয়ান আমার দিকে কটাক্ষ করে — কেননা আমার কাপড় চোপড় জীর্ণ। কষ্ট করে ভেতরে ঢুকতে হয়। চাচার বন্ধুর আমাকে মনে আছে, কিন্তু আমার সঙ্গে উত্তাপহীন ব্যবহার করেন। তিনি আমাদের সম্পর্কে সব কিছুই জানতেন।

আমাকে কোথাও চাকুরির জন্য সুপারিশ করতে বলায় তিনি ভাবলেশহীন-ভাবে বললেন: "এটা পরিষ্কার তুমি এখানে থাকতে পারনা। কিন্তু কোথায় যাবে? খুব কষ্টকর ব্যাপার। বোধ হয় জান, তোমার — তোমার সেই বন্ধু, জিজুন, মারা গেছে।"

আমি বোবা হয়ে যাই।

শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলি: "আপনি কি নিশ্চিত?"

তিনি একটু কৃত্রিম হাসি হাসলেন, "নিশ্চয়ই। আমার চাকর ওয়াং শেং তার একই গ্রামের।"

"কিন্তু — সে কিভাবে মরেছে?"

"কে জানে? যে কোন ভাবে, সে মৃত।"

ভুলে গেছি কিভাবে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরেছি। জানতাম তিনি মিথ্যা বলবেন না। গত বছরের মত, জিজুন আর কখনো আমার সঙ্গে থাকবে না। যদিও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও শীতল চাহনির মধ্যে সে এই শূন্যতার বোঝা বহন করতে চেয়েছে, এটা তার জন্য ছিল খুব বেশী। নিয়তির বিধান, তাকে যে সত্য বলেছি তা জেনেই সে মারা যাবে — ভালোবাসাহীন জগতে মরণ।

এটা পরিষ্কার, আমি সেখানে থাকতে পারি না। কিন্তু কোথায় যেতে পারি?

চারদিকে একটা বিশাল শূন্যতা, মৃত্যুর নীরবতা। মনে হল, ভালোবাসাহীন মৃত্যুর শিকার প্রতিটি মানুষের চোখের সামনের অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি, তাদের সব আর্ত ও সংগ্রামের আশাহীন চীৎকার শুনতে পাচ্ছি।

নতুন, নামহীন এবং অপ্রত্যাশিত কিছু একটার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু সেই মৃত্যুর নীরবতার ভেতর দিনের পর দিন কেটে যায়।

এখন আগের চেয়ে অনেক কম বাইরে যাই। এই বিরাট শূন্যতার ভেতর শুয়ে, বসে থাকি। যাতে এই মৃত্যুর নীরবতা আমার আত্মাকে গ্রাস করতে পারে। মনে হয় এই নীরবতা সময় সময় নিজে ভীতে কাঁপে, পিছিয়ে যায়। এমন সময় নামহীন, অপ্রত্যাশিত, নতুন আশা উঁকি দেয়।

এক মেঘলা সকালে, যখন সূর্য মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না, বাতাস ক্লান্ত। ছোট্ট পায়ের ও নাক শুকার শব্দে আমার চোখ খুলে যায়। কামরায় চারদিকে তাকিয়ে কিছুই চোখে পড়ে না, কিন্তু নীচে তাকিয়ে দেখি একটি ছোট্ট প্রাণী ঘুরঘুর করছে — শুকনো, ধূলোয় ভর্তি, জীবন্তের চেয়ে বেশী মৃত . . . . . .

ভালো করে তাকাতেই দম বন্ধ হয়ে আসে। আমি লাফিয়ে উঠি।

আস্সুই . . . . . .! ফিরে এসেছে!

শুধু বাড়ীওয়ালা এবং চাকরানীর শীতল চাহনির কারণে জিযাও গলি ছাড়িনি, বরং অনেকটা আস্সুইএর কারণে। কিন্তু কোথায় যেতে পারি? স্বভাবতঃই বুঝতে পারি সামনে অনেক রাস্তা খোলা আছে, কখনো কখনো মনে হয়েছে তা ঠিক সামনেই প্রসারিত। যদিও জানতাম না, কি ভাবে প্রথম পা ফেলতে হবে।

অনেক ভাবনা চিন্তার পর ঠিক করি হোষ্টেলই আমার থাকার একমাত্র জায়গা। আগের মত সেই জীর্ণ কামরা, একই কাঠের বিছানা, প্রায়ই বিবর্ণ লোকাস্ট এবং উইস্টারিয়া। কিন্তু আগে যা আমাকে ভালোবাসা ও জীবন, আশা ও সুখ দিয়েছিল এখন উধাও হয়ে গেছে। শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই, সত্যের সঙ্গে যে শূন্য অস্তিত্ব বিনিময় করেছি।

আমার সামনে অনেক রাস্তা খোলা আছে। যেহেতু এখনো বেঁচে আছি তাই যে কোন একটা বেছে নিতে হবে। যদিও জানি না কিভাবে প্রথম পা ফেলতে হবে। কখনো কখনো রাস্তাকে মনে হয় একটা বিরাট, ধূসর সাপ, আমার দিকে ফণা তুলে আছে। অপেক্ষা আর অপেক্ষা করি, এগিয়ে আসা দেখি, কিন্তু সবসময় হঠাৎ অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

প্রথম বসন্তের রাতগুলো আগের মতই দীর্ঘ। অনেকক্ষণ অলসভাবে বসে থাকি এবং আজ সকালে রাস্তায় দেখা শোক মিছিল স্মরণ করি। সামনে কাগুজে মূর্তি, কাগুজে ঘোড়া, এবং পেছনে সুর করে বিলাপ। দেখতে পাই তারা কত



. . . . . . কিন্তু নীচে তাকিয়ে দেখি একটি ছোট্ট প্রাণী ঘুরঘুর করছে — শুকনো,
ধূলোয় ভর্তি, জীবন্তের চেয়ে বেশী মৃত . . . . . .

চালাক — ব্যাপারটা এত সহজ।

তার পর জিজুনের শেষকৃত্য আমার মনে ভেসে উঠে। সে একা শূন্যতার বোঝা বহন করেছে, ধূসর পথে একা এগিয়ে গেছে নিষ্ঠুরতা এবং শীতল চাহনির ভেতর নিঃশেষিত হবার জন্য।

ইচ্ছে হয় যদি সত্যি ভূত ও নরক থাকত, তাহলে, নরকের আগুন যত তীব্রই হত আমি জিজুনকে খুঁজতে যেতাম, তাকে আমার দুঃখ, বেদনার কথা বলতে, এবং ক্ষমা চাইতে। অন্যথায় নরকের বিষাক্ত আগুন আমাকে ঘিরে ধরবে, আমার দুঃখ-বেদনার অবসান ঘটাবে।

আগুনের চরকির ভেতর জিজুনকে জড়িয়ে ধরতাম, তার কাছে ক্ষমা চাইতাম অথবা তাকে সুখী করার চেষ্টা করতাম . . . . . .

যাহোক, নতুন জীবনের চেয়ে এটা শূন্য। এখন আছে প্রথম বসন্তের রাত, যা আগের মতই দীর্ঘ। যেহেতু বেঁচে আছি, তাই নতুন জীবন শুরু করতে হবে। প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে জিজুন ও আমার নিজের জন্য দুঃখ ও বেদনা বর্ণনা করা।

আমি শুধু বিলাপ করতে পারি। জিজুনের জন্য শোক গুঞ্জন মনে হয়, যেটা তাকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিচ্ছে।

আমি ভুলতে চাই। নিজের কারণে জিজুনকে যে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিয়েছি তা স্মরণ করতে চাই না।

জীবনে আমাকে নতুনভাবে শুরু করতে হবে। আহত হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে রাখতে হবে সত্য, নীরবে এগিয়ে যেতে হবে, বিস্মৃতি ও ছলনাকে সঙ্গী করে . . . . . .

অক্টোবর ২১, ১৯২৫

তালাক

"ওহ, চাচা মু! শুভ নববর্ষ, আপনার উন্নতি হোক! "

"বাসান, তুমি কেমন আছ? শুভ নববর্ষ! ......"

"শুভ নববর্ষ! আইগু-ও এখানে আছে তাহলে ......"

"মু দাদুর সঙ্গে দেখা হয়েছে! ......"

য়ুয়াং মুসান এবং তার মেয়ে আইগু ম্যাগনোলিয়া ঘাট থেকে নৌকোয় নামতেই নৌকায় একটি গুঞ্জন ওঠে। যাত্রীদের কেউ কেউ হাত জড়ো করে প্রণাম করে এবং কেবিনের বেঞ্চে চারটি আসন খালি করে দেয়। শুভেচ্ছা জানিয়ে য়ুয়াং মুসান বসে পড়ে। নৌকোর সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখে লম্বা পাইপ। বাসানের উল্টো দিকে তার বাম পাশে বসে আইগু, পা জোড়া V এর মত আড়াআড়ি করা।

কাকড়ার খোলের মত কর্কশ মুখের একজন জিজ্ঞেস করে: "মু দাদু, শহরে যাচ্ছেন?"

"শহরে নয়।" মু দাদুকে হতাশ মনে হয়। তার কালচে লাল মুখে এত বলিরেখা যে তাকে আগের মতই দেখায়। "আমরা পাং গ্রামে যাচ্ছি।"

তাদের দিকে তাকানোর জন্য নৌকোর সবাই কথা বন্ধ করে দেয়।

সবশেষে বাসান জিজ্ঞেস করে: "আবার কি আইগু'র ব্যাপারে?"

"হ্যাঁ ...... এ ব্যাপারে আমার মরণ হবে। তিন বছর ধরে চলছে। বার বার ঝগড়া করে মিটিয়ে ফেলেছি, তবু ব্যাপারটার সুরাহা হয় নি ......"

"আবার কি মিঃ ওয়েই-এর বাড়ী যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। এই প্রথমবার তিনি সালিসি করছেন না, কিন্তু আমি কখনো তার শর্ত মানি নি। তাতে কিছু যায় আসে না। এখন তাদের পরিবারে নববর্ষের পুনর্মিলন হচ্ছে। এমনকি সাতনম্বর সাহেবও শহর থেকে আসবেন ......"

"সাত নম্বর সাহেব?" বাসানের চোখ বড় হয়ে যায়। "তাহলে তিনিও

ফোড়ন কাটবেন? ......ভালো...... বলতে গেলে গত বছর তাদের রান্নাঘরের উনুন ভেঙে ফেলার পর থেকে মোটামুটি আমাদের প্রতিশোধ নেয়া হয়ে গেছে। তাছাড়া আইগু'র সেখানে ফিরে যাওয়ার কোন যুক্তি নেই ......" সে আবার তার চোখ নামিয়ে নেয়।

"বাসান ভাই, আমি সেখানে ফিরে যেতে রাজী নই।" আইগু ক্ষোভের সঙ্গে তাকায়। "আমি এটা করছি তাদের থু থু দেওয়ার জন্য। একবার ভেবে দেখুন। ছোট হারামীটা সেই ছোট্ট বিধবাকে নিয়ে থাকছে আর ঠিক করেছে আমাকে চায় না। এটা কি এতই সহজ? বুড়ো হারামীটাও ছেলের সঙ্গে দল পাকিয়ে আমাকে তাড়াতে চায়। যেন এতই সোজা। সাত নম্বর সাহেবের ব্যাপারটা কি? যেহেতু সে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করে তাই বলে আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারবে না? সে মিঃ ওয়েই-এর মত এত গোবরমাথা হতে পারে না। সে শুধু বলে 'আলাদা হও, আলাদা হওয়াই ভালো।' আমি তাকে বলব এ ক'বছর কেমন করে কেটেছে, এবং দেখব কাকে তিনি সঠিক মনে করেন?"

বাসান বুঝতে পারে কিছু মুখ খোলে না।

নৌকোর ভেতরটা খুব নীরব। জলের ছলছলাৎ শব্দ ছাড়া কোন শব্দ নেই। পাইপটা নিয়ে তা ভর্তি করে যুয়াং মুসান।

তার উল্টো দিকে, বাসানের পাশেই বসা একটি মোটা লোক কোমর খুঁজে দেশলাই বার করে জ্বালায় এবং যুয়াং মুসানের পাইপের কাছে ধরে।

তার দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে যুয়াং মুসান, "ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।"

বিনয়ের সঙ্গে মোটা লোকটি বলে: "এই প্রথমবার দেখা হলেও আমি আপনার কথা অনেক আগেই শুনেছি। নদীর পাড়ের আঠারো গ্রামের কে মু চাচার কথা জানে না? আমরা বেশ কিছুদিন থেকেই জানি যুবক শি এক ছোট্ট বিধবার সঙ্গে থাকে। যখন গত বছর আপনার ছয় ছেলেকে নিয়ে তাদের রান্নাঘরের উনুন ভেঙে ফেলেছেন তখন কে বলে নি আপনারা ঠিক? .. ...সব বড় দরোজা আপনার জন্য খোলা, আপনার পক্ষে অনেক লোক আছে...... তাদের ভয় পাচ্ছেন কেন......"

সায় দিয়ে আইগু বলে: "এই চাচা সত্যিই ন্যায় অন্যায় বিচার করতে জানেন। যদিও তাকে চিনি না।"

সঙ্গে সঙ্গে মোটা লোকটি জবাব দেয়: "আমি ওয়াং ডেগুই।"

"তারা আমাকে ঠেলে দিতে পারে না। সাত নম্বর অথবা আট নম্বর সাহেব হোক পরোয়া করি না। তাদের পরিবার ধ্বংস হওয়া এবং তাদের প্রত্যেকে মারা না যাওয়া পর্যন্ত আমি গোলমাল পাকিয়ে যাব। মিঃ ওয়েই চারবার আমার

পিছু লেগেছে, নয় কি? এমনকি সালিসের টাকা দেখে বাবার মত পাল্টে গেছে।"

য়ুয়াং মুসান নিজে নিজে গালি দেয়।

কাকড়ামুখো জিজ্ঞেস করে, "কিন্তু মু দাদু, গত বছরের শেষে শি পরিবার কি মিঃ ওয়েইকে খাওয়া পাঠায় নি?"

ওয়াং ডেগুই বলে: "কিছু যায় আসে না। খাওয়া কি একজন মানুষকে পুরোপুরি অন্ধ করে দিতে পারে? যদি তাই হয়, তাহলে বিদেশী খাওয়া পাঠালে কি হবে? সেসব বুদ্ধিজীবীরা যারা সত্যকে জানে, সব সময় ন্যায় বিচারকে তুলে ধরবে। যদি কাউকে সবাই গাল দেয় তাহলে তারা তার পক্ষ নেবে, তাতে ফায়দা হোক বা না হোক। গত বছরের শেষে আমাদের ছোট্ট গ্রামের মিঃ রোং বেইজিং থেকে ফিরে আসেন। তিনি গ্রামবাসীদের মত নন, তিনি বড়ো পৃথিবী দেখেছেন। তিনি বলেছেন সেখানে জনৈক মাদাম গুয়াং সবচে ভালো ......"

নোঙর ফেলতে ফেলতে মাঝি চীৎকার করে, "ওয়াং ঘাট। কেউ কি নামবে এখানে?"

"আমি নামব।" মোটা লোকটি পাইপ হাতে কেবিন থেকে বেরিয়ে আসে, এবং নৌকা ভিড়তে ভিড়তে তীরে লাফিয়ে নামে।

যাত্রীদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, "মাফ করবেন।"

নতুন নীরবতায় নৌকো চলতে থাকে। শুধু জলের ছল ছলাৎ শব্দ সে নীরবতা ভেঙ্গে দেয়। আইগু'র জুতোর দিকে মুখ করে বাসান ঝিমুতে থাকে, আস্তে আস্তে তার মুখ হা হয়ে যায়। কেবিনের সামনের দুই বুড়ী ধীরে ধীরে বৌদ্ধমন্ত্র আওড়াচ্ছে, এবং মালা জপছে। আইগু'র দিকে তাকিয়ে তারা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে, ঠোঁট চাটতে চাটতে মাথা নত করে।

আইগু ছইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে, বোধ হয় ভাবছে কিভাবে সেই বুড়ো হারামীর সংসার ধ্বংস করা যায় যাতে তার এবং ছোট হারামীর কোন পথ খোলা থাকবে না। সে মিঃ ওয়েই-এর ভয়ে ভীত নয়। সে তাকে দু'বার দেখেছে, সে একটি হোঁদল, মোটাবুদ্ধি — তার নিজের গ্রামে এ ধরনের অনেক লোক আছে, শুধু গায়ের রং একটু ময়লা।

য়ুয়াং মুসানের পাইপের তামাক ফুরিয়ে এসেছে এবং টানের সঙ্গে তেল আসছে, তবু সে টেনেই চলে। সে জানে ওয়াং ঘাটের পরই পাং গ্রাম। এখনই গ্রামে ঢোকার মুখে 'সাহিত্যিক প্যাভিলিয়ন' চোখে পড়ছে। সে এতবার এখানে এসেছে যে মিঃ ওয়েই-এর মত এ নিয়ে কথা বলার মানে হয় না। তার মনে পড়ে কি ভাবে তার মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরেছে, তার স্বামী এবং শ্বশুর

কি ধরনের খারাপ ব্যবহার করেছে এবং সে কি ভাবে তাদের ক্ষতি করেছে। তার চোখের সামনে আবার অতীত ফিরে আসে। সাধারণতঃ যখন দুষ্টলোকদের শাস্তি দেয়ার কথা তার মনে পড়ে সে একটা ক্রূর হাসি হাসে—কিন্তু এখন নয়। সাত নম্বর সাহেবের মোটা শরীরটা চিন্তায় বাধা দিচ্ছে এবং তার মনের শান্তি কেড়ে নিচ্ছে।

নীরবে নৌকা এগিয়ে চলে। শুধু বৌদ্ধমন্ত্রের আওয়াজ বাড়তে থাকে। মনে হয় অন্য সবাই আইগু এবং তার বাবার মত চিন্তায় ডুবে আছে।

"মু চাচা, পাং গ্রাম এসে,গেছে।"

মাঝির গলায় জেগে উঠে তারা চোখের সামনে দেখতে পায় 'সাহিত্যিক প্যাভিলিয়ন'।

তীরে লাফিয়ে নামে য়ুয়াং। পেছনে পেছনে আইগু। প্যাভিলিয়ন ছাড়িয়ে তারা মিঃ ওয়েই-এর বাড়ীর দিকে এগিয়ে যায়। দক্ষিণমুখী পথে ত্রিশটি বাড়ী পেরুনোর পর মোড় নিয়ে তারা গন্তব্যে পৌছে যায়। দরোজায় চারটি কালো ছইওয়ালা নৌকো সার দিয়ে বাধা।

কালো-গালা লাগানো দরজা পেরুতেই তাদের কাছারীঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘর ভর্তি কামলা এবং মাঝি, দুই টেবিলে বসা। তাদের দিকে তাকাতে সাহস করেনা আইগু, কিন্তু দ্রুত একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে বুড়ো ও ছোট হারামীর কোন চিহ্ন দেখতে পায় না।

নববর্ষের মিষ্টি কেক দেয়া স্যুপ নিয়ে যখন একটি চাকর ছেলে আসে তখন আইগু জানে না কেন সে আরো অস্বস্তি এবং অস্থির বোধ করে। ভাবে, "সে ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করেই বলে কি আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারে না? এসব পণ্ডিতরা যারা সত্যকে জানে সবসময় ন্যায় বিচারকে তুলে ধরবে। পনের বছর বয়সে আমার বিয়ে হওয়া থেকে শুরু করে সাত নম্বর সাহেবকে পুরো ঘটনা বলতে হবে . . . . . ."

স্যুপ শেষ হলে সে বুঝতে পারে তাদের সময় হয়েছে। সত্যি সত্যি, কিছুক্ষণের মধ্যে সে দেখতে পায় একজন কামলা তাকে ও বাবাকে পথ দেখিয়ে একটি বড় হলঘরের উল্টো দিকে বৈঠকখানায় নিয়ে এসেছে।

ঘরের ভেতর এত জিনিষ ঠাসাঠাসি করা যে সে সবকিছু দেখতে পায় না। বহু অতিথিও আছে, তাদের লাল ও নীল সাটিনের ছোট জ্যাকেট তার চারদিকে ঝলমল করছে। তাদের মাঝে একজনকে দেখেই সে ভাবে নিশ্চয়ই সাত নম্বর সাহেব। তাঁর মুখ, মাথা গোলাকার হলেও তিনি মিঃ ওয়েই এবং অন্যান্যদের চেয়ে অনেক বড়ো দড়। তাঁর বিরাট গোল মুখে একজোড়া ছোট

চোখ, বিড়ালের মত একজোড়া গোঁফ, মাথা ন্যাড়া এবং মুখ কর্কশ এবং তেলতেলে। এক মুহূর্তের জন্য আইগু থতমত খেয়ে যায় এবং তার পরে মনে হয় সে নিশ্চয়ই চামড়ায় শূয়রের চর্বি মেখেছে।

"এটা বাহ্যি-পথে[1] ব্যবহার করা হয়, পূর্বপুরুষরা কবর দেয়ার সময় ব্যবহার করতেন।"

সাত নম্বর সাহেবের হাতে কিছু একটা ধরা, ক্ষয়ে যাওয়া পাথরের মত। এ কথা বলতে বলতে দু'বার তিনি তা দিয়ে নাক ঘষেন। "দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্প্রতি খুঁড়ে এটা পাওয়া গেছে। তবু ভালো, হান আমলের[2] চেয়ে পুরনো হতে পারে না। দেখুন, পারদের দাগ[3] লেগে আছে . . . . . ."

অনেকগুলো মাথা 'পারদের দাগ'কে ঘিরে ধরে, অবশ্যই তাদের মধ্যে একজন মিঃ ওয়েই। বাড়ীর আরো অনেক ছেলে এদের মধ্যে আছে। আইগু তাদের লক্ষ্য করেনি কেননা সাত নম্বর সাহেবের ভয়ে তাদের চ্যাপ্টা ছার-পোকার মত দেখাচ্ছে।

তিনি এই মাত্র যা বলেছেন সে বুঝতে পারে নি ; সে এই 'পারদের দাগে' উৎসাহী নয়, তা খুঁটিয়েও দেখতে চায় না। বরং এই সুযোগে সে চারদিকে তাকায়। তার পেছনে দেয়ালের সঙ্গে দরজার খুব কাছে বুড়ো ও ছোট হারামী উভয়েই দাঁড়িয়ে আছে। সে এক নজরে দেখতে পায় ছয়মাস আগে হঠাৎ দেখা হওয়ার সময় থেকে তাদের বয়স্ক দেখাচ্ছে।

লোকজন 'পারদের দাগ' থেকে সরে যায়। 'বাহ্যি-পথের কাঁটা' নিয়ে মিঃ ওয়েই তা বাজিয়ে দেখে। তারপর যুয়াং মুসানের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে।

"শুধু আপনারা দু'জন এসেছেন?"

"শুধু আমরা দু'জন।"

"আপনার ছেলেরা কেউ আসেনি কেন?"

"তাদের সময় নেই।"

"এ ব্যাপারে না হলে নববর্ষে এসে আপনাদের কষ্ট দিতাম না . . . . . . আপ-নাকে যথেষ্ট ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। দু বছরের বেশী হয়েছে। বলি কি, শত্রুতা রাখার চেয়ে শেষ করা ভালো। স্বামীর সঙ্গে আইগু'র বনে না এবং শ্বশুর শাশুড়ীও তাকে পছন্দ করে না . . . . . . তাই আগে যে পরামর্শ দিয়েছিলাম সে অনুযায়ী তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাক। আপনাকে বোঝানোর মত যথেষ্ট ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু আপনি জানেন সাত নম্বর সাহেব ন্যায় বিচারক। তার মতও আমার মতই। যাহোক তিনি বলেছেন উভয় পক্ষ আরো কিছুটা নরম হোক। তিনি শি পরিবারকে বলেছেন আপোষের জন্য আরো দশ ডলার



তাদের মাঝে একজনকে দেখেই সে ভাবে নিশ্চয়ই সাত নম্বর সাহেব।
তাঁর মুখ, মাথা গোলাকার হলেও তিনি মিঃ 'ওয়েই এবং
অন্যান্যদের চেয়ে অনেক বড়ো দড়।

ধরে 'নব্বই ডলার' করে দিতে।"

"নব্বই ডলার। সম্রাটের কাছে গেলেও এত সুবিধেজনক শর্ত পাবেন না। কেউ না, শুধু সাত নম্বর সাহেব এমন ভালো প্রস্তাব দেবেন!"

যুয়াং মুসানের প্রতি সায় জানানোর জন্য সাত নম্বর সাহেব চোখ বড়ো করে।

"আইগু দেখতে পায় অবস্থা বেগতিক এবং অবাক হয়ে যায়, তার বাবার ভয়ে তীরের সব কটি পরিবার ভীত, তার নিজের হয়ে এখানে একটি কথাও বলেন নি। তার মনে হয়, এটা খুবই অনাহূত। যদিও সাত নম্বর সাহেবের সব কথা সে বুঝতে পারে নি তবু তাকে মনে হয় দয়ালু, সে যেমনটা ভেবেছে তত নিষ্ঠুর নয়।

সে সাহসে বলে ফেলে, "সাত নম্বর সাহেব পণ্ডিত সত্যকে জানেন। তিনি আমাদের গেঁয়ো মানুষদের মত নন। আমার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তা বলার মত কেউ ছিল না, কিন্তু এখন আমি সাত নম্বর সাহেবকে বলব। যতদিন আমার বিয়ে হয়েছে আমি ভালো স্ত্রী হতে চেয়েছি — আসা যাওয়ার সময় মাথা নুইয়েছি এবং স্ত্রীর কোন দায়িত্বে অবহেলা করি নি। কিন্তু আমার দোষ ধরে — একটা নিয়মিত গালাগালি। সে বছর বেজী বড় মোরগটা মেরে ফেলে, খাঁচা বন্ধ না করার জন্য তারা আমাকে দোষ দিল কেন? এটা সেই ক্ষেপা কুত্তা যে কুড়ো মেশানো চাল চুরি করার জন্য ঠেলা দিয়ে খাঁচার দরজা খুলেছিল। কিন্তু সেই ছোট হারামী সাদা কালো পার্থক্য করতে পারে না। সে আমার গালে চড় মারে

সাত নম্বর সাহেব তার দিকে তাকায়।

"আমি জানতাম একটা কারণ আছে। সাত নম্বর সাহেব এটা লক্ষ্য করতে ভুল করবেন না। যেসব পণ্ডিত সত্যকে জানেন তাঁরা সব কিছু জানেন। সেই হারামজাদী তাকে তুক করেছে এবং আমাকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে! আমাদের সামাজিক বিয়ে হয়েছে — তিন পালা চা এবং ছয়টি উপহার[4] এবং পালকীতে চড়ে তার বাড়ী গিয়েছি। আমাকে ছুঁড়ে ফেলা কি তার জন্য এতই সহজ? ...... আমি তাদের দেখিয়ে দিতে চাই কোর্টে যেতে আমার আপত্তি নেই। জজ কোর্টে সমাধান না হলে হাইকোর্ট করব ......"

ওপরের দিকে তাকিয়ে মিঃ ওয়েই বলেন : "সাত নম্বর সাহেব এসব জানেন। আইগু, এত জেদাজেদি করলে তোমার ভালো হবে না। তোমার একটুও পরিবর্তন হয় নি। দেখ, তোমার বাবা কত বুদ্ধিমান। দুঃখ হয়, তুমি ও তোমার ভাইরা

তার মত নও। ধর তুমি হাইকোর্টে যাও, তাহলে কি তিনি সাত নম্বর সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করবেন না? তাহলে ব্যাপারটা প্রকাশ্যে হবে, কেউ রক্ষা পাবে না . . . . . . এরকম বলে . . . . . ."

"প্রয়োজন হলে জীবন দিয়ে দেব, যদি দুটো পরিবার ধ্বংসও হয়ে যায়।"

সাত নম্বর সাহেব ধীরে ধীরে বলেন: "এত বেপরোয়া হওয়ার দরকার নেই। তোমার বয়স এখনও কম। আমাদের প্রত্যেকের শান্তি বজায় রাখা উচিত। 'শান্তিতে সম্পদ আসে' নয় কি? আমি পুরো দশ ডলার বাড়িয়ে দিয়েছি, দয়ার চেয়ে অনেক বেশী। যদি তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী বলে 'যাও', তাহলে তোমাকে অবশ্যই যেতে হবে। হাইকোর্টের কথা বলো না, শাংহাই, বেইজিং অথবা বিদেশে একই অবস্থা হবে। আমাকে বিশ্বেস না করলে তাকে জিজ্ঞেস কর। সে সবে বেইজিং-এর বিদেশী স্কুল থেকে এসেছে।" বলে তিনি পরিবারের লম্বা চিবুক-ওয়ালা এক ছেলের দিকে তাকান। জিজ্ঞেস করেন: "নয় কি?"

নম্র গলায় বিনয়ের সঙ্গে জবাব দেওয়ার জন্য দ্রুত উঠে দাঁড়ায় লম্বা চিবুক-ওয়ালা "অ-ব-শ্যই।"

আইগু খুব বিচ্ছিন্ন বোধ করে। তার বাবা কথা বলতে নারাজ, ভাইরা আসার সাহস পায় নি, মিঃ ওয়েই সবসময় অন্যপক্ষে, সাত নম্বর সাহেব তাকে হতাশ করেছেন, এমনকি এই লম্বা চিবুকওয়ালা তার নরম গলা এবং চ্যাপ্টা ছারপোকার মত যা আশা করা গেছে তাই বলেছে। কিন্তু বিভ্রান্ত হয়ে সে শেষ দেখার ঠিক করে।

"সাত নম্বর সাহেব কি . . . . . ." তার চোখে বিস্ময় ও হতাশা। "হ্যাঁ . . . . . . আমি জানি, আমরা গোঁয়ারা মূর্খ। লোকজনের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা না জানার জন্য বাবা দোষী — তিনি তার পুরনো মেজাজ সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি সব ব্যাপারে বুড়ো ও জোয়ান হারামীকে সুবিধে করে দেন। যত ঘাপলা বাধুক তারা সব ব্যাপারে মাথা ঘামায়, বড়দের প্রতি ভক্তি দেখানোর জন্য। . . . . . "

"তার দিকে দেখেন, সাত নম্বর সাহেব।" তার পেছনে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট হারামী হঠাৎ বলে উঠে, "সাত নম্বর সাহেবের সামনে সে এমন ব্যবহার করার সাহস পায়। বাড়ীতে সে আমাদের কোন শান্তি দেয় নি। সে আমার বাবাকে ডাকে বুড়ো হারামী, আমাকে ডাকে ছোট হারামী অথবা বেজন্মা।"

"কোন শয়তান তোমাকে বেজন্মা ডাকে?" আইগু তাকে রেগে আক্রমণ করে, তারপর সাত নম্বর সাহেবের দিকে তাকায়, "লোকজনের সামনে আমার

আরো কিছু বলার আছে। সে সবসময় আমার সঙ্গে ইতরামি করেছে। সবসময় 'নোংরা' ও 'কুত্তী' বলে গাল দিয়েছে। সেই মাগীটার সঙ্গে ছিনালী শুরু করার পর থেকে আমার পূর্বপুরুষদের পর্যন্ত গাল দিয়েছে। সাত নম্বর সাহেব, দু'জনের মধ্যে বিচার করে দেখুন ......"

সে হঠাৎ চমকে ওঠে। কথা মুখেই আটকে যায়। হঠাৎ চোখ ঘুরিয়ে নাথা তোলেন সাত নম্বর সাহেব। সেই বিড়ালের গোঁফ ওয়ালা মুখ থেকে একটা কর্কশ, টানা চীৎকার বেরিয়ে আসে :

"এদিকে আস ......"

হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে আসা তার বুকের ভেতর ধুক ধুকানি বেড়ে যায়। মনে হয় অবস্থা উল্টে গেছে, যুদ্ধে হেরে গেছে। ভুলভাবে পা বাড়িয়ে সে পানিতে পড়ে গেছে এবং জানে সবটাই তার দোষ।

নীল গাউন এবং কালো জ্যাকেট পরা একটি লোক দ্রুত এগিয়ে আসে এবং হাতজোড়া সোজা করে লাঠির মত সাত নম্বর সাহেবের সামনে দাঁড়ায়।

ঘরের ভেতর টু শব্দটি নেই। সাত নম্বর সাহেব ঠোঁট নাড়েন, কিন্তু কেউ শুনতে পায় না তিনি কি বলছেন। শুধু তার চাকর শুনতে পায়। এই আদেশ তার মজ্জার ভেতর ঢুকে যায়, দু'বার নড়ে ওঠে, যেন ভয় পেয়েছে। জবাব দেয় :

"ঠিক আছে, স্যার।"

তারপর কয়েক পা পিছিয়ে ঘুরে চলে যায়।

আইগু জানে কিছু একটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং কল্পনাতীত ঘটতে যাচ্ছে — যেটা সে ফেরাতে অক্ষম। একমাত্র এখনই সে সাত নম্বর সাহেবের পুরো ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারে। সে আগে ভুল করেছে এবং তাড়াহুড়োয় খারাপ কাজ করেছে। সে অনুতাপ করতে থাকে এবং নিজে নিজে বলতে থাকে :

"আমি সবসময় সাত নম্বর সাহেবের রায় মেনে নিতে চেয়েছি ......"

ঘরের ভেতর টু শব্দটি নেই। তার কথা সিল্কের সুতোর মত হাল্কা মনে হলেও মিঃ ওয়েই-এর কানে বজ্রপাতের মত বাজে।

"ভালো।" তিনি মাথা নেড়ে সামনে এগিয়ে যান। "সাত নম্বর সাহেব ন্যায় বিচারক এবং আইগু সত্যি বিবেচক। সেক্ষেত্রে মুসান তোমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না, যেহেতু তোমার মেয়ে নিজেই সায় দিয়েছে। আমার বিশ্বাস, তুমি কাবিন-নামা নিয়ে এসেছ। এখন উভয় পক্ষই সেটা দেখাও ......"

আইগু দেখতে পায় তার বাবা কাঁপতে কাঁপতে কাপড়ের ভাঁজে কিছু একটা খুঁজছে। লাঠির মত চাকর ছেলেটি আবার আসে, সাত নম্বর সাহেবের হাতে

ছোট, চ্যাপ্টা, কচ্ছপের মত কালো একটা জিনিষ তুলে দেয়। আইগু ভয় পেয়ে যায় কিছু একটা মারাত্মক ঘটতে যাচ্ছে। সে একবার বাবার দিকে তাকায়, কিন্তু বাবা টেবিলের ওপর নীল কাপড়ের একটা পোটলা খুলছে, এবং রূপোলী টাকা বার করছে।

কচ্ছপের মাথা খুলে সাত নম্বর সাহেব তার হাতের তালুতে কিছু একটা ঢালেন, তারপর চ্যাপ্টা জিনিষটা লাঠির মত চাকরকে ফিরিয়ে দেন। তিনি এক আঙ্গুলে হাতের তালু ঘষেন, তারপর নাকের দু ছিদ্রের ভেতর ঢুকিয়ে দেন। তার নাক এবং ওপরের ঠোঁট হলদে হয়ে ওঠে। তারপর তিনি নাক ঘষতে থাকেন যেন হাঁচি দেবেন।

য়ুয়াং মুসান রূপোলী টাকা গুণছিল। মিঃ ওয়েই না গোনা এক সারি থেকে কিছু তুলে নেন এবং বুড়ো হারামীর হাতে তুলে দেন। তিনি লাল এবং সবুজ কাবিন-নামা বদল করে আসল মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেন।

তিনি বলেন, "এগুলো সরিয়ে রাখো। মুসান, দেখ পরিমাণ ঠিক আছে কিনা। ছেলে খেলা নয় — এই সব রূপোলী ......"

"হ্যাঁচ্ছো!"

যদিও আইগু জানে সাত নম্বর হাঁচি দিচ্ছেন, তবু সে তাঁর দিকে না তাকিয়ে পারে না। তাঁর মুখ হা করা এবং নাক কুঁচকে আছে। দুই আঙ্গুলে এখনো তিনি ধরে আছেন "শেষকৃত্যে পূর্বপুরুষরা ব্যবহার করতেন।" এটা দিয়ে তিনি নাক ঘষছেন।

কষ্ট করে য়ুয়াং মুসান টাকা গোণা শেষ করে এবং উভয় পক্ষই লাল এবং সবুজ কাবিন-নামা সরিয়ে রাখে। মনে হয় তারা প্রত্যেকে গুটিয়ে নিয়েছে এবং তাদের উত্তেজনা প্রশমিত। পুরো শান্তি বিরাজ করতে থাকে।

মিঃ ওয়েই বলেন: "ভালো। ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় মিটে গেছে।" তারা চলে যেতে তৈরী দেখে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। "ভালো কথা, এখন আর করার কিছুই নেই। এই ঘাপলা মেটানোর জন্য অভিনন্দন! তোমাদের কি যেতে হবে? নববর্ষের খাওয়ার জন্য থাকবে না? এটা সবসময় আসে না।"

আইগু বলে, "আমরা থাকবনা। আগামী বছর আপনার সঙ্গে মদ পান করার জন্য আসব।"

"মিঃ ওয়েই, ধন্যবাদ। আমরা এখনই মদ পান করব না। আরো কাজ আছে ......" বিনয়ের সঙ্গে পিছিয়ে আসে য়ুয়াং মুসান, বুড়ো হারামী এবং ছোট হারামী।

"কি? যাবার আগে এক ফোটাও না?" পেছনে থাকা আইগু'র দিকে তাকান মিঃ ওয়েই।

"সত্যিই না। ধন্যবাদ, মিঃ ওয়েই।"

নভেম্বর ৬, ১৯২৫

টীকা

1. প্রাচীন কালে সাধারণতঃ মৃত মানুষের মুখে, নাক, কান ও বাহ্যিপথে যসম পাথরের টুকরো দেখা হত। মনে করা হত এতে লাশ কখনো পচে যাবে না।

2. হান আমল (খৃঃপূর্ব ২০৬—খৃঃ ২২০)

3. প্রাচীন কালে কবর দেয়ার সময় মৃতদেহে পারদ লাগিয়ে দেয়া হত, যাতে পচে না যায়। কবর খুঁড়লে যসম পাথরের যে টুকরোগুলো পাওয়া যেত তাতে পারদের দাগ থাকত।

4. পুরনো চীনে অধিকাংশ এলাকায় বিয়ের অনুষ্ঠানে বরপক্ষ কনেপক্ষে চা উপহার দিত। চা গ্রহণ করা মানে কনে বিয়েতে রাজি। এখানে "তিন পালা চা এবং ছয়টি উপহার" এর অর্থ আইগু আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের উপহার গ্রহণ করেছে এবং তার বিয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়েছে।

চন্দ্রাভিযান

১

এটা সত্যি যে বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষের ইচ্ছে বুঝতে পারে। গেট নজরে আসা মাত্রই ঘোড়া গতি কমিয়ে দেয় এবং আরোহীর মত মাথা ঝুলিয়ে মুষল দিয়ে ধানভানার মত সামনে পা ফেলতে থাকে।

বড়ো বাড়ীটা সান্ধ্য কুয়াশায় আবৃত। পড়শীদের চিমণী থেকে কালো ধুঁয়া বেরুচ্ছে। সান্ধ্য কালীন খাবারের সময় এখন। ঘোড়ার খুরের শব্দে প্রহরীরা বেরিয়ে এসে অস্ত্র হাতে ফটকে সোজা দাঁড়িয়ে আছে। আবর্জনার স্তূপের পাশে ভাবলেশহীন ই[1] নামতেই তারা এগিয়ে এসে তার লাগাম ও বেত নিয়ে নেয়। চৌকাঠ পেরুনোর সময় তার নজরে পড়ে নিজের কোমরে ঝোলানো আন-কোরা নতুন তীর, ব্যাগের ভেতর তিনটি কাক, একটি চড়ুই পাখী। তার কলজে ধরে আসে। সাহস করে সে এগিয়ে যায়, থলেতে তীরগুলো ঝুলতে থাকে।

ভেতরের উঠোনে পেঁৗছে সে দেখে ছাং‌এ[2] গোল জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে। সে জানে তার তীক্ষ্ণ চোখ নিশ্চয়ই কাকগুলো দেখে থাকবে, হতাশায় সে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় — কিন্তু তবু তাকে এগিয়ে যেতে হয়। স্বাগত জানানোর জন্য চাকরানীরা এগিয়ে আসে, তার ধনুক, তীর ও থলে খুলে শিকারের ব্যাগ নিয়ে নেয়। সে লক্ষ্য করে তাদের হাসি জোর করা।

হাত মুখ মুছে ভেতরের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সে ডাকে : "মাদাম . . . . . ."

গোল জানালা থেকে সূর্যাস্ত দেখছিল ছাং‌এ। সে ধীরে ধীরে ফিরে তাকায় এবং তার ডাকে সাড়া না দিয়ে উদাস দৃষ্টি হানে।

গত কিছু দিন থেকেই এ ব্যবহার সে পেয়ে আসছে, কমপক্ষে এক বছরের

ওপর। কিন্তু চিরাচরিতভাবে সে গিয়ে উল্টোদিকের পুরনো চিতাবাঘের চামড়া ঢাকা কাঠের চেয়ারে বসে। মাথা চুলকাতে চুলকাতে বিড়বিড় করতে থাকে:

"আজকেও কপাল খারাপ। কাক ছাড়া কিছুই না ......"

"বাহ!"

উইলো পাতার মত ভুরু কুঁচকে ছাং এ লাফিয়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। যেতে যেতে বিড়বিড় করতে থাকে: "আবার কাকের ঝোলওয়ালা ন্যুডলস! আবার কাকের ঝোলওয়ালা ন্যুডলস! জানতে ইচ্ছে হয় আর কারা বছরের পর বছর কাকের ঝোলওয়ালা ন্যুডলস খায়? কপাল মন্দ তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল এবং সারা বছর কাকের ঝোলওয়ালা ন্যুডলস খেতে হচ্ছে।"

"মাদাম!" পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ই তাকে অনুসরণ করে। নরম সুরে বলতে থাকে, "আজকে অবস্থা এত খারাপ নয়। একটা চড়ুইও মেরেছি, তোমার জন্য রান্না করা যাবে ...... ন্যুসিন।" সে চাকরানীকে ডাকে: "তোমার বেগম-সাহেবাকে দেখানোর জন্য ঐ চড়ুইটা নিয়ে আস।"

থলে রান্নাঘরে নেয়া হয়েছে। কিন্তু চড়ুইটা আনবার জন্য ন্যুসিন দৌড়ে যায় এবং দু হাতে তা ছাং এ-র সামনে মেলে ধরে।

"এটা!" বিরক্তি সহকারে তা স্পর্শ করার জন্য সে ধীরে হাত বাড়ায়। রেগে বলে: "বিরক্তিকর। তুমি এটাকে গুঁড়ো করে ফেলেছ। মাংস কোথায়?"

অস্বস্তিতে ই স্বীকার করে, "আমি জানি আমার ধনুক খুব শক্তিশালী, তীরের মাথাটাও খুব বড়।"

"ছোট তীর ব্যবহার করতে পার না?"

"আমার নেই। যখন বড় বরাহ এবং পাইথন শিকার করি ......"

"এটা কি বড় বরাহ না পাইথন?" ন্যুসিন-এর দিকে ফিরে সে আদেশ দেয়, "এটাকে স্যুপের জন্য ব্যবহার কর!" তার পর নিজের কামরায় ফিরে যায়।

একা খেই হারিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ই রান্নাঘরে লাকড়ী পোড়ানোর শব্দ শুনতে থাকে। তার মনে পড়ে দূরে ছোট পাহাড়ের মত বরাহ দলের কথা। তখন না মেরে রেখে দিলে ছয় মাস চলত এবং প্রতিদিনের খাওয়ার চিন্তা থাকত না। এবং সেই বিরাট পাইথন। এটা দিয়ে কি স্যুপ তৈরী হতে পারে।

বাতি জ্বালে ন্যুই। উল্টো দিকের দেয়ালে মৃদু আলোয় চকচক করছে লাল তীর ও ধনুক, কালো তীর ও ধনুক, ক্রস ধনুক তলোয়ার এবং ভোজালি। একবার দেখে ই মাথা নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সন্ধ্যাকালীন খাবার এনে ন্যুসিন তার মাঝখানে টেবিলের ওপর সাজায়, বাম দিকে পাঁচটি বড় বাটি ন্যুডলস, ডান

দিকে দু বাটি নুডলস ও একটি স্যুপ, মাঝখানে এক বড় বাটি কাকের ঝোল।

খাওয়ার সময় ই স্বীকার করে এটা মজাদার খাবার নয়। চুরি করে ছাংএ-র দিকে তাকায়। কাকের ঝোলের দিকে খুব একটা না তাকিয়ে সে স্যুপের ভেতর নুডলস মিশিয়েছে, এবং বাটি প্রায় অর্ধেক শেষ করেছে। তার কাছে মনে হয় ছাংএ-র মুখ শুকনো এবং বিমর্ষ — যেন অসুখে পড়েছে।

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে একটু খোশমেজাজে পানি পান করে কোন কথা না বলে ছাংএ বিছানার ধারে বসে। ই তার পাশেই কাঠের চেয়ারে বসে, লোম ঝরে যাওয়া চিতাবাঘের চামড়ায় হাত বুলাতে থাকে।

মন পাওয়ার ভঙ্গীতে বলে : "আহ, বিয়ের আগে পশ্চিম পাহাড়ে এই চিতা বাঘটা মেরেছিলাম। বড় সুন্দরী ছিল — একতাল সোনার মত।"

তার মনে পড়ে অতীতের কথা। তারা ভালুকের থাবা, উটের কুঁজ ছাড়া কিছু খেত না, অন্যান্য অংশ চাকরানী এবং প্রহরীদের দিয়ে দেয়া হত। শিকার শেষে তারা খেত বন্য বরাহ, খরগোশ এবং রঙ্গীন পাখী। সে এত ভালো তীরন্দাজ ছিল যে, যেমন খুশী তেমন তীর ছুঁড়তে পারত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে : "আসলে আমি খুব ভালো তীরন্দাজ। সে জন্যে পুরো এলাকা খালি হয়ে গেছে। কে জানত, কাক ছাড়া আর কিছু থাকবে না?"

ছাংএ মৃদু হাসে।

"আজকে অন্যদিনের চেয়ে কপাল ভালো ছিল।"ই খোশ মেজাজে বলছে। "অন্ততঃ একটা চড়ুই মারতে পেরেছি। এজন্যে বাড়তি ত্রিশ লি পথ যেতে হয়েছে।"

"তুমি কি আর একটু দূরে যেতে পার না?"

"হ্যাঁ। সেটাই করতে চাই। কাল ভোরে উঠব। তুমি আগে উঠলে, আমাকে ডাকবে। আরো পঞ্চাশ লি পথ গিয়ে দেখতে চাই হরিণ অথবা খরগোশ পাওয়া যায় কিনা। . . . . . . ব্যাপারটা খুব সহজ হবে না। মনে পড়ে সেই বিরাট বরাহ এবং পাইথনটা শিকারের কথা? তোমার মায়ের বাড়ীর সামনে দিয়ে কালো ভালুক আসা যাওয়া করত এবং তিনি আমাকে কয়েকবার বলেছেন সেটাকে মারার জন্য . . . . . ."

"সত্যি?" মনে হয় ব্যাপারটা ছাংএ-র মনে নেই।

"কে ভাবতে পেরেছিল এগুলো এভাবে উধাও হয়ে যাবে? ভেবে দেখছ, আমি জানিনা কিভাবে সামলাব। আমি ঠিক আছি। শুধু সেই সন্ন্যাসীর দেয়া সালসা খেতে হবে এবং আমি উড়ে স্বর্গে যেতে পারি। কিন্তু প্রথমে তোমার

কথা ভাবতে হবে . . . . . . সেজন্যেই কাল আর একটু দূরে যাব ঠিক করেছি

"হুম" ছ্যাংএ পানি শেষ করে। ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ে এবং চোখ বন্ধ করে। মৃদু আলোর বাতি শেষবারের মত দপ দপ করতে থাকে। তার পাউডার অনেকখানি মুছে গেছে, চোখের নীচে কালো রেখা, এবং একটি ভুরু আরেকটির চেয়ে বেশী কালো, তবু মুখ আগুনের মতই লাল, যদিও সে হাসছে না তবু তার গালে টোল দেখা যাচ্ছে।

"আহ, না, না। এ ধরণের একজন মহিলাকে আমি শুধু ন্যুডলস এবং কাকের ঝোল খাওয়াই কি করে!"

লজ্জায় ই'র কান পর্যন্ত লাল হয়ে যায়।

২

রাত কাটে, নতুন ভোর আসে।

হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ই চোখ মেলে। পশ্চিম দেয়ালে সূর্যের আলো দেখে বুঝতে পারে খুব একটা সকাল নয়। সে গভীর ঘুমে অচেতন ছ্যাং-এ-র দিকে তাকায়। কোন শব্দ না করে গায়ে কাপড় চড়িয়ে চিতাবাঘের চামড়া দেয়া চেয়ার থেকে নামে এবং পা টিপে টিপে হলঘরে যায়। মুখ ধুতে ধুতে ন্যু-গেংকে বলে ঘোড়ার জিন পরানোর জন্য ওয়াং শেংকে আদেশ দিতে।

এত কাজ থাকে যে সে অনেক আগেই নাস্তার পাট চুকিয়ে দিয়েছে। ন্যাই তার থলেতে পাঁচটি কেক, পাঁচটি পেঁয়াজ পাতা এবং এক প্যাকেট মরিচের গুঁড়ো দিয়ে তার তীর ধনুকসহ কোমরের সঙ্গে শক্ত করে বেধে দেয়। সে শক্ত করে বেল্ট বাধে এবং ধীরে ধীরে হলঘরের বাইরে যায় এবং ন্যুগেংকে বলে :

"শিকারের জন্য আজ দূরে যাবার আশা রাখি। ফিরতে ফিরতে হয়ত একটু দেরী হবে। গিন্নী যখন নাস্তা সারবে এবং ভালো মেজাজে থাকবে তখন আমার হয়ে ক্ষমা চাইবে এবং সান্ধ্য খাবারের সময় আমার জন্য অপেক্ষা করতে বলবে। আমি ক্ষমা চেয়েছি — ভুলে যেয়ো না।"

সে হনহনিয়ে বেরিয়ে যায়, জিন পরায় এবং দু পাশে দাঁড়ানো প্রহরীদের ছাড়িয়ে যায়। সহসা গ্রামের বাইরে আসে। সামনেই সরগমের মাঠ, যেটা সে প্রতিদিন পার হয়। এটা সে উপেক্ষা করে, কেননা অনেক আগেই জেনেছে এখানে কিছু নেই। দুবার চাবুকের বাড়ি মেরে সে সামনে এগোয়, একটানা

ষাট লি পথ অতিক্রম করে। সামনেই গভীর বন। ঘোড়া হাফিয়ে ওঠায় এবং মুখে ফেনা বেরিয়ে যাওয়ায় গতি কমিয়ে আনে। আরো দশ লি পরে তারা বনের ভেতর ঢোকে। কিন্তু মৌমাছি, প্রজাপতি, পিপীলিকা, ফড়িং ছাড়া ই কিছুই দেখতে পায় না — কোন পশু-পাখীর চিহ্ন নেই। এই পতিত অরণ্যের প্রথম দৃশ্যে মনে হয়েছিল কিছু শেয়াল অথবা খরগোশ মারা যাবে, কিন্তু এখন সে বুঝতে পারে এটা দিবাস্বপ্ন। এগিয়ে গিয়ে সামনেই সবুজ সরগমের ক্ষেত দেখতে পায়। দূরে দু' একটি মাটির ঘর। বাতাসে একটা মিষ্টি গন্ধ, সূর্যের আলো কড়কড়ে, কাক-চড়ুই শব্দ শোনা যায় না।

মনের ভাব হাল্কা করার জন্য সে বলে : "বিরক্তিকর।"

আরো কয়েক কদম এগিয়ে যাওয়ার পর তার মন আনন্দে নেচে ওঠে। দূরে মাটির কুড়েঘরের সামনের উঠোনে সত্যি সত্যি একটি পেঁচা। এমনভাবে ঘুরছে দেখে মনে হয় বড় পায়রা। সে ধনুক নিয়ে তীর আটকায়, এবং জোরে টেনে ছেড়ে দেয়। উল্কার মত ছুড়ে যায় তার তীর।

ইতস্তত: না করে, কেননা কখনো তার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়নি, সে তীরের পেছনে ছুটে যায়। কিন্তু কাছে যেতেই এক বুড়ী এগিয়ে আসে ঘোড়ার দিকে। সে তীর লাগা বড় পায়রাটা তুলে চীৎকার করছে :

"তুমি কে? কেন তুমি আমার সবচে ভালো কালো মুরগীটি মেরেছ? তোমার কি আর কিছু করার নেই? ......"

ই'র দম বন্ধ হয়ে আসে। সে দম ফেলে।

"কি? মুরগী?" সে ভয়ে ভয়ে জবাব দেয়, "আমি ভেবেছিলাম কাঠপায়রা।"

"তুমি কি কানা? তোমার বয়স নিশ্চয়ই চল্লিশের ওপর।"

"হ্যাঁ। গত বছর পঁয়তাল্লিশ হয়েছে।"

"লোকে বলে, বোকা বুড়োর মত বোকা হয় না। ভেবে দেখ, মুরগীকে কাঠপায়রা বলে ভুল করে। তুমি কে?"

"আমি ই।" বলার সময় সে দেখতে পায় তার তীর মুরগীটার কলজে ছিদ্র করে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলেছে। তাই ঘোড়া থেকে নামার সময় নাম বলতে বলতে তার কণ্ঠ ভারী হয়ে আসে।

"ই? ...... তার কথা কখনো শুনিনি।" বুড়ী তার মুখের দিকে তাকায়।

"অনেকে আমার নাম জানে। রাজা ইয়াও-এর সুদিনে আমি বন্য বরাহ এবং সাপ শিকার করতাম ......"

"তুমি একটা মিথ্যুক। এগুলো প্রভু ফেং মেং[3] এবং অন্যেরা শিকার করেছে। হয়ত তুমি সাহায্য করেছিলে। কিন্তু এটা নিজে করার গর্ব কর কি করে? লজ্জা।"

"কেন? ফেং মেং গত কয়েক বছর ধরে প্রায় আমাকে দেখতে আসে। আমরা কখনো একসঙ্গে কাজ করি নি। এতে তার কোন অংশ ছিল না।"

"মিথ্যুক! সবাই সে কথা বলে। আমি মাসে চার পাঁচ বার একথা শুনি।"

"ঠিক আছে। এখন ফয়সালা করা যাক। এই মুরগীর কি হবে?"

"তোমাকে পূরণ করতে হবে। এটা সবচে সেরা ছিল, প্রতিদিন একটি করে ডিম দিত। বিনিময়ে আমাকে তোমার একজোড়া নিড়ানি এবং তিনটি টাকু দিতে হবে।"

"আমার দিকে তাকান — আমি চাষীও নই, জোলাও নই। আমি নিড়ানি অথবা টাকু কোথায় পাব? আমার কাছে টাকা পয়সাও নেই, শুধু পাঁচটি কেক আছে — কিন্তু সেগুলো ময়দার তৈরী। আমি আপনার মুরগীর বিনিময়ে এগুলোসহ, পাঁচটি পেঁয়াজ এবং এক প্যাকেট মরিচের গুঁড়ো দেব। কি বলেন? ......"

এক হাতে ব্যাগ থেকে কেকগুলো নিয়ে সে আর এক হাতে মুরগীটি তোলে।

বুড়ী ময়দার তৈরী কেকের ব্যাপারে খুব বিরক্ত নয়, কিন্তু সে পনেরোটি দাবী করতে থাকে। কিছুক্ষণ দরাদরির পর তারা দশটিতে রাজী হয় এবং ই প্রতিজ্ঞা করে সর্বশেষ পরদিন দুপুরের মধ্যে বাকী পাঁচটি এনে দেবে। জামিন হিসেবে রেখে যায় তার তীর। তার পর মনের শান্তিতে মুরগীটি থলেতে পুরে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়। ক্ষুধায় কাতর হলেও সে খুশী। এক বছরের বেশী হয়েছে শেষ বার মুরগীর স্যুপের স্বাদ নিয়েছে।

বন পেরোতে পেরোতে বিকেল হয়ে যায়। বাড়ীতে পৌঁছার অস্থিরতায় সে জোরে চাবুক চালাতে থাকে। তার ঘোড়াও ক্লান্ত এবং সন্ধ্যার আগে তারা পরিচিত সরগম মাঠে পৌঁছুতে পারে না। একটু দূরে একটি ছায়া তার নজরে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাতাস ভেদ করে তার দিকে ছুটে আসে একটি তীর।

ক্লান্ত ঘোড়ার রাশ না টেনে ই ধনুকে তীর বাগিয়ে ছুড়ে দেয়। ঝিং! দুটি তীরের মুখোমুখি সংঘর্ষে স্ফুলিঙ্গ উঠে এবং উল্টে মাটিতে পড়ার আগে দুটি তীরের লেজ উল্টো V এর মত হয়ে যায়। প্রথম দুটি মিলতে না মিলতেই দুজনেই আরো দুটি তীর ছুড়ে দেয়, আবার মাঝ-আকাশে সংঘর্ষ হয়। ই'র সরবরাহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা নয়বার এ রকম করে, এখন সে উল্টো দিকে দেখতে পায় ফেং মেংকে তার গলার দিকে আনন্দে তীর তাক করছে।

ই ভাবে, "ভালো, ভালো, ভেবেছিলাম সে সাগরতীরে মাছ ধরছে, কিন্তু এখন দেখি এ ধরণের নোংরামির জন্য ওৎ পেতে আছে। এখন বুঝছি বুড়ী কেন ওভাবে কথা বলেছে ......"

চোখের পলকে তার শক্রর ধনুক পূর্ণিমার চাঁদের মত গোল হয়ে যায় এবং বাতাসের ভেতর দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে তীরটি ই'র গলার দিকে এগিয়ে আসে। বোধ হয় লক্ষ্য ঠিক ছিল না, কেননা এটা ঠিক তার মুখে আঘাত করে। কেঁপে উঠে সে অসাড় হয়ে যায়, তার পর মাটিতে পড়ে যায়। তার ঘোড়াটি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে।

ই'কে মৃত মনে করে ফেং মেং পা টিপে টিপে এগিয়ে আসে। বিজয়ের আনন্দে হাসতে হাসতে সে মৃতের মুখের দিকে তাকায়।

সে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ই চোখ মেলে এবং উঠে বসে।

"আমাকে একশো বার মোকাবেলা করেও তুমি কিছু শেখো নি।" তীর ছুড়ে সে হেসে ওঠে। "তুমি আমার তীর খেয়ে ফেলার কৌশল কি জান না? খুব খারাপ। এসব ফন্দিতে কোন লাভ হবে না। তুমি গুরুর কাছ থেকে শেখা বিদ্যা দিয়ে গুরুকে মারতে পারবে না। তোমাকে নিজের একটা কিছু বের করতে হবে।"

বিজয়ী বিড়বিড় করে: "আমি মাছের তেলে মাছ ভাজতে চেয়েছিলাম

প্রাণ খুলে হাসতে হাসতে ই উঠে দাঁড়ায়। "তুমি সবসময় কোন না কোন প্রবাদ বলছ। হয়ত এসব দিয়ে বুড়ীকে মুগ্ধ করতে পারবে, কিন্তু আমাকে না। আমি সবসময় শিকার করেছি, তোমার মত ডাকাতি করিনি ......"

ব্যাগের ভেতর মুরগীটার ক্ষতি হয়নি দেখে সে ঘোড়ায় চড়ে চলে যায়।

"নিকুচি করি ......" সে একটা গাল শুনতে পায়।

"সে এত নীচে নেমেছে ভাবতে গেলে ...... তার মত একজন যুবক এবং সে গাল দেয়া শুরু করেছে। সেই বুড়ী বিশ্বাস করেছে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।" যেতে যেতে ই দুঃখে মাথা নাড়তে থাকে।

৩

সরগমের মাঠ পেরোনোর আগেই রাত নামে। নীল আকাশে তারার মেলা। পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যাতারা খুব বেশী জ্বল জ্বল করছে! মাঠের মাঝখানে আল দিয়ে ঘোড়াটি এগিয়ে চলেছে, এত ক্লান্ত যে গতি আগের চেয়ে অনেক মন্থর। ভাগ্য ভালো, দিগন্তে রূপালী আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে চাঁদ।

।" ই যার পেট এতক্ষণ মোচড়াচ্ছিল, ধৈর্য হারিয়ে ফেলে।

"বেঁচে থাকার জন্য যত কষ্ট করি, সময় নষ্ট করে তত বাজে ঘটনা ঘটে।" সে ঘোড়ার ওপর চাবুক চালায়, কিন্তু এটা একটু নড়ে চড়ে আগের মতই ধীরে ধীরে চলতে থাকে।

সে ভাবে : "এত দেরী হয়েছে, ছাংএ নিশ্চয়ই রেগে যাবে। তার মেজাজ চড়ে যেতে পারে। কপাল ভালো, তাকে খুশী করার জন্য এই ছোট্ট মুরগীটি আছে। তাকে বলব : 'গিন্নী দু'শ লি পথ আসা যাওয়া করে তোমার জন্য এটা পেয়েছি।' না এতে হবে না, খুব বাড়িয়ে বলা হচ্ছে।"

সামনেই আলো দেখে সে খুশী হয় এবং চিন্তা দূর করে দেয়। কোন চাবুক ছাড়াই ঘোড়াটি স্বচ্ছন্দে চলতে থাকে। বরফের মত সাদা গোল চাঁদের আলো তার পথে আলো ছড়িয়ে দিয়েছে এবং গালে লাগছে ঠাণ্ডা বাতাসের পরশ— বড় শিকার থেকে বাড়ী ফেরার চেয়ে এটা ভালো।

আবর্জনার স্তূপের পাশে ঘোড়াটি নিজে নিজে থেমে যায়। এক নজরে ই বুঝতে পারে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। পুরো বাড়ীতে একটা বিশৃংখলা। তার সঙ্গে দেখা করার জন্য যাও ফু একা এসেছে।

সে জানতে চায়, "কি হয়েছে? ওয়াং শেং কোথায়?"

"সে বেগমসাহেবাকে খুঁজতে ইয়াও পরিবারে গিয়েছে।"

"কি? তোমাদের বেগমসাহেবা ইয়াও পরিবারে গিয়েছেন?" নামতে নামতে ই'ও খুব অবাক হয়ে যায়।

"জ্বি।" যাও জিন এবং চাবুক নিয়ে নেয়।

তার পর ঘোড়া থেকে নেমে চৌকাঠ পেরোয় ই। এক মুহূর্ত ভেবে সে জিজ্ঞেস করার জন্য ফিরে তাকায়, "তুমি কি ঠিক জান অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে সে কোন রেস্তোরায় যায় নি?"

"না হুজুর। আমি সবগুলো রেস্তোরায় খুঁজেছি। তিনি নেই।"

চিন্তায় তার মাথা নুইয়ে আসে, ই বাড়ীতে ঢোকে। হলঘরের সামনে তিন চাকরানী ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিস্ময়ে সে চীৎকার করে :

"কি? তোমরা সবাই এখানে? তোমাদের বেগমসাহেবা কখনো একলা ইয়াও পরিবারে যায় না।"

তারা নীরবে তার দিকে তাকায়। তার পর তার ধনুক, তুণীর, এবং ছোট্ট মুরগীওয়ালা থলেটি নেয়। এক মুহূর্ত ভয় পেয়ে যায় ই। যদি রাগে ছাংএ আত্মহত্যা করে থাকে? সে যাও ফু'র জন্য ন্যুগেংকে পাঠায় এবং পেছনে পুকুর ও গাছে খোঁজ করতে বলে। একবার কামরায় এসে বুঝতে পারে অনুমান ভুল। সারা ঘর এলোমেলো, আলমারী খোলা এবং বিছানার পেছনে এক নজর দেখে

বোঝা যায় অলংকারের বাক্সটি উধাও। তার মনে হয় ঠাণ্ডা পানিতে ভিজে গেছে। তার কাছে সোনা রূপার কোন দাম নেই, কিন্তু সন্ন্যাসীর দেয়া সালসা সেই বাক্সে ছিল।

ঘরের ভেতর দুবার ঘুরবার পর সে দরজায় ওয়াং শেংকে দেখতে পায়।

"হুজুর, আমাদের বেগমসাহেবা ইয়াও পরিবারে নেই। তাঁরা আজকে পাশা খেলছেন না।"

ই তার দিকে তাকিয়ে কিছুই বলে না। ওয়াং শেং চলে যায়।

ঢুকতে ঢুকতে যাও ফু জিজ্ঞেস করে: "হুজুর, কি আমাকে ডেকেছিলেন?"

ই মাথা নেড়ে তাকে চলে যেতে ইশারা করে।

সে ঘরের ভেতর ঘুরতেই থাকে, ঘুরতেই থাকে, তার পর হলঘরে যায় এবং বসে পড়ে। মাথা তুলে উল্টো দিকের দেয়ালে দেখতে পায় সিন্দূর রংয়ের তীর-ধনুক, কালো তীর-ধনুক, ক্রসধনুক, তলোয়ার এবং ভোজালি। কিছুক্ষণ চিন্তার পর, সেখানে কাঠের মত দাঁড়িয়ে থাকা চাকরানীদের জিজ্ঞেস করে:

"তোমাদের বেগমসাহেবা কখন উধাও হয়েছেন?"

ন্যুই বলে: "যখন বাতি নিয়ে আসি তখন তিনি এখানে ছিলেন না। কিন্তু কেউ তাঁকে বাইরে যেতে দেখেনি।"

"তোমরা কি তাঁকে ঐ বাক্সে ওষধটা নিতে দেখেছ?"

"না, হুজুর। কিন্তু আজ বিকেলে তিনি কিছু পানি চেয়েছিলেন।"

আতংকে ই উঠে দাঁড়ায়। সন্দেহ হয় এই পৃথিবীতে সে একা।

জিজ্ঞেস করে: "তোমরা কি কোন কিছু স্বর্গের দিকে উড়ে যেতে দেখেছ?"

"ওহ।" ন্যুসিন চিন্তায় পড়ে যায়। "বাতি জ্বালিয়ে বাইরে এসে, এই পথে একটি কালো ছায়া উড়ে যেতে দেখেছি। স্বপ্নেও ভাবিনি তিনি আমাদের বেগমসাহেবা......" তার মুখ শুকিয়ে যায়।

"নিশ্চয়ই তাই ঘটেছে।" হাঁটু চাপড়ে ই লাফিয়ে উঠে। বেরিয়ে যেতে যেতে ফিরে ন্যুসিনকে জিজ্ঞেস করে: "ছায়াটি কোন দিকে গেছে?"

ন্যুসিন এক আঙ্গুলে দেখায়। কিন্তু সে দিকে শুধু দেখতে পায় গোল বরফের মত সাদা চাঁদ আকাশে ঝুলে আছে। এতে আবছা ইমারত আর গাছও দেখা যায়। যখন ছোট ছিল, দিদিমা চাঁদের সৌন্দর্যের কথা বলেছিলেন, আবছা আবছা সে বর্ণনার কথা মনে আছে। চাঁদটিকে নীলকান্ত মণির সাগরে ভাসতে দেখতে দেখতে তার হাত পা ভারী হয়ে আসে।

প্রতিহিংসা তাকে পেয়ে বসে। এবং এই প্রতিহিংসায় খুন করার ইচ্ছা বোধ করে। চোখ পাকিয়ে সে চাকরানীদের উদ্দেশে চীৎকার করে:

"আমার ধনুক নিয়ে আয়। যেটা দিয়ে আমি সূর্যকে বধ করেছিলাম। এবং তিনটি তীর।"

ন্যুই এবং ন্যুগেং অতিকায় ধনুকটি হলঘরের মাঝখানে নিয়ে ধুলা ঝাড়তে থাকে। তিনটি তীরসহ সেটা তারা তার হাতে তুলে দেয়।

এক হাতে ধনুক ধরে অন্য হাতে সে তিনটি তীর আটকায়। চাঁদের দিকে তাক করে ধনুকটি পুরোপুরি টানে। সেখানে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থেকে তার চোখ দিয়ে আগুনের ফুলকি বেরোতে থাকে, বাতাসে চুল দাড়ি এমনভাবে উড়তে থাকে যেন আগুনের কালো শিখা। এক মুহূর্তের জন্য তাকে মনে হয় সেই বীর, যে অনেক অনেক আগে সূর্যকে বধ করেছিল।

হঠাৎ, একটা, শুধু একটা হুইসিল শোনা যায়। তিনটি তীর একটার পর একটা এগিয়ে যায়, এত দ্রুত যে চোখে দেখা বা কানে শোনা অসম্ভব। একই জায়গায় এগুলো চাঁদকে আঘাত করা উচিত ছিল, কেননা এক চুলও ফাঁক না রেখে ওগুলো এগিয়ে যায়। কিন্তু নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে পথ সামান্য পাল্টে দেয়, যাতে তিনটি তীর তিন জায়গায় তিনটি ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে।

চাকরানীরা চেঁচিয়ে ওঠে। তারা চাঁদটিকে কাঁপতে দেখে এবং ভাবে নিশ্চয়ই পড়ে যাবে—কিন্তু তবু সেটা সেখানে শান্তভাবে ঝুলে থাকে, যেন একটুও আঁচড় লাগে নি এভাবে শান্ত, আরো উজ্জ্বল আলো ছড়াতে থাকে।

আকাশকে গাল দেয়ার জন্য ই মাথা পেছনে ছুড়ে দেয়। সে দেখে এবং অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু চাঁদটি কোন নজর দেয় না। সে তিন পা এগিয়ে যায়, চাঁদটিও তিন পা পিছিয়ে যায়। সে তিন পা পিছিয়ে আসে, চাঁদটিও তিন পা এগিয়ে আসে।

তারা নীরবে একে অপরের দিকে তাকায়।

অনুভূতিহীন ই ধনুকটি হলঘরের দরজার সঙ্গে হেলান দিয়ে রাখে। ভেতরে যায়। চাকরানীরা পিছু পিছু যায়।

সে বসে পড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "তোমাদের বেগমসাহেবা এখনথেকে নিজেকে নিয়ে চিরদিন সুখে থাকবেন। কেমন করে সে আমাকে রেখে ওখানে একলা উড়ে গেল? সে কি আমাকে খুব বুড়ো ঠাউরেছে? কিন্তু মাত্র গত মাসে বলেছে: তুমি বুড়ো নও। নিজেকে বুড়ো ভাবা মানসিক দুর্বলতার লক্ষণ......"

ন্যুই বলে: "তা হতে পারে না। হুজুর, লোকজন এখনো আপনাকে যোদ্ধা ভাবে।"

"কখনো কখনো আপনাকে শিল্পী মনে হয়।" ফোড়ন কাটে ন্যুসিন।

"ননসেন্স! আসল কথা হচ্ছে, কাকের ঝোলওয়ালা ঐ ন্যুডলগুলো খাওয়ার অযোগ্য। খেতে না পারার জন্য তাকে দোষ দিতে পারি না . . . . . ."

"ঐ চিতাবাঘের চামড়াটার একটা কোনা ছিঁড়ে গেছে। দেয়ালের দিকে মুখ করা একটি পা কেটে নেব সারাইয়ের জন্য। তাতে ভাল দেখাবে।" ন্যুসিন ভেতরে যায়।

"একটু অপেক্ষা কর!" বলে ই চিন্তা করে। "এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আমি ক্ষুধার্ত। জলদি মরিচের গুঁড়ো দিয়ে মুরগীর তরকারী এবং পাঁচ ক্যাটি কেক বানিয়ে দাও। তার পর শুতে যেতে পারি। আগামী কাল সেই সন্ন্যাসীকে আবার সালসার কথা বলব, যাতে তাকে অনুসরণ করতে পারি। ন্যুগেং, ওয়াং শেংকে বল আমার ঘোড়াকে চার পাত্র মটরশুঁটি দিতে।"

ডিসেম্বর, ১৯২৬

টীকা

1. চীনা রূপকথার বিখ্যাত তীরন্দাজ ই বা হৌ ই।

2. চীনা পৌরাণিক কাহিনীর দেবী। ই'র স্ত্রী হিসেবে বিবেচিত। অমরত্বের সালসা পান করে সে চাঁদে উড়ে যায় সেখানে দেবী হওয়ার জন্য।

3. ফেং মেং ছিলো ই'র শিষ্য এবং আর একজন ভাল তীরন্দাজ। তরুণ লেখক গাও ছাং-হোংকে ব্যঙ্গ করে বলা। কারণ সে লুস্যুন-এর শিষ্য ছিল। পরে প্রবন্ধ লিখে লুস্যুনকে আক্রমণ করে। তাই ইর বিরুদ্ধে ফেং মেং-এর তীর লুস্যুন-এর বিরুদ্ধে গাওএর আক্রমণের সঙ্গে তুলনীয়।

তলোয়ার

।।১।।

মেই জিয়ানছি মায়ের পাশে শুতে না শুতেই পাতিলের কাঠের ঢাকনা কাটার জন্য ইঁদুরগুলো বেরিয়ে আসে। শব্দে তার মাথা ধরে যায়। প্রথমে তার শব্দে কাজ হত, কিন্তু এখন ইঁদুরগুলো তাকে উপেক্ষা করে যেমন খুশী তেমন চিবিয়ে যাচ্ছে। মা জেগে যাবে এই ভয়ে সে এগুলোকে তাড়ানোর জন্য উচ্চ শব্দ করার সাহস পায় না। সারাদিনের পরিশ্রমে মা এত ক্লান্ত যে বালিশে মাথা রাখতে না রাখতেই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

অনেকক্ষণ পর নীরবতা নেমে আসে। সে ঝিমুচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ ঝুপ করে শব্দ হওয়ায় আচমকা তার তন্দ্রা কেটে যায়। সে মাটির পাত্রের সঙ্গে থাবার খর খর শব্দ শুনতে পায়।

"ভালো! আশা করি ডুবে মরবে!" সে আনন্দে ভাবতে থাকে এবং চুপচাপ উঠে বসে।

বিছানা থেকে নেমে, চাঁদের আলোয় সে দরজার দিকে যায়। পেছনে লাক-ড়ির জন্য হাত বাড়ায়, এবং একটি পাইনের লাকড়ি নিয়ে আগুন ধরিয়ে কলসীর ওপর আলো ফেলে। সত্যি, একটা বড় ইঁদুর পড়েছে ভেতরে। বেরিয়ে আসার মত জল খুব কম। শুধু ভেতরে সাঁতার কাটছে আর কলসীর গায়ে আঁচড় কাটছে।

ছেলেটি উল্লসিত হয়ে উঠে, "খুব মজা হয়েছে!" এটা সেই ইঁদুরগুলোর একটা যা প্রতিরাতে আসবাবপত্র কেটে তাকে ঘুমুতে দেয় নি। মজার দৃশ্য দেখার জন্য ছেলেটি দেয়ালের ছিদ্রে বাতিটি গেঁথে রাখে। তবু ইঁদুরটির বীজের মত চোখ দেখে তার ঘেন্না ধরে। সে একটি কাঠি নিয়ে এটাকে পানির নীচে ঠেলে দেয়। কিছুক্ষণ পর সে লাঠিটি সরিয়ে নেয় এবং ইঁদুরটি ওপরে উঠে সাঁতরাতে

থাকে এবং কলসীর গায়ে আঁচড় কাটতে থাকে, কিন্তু আগের চেয়ে কম শক্তিতে। এটার চোখজোড়া পানির নীচে — শুধু চোখে পড়ে ছোট্ট সরু নাকের লাল অগ্রভাগ, বেপরোয়া শ্বাস নিচ্ছে।

গত কিছুদিন ধরে লাল-নাক ওয়ালা লোকজনের ব্যাপারে সে বিরূপ। তবু এখন এই ছোট্ট লাল-নাক ওয়ালা প্রাণীটিকে তার কাছে করুণ মনে হয়। সে লাঠি দিয়ে ইঁদুরটির পেটে খোঁচা মারে। ইঁদুরটি সেটা ধরে ফেলে, তারপর একটু দম নিয়ে লাঠি বেয়ে উঠতে শুরু করে। কিন্তু এর গোটা শরীরের দৃশ্য — কালো পশম, ফোলা পেট, কৃমির মত লেজ — দেখে তার এত ঘেন্না লাগে যে লাঠি ঝাড়া দেয়। ইঁদুরটি ঝুপ করে পানির ভেতর পড়ে যায়। তারপর ডুবিয়ে দেয়ার জন্য সে কয়েকবার এটার মাথায় আঘাত করে।

এখন পাইনের লাকড়িটি ছয়বার বদলেছে। ক্লান্ত ইঁদুরটি ডুবে ডুবে কলসীর মাঝখানে ভাসছে, কখনো কখনো কিনারায় আসার চেষ্টা করছে। ছেলেটির আবার করুণা হয়। সে লাঠিটি ভেঙে দু'টুকরো করে ফেলে, তারপর কষ্ট করে ইঁদুরটিকে আটকে মেঝেতে ফেলে। প্রথমে এটা নড়ে নি, তারপর একটু দম নেয়, অনেকক্ষণ পর পা নড়ে এবং এটা উল্টে যায়, যেন চলে যায়। এতে মেই জিয়ানছি একটা ধাক্কা খায়। সঙ্গে সঙ্গে সে পা তুলে জোরে আঘাত করে। একটা ছোট্ট চীৎকার শুনতে পায়। নীচে তাকিয়ে দেখে, ইঁদুরটির নাকে-মুখে রক্ত — বোধ হয় মরে গেছে।

তার আবার খারাপ লাগে, এত খারাপ যেন অপরাধ করেছে। সে সেখানে উপুড় হয়ে বসে, দৃষ্টি ইঁদুরটির দিকে নিবদ্ধ, আর ওঠার শক্তি নেই।

এর মাঝে তার মায়ের ঘুম ভেঙেছে। বিছানা থেকে তিনি জিজ্ঞেস করেন: "বাবা, কি করছ?"

"একটা ইঁদুর ......" সে দ্রুত উঠে দাঁড়ায় এবং সংক্ষেপে জবাব দেয়ার জন্য ফিরে তাকায়।

"আমি জানি ইঁদুর। তুমি কি করছ? মারছ অথবা বাঁচিয়ে রাখছ?"

সে জবাব দেয় না। আলোও নিভে গেছে। সে সেখানে অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, চাঁদের মৃদু আলোর সঙ্গে চোখ মানিয়ে নিতে থাকে।

তার মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "মাঝরাতের পর তোমার বয়স ষোল হবে, কিন্তু এখনও ছেলে মানুষ আছ। তুমি কখনো বদলাবে না। মনে হচ্ছে তোমার বাবার প্রতিশোধ নেয়ার কেউ থাকবে না।"

মনে হচ্ছে ধূসর আলোয় বসে থাকা মায়ের মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপছে। তার নীচু কণ্ঠস্বরের অসীম দুঃখে তারও কাঁপুনি ধরে যায়। পর মুহূর্তে তার

শিরা উপশিরা দিয়ে গরম রক্ত বইতে শুরু করে।

"বাবার প্রতিশোধ? তাঁর কি প্রতিশোধ দরকার আছে?" অবাক বিস্ময়ে সে এগিয়ে যায়।

"প্রয়োজন আছে। সে দায়িত্ব তোমার। অনেকদিন তোমাকে বলতে চেয়েছি, কিন্তু ছোট ছিলে বলে কিছুই বলি নি। এখন তুমি আর ছেলে মানুষ নও, যদিও সেরকম ব্যবহার কর। আমি জানি না কি করতে হবে। তোমার মত একজন ছেলে মানুষ কি বড়ো মানুষের কাজ করতে পারে?"

"আমি পারি। মা, আমাকে বল। আমি বদলে দিতে যাচ্ছি......"

"নিশ্চয়ই, আমি তোমাকে বলতে পারি। এবং তোমাকে বদলে দিতে হবে।...... ঠিক আছে, এখানে আস।"

সে এগিয়ে যায়। তার মা বিছানায় উঠে বসে আচ্ছা চাঁদের আলোয় তার চোখ জ্বলজ্বল করছে।

মা গম্ভীরভাবে বলতে থাকে, "শোন, তলোয়ার নির্মাতা হিসেবে তোমার বাবার খুব খ্যাতি ছিল, এ তল্লাটে সবচে সেরা। যাতে উপোস করতে না হয় সেজন্যে তাঁর যন্ত্রপাতি বিক্রী করে দিয়েছি, তাই তোমার দেখার মত কিছু নেই। কিন্তু সারা পৃথিবীতে তিনি ছিলেন সেরা তলোয়ার নির্মাতা। বিশ বছর আগে, রাজার রক্ষিতা এক টুকরো লোহার জন্ম দেয়। তারা বলে একটি লোহার থামকে জড়িয়ে ধরার পর সে এটা গর্ভ ধারণ করেছে। এটা ছিল স্বচ্ছ, খাঁটি লোহা। এটা অমূল্য সম্পদ বুঝতে পেরে, রাজত্ব রক্ষা, শত্রুদের খতম করা এবং নিজের আত্মরক্ষার জন্য রাজা এটা দিয়ে একটা তলোয়ার বানানোর সিদ্ধান্ত নেন। কপাল খারাপ, তোমার বাবাকে এ কাজের জন্য বাছাই করা হয় এবং দু'হাতে তিনি লোহাটি বাড়ীতে নিয়ে আসেন। তিন বছর দিন রাত এটা পুড়িয়ে, পিটিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি দুটো তলোয়ার তৈরী করেন।

"শেষ পর্যন্ত যখন হাপর খুললেন তখন সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে উঠে যায়, মাটি কেঁপে ওঠে। সাদা ধোঁয়া ওপরে সাদা মেঘ বনে যায়, ধীরে তা রক্ত বর্ণ হয়ে ওঠে এবং সবকিছুর ওপর পীচ ফুলের রঙ ছিটিয়ে দিতে থাকে। কালো হাপরের ভেতর পড়ে থাকে দুটো লাল-গরম তলোয়ার। তোমার বাবা কূপের পরিষ্কার পানি ছিটাতে শুরু করলে তলোয়ার থেকে ছ্যাৎ ছ্যাৎ শব্দ উঠতে থাকে এবং ধীরে ধীরে নীল বর্ণ হয়ে যায়। সাতদিন, সাত রাত পর তলোয়ার দুটি উধাও হয়ে যায়। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় তখনো হাপরে পড়ে আছে, পরিষ্কার নীল এবং বরফের মত স্বচ্ছ।

"তোমার বাবার চোখে খুশীর ছটা ফুটে ওঠে। তলোয়ার দুটি তুলে তিনি

সেগুলো টোকা মেরে দেখেন, আদর করেন। তারপর তাঁর কপালে এবং মুখের কোনায় দুঃখের রেখা দেখা দেয়। তিনি দুটি কাস্কেটে তলোয়ার দুটি রাখেন।

"তিনি চুপে চুপে আমাকে বলেন, 'গত কয়েকদিনের আলামত দেখে তুমি বুঝতে পারছ সবাই জানে তলোয়ার তৈরী হয়ে গেছে। একটা রাজাকে দেয়ার জন্য কাল আমাকে অবশ্যই যেতে হবে। কিন্তু যেদিন এটা দেব, সেদিনই হবে আমার জীবনের শেষ দিন! ভয় হয়, আমাদের আর কখনো দেখা হবে না।'

"ভয় পেয়ে এবং তাঁর কথার মর্ম বুঝতে না পেরে কি জবাব দিতে হবে বুঝতে পারি নি। শুধু বলতে পারি : 'কিন্তু আপনি এত সুন্দর কাজ করেছেন।'

" 'আহ, তুমি বুঝতে পারছ না। রাজা সন্দেহপ্রবণ এবং নিষ্ঠুর। এখন আমি দুটো তলোয়ার তৈরী করেছি যা আগে কখনো দেখা যায় নি তাই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী-রা যাতে তাঁর বিরোধিতা অথবা তাঁকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে দিয়ে তলোয়ার বানাতে না পারে সেজন্যে তিনি আমাকে খুন করতে বাধ্য।'

"আমি চোখের জল ফেলি।

"তিনি বললেন : 'কেঁদো না। কোন পথ নেই। চোখের জল ভাগ্য বদলে দিতে পারে না। গত কিছু দিন ধরেই আমি এজন্যে তৈরী হয়েছি।' আমার হাঁটুর ওপর একটা কাস্কেট রাখতে রাখতে মনে হল তাঁর চোখে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তিনি আমাকে বলেন, 'এটা পুরুষ তলোয়ার। এটা রাখ। কাল রাজার কাছে নারী তলোয়ারটা নিয়ে যাব। ফিরে না আসলে বুঝবে আমি মৃত। চার পাঁচ মাসের মধ্যে কি তোমার বাচ্চা হবে না? দুঃখ করো না, আমাদের সন্তানকে ভালোভাবে লালন পালন করবে। যখন সে বড় হবে, তাকে এই তলোয়ার দিয়ে বলবে প্রতিশোধের জন্য রাজার মাথা কেটে ফেলতে।"

ছেলেটি জানতে চায়, "বাবা কি সেদিন ফিরেছিলেন?"

মা শান্তভাবে জবাব দেয় : "না। আমি সর্বত্র খোঁজ করেছি, কিন্তু তাঁর কোন খবব নেই। তারপর একজন আমাকে বলে তোমার বাবাই প্রথম নিজের তৈরী তলোয়ারকে নিজের রক্তে রাঙিয়েছেন। তাঁর ভূত রাজ প্রাসাদে আস্তনা গাড়বে এই ভয়ে তারা তাঁর শরীরকে সামনের দরজায় পুঁতে রাখে, আর মাথা পুঁতে রাখে পেছনের পার্কে।"

মেই জিয়ানছি'র মনে হয় তার শরীরে আগুন ধরেছে এবং মাথার প্রতিটি চুল দিয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বেরুচ্ছে। আঙ্গুলের গাঁট না ফোটা পর্যন্ত অন্ধকারে সে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে।

তার মা উঠে দাঁড়ায়, বিছানার মাথা থেকে একটি তক্তা সরায়। তারপর বাতি জ্বালিয়ে দরজার পেছন থেকে নিড়ানি বের করে ছেলেকে আদেশ করে :

"খোঁড়!"

ছেলেটির বুক ধুক ধুক করলেও, সে ধীরে ধীরে খোঁড়ে, কোপের পর কোপ। সে পাঁচ ফুটের বেশী হলদে মাটি খোঁড়ে, তারপর পচা কাঠের দেখা পাওয়া যায়।

"দেখ! খুব সাবধানে।" মা চীৎকার করে ওঠে।

গর্তের পাশে শুয়ে পড়ে হাত বাড়িয়ে সে পচা কাঠের সন্ধান পায়। তারপর তার আঙ্গুলে বরফের মত ঠাণ্ডা কিছু একটা লাগে। স্বচ্ছ, খাঁটি তলোয়ার। সে হাতলটা ধরে বাইরে নিয়ে আসে।

জানালার বাইরে চাঁদ-তারা এবং ঘরের ভেতর-বাতি হঠাৎ ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলে। পৃথিবী ভরে যায় ইস্পাত, নীল আলোতে। এবং এই ইস্পাত আলোতে মনে হয় তলোয়ারটি গলে চোখের আড়াল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভালো করে তাকিয়ে বালকটি দেখে তিনফুটের লম্বা একটা কিছু — কিন্তু খুব বেশী ধারালো নয় — আসলে পেঁয়াজ পাতার মত গোলাকার।

মা বলেন : "এখন থেকে তোমাকে আর নরম হলে চলবে না। বাবার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এই তলোয়ার নাও।"

"আমি ইতোমধ্যে মন নরম করা বন্ধ করে দিয়েছি। এ তলোয়ার দিয়ে আমি তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণ করব।"

"আমিও তাই আশা করি। একটি নীল কোট পর এবং তলোয়ারটি পেছনে বাঁধ। এক রঙ হলে কেউ দেখবে না। আমার কাছে কোট আছে।" তার মা আঙ্গুল দিয়ে বিছানার পেছনে এক জীর্ণ বাক্স দেখায়। "তুমি কালকেই বেরিয়ে পড়বে, আমার জন্য চিন্তা করবে না।"

মেই জিয়ানছি নতুন কোটটা পরার চেষ্টা করে, তার গায়ে ঠিক ঠিক লেগে গেছে। সে এটা দিয়ে তলোয়ারটা জড়িয়ে বালিশের কাছে রাখে, তারপর চুপচাপ শুয়ে পড়ে। তার বিশ্বাস, সে মন নরম করা বন্ধ করে দিয়েছে। মনে কিছু নেই এমন চিন্তা করার কথা সে ঠিক করে, তার পর ঘুমিয়ে পড়বে, নিয়মমত পরদিন ভোরে উঠে প্রাণঘাতী শত্রুর খোঁজে দৃঢ়তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়বে।

•

কিন্তু সে ঘুমোতে পারে না। এপাশ ওপাশ করে, সবসময় উঠে বসার জন্য ব্যস্ত। সে মায়েব দীর্ঘ, নরম এবং হতাশ শ্বাস শুনতে পায়। যখন মোরগের প্রথম ডাক শুনতে পায় বুঝতে পারে ভোর হয়েছে, এখন তার বয়স ষোল।

॥২॥

মেই জিয়ানছি, তার চোখ ফোলা, একবারও পেছনে না তাকিয়ে বাড়ী থেকে বেরোয়। নীল কোট এবং পেছনে বাঁধা তলোয়ার নিয়ে সে দ্রুত শহরের দিকে এগোয়। তখনো পূর্ব দিকে কোন আলো নেই। তখনো প্রতিটি পাতায় রাতের শিশির লেগে আছে। বনের শেষ সীমায় পেঁাছতে পেঁাছতে শিশিরকণাগুলো ঝলমলিয়ে ওঠে, এবং ভোরের স্পর্শ অনুভূত হয়। বহু দূরে তার নজরে পড়ে শহরের দেয়ালের ধূসর সীমা রেখা।

তরকারীওয়ালাদের সঙ্গে মিশে সে শহরে প্রবেশ করে। রাস্তা ঘাটে ইতোমধ্যে গোলমাল ও হৈচৈ বেধে গেছে। লোকজন অলসভাবে দলে দলে দাঁড়িয়ে আছে। যখন তখন মেয়েরা দরজা দিয়ে উঁকি মারছে। ঘুমের ফলে তাদের অনেকের চোখের পাতা ফোলা, চুল অবিন্যস্ত এবং মুখ ফ্যাকাশে কেননা পাউডার মাখার সময় পায় নি।

মেই জিয়ানছি বুঝতে পারে একটা বিরাট কিছু ঘটতে যাচ্ছে, এইসব লোকজন অধীরভাবে ও ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করছে।

সে এগোতেই একটি ছেলে পাশ কাটিয়ে যায়। পিঠের তলোয়ারের সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লেগে গিয়েছিল। সে ভয়ে ঘেমে ওঠে। প্রাসাদ থেকে অল্পদূরে উত্তরে মোড় নিয়ে দেখতে পায় একদল লোক রাস্তার দিকে তাদের মাথা বাড়িয়ে আছে। সে লোকজনের ভীড়ে নারী ও ছেলে মেয়েদের চীৎকার শুনতে পায়। তার অদৃশ্য তলোয়ার তাদের আহত করবে ভয়ে সে সামনে এগোনোর সাহস পায় না। কিন্তু নতুন আসা লোকজন তাকে সামনে ঠেলে দেয়। তাকে তাদের পথ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়, শেষ পর্যন্ত সে শুধু সামনে তাদের পিঠ ও বাড়ানো গলা দেখতে পায়।

হঠাৎ সামনের লোকজন একের পর এক হাঁটু গেড়ে বসে। দূরে নজরে পড়ে দু'জন ঘোড়সওয়ার পাশাপাশি এগিয়ে আসছে। তাদের পেছনে রয়েছে লাঠি, বর্শা, তলোয়ার, ধনুক, পতাকাবাহী যোদ্ধা। তারা হলদে ধোঁয়া উড়িয়ে আসছে। তার পেছনে, একটি চার ঘোড়ার টমটম। তাতে রয়েছে বাদ্যযন্ত্রী। তারা ঢোল করতাল এবং অদ্ভুত যন্ত্র বাজাচ্ছে। এর পেছনে রয়েছে আরো কিছু শকট। সেগুলোয় রয়েছে উজ্জ্বল পোশাক পরা রাজসভাসদ, বুড়ো অথবা বেঁটে মোটা লোক, ঘামে তাদের মুখ চকচক করছে। তাদের অনুসরণ করছে বল্লম, তলোয়ার ও ত্রিশূলওয়ালা অশ্বারোহী সৈন্য। তারপর নতজানু লোকজন উপুড় হয়

এবং মেই জিয়ানছি দেখতে পায় হলদে চাঁদোয়া দেয়া একটা বিরাট গাড়ী এগিয়ে আসছে। মাঝখানে বসে আছে উজ্জ্বল পোশাক পরা একটি মোটা লোক। মুখে ধূসর গোঁফ এবং মাথাটা ছোট। তার সঙ্গে রয়েছে ছেলেটির পিঠে বাঁধা তলোয়ারের মত একটি তলোয়ার।

মেই জিয়ানছি'র হঠাৎ কাঁপুনি ধরে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সে প্রচণ্ড গরম অনুভব করে। পিঠের তলোয়ারের হাতল ধরে সে নতজানু লোকজনের মাথার ফাঁক দিয়ে সামনে এগোয়।

কিন্তু পাঁচ ছয় কদমের বেশী এগোয় নি এমন সময় সে কারো সঙ্গে হোঁচট খায় এবং শীর্ণ মুখওয়ালা এক যুবকের ওপর গিয়ে পড়ে। তার তলোয়ারের মাথা কোন ক্ষতি করেছে কিনা এটা দেখার জন্য যেই সে ভয়ে ভয়ে ওঠার চেষ্টা করে তখন পাঁজরে দুটি প্রচণ্ড ঘুষি খায়। প্রতিবাদ না করে সে রাস্তার দিকে তাকায়। কিন্তু হলদে চাঁদোয়া দেয়া গাড়ী পার হয়ে গেছে। এমনকি পেছনের অশ্বারোহী চাকর বাকররাও বেশ দূরে চলে গিয়েছে।

রাস্তার দু'পাশের সবাই আবার উঠে দাঁড়ায়। শীর্ণ মুখওয়ালা যুবকটি মেই জিয়ানছি'র কলার চেপে ধরেছে এবং তাকে যেতে দেবে না। সৌরজাল নষ্ট করার জন্য তাকে দায়ী করে এবং আদেশ করে আশি বছর বয়সের আগে মারা গেলে তাকে নিজের জীবন দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ভবঘুরেরা একনজর দেখার জন্য ভীড় করে, কিন্তু কিছুই বলে না। শীর্ণ মুখওয়ালা যুবকের পক্ষ নেয়া লোকজন কিছু ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করে। এই বিদ্রূপে মেই জিয়ানছি হাসতেও পারে না, মেজাজও গরম করতে পারে না। তাদের মত বিরক্ত হলেও, তাদের কাছ থেকে ছাড়া পায় না। এক হাঁড়ি জোয়ার রান্নায় যতক্ষণ লাগে ব্যাপারটা ততক্ষণ ধরে চলে। সে অধৈর্য হয়ে জ্বলে ওঠে। তবু পথচারীরা যেতে চায় না, লোভীর মত তাকিয়ে থাকে।

তার পর ভীড় ঠেলে একজন কালো লোক এগিয়ে আসে, লোহার রঙের মত পাতলা, চোখ, দাড়ি কালো। কোন কথা না বলে, সে মেই জিয়ানছি'র দিকে নিষ্প্রাণ হাসি হাসে, তারপর তার হাত দিয়ে শীর্ণ মুখওয়ালা যুবকের চোয়াল চেপে ধরে তার চোখের দিকে তাকায়। এক মুহূর্ত যুবকটি তাকায়, তারপর ছেলেটি কলার ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। কালো লোকটিও চলে যায় এবং হতাশ দর্শকরা সরে পড়ে। কেউ কেউ এগিয়ে এসে মেই জিয়ানছি'কে তার বয়স ও ঠিকানা জিজ্ঞেস করে এবং জানতে চায় বাড়ীতে বোন আছে কিনা। কিন্তু সে তাদের উপেক্ষা করে।

সে দক্ষিণে হেঁটে যায়। বুঝতে পারে এই ব্যস্ত শহরে দুর্ঘটনায় কাউকে

আহত করা সম্ভব। বাবার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তার বরং রাজার প্রত্যাবর্তনের জন্য দক্ষিণ দরোজার বাইরে অপেক্ষা করা ভালো। সেই উন্মুক্ত জনশূন্য স্থানটি তার উদ্দেশ্যের জন্য সবচে ভালো। ইতোমধ্যে লোকজন পাহাড়ে রাজার ভ্রমণ সম্পর্কে আলোচনা করতে শুরু করেছে। কি লোকলস্কর! কি দাপট! রাজাকে দেখতে পাওয়া কত সম্মানজনক! তারা এত নত হয়েছে যে গোটা জাতির জন্য উদাহরণ হওয়া উচিত! তারা মৌমাছির মত গুন গুন করছে। দক্ষিণ দরোজার কাছে এটা শান্ত হয়ে আসে।

শহর ত্যাগ করার পর দুটি সেদ্ধ রুটি খাওয়ার জন্য সে একটা বড়ো তুঁত গাছের নীচে বসে। খেতে খেতে মার কথা ভাবতে গিয়ে তার গলায় আটকে যায়, তার পর সেটা কেটে যায়। চারদিকের সবকিছু ধীরে ধীরে নীরব হয়ে আসে, শেষ পর্যন্ত সে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস পরিষ্কার শুনতে পায়।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে সে অস্থির হয়ে উঠে। চোখ কচলে সামনে তাকায়, কিন্তু রাজার কোন চিহ্ন নেই। যেসব গ্রামবাসীরা তরকারী বেচার জন্য শহরে গিয়েছিল একের পর এক খালি ঝুড়ি কাঁধে বাড়ী ফিরছে।

সবকিছু শেষ হওয়ার পর সেই কালো লোকটা শহর থেকে বেরিয়ে আসে।

"মেই জিয়ানছি, পালাও! রাজা তোমার পেছনে লেগেছে।" তার গলা পেঁচার চীৎকারের মত মনে হয়।

মেই জিয়ানছি'র পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। স্তব্ধ হয়ে কালো লোকটিকে অনুসরণ করতে থাকে, দৌড়াচ্ছে যেন পাখা গজিয়েছে। সবশেষে, দম ফেলার অবসরে সে বুঝতে পারে তারা বনের কিনারায় পেঁাছেছে। অনেক পেছনে উদীয়মান চাঁদের রূপালী আলো, কিন্তু সামনে শুধু দেখতে পায় কালো লোকটির চোখ আলেয়ার মত জ্বলছে।

অবাক বিস্ময়ে ছেলেটি জিজ্ঞেস করে: "আপনি আমাকে চিনলেন কি করে? ......"

"আমি সবসময় তোমাকে চিনি।" লোকটি হেসে ওঠে। "আমি জানি. বাবার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তোমার পিঠে পুরুষ তলোয়ারটি রয়েছে। এবং আমি জানি তুমি ব্যর্থ হবে। শুধু তাই নয়, আজকে একজন তোমার বিরুদ্ধে বলে দিয়েছে। তোমার শত্রু পূর্ব দরজা দিয়ে রাজপ্রাসাদে ঢুকে তোমার গ্রেফতারের আদেশ জারী করেছে।"

মেই জিয়ানছি হতাশ হতে শুরু করে।

বিড়বিড়িয়ে বলে, "অবাক হওয়ার কিছু নেই, মা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়েছেন।"

"কিন্তু তিনি শুধু অর্ধেক জানেন। তিনি জানেন না যে আমি তোমার হয়ে

প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছি।"

"আপনি? ন্যায়ের প্রতীক, আপনি কি আমার হয়ে প্রতিশোধ নিতে রাজী?"

"আহ, ঐ উপাধি দিয়ে আমাকে অপমান করো না।"

"তাহলে, বিধবা এবং এতিমদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে?"

সে ধমকে উঠে, "এসব নোংরা শব্দ ব্যবহার করো না। ন্যায় বিচার, সহানুভূতি যা একসময় ভালো শব্দ ছিল, এখন নিষ্ঠুর, সুদখোরের পুঁজি। আমার হৃদয়ে এগুলোর জন্য কোন স্থান নেই। আমি শুধু তোমার হয়ে প্রতিশোধ নিতে চাই।"

"ভালো। কিন্তু কি ভাবে করবেন?"

"আমি তোমার কাছ থেকে দুটো জিনিষ চাই।" মনে হয় তার কণ্ঠ জ্বলন্ত চোখের নীচ থেকে আসছে। "কোন দুটো জিনিষ? প্রথমে তোমার তলোয়ার, তারপর তোমার মাথা।"

মেই জিয়ানছি'র কাছে প্রস্তাবটা বড় অদ্ভুত মনে হয়। ইতস্ততঃ করলেও, সে ভয় পায় না। এক মুহূর্তের জন্য সে বোবা হয়ে যায়।

অন্ধকারে সেই অশান্ত কণ্ঠ ভেসে আসে, "জীবন ও সম্পদ নিয়ে তোমাকে বোকা বানাতে চাই এটা ভয় করো না। সবটা তোমার ওপর নির্ভর করে। যদি বিশ্বাস কর তাহলে আমি এগোব, না করলে না।"

"কিন্তু আপনি কেন আমার হয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইছেন? আপনি কি আমার বাবাকে জানতেন?"

"প্রথম থেকেই তাকে জানতাম, যেভাবে সবসময় তোমাকে জেনেছি। কিন্তু সেটাই কারণ নয়। বুদ্ধিমান ছেলে, তুমি বুঝবে না, প্রতিশোধ গ্রহণে আমি কত ওস্তাদ। যা তোমার সেটা আমার, যা তাঁর ব্যাপার, সেটা আমারও ব্যাপার। আমি অন্যদের এবং নিজের কাছ থেকে হৃদয়ে এত আঘাত পেয়েছি যে এখন নিজেকে ঘৃণা করি।"

অন্ধকারের সেই কণ্ঠ থেমে যায়। মেই জিয়ানছি হাত দিয়ে পিঠ থেকে নীল তলোয়ার বের করে এবং একই সঙ্গে তার ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দেয়। পায়ের কাছে সবুজ শেওলার ওপর তার মাথা পড়তে পড়তে সে কালো লোকটিকে তরবারি এগিয়ে দেয়।

"আহা।" লোকটি এক হাতে তলোয়ারটি নেয় এবং অন্য হাতে চুল ধরে মেই জিয়ানছি'র মাথাটি তোলে। সে উষ্ণ ও মৃত ঠোঁটে দুবার চুমু খায় এবং তারপর নিষ্প্রাণ, অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

তার হাসি ছড়িয়ে পড়ে বনের ভেতর। তৎক্ষণাৎ, বনের গভীরে আলেয়ার

আলোর মত জ্বলজ্বলে চোখ চোখে পড়ে, যেটা পর মুহূর্তে এত কাছে এসে পড়ে যে নেকড়ের নিশ্বাস পর্যন্ত শোনা যায়। এক কামড়ে মেই জিয়ানছি'র নীল কোটটি টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তারপর তার গোটা শরীর এবং তৎক্ষণাৎ তার রক্ত চেটে খেয়ে ফেলে। একমাত্র হাড় চিবুনোর শব্দ আসে।

সবচে সামনের বড়ো নেকড়েটা কালো মানুষটির দিকেও ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু নীল তলোয়ারের এক ঘায়ে এর খণ্ডিত মাথা পড়ে যায় তার পায়ের কাছে সবুজ শেওলার ওপর। অন্য নেকড়েগুলো এক কামড়ে এর চামড়া তুলে ফেলে, তার শরীর সাবাড় করে এবং তৎক্ষণাৎ রক্ত চেটে খেয়ে ফেলে। একমাত্র হাড় চিবুনোর শব্দ আসে।

মেই জিয়ানছি'র মাথা জড়ানোর জন্য কালো লোকটি মাটি থেকে নীল কোটটি তুলে নেয়। পিঠে মাথা ও তলোয়ার বেঁধে নিয়ে অন্ধকারের ভেতর রাজধানীর দিকে এগিয়ে চলে।

নেকড়েগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, জিহ্বা দিয়ে লালা পড়তে থাকে এবং হাঁপাতে থাকে। সে চলে যাবার সময় তারা লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

সে অন্ধকারে রাজধানীর দিকে এগিয়ে চলে। কর্কশ কণ্ঠে গান গাইতে থাকে :

গান গাও, গান গাও,
যে ভালো বেসেছে তলোয়ার
মৃত্যুকে জেনেছে পুরস্কার।
যারা একা যায় তারা অসংখ্য
যারা তলোয়ার ভালোবাসে,
তাবা আর একা নয়।
দুশমনের বদলে দুশমন,
হা! মাথার বদলে মাথা।
দুজন মানুষ নিজের হাতে মৃত।

।।৩।।

পাহাড়ে গিয়ে রাজা খুব একটা শান্তি পান নি। রাস্তায় লুকিয়ে থাকা আততা-য়ীর সংবাদ তাঁকে আরো হতাশ করে দেয়। সে রাতে তাঁর মেজাজ ছিল খুব খারাপ। তিনি অভিযোগ করেন এমনকি নয় নম্বর রক্ষিতার চুলও গতদিনের মত এত কালো ছিল না। কপাল ভালো, সে রাজার হাঁটুতে বসে সত্তর বার চেষ্টা

করে তাঁর কপালের বলি রেখা মুছে দেয়।

কিন্তু পরদিন দুপুরে ঘুম থেকে ওঠার পর রাজার মেজাজ আবার চড়ে যায়। দুপুরের খাওয়া শেষ হতে হতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

হাই তুলে চেঁচিয়ে ওঠেন, "আমি বিরক্ত।"

রানী থেকে শুরু করে দরবারের ভাঁড় পর্যন্ত ভয়ে চুপসে যায়। রাজা অনেক দিন থেকেই বুড়ো মন্ত্রীদের উপদেশ এবং বামুন লোকদের হাসি ঠাট্টায় ক্লান্ত। সম্প্রতি দড়ির ওপর হাঁটা, ভোজবাজি, ডিগবাজী, তলোয়ার গিলে ফেলা, অগ্নি বমি করা, লাঠিতে ওঠার খেলাও তাঁর কাছে নীরস মনে হচ্ছে। এখন তাঁর রাগে ফেটে পড়ার উপক্রম, এত রাগ যে সামান্যতম অজুহাতে তলোয়ার বের করে মানুষ খুন করে ফেলবেন ।

দু'জন খোজা প্রাসাদের বাইরে লুকোচুরি খেলে ফিরে আসছিল। তারা দেখেছে রাজদরবারে অন্ধকার নেমে এসেছে, বুঝতে পেরেছে মারাত্মক বিপদ ঘনিয়ে আসছে। একজন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আরেকজন, সাহসে বুক বেঁধে আস্তে আস্তে রাজার সামনে গিয়ে নতজানু হয়ে ঘোষণা করে :

"দাস এই কথা জানাতে চায়, সে এইমাত্র এমন এক চমৎকার লোকের দেখা পেয়েছে যে মহামান্য রাজাকে আনন্দ দিতে পারবে।"

"কি ?" রাজা কথা বেশী বলেন না।

"সে একজন রোগা পাতলা কালো লোক, দেখতে ভিখিরীর মত। তার পরণে নীল পোশাক, পিঠে নীল, গোলাকার পুঁটলি এবং অদ্ভুত ছন্দহীন গান গায়। প্রশ্ন করলে, বলে, সে এমন অদ্ভুত খেলা দেখাতে পারে যা কেউ কখনো দেখে নি, পৃথিবীতে অদ্ভুত এবং সম্পূর্ণ নতুন। এ দৃশ্য দেখলে সব ঝামেলা চুকে যাবে এবং পৃথিবীতে শান্তি আসবে। কিন্তু দেখাতে বলায় সে দেখায় নি। সে বলে এজন্যে প্রয়োজন সোনালী ড্রাগন এবং সোনালী কড়াই ......"

"সোনালী ড্রাগন ? সে'ত আমি। সোনালী কড়াই ? আমার একটা আছে।"

"অনুগত দাস তাই ভেবেছে ......"

"তাকে ভেতরে নিয়ে আস।"

রাজার কণ্ঠ মিলিয়ে যাবার আগেই চারজন রক্ষী খোজার সঙ্গে দৌড়ে যায়। রানী থেকে শুরু করে রাজদরবারের ভাঁড় পর্যন্ত সবাই খুশী হয়ে ওঠে, আশা এই যাদুকর ঝামেলা মিটিয়ে দেবে এবং পৃথিবীতে শান্তি আনবে। খেলা না জমলেও, রোগা পাতলা, কালো, ভিখিরীর মত দেখতে লোকটি রাজ-রোষ সহ্য করতে পারবে। সে আসা পর্যন্ত তারা টিকতে পারলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

তাদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি। ছয়জন লোক সোনালী সিংহাস-

নের দিকে হনহনিয়ে এগিয়ে আসে। সামনে খোজা, পেছনে চারজন রক্ষী এবং মাঝখানে একটি কালো লোক। কাছে এলে তারা তাকিয়ে তার নীল কোট, কালো দাড়ি, ভুরু এবং চুল দেখতে পায়। সে এত শুকনো যে চোয়ালের হাড় বেরিয়ে আছে এবং চোখ গর্তের ভেতর। প্রণাম করার জন্য সে যখন নত-জানু হয় তারা তার পিঠের ওপর দেখতে পায় নীল কাপড়ে জড়ানো, গভীর লাল নকশাওয়ালা একটি ছোট গোল পুঁটলি।

"ঠিক আছে।" অধৈর্য হয়ে রাজা চেঁচিয়ে ওঠেন। লোকটির সাধারণ বেশভূষা তার কৌশলের জন্য ভালো হয় নি।

"প্রজার নাম ইয়ান-শি-আও-যে, জন্ম ওয়েনওয়েন গ্রামে। আমার কোন পেশা ছিল না। যখন বড় হই, তখন এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি আমাকে একটি বালকের মাথা নিয়ে যাদু দেখানো শেখান। তবে আমি এটা একা করতে পারি না। এটা হতে হবে সোনালী ড্রাগনের উপস্থিতিতে, আরো প্রয়োজন পরিষ্কার পানি ওয়ালা সোনালী কড়াই, কয়লা দিয়ে সেদ্ধ করা। যখন ছেলেটির মাথা রাখা হবে এবং পানি ফুটতে থাকবে তখন মাথাটি উঠবে, নামবে এবং সব ধরণের নাচ দেখাবে। অদ্ভুত কণ্ঠে গান গাইবে এবং হাসবে। যে কেউ এর গান শুনবে বা নাচতে দেখবে, সে ঝামেলা মেটানোর পথ পাবে। যখন সবাই দেখবে, সারা পৃথিবীতে শান্তি আসবে।

রাজা জোরে আদেশ দেন, "ঠিক আছে, দেখাও।"

তাদের খুব বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি। রাজদরবারের বাইরে একটি ষাঁড় সেদ্ধ করার মত বড় সোনালী কড়াই বসানো হয়। পরিষ্কার জলে ভর্তি, নীচে কয়লার আগুন। কালো লোকটি দাঁড়ায় এক পাশে। কয়লা লাল হলে সে পোটলা নামিয়ে খোলে। তারপর দু'হাতে তুলে ধরে সুন্দর ভুরু, বড় চোখ, সাদা দাঁত এবং লাল ঠোঁট ওয়ালা একটি বালকের মাথা। এর মুখে হাসি। এলো-মেলো চুল দেখতে অস্পষ্ট নীল ধোঁয়ার মত। পুরো জমায়েতকে ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য কালো লোকটি মাথাটি উঁচু করে ধরে। সে এটা কড়াইর ওপর ধরে, বিড়-বিড়িয়ে অস্পষ্ট কিছু একটা আওড়ায়, শেষ পর্যন্ত ঝুপ করে তা পানিতে ফেলে দেয়। প্রায় পাঁচ ফুট পর্যন্ত ফেনা ওঠে। তারি পর সবকিছু শান্ত হয়ে যায়।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছুই ঘটে না। রাজা ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন, রানী, রক্ষিতা, মন্ত্রী এবং খোজারা ভয় পেতে থাকে এবং কুঁজো বামুন ব্যঙ্গ করতে থাকে। এই ব্যঙ্গে রাজার মনে হয় তিনি বোকা বনেছেন। তিনি রক্ষীদের আদেশ দেন, এই হাবা যে তার রাজাকে প্রতারণা করার সাহস পেয়েছে তাকে কড়াইতে ফেলে সেদ্ধ করে মারতে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনি শুনতে পান পানি ফুটছে। গনগনে আগুনের আভা কালো লোকটির মুখে ছড়িয়ে পড়েছে, গলিত লাল লোহার মত দেখাচ্ছে। রাজা চারদিকে তাকিয়ে দেখেন। কালো লোকটি দু'হাত আকাশের দিকে তুলে শূন্যে তাকিয়ে আছে, নাচছে, কর্কশ কণ্ঠে গান গাইছে :

ভালোবাসার গান গাও,
আহা ভালোবাসা! আহা রক্ত! কে এমন নয়?
মানুষ অন্ধকারে লুকোয়,
রাজা জোরে হাসে,
দশহাজার মাথা মরে গিয়ে নত হয়েছে।
আমি শুধু একটি মাথা ব্যবহার করি,
একজনের মাথার জন্যই রক্ত ঝরুক!
রক্ত — বয়ে থাক!
গান গাও, গাও গান!

তার গানের সঙ্গে সঙ্গে কড়াই'র পানি কোনাকার পবতের মত ডপরে ডঠতে থাকে, উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ফুটতে থাকে। মাথাটি পানির সঙ্গে উপরে উঠতে, নীচে নামতে থাকে, ঘুরতে ঘুরতে ডিগবাজী খেতে থাকে। তারা শুধু এর মুখে সুখের হাসি দেখতে পায়। তারপর স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটার জন্য হঠাৎ এসব বন্ধ করে। ঘুরতে থাকে, আগ পিছ করতে থাকে এমনভাবে চারদিকে পানি ছিটাতে থাকে যে রাজদরবারে গরম পানির ফোটা পড়তে থাকে। বামুন-দের একজন চীৎকার করে নাক ঘষতে থাকে। ছ্যাকা খেয়ে সে ব্যথায় চীৎকার চেপে রাখতে পারে না।

কালো লোকটি গান বন্ধ করে দেয়। মাথাটি পানির মাঝখানে নিশ্চল, মুখমণ্ডল গম্ভীর। কয়েক সেকেণ্ড পর এটা আবার ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে, নামতে থাকে। এটা ওপরে নীচে সাঁতার কাটতে শুরু করে, খুব দ্রুত নয়, কিন্তু অসীম প্রশান্তিতে। উপর নীচ করে তিনবার কড়াইতে পাক খায়। তারপর চোখ মেলে, উজ্জ্বল কালো মণি বের করে গেয়ে উঠে :

রাজার শাসন ছড়িয়ে পড়ে দূর দূরান্তে
জয় করেন চারদিকের শত্রু।
পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে,
কিন্তু তাঁর ক্ষমতা নয়,
তাই আমি এখানে এসেছি উজ্জ্বল আলোয়।
চকচকে তলোয়ার — আমাকে ভুলো না,

রাজদর্শন, কিন্তু কপাল খারাপ।
গান গাও, গাও গান, রাজদর্শন!
ফিরে আস, যেখানে উজ্জ্বল নীল আলো।

মাথাটি হঠাৎ পানির ওপরে থেমে যায়। কয়েকবার ডিগবাজি খাওয়ার পর আবার ওঠা-নামা করতে থাকে, ডাইনে-বাঁয়ে মোহন দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে আর একবার গেয়ে উঠে:

হে, হো, যে ভালোবাসা আমরা জানি!
আমি কাটি একটি মাথা, একটি মাথা হে হো!
একটি মাথা ব্যবহার করি, বেশী নয়,
যে মাথা সে ব্যবহার করে তা অনেক ......।

গানের শেষ কলিতে মাথাটি আবার ডুবে যায়, যেহেতু আর উঠে নি তাই গান অস্পষ্ট হয়ে যায়। গান অস্পষ্ট হয়ে এলে ভাঁটার মত ফুটন্ত জল ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে, শেষ পর্যন্ত কড়াই'র কিনারার নীচে নেমে যায়। দূর থেকে আর কিছু দেখা যায় না।

"ঠিক আছে?" অপেক্ষা করতে করতে রাজা অধৈর্য হয়ে পড়েন।

"মাননীয় রাজা!" লোকটি এক হাঁটু গেঁড়ে বসে। "এটা কড়াই'র তলায় সবচে বিস্ময়কর মিলনের নাচ নাচছে। কাছে না এলে আপনি দেখতে পাবেন না। আমি এটাকে ওপরে আনতে পারি না, কেননা এই মিলনের নাচ কড়াই'র তলায় নাচতে হয়।"

রাজা উঠে সিঁড়ি বেয়ে কড়াই'র কাছে যান। তাপ উপেক্ষা করে দেখার জন্য মাথা ঝুঁকিয়ে দেন। আয়নার মত পরিষ্কার পানি। নিশ্চল মাথাটি সেখান থেকে রাজার দিকে তাকায়। যখন রাজার দৃষ্টি এর ওপর পড়ে তখন একটা মিষ্টি হাসি দেয়। হাসি দেখে রাজার মনে হয় তাদের আগে দেখা হয়েছে। এটা কে হতে পারে? যখন তিনি ভাবছেন, কালো লোকটি পিঠ থেকে নীল তলোয়ারটি এনে বিদ্যুতের মত রাজার ঘাড়ের ওপর চালিয়ে দেয়। ঝুপ করে কড়াইয়ের ভেতর পড়ে যায় রাজার মাথা।

যখন শত্রুরা মিলিত হয়, একনজরে একে অপরকে চিনতে পারে, বিশেষ করে খুব কাছাকাছি হলে। ঠিক যে মুহূর্তে রাজার মাথা পানি স্পর্শ করে, তখন মেই ছিয়ানছি'র মাথা এগিয়ে এসে তাঁর কান কামড়ে দেয়। দুটি মাথা মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হলে কড়াই'র জল টগবগ করে ফুটতে থাকে। প্রায় বিশ বার প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর রাজা পাঁচ জায়গায় এবং মেই জিয়ানছি সাত জায়গায় আহত হয়। দুষ্ট রাজা তার শত্রুর পেছনে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে, আর এক অসতর্ক

মুহূর্তে মেই জিয়ানছি'র ঘাড়ের পেছনে ধরে ফেলে তাই সে আর ঘুরতে পারে না। রেশমী পোকা যেভাবে তুঁতগাছের পাতা চিবিয়ে ধরে রাজা সেভাবে তার দাঁত বসিয়ে দেয়। কড়াই'র বাইরে ছেলেটির আর্ত চীৎকার শোনা যায়।

রানী থেকে শুরু করে ভাঁড় পর্যন্ত সবাই যারা ভয়ে জমে গিয়েছিল — এই চীৎকারে তাদের দেহে প্রাণ ফিরে আসে। তাদের মনে হয় সূর্য অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে। ভয়ে কাঁপতে থাকলেও তারা গোপন আনন্দ অনুভব করে। চোখ বড় করে অপেক্ষা করতে থাকে।

অবাক হয়ে গেলেও, কালো লোকটির চেহারা বদলায় নি। অনায়াসে সে অদৃশ্য তলোয়ার নিয়ে শুকনো ডালের মত হাত তোলে। সামনে ঝুঁকে পড়ে যেন কড়াইতে কিছু দেখছে। হঠাৎ তার হাত বেঁকে যায়, নীল তলোয়ারটি এক ঘায়ে তার মাথা কড়াইতে ফেলে দেয়। বরফের মত সাদা ফেনা চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

তার মাথা পানিতে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে রাজার মাথাকে আক্রমণ করে এবং রাজার নাক কামড়ে ধরে, প্রায় তুলে নেয়ার মত অবস্থা। ব্যথায় রাজা চীৎকার করে ওঠেন। ছাড়া পাবার জন্য মেই জিয়ানছি এই সুযোগ গ্রহণ করে এবং তার চোয়াল টেনে ধরে। তারা সর্বশক্তি দিয়ে উল্টো দিকে টানতে থাকে, তাই রাজা তার মুখ বন্ধ করে রাখতে পারে না। তারপর, ক্ষুধার্ত মুরগী যেভাবে ধানের উপর লাফিয়ে পড়ে সেভাবে তারা রাজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, যে পর্যন্ত রাজার চেহারা চেনার অযোগ্য হয়ে না যায়। প্রথমে রাজা কড়াইতে প্রাণপণ চেষ্টা করে, তারপর পড়ে থেকে কোঁকাতে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত দম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চুপ হয়ে পড়ে।

কালো লোকটি এবং মেই জিয়ানছি কামড়ানো বন্ধ করে দেয়। তাদের শত্রু ভান করছে কি না এটা দেখার জন্য তারা একবার কড়াইয়ের চারদিকে পাক খায়। রাজা মরেছে আশ্বস্ত হয়ে তারা চোখাচোখি করে এবং হাসে। তারপর আকাশের দিকে মুখ করে চোখ বন্ধ করে তারা জলের তলায় ডুবে যায়।

।৪।

ধোঁয়া সরে যায়, আগুন নিভে যায়। জলের ওপর আর কোন আলোড়ন নেই। অসীম নীরবতা ছোট বড় সকলের হুঁশ ফিরিয়ে আনে। কেউ হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে, তৎক্ষণাৎ ভয়ে অন্য সবাই চেঁচিয়ে ওঠে। কেউ একজন

সোনালী কড়াইয়ের দিকে এগোয়, অন্যেরাও তার পিছু পিছু যায়। যারা পেছনে জড়ো হয়েছে তারা শুধু সামনের লোকজনের ঘাড়ের ফাঁক দিয়ে দেখতে পায়।

আগুনের তাপ তখনো তাদের গালে লাগছে। আয়নার মত স্বচ্ছ পানি এখন তেলচেলে, তাতে সকলের ছায়া পড়েছে : রানী, রক্ষিতা, প্রহরী, পুরনো মন্ত্রী, বামুন, খোজা ......

"হা, ঈশ্বর! আমাদের রাজার মাথা এখনো ওখানে! কি ভয়ঙ্কর!" ছয় নম্বর রক্ষিতা হঠাৎ ফুঁপিয়ে ওঠে।

রানী থেকে শুরু করে ভাঁড় পর্যন্ত সবাই আতংকগ্রস্ত। তারা ভয়ে ছুটোছুটি করতে থাকে, বৃত্তাকারে দৌড়াতে থাকে। জ্ঞানী বুড়ো উপদেষ্টা একা সামনে এগিয়ে যান এবং কড়াই'র গায়ে হাত রাখেন। তিনি ভয়ে পিছিয়ে আসেন, আঙ্গুল সরিয়ে নেন এবং দুটো আঙ্গুল মুখের কাছে এনে ফুঁ দিতে থাকেন।

শেষ পর্যন্ত হুঁশ ফিরে এলে তারা কেমন করে রাজার মাথা তুলতে হবে তা নিয়ে পরামর্শ করার জন্য রাজ প্রাসাদের সামনে জড়ো হয়। তিন পাত্র জোয়ার রান্না করতে যে সময় লাগে ততক্ষণ পরামর্শ করে। শেষ সিদ্ধান্ত ছিল : বড় রান্নাঘর থেকে তারের চালুনী সংগ্রহ করা এবং রাজকীয় মাথা তোলার জন্য গার্ডদের আদেশ দেয়া।

সহসাই সরঞ্জাম তৈরী হয়ে যায় : তারের চালুনী, ছাঁকনী, সোনালী থালা এবং বুরুশ। সবকিছু রাখা হয় কড়াই'র পাশে। রক্ষীরা হাতা গুটায়। কেউ চালুনী হাতে, কেউ ছাঁকনী হাতে বিনয়ের সঙ্গে দেহাবশেষ তোলার কাজে হাত দেয়। চালুনী একটা আরেকটার সঙ্গে ধাক্কা খায়, কড়াই'র কিনারায় ধাক্কা খায় এবং জল ছিটকে পড়ে। কিছুক্ষণ পর একজন প্রহরী গম্ভীর মুখে দু'হাতে সতর্কতার সঙ্গে তার চালুনী তোলে। পাত্র থেকে মুক্তোর বিন্দুর মত ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে, তার মধ্যে বরফের মত সাদা একটা খুলি। সবাই যখন বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠে, সে খুলিটি রাখে একটি সোনালী থালার ওপর।

"হায়! আমাদের রাজা!" রানী, রক্ষিতা, মন্ত্রী এবং এমনকি খোজারা পর্যন্ত ফুঁপিয়ে ওঠে। তারা সহসাই থেমে যায় যখন আরেকজন প্রহরী প্রথমটার মত আরেকটি খুলি তোলে।

তারা অশ্রুসজল চোখে ঘর্মাক্ত প্রহরীদের উদ্ধার কাজ দেখতে থাকে। তারপর এক গুচ্ছ সাদা ও কালো চুল, কয়েক চামচ ছোট চুল, নিঃসন্দেহে সাদা ও কালো গোঁফ, উদ্ধার করে। তারপর আরেকটি খুলি। তারপর তিনটি চুলের কাঁটা।

কড়াইতে স্বচ্ছ স্যুপ ছাড়া যখন আর কিছুই নেই তখন তারা থামে এবং তিন সোনালী থালায় জিনিষগুলো ভাগ করে : একটিতে খুলি, একটিতে চুল,

একটিতে চুলের কাঁটা।

"মাননীয় রাজার একটি মাত্র মাথা ছিল। কোনটা তাঁর?" নয় নম্বর রক্ষিতা পাগলের মত জানতে চায়।

হতাশ হয়ে মন্ত্রীরা একে অপরের দিকে তাকায়। "তাইতো......"

নতজানু এক বামুন বলে : "চামড়া এবং মাংস সেদ্ধ না হয়ে গেলে কোনটা কার বলা সহজ হত।"

তারা বাধ্য হয়ে খুলিগুলো পরীক্ষা করতে থাকে, কিন্তু আকার ও রঙ প্রায় একই রকম। কোনটি ছেলের তারা তাও চিনতে পারে না। রানী বলেন যুবরাজ থাকা কালীন পড়ে যাওয়ায় রাজার মাথার ডানদিকে একটা কাটা দাগ ছিল, সে দাগ হয়ত এখনো খুলিতে আছে। সত্যি সত্যি, এক বামুন এক খুলিতে এরকম একটি দাগ আবিষ্কার করে এবং সবাই খুশী হয়ে ওঠে। এসময় আরেকটি বামুন আর একটি ঈষৎ হলদে খুলিতে এরকম একটি দাগ আবিষ্কার করে।

"আমি জানি।" খুশীতে বলে তিন নম্বর রক্ষিতা। "আমাদের রাজার নাক ছিল খুব উঁচু।"

খোজারা নাক পরীক্ষা করতে লেগে যায়। সত্যি সত্যি, একটা একটু উঁচু, কিন্তু তাদের মতে পার্থক্য করার তেমন কিছু নেই, কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই বিশেষ খুলিটির ডান দিকে কোন কাটা দাগ ছিল না।

মন্ত্রীরা খোজাদের বলে, "তাছাড়া, রাজার মাথার পেছনের দিকটা কি এত ফোলা ছিল?"

"আমরা কখনো মাননীয় রাজার মাথার পেছনে নজর দেই নি......"

রানী এবং রক্ষিতারা তাদের স্মৃতি হাতড়াতে থাকে। কেউ কেউ বলে এটা ছিল ফোলা, কেউ বলে সমান। যে খোজা রাজার চুল আঁচড়িয়েছে তাকে জিজ্ঞেস করলে সে কোন জবাব দেয় না।

সে সন্ধ্যায় রাজার মাথা বাছাই করার জন্য যুবরাজ ও মন্ত্রীদের সভা বসে, কিন্তু দিনের চেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায় না। বাস্তবে, চুল দাড়িও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সাদা নিঃসন্দেহে রাজার, কিন্তু যেহেতু তা ধূসর বর্ণের, তাই কালো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়াও খুব কঠিন। মাঝরাত্রি পযন্ত আলোচনার পর তারা কয়েকটি বাদামী দাড়ি সরিয়েছে এমন সময় নয় নম্বর রক্ষিতা প্রতিবাদ করে। সে নিশ্চিত রাজার গোঁফে বাদামী রং দেখেছে, সেক্ষেত্রে তারা কি করে নিশ্চিত হতে পারে একটিও লাল চুল নেই? তাদের সবগুলো একত্র করে ব্যাপারটা অমীমাংসিত রেখে দিতে হয়।

ভোর পর্যন্ত তারা কোন সমাধানে পেঁছুতে পারে না। হাই তুলতে তুলতে

আলোচনা চালায়। মোরগ যখন দ্বিতীয় বার ডাকে তখন তারা একটি সন্তোষ-জনক সমাধানে পৌঁছে: কবর দেয়ার জন্য রাজার শরীরের পাশে তিনটি মাথাই সোনালী কফিনের ভেতর রাখা হবে।

এক সপ্তাহ পরে শেষ কৃত্য হয়। পুরো শহর উত্তেজিত হয়ে পড়ে। রাজধানী এবং দূর দূরান্ত থেকে লোক আসে রাজকীয় শেষ কৃত্যে। ভোর হতে না হতেই পথঘাট ভরে যায় নারী পুরুষে। এদের মাঝখানে ভোগের সামগ্রীর টেবিলের চ্যাপ্টা হয়ে যাবার ফলা। দুপুরের একটু আগে অশ্বারোহীরা আসে রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য। তার পরে আসে পতাকা, লাঠি, বর্শা, ধনুক, এর মিছিল, পেছনে পেছনে চারগাড়ী বাদ্যযন্ত্রী। তারপর অসমান মাটিতে ওঠা নামা করতে করতে এগিয়ে আসে হলদে চাঁদোয়া দেয়া গাড়ী। সোনালী কফিন-এর, যার ভেতর রয়েছে তিনটি মাথা ও একটি দেহ, শবযান তৈরী করা সহজ ছিল।

লোকজন নতজানু হয়, ভোগের সামগ্রীর টেবিল চোখে পড়ে। রাজার সঙ্গে দুটি দুষ্ট আত্মা ভোগ গ্রহণ করছে এই কথা ভেবে কোন কোন অনুগত প্রজা রাগে গর গর করতে থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের কিছুই করার নেই।

এর পেছনে আসে রানী ও রক্ষিতাদের বাহন। লোকজন তাদের দিকে তাকায়, তারাও লোকজনের দিকে তাকায়; কিন্তু বিলাপ বন্ধ করে না। তারপর আসে মন্ত্রী, খোজা এবং বামুনরা, তাদের মুখেও বিষাদের ছায়া। কেউ তাদের দিকে সামান্য নজরও দেয় না, এবং তাদের মিছিলে কোন শৃংখলা নেই।

অক্টোবর, ১৯২৬